# হাদীসের নামে জালিয়াতি

## প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

# হাদীসের নামে জালিয়াতি

## প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা



**ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর**
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

**আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স**
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ
**www.assunnahtrust.com**

**الوضع في الحديث والأحاديث الموضوعة المشتهرة**

**تأليف: دكتور خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير**
**أستاذ قسم الحديث بالجامعة الإسلامية الحكومية، كوشتيا، بنغلادش**

# হাদীসের নামে জালিয়াতি

প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

**প্রকাশক**
উসামা খোন্দকার
**আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স**
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট ভবন
পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০
মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪, ০১৭১৫৪০০৬৪০

বিক্রয় কেন্দ্র: ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৯৮৬২৯০১৪৭

**প্রথম প্রকাশ :** যুলকাদ ১৪২৬ হিজরী, ডিসেম্বর ২০০৫ খৃস্টাব্দ
**পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ:**
রামাদান ১৪৩৪ হিজরী,
আষাঢ় ১৪২০ হিজরী বঙ্গাব্দ, জুলাই ২০১৩ খৃস্টাব্দ

হাদিয়া: ৩৮০ (তিনশত আশি) টাকা মাত্র।

**ISBN: 978-984-90053-3-9**

**"HADISER NAME JALIATI (Fabrication in the name of Hadith)" by Professor Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications,** As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300. 4th eddition, July 2013. Price TK 380 only.

### আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুরফুরার পীর আমীরুল ইত্তিহাদ মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী আল-কুরাইশী সাহেবের

# বাণী

**নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম, আম্মাবা'দ**

কুরআন কারীমের পরে দীন ইসলামের মূলভিত্তি হলো হাদীস। এজন্য হাদীস বিশুদ্ধভাবে শিক্ষা করতে, মুখস্থ রাখতে ও প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। একই সাথে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন তাঁর নামে মিথ্যা বলতে। মিথ্যা হতে পারে এরূপ সন্দেহজনক কোনো কথা তাঁর নামে যে বলবে, সেও মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

হাদীসের নামে জালিয়াতির প্রচেষ্টা সেই প্রাচীন যুগ থেকেই অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে সাহাবীগণের যুগ থেকেই মুসলিমগণ হাদীসের নামে সকল প্রকার মিথ্যা ও জালিয়াতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ সকল জাল হাদীস চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ক সঠিক জ্ঞানের অভাবে অনেক আলিম বা নেককার মানুষও না জেনে অনেক জাল হাদীস বলেন, প্রচার করেন বা লিখেন। এভাবে সমাজে অনেক জাল হাদীস ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা অনেকেই গাফলতির কারণে এ কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত হচ্ছি।

জাল হাদীসের উপর আমল করেও আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) যা করতে বলেন নি তা করে আমরা পণ্ডশ্রম করছি। উপরন্তু আমরা সহীহ হাদীসের উপর আমল করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছি। এজন্য মুসলিম উম্মাহর আলিমগণের উপর অর্পিত একটি ফরয দায়িত্ব হলো সমাজে প্রচলিত জাল হাদীসগুলো চিহ্নিত করা এবং এগুলোর খপ্পর থেকে সমাজকে রক্ষা করা। রাসূলুলাহ্ (ﷺ)-এর সুন্নাতকে জীবিত করার এ হলো অন্যতম পদক্ষেপ। আমার স্নেহাস্পদ জামাতা খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরকে আমি গত কয়েক বছর যাবৎ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার জন্য নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করছি। আল্লাহ পাকের রহমতে এতদিনে সে এ বিষয়ে একটি বই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

আমি আমার মুহিব্বীন, মুরীদীন ও দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমিকে বইটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি। যে সকল কথাকে 'জাল হাদীস' বলে জানতে পারবেন সেগুলোকে কোনো অজুহাতেই আর বলবেন না বা পালন করবেন না। তাহকীক করুন। কিন্তু 'অমুক বলেছেন', 'তমুক লিখেছেন', 'সহীহ না হলে কি তিনি বলতেন বা লিখতেন' ইত্যাদি কোনো অজুহাতেই সেগুলো বলবেন না বা পালন করবেন না। আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর দরবারে তার নিজের কর্মের হিসাব দিতে হবে, অন্যের কর্মের নয়।

কেউ হয়ত না জেনে বা ভুলে জাল হাদীস বলেছেন, সে কারণে কি আমি জেনে-শুনে একটি জাল হাদীস বলব? কারো হয়ত অনেক নেক আমল আছে, যেগুলোর কারণে আল্লাহ তার এরূপ দু'-চারটি ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার এ ইচ্ছাকৃত কঠিন পাপের ক্ষমা মিলবে কিভাবে?

কোনো হাদীস জাল বলে জানার পরে মুমিনের দায়িত্ব হলো তা বলা বা পালন স্থগিত করা। প্রয়োজনে সে বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে নিশ্চিত হতে হবে। কোনো বিষয়ে এ গ্রন্থের লেখকের ভুল হয়েছে বলে মনে হলে আপনারা আরো 'ইলমী তাহকীক' বা গবেষণা করবেন এবং মুহাদ্দিসগণের মতামত বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবেন। ভুল প্রমাণিত হলে তাকে বা আমাকে জানাবেন। তবে গায়ের জোরে বা মুহাদ্দিসগণের সুস্পষ্ট মতামতের বাইরে কিছু বলবেন না। মনে রাখবেন যে, কোনো মুসলিম যদি জীবনে একটিও 'হাদীস' না বলেন তবে তার কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু ওয়ায, দাওয়াত, ইবাদত বা অন্য যে কোনো নেক উদ্দেশ্যে যদি তিনি একটিও মিথ্যা বা জাল হাদীস বলেন তবে তা হবে কঠিনতম একটি পাপ।

মুসলিম উম্মাহ একমত যে, জাল হাদীস বলা বা রেওয়ায়াত করাও কঠিনতম হারাম। পোশাক-আশাক, পানাহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে হারাম হালাল বিষয়ে যেমন সতর্ক থাকতে হয়, কথাবার্তার ক্ষেত্রেও তেমনি হারাম-হালাল বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেন নি, তা তাঁর নামে বলা হলো সবচেয়ে কঠিন হারাম কথা। এ বিষয়ে সতর্কতা অতীব জরুরী।

মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন এ গ্রন্থখানা কবুল করেন এবং লেখককে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করেন। বইটি প্রকাশে যারা সহায়তা করেছেন এবং যারা গ্রন্থটি পড়বেন বা প্রচার করবেন তাদের সকলকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, বরকত, কল্যাণ ও উন্নতি দান করুন। আমীন!

**আহ্কারুল ইবাদ,**

**আবুল আনসার সিদ্দীকী**
**(পীর সাহেব, ফুরফুরা)**

# প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين

কুরআন কারীমের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি। মুমিনের জীবন আবর্তিত হয় রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর হাদীসকে কেন্দ্র করে। হাদীস ছাড়া কুরাআন অনুধাবন ও বাস্তাবায়ন করাও সম্ভব নয়। হাদীসের প্রতি এ স্বভাবজাত ভালবাসা ও নির্ভরতার সুযোগে অনেক জালিয়াত বিভিন্ন প্রকারের বানোয়াট কথা 'হাদীস' নামে সমাজে প্রচার করেছে। সকল যুগে আলিমগণ এসকল জাল ও বানোয়াট কথা নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত করে মুসলিমদের সচেতন করেছেন।

আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে হাদীসের পঠন, পাঠন ও চর্চা থাকলেও সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীসের বাছাইয়ের বিষয়ে বিশেষ অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। যুগ যুগ ধরে অগণিত বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা কথা হাদীস নামে আমাদের সমাজে প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে। এতে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত হচ্ছি। এছাড়াও দু'ভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। প্রথমতঃ এ সকল বানোয়াট হাদীস আমাদেরকে সহীহ হাদীসের শিক্ষা, চর্চা ও আমল থেকে বিরত রাখছে। দ্বিতীয়তঃ এগুলোর উপর আমল করে আমরা আল্লাহর কাছে পুরস্কারের বদলে শাস্তি পাওনা করে নিচ্ছি।

১৯৯৮ সাল থেকে আমার মুহতারাম শ্বশুর ফুরফুরার পীর মাওলানা আবুল আনসার সিদ্দীকী আল-কুরাইশী সাহেব (হাফিযাহুল্লাহ) আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন সমাজে প্রচলিত বানোয়াট ও জাল হাদীস সম্পর্কে বই লিখতে। তাঁর নির্দেশ অনুসারে কিছু বিষয় লিখে জমা করেছিলাম। ২০০২-২০০৩ সালে নেদায়ে ইসলামের কয়েক সংখ্যায় এ বিষয়ে কিছু লিখেছিলাম। কিন্তু যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা, সময়ের অভাব ইত্যাদি কারণে বিষয়টি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা আর হয়ে উঠছিল না। অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে পুস্তকটি প্রকাশ করতে পেরে তাঁর দরবারে অগণিত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

জাল হাদীসের বিষয়ে দু প্রকারের বিভ্রান্তি বিরাজমান। অনেকেই মনে করেন 'হাদীস' মানেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী, কাজেই কোনো হাদীসকে দুর্বল বলে মনে করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বা বাণীকে অবজ্ঞা করা। কেউবা মনে করেন, যত দুর্বল বা যয়ীফই হোক, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা, কাজেই তাকে গ্রহণ ও পালন করতে হবে।

এ ধারণা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত। তবে এর বিপরীতে এর চেয়েও মারাত্মক বিভ্রান্তি অনেকের মধ্যে বিরাজমান। অনেক অজ্ঞ 'পণ্ডিত' মনে করেন, হাদীস যেহেতু মৌখিকভাবে সনদ বা বর্ণনাকারীদের পরম্পরার মাধ্যমে বর্ণিত এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কয়েকশত বছর পরে লিখিত ও সংকলিত, কাজেই তার মধ্যে ভুলভ্রান্তি ব্যাপক। এজন্য হাদীসের উপর নির্ভর করা যাবে না। কেউবা ভাবেন, হাদীসের মধ্যে অনেক জাল কথা আছে, কাজেই আমরা আমাদের বুদ্ধি-বিবেক অনুসারে কোনোটি মানবো এবং কোনোটি মানবো না।

এ সকল বিভ্রান্তির কারণ হলো, হাদীসের সনদ বিচার ও হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণের সুক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এজন্য এ পুস্তকের প্রথম পর্বে হাদীসের পরিচয়, হাদীসের নামে মিথ্যার বিধান, ইতিহাস, হাদীসের নির্ভুলতা নির্ণয়ে সাহাবীগণ ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা পদ্ধতি, নিরীক্ষার ফলাফল, মিথ্যার প্রকারভেদ, মিথ্যাবাদী রাবীগণের শ্রেণীভাগ, জাল হাদীস নির্ধারণের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আশা করি এ আলোচনা পাঠকের মনের দ্বিধা ও অস্পষ্টতা দূর করবে এবং হাদীসের নির্ভুলতা রক্ষায় মুসলিম উম্মাহর অলৌকিক বৈশিষ্ট্য পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হবে।

দ্বিতীয় পর্বে আমাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও জাল হাদীসের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য যে, জাল হাদীসের বিষয়ে আমি মূলত নিজের কোনো মতামত উল্লেখ করি নি। দ্বিতীয় হিজরীর তাবিয়ী ও তাবে- তাবিয়ী ইমামগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের অগণিত মুহাদ্দিস রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচারিত সকল হাদীস সংকলন করে, গভীর নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের মাধ্যমে সে সকল হাদীস ও রাবীদের বিষয়ে যে মত প্রদান করেছেন আমি মূলত তার উপরেই নির্ভর করেছি এবং তাঁদের মতই উল্লেখ করেছি। যে সকল হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদ উল্লেখ করেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

দু একটি ক্ষেত্রে দেখেছি যে, আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু গ্রন্থে এমন কিছু হাদীস রয়েছে যা সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ কোনো প্রকারের সনদেই কোনো গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলো বাহ্যত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এ প্রকারের হাদীসের ক্ষেত্রে আমি নিজের মতামত প্রকাশ করেছি। পরবর্তী খণ্ডগুলোতে এ প্রকারের হাদীস সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ ধরনের অনেক কথা সরাসরি হাদীস নামে বলা হয়। আবার অনেক কথা সাওয়াব, ফযীলত, বরকত বা ক্ষতির কারণ হিসাবে সাধারণ ভাবে বলা হয়, কিন্তু পাঠক বা শ্রোতা কথাটিকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর কথা বলেই বোঝেন। এ জাতীয় অনেক কথা আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেগুলো সম্পর্কেও মাঝে মাঝে আলোচনা করেছি।

প্রচলন বুঝাতে কখনো কখনো প্রচলিত বই-পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছি। এ সকল ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য কথাটির প্রচলন বুঝানো। উক্ত বই বা লেখকের সমালোচনা বা অবমূল্যায়ন আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং তাঁদের খেদমতের স্বীকৃতির সাথে সাথে হাদীসের নামে প্রচলিত বানোয়াট কথাগুলোর বিষয়ে পাঠকদেরকে সতর্ক করাই আমার উদ্দেশ্য। সকল লেখকই তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাবেন। আমরা এ সকল লেখকের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, তিনি তাঁদের মহান খেদমত কবুল করুন, তাঁদেরকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন এবং আমাদের ও তাঁদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করুন।

বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির একটি কারণ হলো, প্রায় সকল বিষয়ে বানোয়াট হাদীসগুলো আলোচনার সময় সে বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলোর বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে হয়েছে। দুটি কারণে তা করতে হয়েছে:

**প্রথমত:** অনেক সময় জালিয়াতগণ জাল হাদীস তৈরি করার সময় সহীহ হাদীসের কিছু শব্দ ও বাক্য তার সাথে জুড়ে দেয়। এছাড়া অনুবাদের কারণে অনেক সময় জাল ও সহীহ হাদীসের অর্থ কাছাকাছি মনে হয়। এজন্য শুধু জাল হাদীসটি উল্লেখ করলে সাধারণ পাঠকের

মনে হতে পারে যে, এ বিষয়ে সকল হাদীসই বুঝি জাল। অথবা, এ অর্থের একটি হাদীস অমুক গ্রন্থে রয়েছে, কাজেই তা জাল হয় কিভাবে।

**দ্বিতীয়ত:** শুধু জাল হাদীস চিহ্নিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বাসে ও কর্মে জাল হাদীস বর্জন করে সহীহ হাদীসের উপর আমল করে নিজেদের নাজাতের জন্য চেষ্টা করা। এজন্য জাল হাদীস উল্লেখের সময় সে বিষয়ক সহীহ হাদীসগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও কিছু বলেছি।

সম্মানিত পাঠককে একটি বিষয়ে সাবধান করতে চাই। আমরা জানি যে, নিজে কর্ম করার চেয়ে অন্যের সমালোচনা করা অনেক বেশি সহজ ও মানবীয় প্রবৃত্তির কাছে আনন্দদায়ক। এজন্য অনেক সময় আমরা একটি নতুন বিষয় জানতে পারলে সে নতুন জ্ঞানকে অন্যের দোষ ধরার জন্য ব্যবহার করি।

আমাকে একজন বললেন, "অমুকেরা যয়ীফ বা জাল হাদীস দিয়ে মানুষদের আল্লাহর পথে ডাকেন। কত বলি যে, আপনারা সহীহ হাদীসের কিতাব পড়ুন, কিন্তু তাঁরা শুনেন না।" আমি বললাম, "তাঁরা তো যয়ীফ হাদীস দিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে যেয়ে ডাকছেন, আপনি সহীহ হাদীসের গ্রন্থগুলো নিয়ে ক'জনের দ্বারে গিয়েছেন?" শুধু সমালোচনা কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

এ বই থেকে আমরা অনেক জাল হাদীসের কথা জানতে পারব। এ জ্ঞান আমাদেরকে সহজেই শয়তানের খপ্পরে ফেলে দিতে পারে। আমরা চায়ের দোকানে, মসজিদে, ওয়াযে, আলোচনায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলকে সমালোচনা করে বলতে পারব যে, তারা অমুক জাল হাদীসটি বলেন বা পালন করেন।

এ কর্মের দ্বারা আমরা সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ অর্জন করব। এ বইটি লেখার উদ্দেশ্য তা নয়। এ বইটি লেখার উদ্দেশ্য হলো আমরা অনির্ভরযোগ্য, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট 'হাদীসে'র পরিবর্তে সহীহ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করে নিজেদের কর্ম ও বিশ্বাসকে আরো উন্নত করব। যে সকল সহীহ হাদীস আমরা জানতে পারব সেগুলো ব্যক্তিগতভাবে পালন করব এবং অন্যদেরকে পালন করতে উৎসাহ দেব। যে সকল জাল হাদীসের বিষয়ে জানতে পারব সেগুলো কখনোই আর হাদীস হিসেবে বলব না বা পালন করব না। কেউ তা করলে সম্ভব হলে ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের সাথে সংশোধনের চেষ্টা করব। সর্বাবস্থায় মহিমাময় করুণাময় আল্লাহর কাছে তার ও আমাদের নিজেদের ক্ষমা ও কবুলিয়তের জন্য দোয়া করব।

সম্মানিত পাঠক, আমার যোগ্যতার কমতির বিষয়ে আমি সচেতন। আমি জানি এ বিষযে লেখালেখি করার যোগ্যতা মূলত আমার নেই। যা কিছু লিখেছি সবই মূলত ধার করা বিদ্যা। আর এতে ভুল ভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই যে কোনো বিষয়ে যদি আপনি আমার ভুল ধরে দেন তবে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং আপনাকে উস্তাদের সম্মান প্রদান করব।

আগেই বলেছি, এ পুস্তকটি লিখতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুর ফুরফুরার পীর শায়খ আবুল আনসার সিদ্দীকী। মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করেন, তাঁকে, তাঁর সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তবৃন্দকে হেফাযত করেন। এ ছাড়া অনেক বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ী আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। বন্ধুবর ড. মো. আবু সিনা, ড. মো. অলি উল্যাহ, জনাব আ. শ. ম. শুআইব আহমদ ও জনাব মো. আব্দুল মালেক বইটির পাণ্ডুলিপি দেখে অনেক গঠনমূলক পরামর্শ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

বানানের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বাংলা একাডেমী মতামত অনুসরণ করা হয়েছে। তবে আরবী-ফারসী শব্দের ক্ষেত্রে মূল উচ্চারণের কাছাকাছি বর্ণ ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। বিষয়টি কঠিন। অগণিত আরবী শব্দ ফারসী-উর্দুর প্রভাবে ভুল উচ্চারণে ও ভুল প্রতিবর্ণে বাংলা ভাষার সম্পদে পরিণত হয়েছে। এগুলো অনেক ক্ষেত্রে সেভাবেই রাখা হয়েছে।

রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর হাদীসের খেদমতে একটি অতি নগণ্য প্রচেষ্টা এ গ্রন্থ। আমার কর্মের মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়েছে। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি দয়া করে ভুলত্রুটি ক্ষমা করে এ নগণ্য খেদমতটুকু কবুল করেন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়, বন্ধুগণ ও সকল পাঠকের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন!

**আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর**

## তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রশংসা আলাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর মহান রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের উপর। ২০০৫ সালে এ বইটি প্রকাশের পর প্রশংসা ও নিন্দা অনেক হলেও তথ্যগত সংশোধন বা সংযোজন করতে তেমন কেউ এগিয়ে আসেন নি। যে কজন তথ্যগত সহযোগিতা করেছেন তাদের অন্যতম যশোর জেলার মনিরামপুরের মুহাতারাম ভাই আসাদুল্লাহ। 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বইটি পড়ার পর তিনি আমাকে বললেন, "ফুরফুরা শরীফ থেকে ইতোপূর্বে উর্দু ভাষায় জাল হাদীস বিষয়ক যে বইটি লেখা হয়েছিল সে বইয়ের সাথে আপনার এ বইয়ের অনেক মিল রয়েছে। আমার আব্বা ফুরফুরার মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। তিনি বইটি কিনেছিলেন এবং আমার কাছে এখনো তা রয়েছে।" অতীব আগ্রহের সাথে আমি বইটি তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করলাম। পরবর্তীতে ফুরফুরায় যোগাযোগ করে জানতে পারলাম যে, বইটি তথায় পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে।

ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দীকীর (রাহ) জীবদ্দশায় তাঁরই নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আল্লামা আবু জাফর সিদ্দীকী (রাহ) ১৩৪৮ হিজরীতে (১৯২৯ খৃ) উর্দু ভাষায় 'আল-মাউযূআত' নামে জাল হাদীস বিষয়ক এ বইটি লিখেন এবং ১৩৫২ হি. (১৯৩৩ খৃ) তিনি বইটি প্রকাশ করেন।

গ্রন্থটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ থেকে কিছু ভিত্তিহীন বা জাল হাদীস সংকলন করেছেন তিনি, যেন সাধারণ ও অসাধারণ সকলেই জানতে পারেন যে, এগুলো বানোয়াট। কারণ অনেকেই তাদের ওয়ায-নসীহত, কথাবার্তা ও আলোচনার মধ্যে তাহকীক বা অনুসন্ধান না করে অনেক জাল হাদীস ও বানোয়াট গল্প-কাহিনী উল্লেখ করেন। তা সহীহ না জাল তা তারা চিন্তা করেন না। জাল হাদীস বর্ণনার ভয়াবহ পরিণতি সকলেরই জানা দরকার। তিনি আরো লিখেছেন যে, অতীতে অনেক মানুষ প্রকৃতই

কামেল ও মুকাম্মাল ছিলেন। তবে ইলম হাদীসের ময়দান অনেক বড়। সেখানে তারা ঢিলেমি করেছেন এবং মাউযূ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি জাল হাদীস বিষয়ক কিছু ঘটনা এবং মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। এরপর অভিধান পদ্ধতিতে প্রায় ৫০০ জাল হাদীস সংকলন করেছেন। পৃথক পরিচ্ছেদে তিনি অনেক ভিত্তিহীন কাহিনী, বিশ্বাস, কুসংস্কার ও জনশ্রুতি উল্লেখ করেছেন। তাঁর সংকলিত এ সকল জাল হাদীস ও মূলনীতি অধিকাংশই আমার এ পুস্তকে এসে গিয়েছে। এছাড়া গ্রন্থের শেষে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, তাসাউফ, ফাতওয়া, ওয়াজ ও গল্প-কাহিনী বিষয়ক যে সকল গ্রন্থে জাল হাদীসের সংখ্যা বেশি সেগুলোর একটি তালিকা প্রদান করে সেগুলো পাঠ না করতে বা সাবধানে পাঠ করতে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। উপসংহারে তিনি লিখেছেন যে, তাঁর গ্রন্থের কোনো হাদীস জাল নয় বলে যদি কারো সন্দেহ হয় তবে তিনি যেন, অনুগ্রহপূর্বক সনদসহ হাদীসটি তাঁর কাছে লিখে পাঠান, যেন ইলমুর রিজালের গ্রন্থাদির আলোকে সনদটি বিচার করা যায়। হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচারে শুধু গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া বা হাদীসটি অমুক কিতাবে উল্লেখ আছে বলা যথেষ্ট নয়, কিন্তু যদি হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থ হয় তবে ভিন্ন কথা।

জাল হাদীসের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণের প্রতিরোধের ধারাবাহিকতায় আল্লামা আবু জাফর লিখিত এ গ্রন্থ। আমার গ্রন্থের ১৩১-১৩২ পৃষ্ঠায় জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলির যে তালিকা লিখেছি তার শেষে সংযুক্ত হবে এ গ্রন্থ। বঙ্গদেশের ইতিহাসে এ গ্রন্থের মূল্য অনেক। বাঙালী লেখকের রচিত ও বঙ্গদেশে প্রকাশিত জাল হাদীস বিষয়ক এটি প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা করছি এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

বইটি প্রমাণ করে যে, সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও জাল হাদীস প্রতিরোধ খুব কঠিন কাজ। বাংলাদেশের অগণিত আলিম-উলামা ও পীর-বুজুর্গ ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীকী ও তাঁর সন্তানদেরকে অতীব ভক্তি করেন। কিন্তু জাল হাদীসের বিরুদ্ধে তাঁদের মতামত তাঁরা গ্রহণ করেন নি। এ গ্রন্থটি ফুরফুরার ভক্ত-খলীফাগণ পড়েও দেখেন না। ফুরফুরার পীর যে সকল কথা বা হাদীসকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন, উপরন্তু এগুলোর প্রচারকরদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, ফুরফুরার অগণিত খলীফা ও ভক্ত নিজেদের কথাবার্তায় বা লেখায় সেগুলো উল্লেখ করছেন এবং সেগুলোকেই নিজেদের আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জাল হাদীস নির্ভর হওয়ার কারণে যে সকল পুস্তক পাঠ করতে তিনি নিষেধ করেছেন সেগুলো তাঁরা মূল পাঠ্য ও দলীল হিসেবে গ্রহণ করছেন!!

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে পাঠক জানবেন যে, ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহা. আব্দুল কাহ্‌হার সিদ্দীকী (রাহ) তাঁর পিতা-পিতামহের সুযোগ্য ও প্রকৃত উত্তরসূরী হিসেবে জাল হাদীসের বিরুদ্ধে এ বইটি লিখতে আমাকে নির্দেশ দান করেন। ২০০৬-এর ডিসেম্বরে তিনি তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নিয়েছেন। মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন তাঁকে মাগফিরাত, রহমত ও সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করেন, তাঁর সন্তানগণ-সহ আমাদেরকে তাওহীদ ও সুন্নাতের খেদমতে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে আমাদেরকে পুনরায় একত্রিত করেন। আমীন!

**আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর**

## চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনি'মাতিহী তাতিম্মুস স্বালিহাত। প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত যার নিয়ামতেই পূর্ণতা লাভ করে ভাল কর্মগুলো। মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বইটিকে নতুন করে বিন্যাস, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে প্রকাশ করতে পেরে তাঁর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সালাত ও সালাম তাঁর হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবী ও অনুসারীদের উপর।

২০০৮ সালে বইটির তৃতীয় সংস্করণে ভূমিকায় পাঠকদেরকে ফুরফুরার পীর আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত ও ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত "আল-মাউযূআত" বইটির কথা জানিয়েছিলাম। বস্তুত এ বইটি বঙ্গদেশীয় কোনো আলিমের লেখা ও বঙ্গদেশে প্রকাশিত জাল হাদীস বিষয়ক প্রাচীনতম গ্রন্থ। সম্ভবত উর্দভাষাতেও এটি জাল হাদীস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। মহান আল্লাহর রহমত ও তাওফীকে পরের বছর ২০০৯ সালে উক্ত বইটির বাংলা অনুবাদ বিস্তারিত পর্যালোচনা-সহ প্রকাশ করতে সক্ষম হই। **"ফুরফুরার পীর আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর (রাহ) আল-মাউযূআত: একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা"** নামের এ বইটি পাঠ করতে সম্মানিত পাঠককে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

এবারের সংস্করণে প্রথম পর্বের শেষদিকে **"জাল হাদীস চিহ্নিতকরণে বাঙালী আলিমগণ"** শীর্ষক একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছি। এ পরিচ্ছেদে আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকীর এ বইটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এছাড়া জাল হাদীস প্রতিরোধে মাওলানা রুহুল আমিন বশিরহাটীর (১৯৪৫ খৃ) বিভিন্ন বক্তব্য আলোচনা করেছি। সমকালীন বাংলাদেশে জাল হাদীস বিষয়ে রচিত মূল্যবান দুটি গ্রন্থ: শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সম্পাদিত 'প্রচলিত জাল হাদীস' এবং আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরীরর তত্ত্বাবধানে মাওলানা যাকারিয়া হাসানাবাদী রচিত 'প্রচলিত জাল হাদীস: একটি তাত্ত্বিক আলোচনা'। এ পরিচ্ছেদে এ গ্রন্থ দুটির বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় পর্বকেও সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিন্যাস করার চেষ্টা করেছি। অনেক স্থানে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে অনেক জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা নতুন করে সংযোজন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষত জাল হাদীসের প্রচারে প্রকাশিত দুটি জাল পুস্তক বিষয়ক আলোচনা এ সংস্করণের নতুন সংযোজন। 'মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকের প্রথম খণ্ডের হারানো অংশ' নামে এবং 'ইবন হাজার হাইতামী রচিত আন-নি'মাতুল কুবরা' নামে প্রকাশিত ও প্রচারিত দুটি জাল পুস্তক সম্পর্কে দ্বিতীয় পর্বের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তৃতীয় ও একাদশ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বইয়ের প্রথম সংস্করণে বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের আশা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে আমার জন্য তা সম্ভব হয় নি। বাঙালী মুসলিম সমাজকে জালিয়াতির খপ্পর থেকে রক্ষার জন্য এ বিষয়ে অনেক কিছু লেখা প্রয়োজন। আমরা আশা করি, নতুন প্রজন্মের সচেতন আলিমগণ এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং এ বিষয়ে গবেষণা ও লেখালেখিতে এগিয়ে আসবেন। মহান আল্লাহর দরবারে দুআ করি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র আঙ্গিনাকে জালিয়াতির অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ সুন্নাতে নববী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার খিদমাতে বাংলাদেশের আলিম সমাজকে তিনি কবুল করে নিন।

এ সংস্করণে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ হাদীস বিশেষজ্ঞ, মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া, ঢাকার শিক্ষা পরিচালক মুহতারাম শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক। অনেকগুলো দুষ্প্রাপ্য বই, পাণ্ডুলিপি ও বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। চট্টগ্রাম থেকে মুহতারাম মাওলানা নাসিরুদ্দীন খাকীর পাঠানো অনেকগুলো বই আমাকে  সহায়তা করেছে। চুয়াডাঙ্গার মাওলানা ইমদাদুল হক এ সংস্করণের প্রুফ দেখেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে এবং এ বইটির সকল পাঠক, প্রচারক ও শুভানুধ্যায়ীকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

মহান আলাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের উপর সালাত ও সালাম। প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আলাহর নিমিত্ত।

**আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর**

# সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

# প্রথম পর্ব

# হাদীস ও হাদীসের নামে জালিয়াতি

## ১. ওহী ও হাদীস

### ১. ১. মানবতার সংরক্ষণে ওহীর গুরুত্ব

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মানুষকে তিনি সৃষ্টির সেরা হিসাবে তৈরি করেছেন। তাকে দান করেছেন জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তি যা তাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। মানুষের এ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষ তার জ্ঞান, বিবেক ও বিবেচনা দিয়ে তার পার্থিব জগতের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারে এবং নিজেকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তার ইন্দ্রিয়ের বাইরের কিছু সে জানতে পারে না। এজন্য ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন বিষয়ে মানুষ জ্ঞান, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে অনুরূপভাবে সক্ষম হয় না। আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারি।

জাগতিক বিষয়গুলো মানুষ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারে। কিভাবে চাষ করলে বেশি ফল ফসল হবে, কিভাবে বাড়ি বানালে বেশি টেকসই হবে, কিভাবে গাড়ি বানালে দ্রুত চলবে, কিভাবে রান্না করলে খাদ্যমানের বেশি সাশ্রয় হবে, কিভাবে ব্যবসা করলে লাভ বেশি হবে বা পুঁজির নিরাপত্তা বাড়বে, কিভাবে চিকিৎসা করলে আরোগ্যের সম্ভাবনা, নিশ্চয়তা বা হার বাড়বে ইত্যাদি বিষয় মানবীয় অভিজ্ঞতা, গবেষণা, যুক্তি ও চিন্তার মাধ্যমে জানা যায়।

কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস, কর্ম ও আচার আচরণ বিষয়ক জ্ঞান কখনো অভিজ্ঞতা বা ঐন্দ্রিক জ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায় না। আল্লাহর সম্পর্কে বিশ্বাস কিরূপ হতে হবে, কিভাবে নবী-রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, পরকালের সঠিক বিশ্বাস কী, কিভাবে আল্লাহকে ডাকতে হবে, কোন্ কর্ম করলে তাঁর রহমত ও বরকত বেশি পাওয়া যাবে, কিভাবে চললে আখেরাতে মুক্তির সম্ভাবনা বাড়বে, কোন্ পদ্ধতিতে চললে দ্রুত আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জন করা যাবে, কোন্ কাজ করলে বেশি সাওয়াব অর্জন করা যাবে, কোন্ কর্মে পাপের ক্ষমালাভ হয় ইত্যাদি অধিকাংশ ধর্মীয় ও বিশ্বাসীয় বিষয় কখনোই অভিজ্ঞতা বা গবেষণার মাধ্যমে চূড়ান্তরূপে জানা যায় না বা এ বিষয়ক কোনো সমস্যা গবেষণা বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে চূড়ান্ত সমাধান করা যায় না।

এ জন্য আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে সৃষ্টির সেরা রূপে সৃষ্টি করার পরেও তার পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে কিছু মহান মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের কাছে তাঁর বাণী, ওহী বা প্রত্যাদেশ (revelation) প্রেরণ করেছেন। মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যে সকল বিষয় জানতে পারে না বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না সে সকল বিষয় ওহীর মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। এ ছাড়া মানুষ বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে যে সকল বিষয় ভাল বা মন্দ বলে বুঝতে পারে সে সকল বিষয়েও ভাল-মন্দের পর্যায়, গুরুত্ব, পালনের উপায় ইত্যাদি তিনি ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন।

ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের সংরক্ষণ ও তার অনুসরণ ব্যতীত মানব জাতি ও মানব সভ্যতার সংরক্ষণ সম্ভব নয়। স্বার্থের সংঘাত, হানাহানি ও স্বার্থপরতা দূর করে প্রকৃত ভালবাসা, সেবা ও মানবীয় মূল্যবোধগুলির বিকাশ করতে ওহীর জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করতে হবে। বিশ্বাস, সততা, পাপ, পূণ্য, স্রষ্টা, পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে ওহীর বাইরে মানবীয় বিবেক, অভিজ্ঞতা বা গবেষণার আলোকে যা কিছু বলা হয় সবই বিতর্ক, সংঘাত ও বিভক্তি বৃদ্ধি করে। কারণ এ সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সত্য কখনোই ওহী ছাড়া মানবীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে জানা যায় না। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের বিকৃতি বা বিলুপ্তির কারণেই বিভিন্ন জাতি বিভ্রান্ত হয়েছে।

### ১. ২. ওহীর বিকৃতি বা বিলুপ্তির কারণ

কুরআন-হাদীসের বর্ণনা এবং বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ দুটি:

১. অবহেলা, মুখস্থ না রাখা বা অসংরক্ষণের ফলে ওহীলব্ধ জ্ঞান বা গ্রন্থ হারিয়ে যাওয়া বা বিনষ্ট হওয়া।
২. মানবীয় কথাকে ওহীর নামে চালানো বা ওহীর সাথে মানবীয় কথা বা জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটানো।[১]

প্রথম পর্যায়ে 'ওহী'-র জ্ঞান একেবারে হারিয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'ওহী' নামে কিছু 'জ্ঞান' সংরক্ষিত থাকে, যার মধ্যে 'মানবীয় জ্ঞান ভিত্তিক' কথাও সংমিশ্রিত থাকে। কোন কথাটি ওহী এবং কোন কথাটি মানবীয় তা জানার বা পৃথক করার কোনো উপায় থাকে না। ফলে 'ওহী' নামে সংরক্ষিত গ্রন্থ বা জ্ঞান মূল্যহীন হয়ে যায়। পূর্ববর্তী অধিকাংশ জাতি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ওহীর জ্ঞানকে বিকৃত করেছে। ইহুদী, খৃস্টান ও অন্যান্য অধিকাংশ ধর্মাবলম্বীদের কাছে 'ধর্মগ্রন্থ', Divine scripture ইত্যাদি নামে কিছু গ্রন্থ সংরক্ষিত রয়েছে। যেগুলোর মধ্যে অগণিত মানবীয় কথা, বর্ণনা ও মতামত সংমিশ্রিত রয়েছে। ওহী ও মানবীয় কথাকে পৃথক করার কোনো পথ নেই এবং সেগুলো থেকে ওহীর শিক্ষা নির্ভেজালভাবে উদ্ধার করার কোনো পথ নেই।

### ১. ৩. দু প্রকার ওহী: কুরআন ও হাদীস

কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর মহান রাসূলকে (ﷺ) দুটি বিষয় প্রদান করেছেন: একটি 'কিতাব' বা 'পুস্তক' এবং দ্বিতীয়টি 'হিকমাহ' বা 'প্রজ্ঞা'।[২] এ পুস্তক বা 'কিতাব' হলো কুরআন কারীম, যা হুবহু ওহীর শব্দে ও বাক্যে সংকলিত হয়েছে। আর 'হিকমাহ' বা প্রজ্ঞা হলো ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত অতিরিক্ত প্রায়োগিক জ্ঞান যা 'হাদীস' নামে সংকলিত হয়েছে। কাজেই ইসলামে ওহী দুই প্রকার: কুরআন ও হাদীস। ইসলামের এ দুই মূল উৎসকে রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ওহীর জ্ঞানকে হুবহু নির্ভেজালভাবে সংরক্ষণের জন্য একদিকে কুরআন ও হাদীসকে হুবহু শাব্দিকভাবে মুখস্থ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয় এমন কোনো কথাকে মহান আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নামে বলতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

### ১. ৪. হাদীসের ব্যবহারিক সংজ্ঞা

হাদীস বলতে সাধারণত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম বা অনুমোদনকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে রাসূলুলাহ (ﷺ) যা বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তাকে হাদীস বলা হয়।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় "যে কথা, কর্ম, অনুমোদন বা বিবরণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বলে প্রচার করা হয়েছে বা দাবী করা হয়েছে" তাই "হাদীস" বলে পরিচিত। এছাড়া সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণের কথা, কর্ম ও অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে "মারফূ' হাদীস" বলা হয। সাহাবীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে "মাউকূফ হাদীস" বলা হয়। আর তাবিয়ীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে "মাকতূ' হাদীস" বলা হয়।[৩]

লক্ষণীয় যে, যে কথা, কাজ, অনুমোদন বা বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বলে দাবী করা হয়েছে বা বলা হয়েছে একেই মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় 'হাদীস' বলে গণ্য করা হয়। তা সত্যই রাসূলুলাহর (ﷺ) কথা কিনা তা যাচাই করে নির্ভরতার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিভিন্ন প্রকারে ও পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। আমরা পরবর্তী আলোচনায় সেগুলো ব্যাখ্যা করব, ইনশা আল্লাহ।

### ১. ৫. ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্বের বিষয়টি আলোচনা বাহ্যত নিষ্প্রয়োজনীয়। কুরআন কারীমের অনেক নির্দেশ, রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর অগণিত নির্দেশ ও সাহাবীগণের কর্ম-পদ্ধতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, 'হাদীস' ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস ও ভিত্তি। বস্তুত মুসলিম উম্মাহর সকল যুগের সকল মানুষ এ বিষয়ে একমত। সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে সকল যুগে হাদীস শিক্ষা, সংকলন, ব্যাখ্যা এবং হাদীসের আলোকে মানব জীবন পরিচালিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে গড়ে উঠেছে হাদীস বিষয়ক সুবিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার।

তবে কতিপয় ইহূদী-খৃস্টান 'প্রাচ্যবিদ' পণ্ডিত ও মুসলিম উম্মাহর কোনো কোনো 'পণ্ডিত' বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ভাবে হাদীসের গুরুত্ব অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের পক্ষে উপস্থাপিত 'দলীল'-সমূহকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি:

(১) কুরআন কারীমের কিছু আয়াতের আলোকে দাবি করা যে, 'কুরআনেই সব কিছুর বর্ণনা' রয়েছে, কাজেই 'হাদীস' নিষ্প্রয়োজনীয়।

(২) হাদীসের বর্ণনা ও সংকলন বিষয়ক কিছু আপত্তি উত্থাপন করে দাবি করা যে, হাদীসের মধ্যে অনেক জালিয়াতি প্রবেশ করেছে, কাজেই তাঁর উপর নির্ভর করা যায় না।

(৩) কিছু হাদীস উল্লেখ করে হাদীসের মধ্যে বিজ্ঞান বা জ্ঞান বিরোধী কথাবার্তা বা বৈপরীত্য আছে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা।

(৪) কিছু হাদীস থেকে তাঁরা প্রমাণ (!) পেশ করেন যে, রাসূলুলাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ হাদীসের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা আমাদের গ্রন্থের পরিসরে সম্ভব নয়। তবে আমরা আমাদের এ গ্রন্থে হাদীসের জালিয়াতি ও সহীহ হাদীস থেকে জাল হাদীসকে পৃথক করার বিষয়ে আলোচনা করছি। আমাদের সকল আলোচনা এবং সাহাবীগণের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর সকল শ্রমের মূল ভিত্তিটিই হলো এটা যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের অনুসরণ ছাড়া কুরআন পালন, ইসলাম পালন বা মুসলমান হওয়া যায় না। আমাদের জীবন চলার অন্যতম পাথেয় হাদীসে রাসূল (ﷺ)। তবে আমাদের অবশ্যই বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে।

হাদীস বাদ দিলে আর কোনোভাবেই কুরআন মানা বা ইসলাম পালন করা যায় না। হাদীসের বিরুদ্ধে এ সকল মানুষের

উত্থাপিত যুক্তিগুলোর মধ্যে প্রথম যুক্তিটি আমরা আলোচনা করতে পারি। আমরা দেখতে পাব যে, কুরআন মানতে হলে হাদীস মানা আবশ্যক। নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

(১) 'ওহী'র মাধ্যমে যে নির্দেশনা মানব জাতি লাভ করে তার বাস্তব প্রয়োগ ও পালনের সর্বোচ্চ আদর্শ হন 'ওহী-প্রাপ্ত নবীগণ' ও তাঁদের সাহচর্য প্রাপ্ত শিষ্য বা সঙ্গীগণ। তাঁদের জীবনাদর্শই মূলত অন্যদের জন্য 'ওহী'র অনুসরণ ও পালনের একমাত্র চালিকা শক্তি। এ জন্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরা ধর্ম-প্রচারক ও তাঁর শিষ্য, প্রেরিত বা সহচরদের জীবন, কর্ম ও আদর্শকে 'ধর্ম' পালনের মূল উৎসরূপে সংরক্ষণ ও শিক্ষা দান করেন। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন, কর্ম, ত্যাগ, ধৈর্য, মানবপ্রেম, আল্লাহর ভয়, সত্যের পথে আপোষহীনতা... ইত্যাদি 'হাদীস' ছাড়া জানা সম্ভব নয়। একজন মুসলমানকে হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থই হলো তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এতে অতি সহজেই তাঁকে কুরআন থেকে এবং ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব হয়।

(২) হাদীসের উপর নির্ভর না করলে 'কুরআন'-এর পরিচয় লাভ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জীবন, পরিচয়, বিশ্বস্ততা, সততা, নবুয়ত ইত্যাদি কোনো তথ্যই হাদীসের মাধ্যমে ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তিনি কিভাবে কুরআন লাভ করলেন, শিক্ষা দিলেন, সংকলন করলেন... ইত্যাদি কোনো কিছুই হাদীসের তথ্যাদি ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

(৩) হাদীসের উপর নির্ভর না করলে 'কুরআন' মানাও সম্ভব নয়। কুরআন কারীমে 'সকল কিছুর' বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু তা সবই শুধুমাত্র 'মূলনীতি' বা 'প্রাথমিক নির্দেশনা' রূপে। কুরআন কারীমের অধিকাংশ নির্দেশই 'প্রাথমিক নির্দেশ', ব্যাখ্যা ছাড়া যেগুলো পালন করা অসম্ভব। ইসলামের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম 'সালাত' বা নামায। কুরআন কারীমে শতাধিক স্থানে সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু সালাতের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয় নি। বিভিন্ন স্থানে রুকু করার ও সাজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'যেভাবে তোমাদেরকে সালাত শিখিয়েছি সেভাবে সালাত আদায় কর'। কিন্তু কুরআন কারীমে কোথাও সালাতের এ পদ্ধতিটি শেখানো হয় নি। 'সালাত' বা 'নামায' কী, কখন তা আদায় করতে হবে, কখন কত রাক'আত আদায় করতে হবে, প্রত্যেক রাক'আত কী পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে, প্রত্যেক রাক'আতে কুরআন পাঠ কিভাবে হবে, রুকু কয়টি হবে, সাজদা কয়টি হবে, কিভাবে রুকু ও সাজদা আদায় করতে হবে.... ইত্যাদি কোনো কিছুই কুরআনে শিক্ষা দেয়া হয় নি। কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশকে আমরা কোনোভাবেই হাদীসের উপর নির্ভর না করে আদায় করতে পারছি না। এভাবে কুরআন কারীমের অধিকাংশ নির্দেশই হাদীসের ব্যাখ্যা ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়।

(৪) কুরআন কারীমে কিছু নির্দেশ বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। যেমন কোথাও মদ, জুয়া ইত্যাদিকে বৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও তা অবৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও কাফির ও অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং কোথাও সকল প্রকার বিরোধিতা ও যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাদীসের নির্দেশনা ছাড়া এ সকল নির্দেশের কোনটি আগে, কোন্‌টি পরে এবং কিভাবে সেগুলো পালন করতে হবে তা জানা যায় না। এজন্য হাদীস বাদ দিলে এ সকল আয়াতের ইচ্ছামত ও মনগড়া ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা খুবই সহজ হয়ে যায়।

মূলত এজন্যই ইহূদী, খৃস্টান, কাদিয়ানী, বাহাঈ প্রমুখ সম্প্রদায় হাদীসের বিরুদ্ধে ঢালাও অপপ্রচার চালান। তাঁদের উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহকে কুরআন ও ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া। তাঁরাও জানেন যে, হাদীসের সাহায্য ছাড়া কোনোভবেই কুরআন মানা যায় না। শুধুমাত্র সরলপ্রাণ মুসলিমকে ধোঁকা দেয়ার জন্যই তারা মূলত 'কুরআনের' নাম নেন।

(৫) আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে দুটি বিষয় প্রদান করেছেন: 'কিতাব' (পুস্তক) ও 'হিকমাহ' (প্রজ্ঞা)। স্বভাবতই কুরআনও প্রজ্ঞা ও হিকমাহ। তবে বারংবার পৃথকভাবে উল্লেখ করা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কুরআনের অতিরিক্ত 'প্রজ্ঞা' বা জ্ঞান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে (ﷺ) প্রদান করেছিলেন এবং তিনি কুরআন ছাড়াও অতিরিক্ত অনেক শিক্ষা মানব জাতিকে প্রদান করেছেন এ 'প্রজ্ঞা' থেকে। আমরা জানি যে, কুরআনের অতিরিক্ত যে শিক্ষা তিনি প্রদান করেছিলেন তাই 'হাদীস'-রূপে সংকলিত। 'হাদীস' ছাড়া তাঁর 'প্রজ্ঞা' জানার ও মানার আর কোনো উপায় নেই। কাজেই কুরআনের নির্দেশ অনুসারেই আমাদেরকে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণে জীবন পরিচালিত করতে হবে।

(৬) কুরআনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আনুগত্য ছাড়াও তাঁকে 'অনুসরণ' করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, এতে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসবেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন।"[৪]

আমরা জানি যে, আনুগত্য অর্থ আদেশ-নিষেধ পালন করা। আর কারো অনুসরণের অর্থ অবিকল তাঁর কর্মের মত কর্ম করা। হাদীসের উপর নির্ভর না করলে কোনোভাবেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কুরআন কারীমে আদেশ নিষেধ উল্লেখ

করা হলেও কোথাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্ম ও জীবনরীতি আলোচিত হয় নি। এজন্য কুরআন দেখে রাসূলুল্লাহর ‘অনুসরণ’ করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। কাজেই ‘কুরআনের নির্দেশ অনুসারে আল্লাহর প্রেম ও ক্ষমা লাভ করতে হলে অবশ্যই হাদীসের বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ করতে হবে।

(৭) মহান আল্লাহ -সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা- বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“নিশ্চয় তোমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে...।”[৫]

ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাস্তব জীবনরীতি কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কুরআনের নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে।

(৮) অন্যত্র মহান আল্লাহ-জাল্লা শানুহু- বলেন:

مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

“রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।”[৬]

আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সুদীর্ঘ নবুওয়তি জীবনে অনেক অনেক শিক্ষা প্রদান করেছেন তাঁর সাহাবীগণকে। জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে খুটিনাটি অনেক দিকনির্দেশনা তিনি প্রদান করেছেন। এ সকল শিক্ষা ও নির্দেশনাও ‘রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন’-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ‘রাসূল যা দিয়েছেন’ সবকিছু গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে কুরআনের পাশাপাশি হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে।

হাদীস সংকলন, লিখন, বর্ণনা ও জালিয়াতি বিষয়ক তাঁদের অন্যান্য আপত্তির বিষয় আমরা এ পুস্তকের অন্যান্য আলোচনা থেকে জানতে পারব। তবে এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে, কুরআনের নির্দেশনা অনুসারেই আমাদেরকে হাদীসের আলোকে জীবন গঠন করতে হবে, হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হুবহু অনুকরণ করতে হবে, হাদীসের আলোকে রাসূলের (ﷺ) আদর্শে জীবন গড়তে হবে এবং হাদীসের ভিত্তিতেই আমাদেরকে কুরআনের নির্দেশাবলি পালন করতে হবে। আমরা আরো দেখছি যে, হাদীস ছাড়া কোনো অবস্থাতেই কুরআন পালন বা ইসলামী জীবন গঠন সম্ভব নয়।

হাদীসের গুরুত্বের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ মূলত একমত। আর এজন্যই হাদীসের নামে জালিয়াতি ও মিথ্যা প্রতিরোধের সর্বোত্তম নিরীক্ষা ও বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাঁরা। তাঁদের নিরীক্ষা ও বিচার পদ্ধতির আলোচনার আগে আমরা মিথ্যার পরিচয় ও ওহীর নামে মিথ্যার বিধান আলোচনা করব। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

## ২. মিথ্যা ও ওহীর নামে মিথ্যা

### ২. ১. মিথ্যার সংজ্ঞা

প্রসিদ্ধ ও পরিজ্ঞাত বিষয় সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। মিথ্যার সংজ্ঞা কি? সত্যের বিপরীতই মিথ্যা। যা সত্য নয় তাই মিথ্যা। এমন কিছু বলা, যা প্রকৃত পক্ষে ঠিক নয় বা সত্য নয় তাই মিথ্যা।

#### ২. ১. ১. ইচ্ছাকৃত বনাম অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা

বিষয়টি সুস্পষ্ট। তবে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার বিষয়ে মুসলিম আলিমদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আলিমগণ মনে করতেন যে, ভুলবশত যদি কেউ কোনো কিছু বলেন যা প্রকৃত অবস্থার বিপরীত তবে তা শরীয়তের পরিভাষায় মিথ্যা বলে গণ্য হবে না। শুধুমাত্র জেনেশুনে মিথ্যা বললেই তা মিথ্যা বলে গণ্য হবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আলিমগণ এ ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের মতে, না-জেনে বা ভুলে মিথ্যা বললেও তা শরীয়তের পরিভাষায় মিথ্যা বলে গণ্য হবে।

ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নাবাবী (৬৭৬ হি) বলেন: “হক্ক-পন্থী আলিমদের মত হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে, অনিচ্ছায়, ভুলে বা অজ্ঞতার কারণে প্রকৃত অবস্থার বিপরীত কোনো কথা বলাই মিথ্যা।”[৭]

তিনি আরো বলেন: “আমাদের আহলুস সুন্নাহ-পন্থী আলিমগণের মতে মিথ্যা হলো প্রকৃত অবস্থার বিপরীত কোনো কথা বলা, তা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা ভুলে হোক। মু'তাযিলাগণের মতে শুধু ইচ্ছাকৃত মিথ্যাই মিথ্যা বলে গণ্য হবে।”[৮]

#### ২. ১. ২. হাদীসের আলোকে অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা

হাদীসের ব্যবহার থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে, অনিচ্ছাকৃতভাবে, অজ্ঞতার কারণে বা যে কোনো কারণে বাস্তবের বিপরীত যে কোনো কথা বলাই মিথ্যা বলে গণ্য। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেখুন :

১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন,

إِنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَذَبْتَ، لاَ يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ».

হাতিবের (রা) একজন দাস তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলে: হে আল্লাহর রাসূল, নিশ্চয় হাতিব জাহান্নামে প্রবেশ করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: তুমি মিথ্যা বলেছ। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না; কারণ সে বদর ও হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিল।[৯]

এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাতিবের এ দাসের কথাকে 'মিথ্যা' বলে গণ্য করেছেন। সে অতীতের কোনো বিষয়ে ইচ্ছাকৃত কোনো মিথ্যা বলেনি। মূলত সে ভবিষ্যতের বিষয়ে তার একটি ধারণা বলেছে। সে যা বিশ্বাস করেছে তাই বলেছে। তবে যেহেতু তার ভবিষ্যদ্বাণীটি বাস্তবের বিপরীত সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অতীত বা ভবিষ্যতের যে কোনো সংবাদ যদি সত্য বা বাস্তবের বিপরীত হয় তাহলে তা মিথ্যা বলে গণ্য হবে, সংবাদদাতার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, অজ্ঞতা বা অন্য কোনো বিষয় এখানে ধর্তব্য নয়। তবে মিথ্যার পাপ বা অপরাধ ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত।

২. তাবিয়ী সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে (রা) বলতে শুনেছি:

بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِى تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِى ذَا الْحُلَيْفَةِ

এ হলো তোমাদের বাইদা প্রান্তর, যে প্রান্তরের বিষয়ে তোমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বল (তিনি এ স্থান থেকে হজ্জের ইহরাম শুরু করেছিলেন বলে তোমরা বল।) অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল হুলাইফার মসজিদের কাছ থেকে হজ্জের ইহরাম করেছিলেন।[১০]

স্বভাবতই ইবনু উমার (রা) এসকল ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলার অভিযোগ করছেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় লক্ষাধিক সাহাবীকে সাথে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে 'যুল হুলাইফা' প্রান্তরে রাত্রি যাপন করেন এবং পরদিন সকালে সেখান থেকে হজ্জের ইহরাম করেন। যুল হুলাইফা প্রান্তরের সংলগ্ন 'বাইদা' প্রান্তর। যে সকল সাহাবী কিছু দূরে ছিলেন তাঁরা তাঁকে যুল হুলাইফা থেকে ইহরাম বলতে শুনেন নি, বরং বাইদা প্রান্তরে তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেন। তাঁরা মনে করেন যে, তিনি বাইদা থেকেই ইহরাম শুরু করেন। একারণে অনেকের মধ্যে প্রচারিত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইদা প্রান্তর থেকে ইহরাম শুরু করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার যেহেতু কাছেই ছিলেন, সেহেতু তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইদা থেকে ইহরাম করার তথ্যটি ছিল সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভুল। যারা তথ্যটি প্রদান করেছেন তারা তাদের জ্ঞাতসারে সত্যই বলেছেন। কিন্তু তথ্যটি যেহেতু বাস্তবের বিপরীত এজন্য ইবনু উমার (রা) তাকে 'মিথ্যা' বলে অভিহিত করেছেন।

### ২. ১. ৩. মিথ্যা বনাম 'মাউদূ' (মাউযূ)[১১] ও 'বাতিল'

হাদীসের পরিভাষায় ও ১ম শতকে সাহাবী-তাবিয়ীগণের পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কথিত মিথ্যাকে حديث كذب বা 'মিথ্যা হাদীস' বলে অভিহিত করা হতো। আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثاً كَذِباً مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ

যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে 'মিথ্যা হাদীস' বলবে তাকে জাহান্নামে বসবাস করতে হবে।[১২]

যে কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন নি তা তাঁর নামে বলা হলে সাহাবী ও তাবিয়িগণ বলতেন: 'هذا الحديث كذب' এ হাদীসটি মিথ্যা, 'حديث كذب' মিথ্যা হাদীস বা অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করতেন। এ ধরনের মানুষদের সম্পর্কে 'মিথ্যাবাদী' (كذّاب), 'সে মিথ্যা বলে' (يكذب) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতেন।[১৩]

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে হাদীসের নামে মিথ্যার প্রসারের সাথে সাথে এ সকল মিথ্যাবাদীদের চিহ্নিত করতে মুহাদ্দিসগণ

'মিথ্যা'-র সমার্থক আরেকটি শব্দ ব্যবহার করতে থাকেন। শব্দটি 'الوضع'। শব্দটির মূল অর্থ নামানো, ফেলে দেয়া, জন্ম দেয়া। বানোয়াটি অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[১৪] ইংরেজিতে: To lay, lay off, lay on, lay down, put down, set up... give birth, produce ...humiliate, to be low, humble...[১৫]

পরবর্তী যুগে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এ শব্দের ব্যবহারই ব্যাপকতা লাভ করে। তাঁদের পরিভাষায় হাদীসের নামে মিথ্যা বলাকে 'ওয়াদউ' (وضع) এবং এধরনের মিথ্যা হাদীসকে 'মাউদূ' (موضوع) বলা হয়। ফার্সী-উর্দু প্রভাবিত বাংলা উচ্চারণে আমরা সাধারণত বলি 'মাউযূ'।

অনেক মুহাদ্দিস ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বা ভুল উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন নি। উভয় প্রকার মিথ্যা হাদীসকেই তাঁরা মাউদূ (موضوع) হাদীস বলে অভিহিত করেছেন।[১৬] বাংলায় আমরা মাউদূ (মাউযূ) অর্থ বানোয়াট বা জাল বলতে পারি।

মুহাদ্দিসগণ মাউযূ (মাউদূ) হাদীসের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন দু'ভাবে: অনেক মুহাদ্দিস মাউযূ হাদীসের সংজ্ঞায় বলেছেন: 'المختلق المصنوع' "বানোয়াট জাল হাদীসকে মাউযূ হাদীস বলা হয়।" এখানে তাঁরা হাদীসের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।[১৭]

অন্যান্য মুহাদ্দিস মাউযূ হাদীসের সংজ্ঞায় বলেছেন: (ما تفرد بروايته كذاب) "যে হাদীস কোনো মিথ্যাবাদী রাবী একাই বর্ণনা করেছে তা মাউযূ হাদীস।"[১৮] এখানে তাঁরা মাউযূ বা জাল হাদীসের সাধারণ পরিচয়ের দিকে লক্ষ্য করেছেন। মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার (Cross Examine) মাধ্যমে রাবীর সত্য-মিথ্যা যাচাই করতেন। নিরীক্ষার মাধ্যমে যদি প্রমাণিত হয় যে, কোনো একটি হাদীস একজন মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ছাড়া কেউ বর্ণনা করছেন না তবে তাঁরা হাদীসটিকে মিথ্যা বা মাউযূ বলে গণ্য করতেন।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাকে 'বাতিল' (باطل) ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যাকে 'মাউযূ' বা 'মাউদূ' (موضوع) বলে অভিহিত করেছেন। নিরীক্ষা মাধ্যমে যদি প্রমাণিত হয় যে, এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন নি, কিন্তু ভুল করে তাঁর নামে বলা হয়েছে, তাহলে তাঁরা সে হাদীসটিকে 'বাতিল' বলে অভিহিত করেন। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, বর্ণনাকারী ইচ্ছাপূর্বক বা জ্ঞাতসারে এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলেছে, তাহলে তাঁরা একে 'মাউযূ' নামে আখ্যায়িত করেন।[১৯]

মিথ্যা হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ প্রথম পদ্ধতিরই অনুসরণ করেছেন। তাঁরা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার মিথ্যাকেই 'মাউযূ' (موضوع) বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, যে কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন নি বা যে কর্ম তিনি করেন নি, অথচ তাঁর নামে কথিত বা প্রচারিত হয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে ওহীর নামে জালিয়াতি রোধ করা। বর্ণনাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাটি বলেছেন, না ভুলক্রমে তা বলেছেন সে বিষয় তাঁদের বিবেচ্য নয়। এ বিষয় বিবেচনার জন্য রিজাল ও জারহ ওয়াত্ তা'দীল শাস্ত্রে পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে।[২০]

## ২. ২. মিথ্যার বিধান

ওহী বা হাদীসের নামে মিথ্যা বলার বিধান আলোচনার আগে আমরা সাধারণভাবে মিথ্যার বিধান আলোচনা করতে চাই। মিথ্যাকে ঘৃণা করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। এজন্য সকল মানব সমাজে মিথ্যাকে পাপ, অন্যায় ও ঘৃণিত মনে করা হয়। কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে মিথ্যাকে অত্যন্ত কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে মুমিনদিগক সর্বাবস্থায় সত্যপরায়ণ হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে মিথ্যাকে ঘৃণিত পাপ ও কঠিন শাস্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সার্বক্ষণিক সত্যবাদিতার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ- সুবহানাহু- বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।[২১]

মিথ্যার ভয়ানক শাস্তির বিষয়ে আল্লাহ-সুবহানাহু- বলেছেন:

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যা বলত।[২২]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

পরিণামে তিনি (আল্লাহ) তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করলেন আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত, কারণ তারা আল্লাহর কাছে যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং তারা ছিল মিথ্যাচারী।[২৩]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[২৪]

অগণিত হাদীসে মিথ্যাকে ভয়ঙ্কর পাপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ (الصِّدْقُ بِرٌّ) وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ (لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ) حَتَّى يُكْتَبَ (عِنْدَ اللهِ) صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ (الْكَذِبُ فُجُوْرٌ) وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ (لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ) حَتَّى يُكْتَبَ (عِنْدَ اللَّهِ) كَذَّابًا

সত্য পুণ্য। সত্য পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। যে মানুষটি সদা সর্বদা সত্য বলতে সচেষ্ট থাকেন তিনি একপর্যায়ে আল্লাহর কাছে ‘সিদ্দীক’ বা মহা-সত্যবাদী বলে লিপিবদ্ধ হন। আর মিথ্যা পাপ। মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। যে মানুষটি মিথ্যা বলে বা মিথ্যা বলতে সচেষ্ট থাকে সে এক পর্যায়ে মহা-মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।[২৫]

হাদীসে মিথ্যা বলাকে মুনাফিকীর অন্যতম চিহ্ন বলে গণ্য করা হয়েছে। এমনকি বলা হয়েছে যে, মুমিন অনেক অন্যায় করতে পারে, কিন্তু মিথ্যা বলতে পারে না। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خَلَّةٍ غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ

মুমিনের প্রকৃতিতে সব অভ্যাস থাকতে পারে, কিন্তু খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা থাকতে পারে না।[২৬]

### ২. ৩. ওহীর নামে মিথ্যা

মিথ্যা সর্বদা ঘৃণিত। তবে তা যদি ওহীর নামে হয় তাহলে তা আরো বেশি ঘৃণিত ও ক্ষতিকর। সাধারণভাবে মিথ্যা ব্যক্তিমানুষের বা মানব সমাজের জন্য জাগতিক ক্ষতি বয়ে আনে। আর ওহীর নামে মিথ্যা মানব সমাজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক স্থায়ী ধ্বংস ও ক্ষতি করে। মানুষ তখন ধর্মের নামে মানবীয় বুদ্ধি প্রসূত বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত হয়ে জাগতিক ও পারলৌকিক ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়।

পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর দিকে তাকালে আমরা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই। আমরা আগেই বলেছি যে, মানবীয় জ্ঞান প্রসূত কথাকে ওহীর নামে চালানোই ধর্মের বিকৃতি ও বিলুপ্তির কারণ। সাধারণভাবে এ সকল ধর্মের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ ধর্মের কল্যাণেই এ সকল কথা ওহীর নামে চালিয়েছেন। তারা মনে করেছেন যে, তাদের এ সকল কথা, ব্যাখ্যা, মতামত ওহীর নামে চালালে মানুষের মধ্যে ‘ধার্মিকতা’, ‘ভক্তি’ ইত্যাদি বাড়বে এবং আল্লাহ খুশি হবেন। আর এভাবে তারা তাদের ধর্মকে বিকৃত ও ধর্মাবলম্বীদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন। কিন্তু তারা বুঝেন নি যে, মানুষ যদি মানবীয় প্রজ্ঞায় এ সকল বিষয় বুঝতে পারতো তাহলে ওহীর প্রয়োজন হতো না।

এর অত্যন্ত পরিচিত উদাহরণ খৃস্টধর্ম। প্রচলিত বিকৃত বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী ‘যীশুখৃস্ট’ তাঁর অনুসারীদের একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে, ইহুদী ধর্মের ১০ মূলনির্দেশ পালন করতে, খাতনা করতে, তাওরাতের সকল বিধান পালন করতে, শূকরের মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকতে ও অনরূপ অন্যান্য কর্মের নির্দেশ প্রদান করেন। সাধু পল (পল) ‘খৃস্টধর্মের প্রচার ও মানুষের মধ্যে ভক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে’ প্রচার করতে থাকেন যে, শুধুমাত্র ‘যীশুখৃস্টকে’ বিশ্বাস ও ভক্তি করলেই চলবে, এ সকল কর্ম না করলেও চলবে। প্রচলিত ইঞ্জিল

শরীফের বিভিন্ন স্থানে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করেছেন যে, আমি প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের পছন্দ মত মিথ্যা বলি, যেন ঈশ্বরের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এক স্থানে তিনি লিখেছেন: "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?"[২৭]।

এভাবে তিনি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেন। ক্রমান্বয়ে এ পৌলীয় কর্মহীন ভক্তিধর্মই খৃস্টানদের মধ্যে প্রসার লাভ করে। ফলে বিশ্বের কোটি কোটি মানব সন্তান শিরক-কুফর ও পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু বিশ্বাসেই স্বর্গ, সেহেতু কোনোভাবেই ধর্মোপদেশ দিয়ে খৃস্টান সমাজগুলি থেকে মানবতা বিধ্বংসী পাপ, অনাচার ও অপরাধ কমানো যায় না।

ওহীর নামে মিথ্যা সবচেয়ে কঠিন মিথ্যা হওয়ার কারণে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে ওহীর নামে বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে মিথ্যা বলতে, সন্দেহ জনক কিছু বলতে বা আন্দাজে কিছু বলতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে অবতীর্ণ উভয় প্রকারের ওহী যেন কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত থাকে সেজন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

## ২. ৪. মিথ্যা থেকে ওহী রক্ষার কুরআনী নির্দেশনা

'ওহী'র নামে মিথ্যা প্রচারের দুটি পর্যায়: প্রথমত: নিজে ওহীর নামে মিথ্যা বলা ও দ্বিতীয়ত: অন্যের বলা মিথ্যা গ্রহণ ও প্রচার করা। উভয় পথ রুদ্ধ করার জন্য কুরআন কারীমে একদিকে আল্লাহর নামে মিথ্যা বা অনুমান নির্ভর কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অপরদিকে কারো প্রচারিত কোনো তথ্য বিচার ও যাচাই ছাড়া গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

### ২. ৪. ১. আল্লাহর নামে মিথ্যা ও আন্দায কথার নিষেধাজ্ঞা

কুরআন বারবার আল্লাহর নামে মিথ্যা বলতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। অনুরূপভাবে না-জেনে, আন্দাজে, ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে আল্লাহর নামে কিছু বলতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলার অর্থ আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা। কারণ রাসূলুলাহ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকেই কথা বলেন। কুরআনের মত হাদীসও আল্লাহর ওহী। কুরআন ও হাদীস, উভয় প্রকারের ওহীই একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসী পেয়েছে। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কোনো প্রকারের মিথ্যা, বানোয়াট, আন্দাজ বা অনুমান নির্ভর কথা বলার অর্থই আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা বা না-জেনে আল্লাহর নামে কিছু বলা। কুরআন কারীমে এ বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২৮] এখানে কয়েকটি বাণী উল্লেখ করছি।

১. কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

"আল্লাহর নামে বা আল্লাহর সম্পর্কে যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে?"[২৯]

২. অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى

"দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।"[৩০]

৩. কুরআন কারীমে বারংবার না-জেনে, আন্দাজে বা অনুমান নির্ভর করে আল্লাহ, আল্লাহর দীন, বিধান ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন একস্থানে বলা করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।[৩১]

৪. অন্যত্র আলাহ-সুবহানাহু ওয়া তা'আলা- বলেন:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক করা, যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেন নি, এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।'[৩২]

এভাবে কুরআনে ওহীর জ্ঞানকে ভেজাল ও মিথ্যা থেকে রক্ষার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ, তাঁর প্রিয় রাসূল (ﷺ), তাঁর দীন, তাঁর বিধান ইত্যাদি কোনো বিষয়ে মিথ্যা, বানোয়াট, আন্দাজ বা অনুমান নির্ভর কথা বলা কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

#### ২. ৪. ২. তথ্য গ্রহণের পূর্বে যাচাইয়ের নির্দেশ

নিজে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অন্যের কোনো অনির্ভরযোগ্য, মিথ্যা বা অনুমান নির্ভর বর্ণনা বা বক্তব্য গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। যে কোনো সংবাদ বা বক্তব্য গ্রহণে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপী তোমাদের কাছে কোনো খবর আনে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্থ না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।"[৩৩]

এ নির্দেশের আলোকে, কেউ কোনো সাক্ষ্য বা তথ্য প্রদান করলে তা গ্রহণের পূর্বে সে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সততা ও তথ্য প্রদানে তার নির্ভুলতা যাচাই করা মুসলিমের জন্য ফরয। জাগতিক সকল বিষয়ের চেয়েও বেশি সতর্কতা ও পরীক্ষা করা প্রয়োজন রাসূলুলাহ (ﷺ) বিষয়ক বার্তা বা বাণী গ্রহণের ক্ষেত্রে। কারণ জাগতিক বিষয়ে ভুল তথ্য বা সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করলে মানুষের সম্পদ, সম্ভ্রম বা জীবনের ক্ষতি হতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বা ওহীর জ্ঞানের বিষয়ে অসতর্কতার পরিণতি ঈমানের ক্ষতি ও আখিরাতের অনন্ত জীবনের ধ্বংস। এজন্য মুসলিম উম্মাহ সর্বদা সকল তথ্য, হাদীস ও বর্ণনা পরীক্ষা করে গ্রহণ করেছেন।

### ২. ৫. মিথ্যা থেকে ওহী রক্ষায় হাদীসের নির্দেশনা

ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার বিকৃতি, ভুল বা মিথ্যা থেকে তাঁর বাণী বা হাদীসকে রক্ষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

#### ২. ৫. ১. বিশুদ্ধরূপে হাদীস মুখস্থ ও প্রচারের নির্দেশনা

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদীস বা বাণী হুবহু বিশুদ্ধরূপে মুখস্থ করে তা প্রচার করতে নির্দেশ দিযেছেন। জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

نَضَّرَ اللهُ عَبْداً (وَجْهَ عَبْدٍ) سَمِعَ مَقَالَتِيْ (مِنَّا حَدِيْثاً) فَوَعَاهَا (وَحَفِظَهَا) ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا

"মহান আল্লাহ সমুজ্জ্বল করুন সে ব্যক্তির চেহারা, যে আমার কোনো কথা শুনল, অতঃপর তা পূর্ণরূপে আয়ত্ব করল ও মুখস্থ করল এবং যে তা শুনে নি তার কাছে তা পৌছে দিল।" এ অর্থে আরো অনেক হাদীস অন্যান্য অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত ও সংকলিত হয়েছে।[৩৪]

#### ২. ৫. ২. রাসূলুলাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যার নিষেধাজ্ঞা

অপরদিকে কোনো মানবীয় কথা যেন তাঁর নামে প্রচারিত হতে না পারে সে জন্য তিনি তাঁদেরকে তাঁর নামে মিথ্যা বা অতিরিক্ত কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ [يَكْذِبْ] عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

"তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।"[৩৫]

যুবাইর ইবনুল আউয়াম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম।"[৩৬]

সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"আমি যা বলি নি তা যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম।"[৩৭]

এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতকে তাঁর নামে মিথ্যা বলার বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং প্রায় ১০০ জন সাহাবী এ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর কোনো হাদীস এত বেশি সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি।[৩৮]

**২. ৫. ৩. বেশি হাদীস ও অ-মুখস্থ হাদীস বলার নিষেধাজ্ঞা**

বেশি হাদীস বলতে গেলে ভুলের সম্ভাবনা থাকে। এজন্য এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। বিশুদ্ধ মুখস্থ ও নির্ভুলতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কোনো হাদীস বর্ণনা করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে বলেন,

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنِّيْ! فَمَنْ قَالَ عني فَلْيَقُلْ حَقًّا وَصِدْقًا (فلا يقل إلا حقا) وَمَنْ تَقَوَّلَ (قال) عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"খবরদার! তোমরা আমার নামে বেশি হাদীস বলা থেকে বিরত থাকবে। যে আমার নামে কিছু বলবে, সে যেন সঠিক কথা বলে। যে আমার নামে এমন কথা বলবে যা আমি বলি নি তাকে জাহান্নামে বসবাস করতে হবে।"[৩৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلا مَا عَلِمْتُمْ.

"তোমরা আমার থেকে হাদীস বর্ণনা পরিহার করবে, শুধুমাত্র যা তোমরা জান তা ছাড়া।"[৪০]

আবু মূসা মালিক ইবনু উবাদাহ আল-গাফিকী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সর্বশেষ ওসীয়ত ও নির্দেশ প্রদান করে বলেন:

عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَسَتَرْجِعُوْنَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ- أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا- فَمَنْ حَفِظَ شَيْئاً فَلْيُحَدِّثْ بِهِ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"তোমরা আল্লাহর কিতাব সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে ও অনুসরণ করবে। আর অচিরেই তোমরা এমন সম্প্রদায়ের কাছে গমন করবে যারা আমার নামে হাদীস বলতে ভালবাসবে। যদি কারো কোনো কিছু মুখস্থ থাকে তাহলে সে তা বলতে পারে। আর যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কিছু বলবে যা আমি বলি নি তাকে জাহান্নামে তার আবাসস্থল গ্রহণ করতে হবে।"[৪১]

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে তাঁর হাদীস হুবহু ও নির্ভুলভাবে মুখস্থ রাখতে ও এরূপ মুখস্থ হাদীস প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে পরিপূর্ণ মুখস্থ না থাকলে বা সামান্য দ্বিধা থাকলে সে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, তিনি যা বলেন নি সে কথা তাঁর নামে বলা নিষিদ্ধ ও কঠিনতম পাপ। ভুলক্রমেও যাতে তাঁর হাদীসের মধ্যে হেরফের না হয় এজন্য তিনি পরিপূর্ণ মুখস্থ ছাড়া হাদীস বলতে নিষেধ করেছেন। আমরা দেখতে পাব যে, সাহাবীগণ এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন।

**২. ৫. ৪. মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের থেকে সতর্কতা**

নিজের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অন্যের বানোনো মিথ্যা গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। মুসলিম উম্মাহর ভিতরে মিথ্যাবাদী হাদীস বর্ণনাকারীর উদ্ভব হবে বলে তিনি উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেন:

سَيَكُونُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُحَدِّثُوْنَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

"শেষ যুগে আমার উম্মাতের কিছু মানুষ তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতা-পিতামহগণ কখনো শুনে নি। খবরদার! তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, তাদের থেকে দুরে থাকবে।"[৪২]

ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা' (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَطُوْفَ إِبْلِيْسُ فِيْ الأَسْوَاقِ، يَقُوْلُ: حَدَّثَنِيْ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ بِكَذَا وَكَذَا.

"কেয়ামতের পূর্বেই শয়তান বাজারে-সমাবেশে ঘুরে ঘুরে হাদীস বলবে: আমাকে অমুকের ছেলে অমুক এই এই বিষয়ে এ হাদীস বলেছে।"[৪৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلا أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ.

"শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষদের মধ্যে আগমন করে এবং তাদেরকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে। এরপর মিথ্যা হাদীসগুলো শুনে সমবেত মানুষ সমাবেশ ভেঙ্গে চলে যায়। অতঃপর তারা সে সকল মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে বলে: আমি এক ব্যক্তিকে হাদীসটি বলতে শুনেছি যার চেহারা আমি চিনি তবে তার নাম জানি না।"[৪৪]

### ২. ৫. ৫. সন্দেহযুক্ত বর্ণনা গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচাই না করে কোনো হাদীস গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ যাচাই না করে যা শুনে তাই হাদীস বলে গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে তাহলে হাদীস যাচাইয়ে তার অবহেলার জন্য সে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার পাপে পাপী হবে। ইচ্ছাকৃত মিথ্যা হাদীস বানানোর জন্য নয়, শুধুমাত্র সত্যমিথ্যা যাচাই না করে হাদীস গ্রহণ করাই তার মিথ্যাবাদী বানানোর জন্য যথেষ্ট বলে হাদীসে বলা হয়েছে। উপরন্তু, যদি কোনো হাদীসের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে দ্বিধা বা সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি সে হাদীস বর্ণনা করে তাহলে সেও মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে ও মিথ্যা হাদীস বলার পাপে পাপী হবে।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে।"[৪৫]

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা) ও মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ.

"যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদীস বলবে এবং তার মনে সন্দেহ হবে যে, হাদীসটি মিথ্যা, সেও একজন মিথ্যাবাদী।"[৪৬]

## ২. ৬. হাদীসের নামে মিথ্যা বলার বিধান

### ২. ৬. ১. হাদীসের নামে মিথ্যা কঠিনতম কবীরা গোনাহ

উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে, হাদীসের নামে মিথ্যা বলা বা মানুষের কথাকে হাদীস বলে চালানো জঘন্যতম পাপ। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনোরূপ সংশয় বা দ্বিধা নেই। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ অনিচ্ছাকৃত বা অসাবধানতামূলক ভুলের ভয়ে হাদীস বলা থেকে বিরত থাকতেন। অনিচ্ছাকৃত ভুলকেও তারা ভয়ানক পাপ মনে করে সতর্কতার সাথে পরিহার করতেন। এছাড়া অন্যের বানোনো মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করাকেও তাঁরা মিথ্যা হাদীস বানানোর মত অপরাধ বলে মনে করতেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নাবাবী (৬৭৬ হি) বলেন: এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুলাহ ﷺ-এর নামে মিথ্য বলা কঠিনতম হারাম, ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ এবং তা জঘন্যতম ও ধ্বংসাত্মক অপরাধ। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ একমত। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে এ অপরাধের কারণে কাউকে কাফির বলা যাবে না। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কোনো মিথ্যা বলবে সে যদি তার এ মিথ্যা বলাকে হালাল মনে না করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না। সে পাপী মুসলিম। আর যদি সে এ কঠিনতম পাপকে হালাল মনে করে তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। আবু মুহাম্মাদ আল-জুআইনী ও অন্যান্য কতিপয় ইমাম এ অপরাধকে কুফুরী বলে গণ্য করেছেন। জুআইনী বলতেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলবে সে কাফির বলে গণ্য হবে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে।

এ সকল হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে যে কোনো মিথ্যাই সমভাবে হারাম, তা যে বিষয়েই হোক। শরীয়তের বিধিবিধান, ফযীলত, ওয়ায, নেককাজে উৎসাহ প্রদান, পাপের ভীতি বা অন্য যে কোনো বিষয়ে তাঁর নামে কোনো মিথ্যা বলা কঠিনতম হারাম ও ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে। যাঁরা মতামত প্রকাশ করতে পারেন এবং যাঁদের মতামত গ্রহণ করা যায় তাঁদের সকলেই এ বিষয়ে একমত।[৪৭]

### ২. ৬. ২. মাউযূ হাদীস উল্লেখ বা প্রচারও কঠিনতম হারাম

ইমাম নাবাবী আরো বলেন: জ্ঞাতসারে কোনো মিথ্যা বা বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করাও হারাম, তা যে অর্থেই হোক না কেন। তবে মিথ্যা হাদীসকে মিথ্যা হিসাবে জানানোর জন্য তার বর্ণনা জায়েয।[৪৮]

অন্যত্র তিনি বলেন: যদি কেউ জানতে পারেন যে, হাদীসটি মাউযূ অর্থাৎ মিথ্যা বা জাল, অথবা তার মনে জোরালো ধারণা হয় যে, হাদীসটি জাল তাহলে তা বর্ণনা করা তার জন্য হারাম। যদি কেউ জানতে পারেন অথবা ধারণা করেন যে, হাদীসটি মিথ্যা এবং তারপরও তিনি সে হাদীসটি বর্ণনা করেন, কিন্তু হাদীসটির বানোয়াট হওয়ার বিষয় উল্লেখ না করেন, তবে তিনিও হাদীস বানোয়াটকারী বলে গণ্য হবেন এবং এ সকল হাদীসে উল্লিখিত ভয়ানক শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবেন।[৪৯]

ইমাম যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন আল-ইরাকী (৮০৬ হি) বলেন: মাউযূ বা জাল হাদীস যে বিষয়ে বা যে অর্থেই হোক্, তা বলা হারাম। আহকাম, গল্প-কাহিনী, ফযীলত, নেককর্মে উৎসাহ, পাপ থেকে ভীতি প্রদর্শন বা অন্য যে কোনো বিষয়েই হোক না কেন, যে ব্যক্তি তাকে মাউযূ বলে জানতে পারবে তার জন্য তা বর্ণনা করা, প্রচার করা, তার দ্বারা দলীল দেয়া বা তার দ্বারা ওয়ায করা জায়েয নয়। তবে হাদীসটি যে জাল ও বানোয়াট সেকথা উল্লেখ করে তা বলা যায়।[৫০]

### ২. ৬. ৩. হাদীস বানোয়াটকারীর তাওবার বিধান

হাদীসের নামে মিথ্যা বলা ও অন্যান্য বিষয়ে মিথ্যা বলার মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য হলো, হাদীসের নামে মিথ্যাবাদীর তাওবা মুহাদ্দিসগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যদি কোনো ব্যক্তির বিষয়ে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কোনো কথাকে মিথ্যাভাবে রাসূলুলাহ ﷺ-এর কথা বলে উল্লেখ করেছেন বা প্রচার করেছেন এবং এরপর তিনি তাওবা করেছেন, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতেও পারেন, তবে মুহাদ্দিসগণের কাছে তিনি তাওবার কারণে গ্রহণযোগ্যতা ফিরে পাবেন না। মুহাদ্দিসগণ আর কখনোই সে ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস সত্য ও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করবেন না।

পঞ্চম শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আহমাদ ইবনু সাবিত খতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি) বলেন: যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মিথ্যা বলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সে যদি তাওবা করে এবং তাঁর সততা প্রমাণিত হয় তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হতে পারে বলে ইমাম মালিক উল্লেখ করেছেন। আর যদি কেউ হাদীস জাল করে, হাদীসের মধ্যে কোনো মিথ্যা বলে বা যা শোনে নি তা শুনেছে বলে দাবী করে তাহলে তার বর্ণিত হাদীস কখনোই সত্য বা সঠিক বলে গণ্য করা যাবে না। আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, সে যদি পরে তাওবা করে তাহলেও তার বর্ণিত কোনো হাদীস সত্য বলে গণ্য করা যাবে না। ইমাম আহমাদ (২৪১ হি)-কে প্রশ্ন করা হয়: একব্যক্তি একটিমাত্র হাদীসের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলেছিল, এরপর সে তাওবা করেছে এবং মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করেছে, তার বিষয়ে কী করণীয়? তিনি বলেন: তার তাওবা তার ও আল্লাহর মাঝে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কবুল করতে পারেন। তবে তার বর্ণিত কোনো হাদীস আর কখনোই সঠিক বলে গ্রহণ করা যাবে না বা কখনোই তার বর্ণনার উপর নির্ভর করা যাবে না। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি), আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (১৮১ হি) ও অন্যান্য ইমামও অনুরূপ কথা বলেছেন।

ইমাম বুখারীর অন্যতম উস্তাদ আব্দুলাহ ইবনু যুবাইর আল-হুমাইদী (২১৯ হি) বলেন, যদি কেউ হাদীস বর্ণনা করতে যেয়ে বলে: আমি অমুকের কাছে হাদীসটি শুনেছি, এরপর প্রমাণিত হয় যে, সে উক্ত ব্যক্তি থেকে হাদীসটি শোনেনি, বা অন্য কোনোভাবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার মিথ্যা ধরা পড়ে তবে তার বর্ণিত কোনো হাদীসই আর সঠিক বা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা যাবে না। খতীব বাগদাদী বলেন, ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ধরা পড়লে সেক্ষেত্রে এ বিধান।[৫১]

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (১০৫২ হি) বলেন: যদি কোনো ব্যক্তির বিষয়ে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে জীবনে একবারও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলার কথা প্রমাণিত হয় তবে তার বর্ণিত কোনো হাদীস সঠিক বা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হবে না, যদিও সে তাওবা করে।[৫২]

### ২. ৭. হাদীসের নামে মিথ্যা বলার উন্মেষ

আমরা জানি যে, সকল সমাজ, জাতি ও ধর্মে মিথ্যা ও মিথ্যাবাদী ঘৃণিত। সত্যবাদীতা সর্বদা ও সর্বত্র প্রশংসিত ও নন্দিত। এজন্যই আরবের জাহিলী সমাজেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অতুলনীয় সত্যবাদিতা প্রশংসিত হয়েছে। তিনি 'আল-আমীন' ও 'আস-সাদিক': বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহচর সাহাবীগণকে অনুপম অতুলনীয় সত্যবাদিতার উপর গড়ে তুলেছেন। তাঁদের সত্যবাদিতা ছিল আপোষহীন। কোনো কষ্ট বা বিপদের কারণেই তাঁরা সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। উপরন্তু তিনি ওহীর নামে ও হাদীসের নামে মিথ্যা বলতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন এবং এর কঠিন শাস্তির কথা বারংবার বলেছেন।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে ইচ্ছাকৃত কোনো মিথ্যা তো দূরের কথা, সামান্যতম

অনিচ্ছাকৃত ভুল বা বিকৃতিকেও তাঁরা কঠিনতম পাপ বলে গণ্য করে তা পরিহার করতেন।

এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কখনোই কোনো অবস্থায় তাঁর নামে মিথ্যা বলার কোনো ঘটনা ঘটে নি। বরং আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ সাহাবী অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে কোনো হাদীসই বলতেন না।

রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় মদীনার সমাজে কতিপয় মুনাফিক বাস করত। এদের মধ্যে মিথ্যা বলার প্রচলন ছিল। তবে এরা সংখ্যায় ছিল অতি সামান্য ও সমাজে এদের মিথ্যাবাদিতা জ্ঞাত ছিল। এজন্য তাদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করতেন না এবং তারাও কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার সাহস বা সুযোগ পাননি।

একটি ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, এক যুবক এক যুবতীর পাণিপ্রার্থী হয়। যুবতীর আত্মীয়গণ তার কাছে তাদের মেয়ে বিবাহ দিতে অসম্মত হয়। পরবর্তী সময়ে সে যুবক তাদের কাছে গমন করে বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তোমাদের বংশের যে কোনো মেয়ে বেছে নিয়ে বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যুবকটি সেখানে অবস্থান করে। ইত্যবসরে তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে এসে বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি বলেন, যুবকটি মিথ্যা বলেছে। তোমরা তাকে জীবিত পেলে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবে। ... তবে তাকে জীবিত পাবে বলে মনে হয় না। ... তারা ফিরে যেয়ে দেখেন যে, সাপের কামড়ে যুবকটির মৃত্যু হয়েছে।..[৫৩]

এ বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য হলে এ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলার একটি ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এ বর্ণনাটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। কয়েকজন মিথ্যায় অভিযুক্ত ও অত্যন্ত দুর্বল রাবীর মাধ্যমে ঘটনাটি বর্ণিত।[৫৪]

সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে যতদিন মুসলিম সমাজে সাহাবীগণের আধিক্য ছিল ততদিন তাঁর নামে মিথ্যা বলার কোনো ঘটনা ঘটে নি।

সময়ের আবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ সময়ে অনেক সাহাবী মৃত্যুবরণ করেন। অগণিত নও-মুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার প্রবণতার উন্মেষ ঘটে। ক্রমান্বয়ে তা প্রসার লাভ করতে থাকে।

২৩ হিজরী সালে যুন্নুরাইন উসমান ইবনু আফফান (রা) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৩৫ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ১২ বছর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে ইসলামী বিজয়ের সাথে সাথে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইসলামের প্রসার ঘটে। অগণিত মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মদীনা থেকে বহুদূরে মিশর, কাইরোয়ান, কুফা, বাসরা, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, খোরাসান ইত্যাদি এলাকায় বসবাস করতেন। সাহাবীগণের সাহচর্য থেকেও তারা বঞ্চিত ছিলেন।

তাঁদের অনেকের মধ্যে প্রকৃত ইসলামী বিশ্বাস, চরিত্র ও কর্মের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে নি। এদের অজ্ঞতা, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, ইসলাম ধর্ম বা আরবদের প্রতি আক্রোশ ইত্যাদির ফলে এদের মধ্যে বিভিন্ন মিথ্যা ও অপপ্রচার ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইসলামের অনেক শত্রু সামরিক ময়দানে ইসলামের পরাজয় ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে মিথ্যা ও অপপ্রচারের মাধ্যমে ইসলামের ধ্বংসের চেষ্টা করতে থাকে। আর সবচেয়ে কঠিন ও স্থায়ী মিথ্যা যে মিথ্যা ওহী বা হাদীসের নামে প্রচারিত হয়। ইসলামের শত্রুরা সে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে।

এসময়ে এ সকল মানুষ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশধরদের মর্যাদা, ক্ষমতা, বিশেষত আলী (রা)-এর মর্যাদা, বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ ক্ষমতা, অলৌকিকত্ব, তাকে ক্ষমতায় বসানোর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে ও উসমান ইবনু আফফান (রা)-এর নিন্দায় অগণিত কথা বলতে থাকে। এ সব বিষয়ে অধিকাংশ কথা তারা বলতো যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। আবার কিছু কথা তারা আকারে-ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামেও বানিয়ে বলতে থাকে। যদিও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে সরাসরি মিথ্যা বলার দুঃসাহস তখনো এ সকল পাপাত্মাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। তখনো অগণিত সাহাবী জীবিত রয়েছেন। মিথ্যা ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। তবে মিথ্যার প্রবণতা গড়ে উঠতে থাকে।

৩য়-৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) ৩৫ হিজরীর ঘটনা আলোচনা কালে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা ইয়ামানের ইহুদী ছিল। উসমান (রা) এর সময়ে সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর বিভিন্ন শহরে ও জনপদে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক কথা প্রচার করতে থাকে। হিজাজ, বসরা, কূফা ও সিরিয়ায় তেমন সুবিধা করতে পারে না। তখন সে মিশরে গমন করে। সে প্রচার করতে থাকে: অবাক লাগে তার কথা ভাবতে যে ঈসা (আ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন বলে বিশ্বাস করে, অথচ মুহাম্মাদ (ﷺ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন বলে বিশ্বাস করে না। ঈসার পুনরাগমনের কথা সে সত্য বলে মানে, আর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পুনরাগমনের কথা বললে তা মিথ্যা বলে মনে করে।.... হাজারো নবী চলে গিয়েছেন। প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের একজনকে ওসীয়তের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করে গিয়েছেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রদত্ত ওসীয়ত ও দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি আলী ইবনু আবী তালিব। ... মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী এবং আলী শেষ ওসীয়ত প্রাপ্ত

দায়িত্বশীল।... যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীয়ত ও দায়িত্ব প্রদানকে মেনে নিল না, বরং নিজেই ক্ষমতা নিয়ে নিল, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে। ...[৫৫]

এখানে আমরা দেখছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা নিজের বিভ্রান্তিগুলোকে যুক্তির আবরণে পেশ করার পাশাপাশি কিছু কথা পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলছে। আলী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাকে দায়িত্ব প্রদান না করা যুলুম ইত্যাদি কথা সে বলছে।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, এ সময়ে মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে সত্যপরায়ণতার ক্ষেত্রে এ ধরনের দুর্বলতা দেখা দেয়ায় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের নামে মিথ্যা বলা প্রতিরোধের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন।

প্রথম হিজরী শতকের শেষ দিকে নিজ নিজ বিভ্রান্ত মত প্রমাণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বানোয়াট হাদীস তৈরি করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। সাহাবীগণের নামেও মিথ্যা বলার প্রবণতা বাড়তে থাকে। পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মুখতার ইবনু আবু উবাইদ সাকাফী (১-৬৭ হি) সাহাবীগণের সমসাময়িক একজন তাবিয়ী। ৬০ হিজরীতে কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন (রা) -এর শাহাদতের পরে তিনি ৬৪-৬৫ হিজরীতে মক্কার শাসক আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (১-৭৩ হি) পক্ষ থেকে কুফায় গমন করেন। কুফায় তিনি ইমাম হুসাইনের হত্যায় জড়িতদের ধরে হত্যা করতে থাকেন। এরপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজেকে আলীর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যার প্রতিনিধি বলে দাবী করেন। এরপর তিনি নিজেকে ওহী-ইলহাম প্রাপ্ত, রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর বিশেষ প্রতিনিধি, খলীফা ইত্যাদি দাবী করতে থাকেন। অবশেষে ৬৭ হিজরীতে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের বাহিনীর কাছে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

তার এ সকল দাবীদাওয়ার সত্যতা প্রমাণিত করার জন্য তিনি একাধিক ব্যক্তিকে তার পক্ষে মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলার জন্য আদেশ, অনুরোধ ও উৎসাহ প্রদান করেন। আবু আনাস হাররানী বলেন, মুখতার ইবনু আবু উবাইদ সাকাফী একজন হাদীস বর্ণনাকারীকে বলেন, আপনি আমার পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে একটি হাদীস তৈরি করুন, যাতে থাকবে যে, আমি তাঁর পরে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করব এবং তাঁর সন্তানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করব। এজন্য আমি আপনাকে দশহাজার দিরহাম, যানবাহন, ক্রীতদাস ও পোশাক-পরিচ্ছদ উপঢৌকন প্রদান করব। সে হাদীস বর্ণনাকারী বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কোনো হাদীস বানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কোনো একজন সাহাবীর নামে কোনো কথা বানানো যেতে পারে। এজন্য আপনি আপনার উপঢৌকন ইচ্ছামত কম করে দিতে পারেন। মুখতার বলে: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কিছু হলে তার গুরুত্ব বেশি হবে। সে ব্যক্তি বলেন: তার শাস্তিও বেশি কঠিন হবে।[৫৬]

মুখতার অনেককেই এভাবে অনুরোধ করে। প্রয়োজনে ভীতি প্রদর্শন বা হত্যাও করেছেন। সালামাহ ইবনু কাসীর বলেন, ইবনু রাব'য়া খুযায়ী রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর যুগ পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি একবার কুফায় গমন করি। আমাকে মুখতার সাকাফীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আমার সাথে একাকী বসে বলেন, জনাব, আপনি তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগ পেয়েছেন। আপনি যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কোনো কথা বলেন তা মানুষেরা বিশ্বাস করবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে একটি হাদীস বলে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন। এ ৭০০ স্বর্ণমুদ্রা আপনার জন্য। আমি বললাম: রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার নিশ্চিত পরিণতি জাহান্নাম। আমি তা বলতে পারব না।[৫৭]

সাহাবী আম্মার ইবনু ইয়াসারের (রা) পুত্র মুহাম্মাদ ইবনু আম্মারকেও মুখতার তার পক্ষে তাঁর পিতা আম্মারের সূত্রে মিথ্যা হাদীস বানিয়ে প্রচার করতে নির্দেশ দেয়। তিনি অস্বীকার করলে মুখতার তাকে হত্যা করে।[৫৮]

প্রথম হিজরী শতকের শেষ দিক থেকে প্রখ্যাত সাহাবীগণের নামে মিথ্যা বলার প্রবণতা দেখা দেয়। বিশেষত আলী ইবনু আবী তালিব (রা)-এর নামে মিথ্যা বলার প্রবণতা তাঁর কিছু অনুসারীর মধ্যে দেখা দেয়। তিনি আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-কে মনে মনে অপছন্দ করতেন বা নিন্দা করতেন, তিনি অলৌকিক সব কাজ করতেন, তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বানোয়াট কথা তারা বলতে শুরু করে।

প্রখ্যাত তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ (১১৭ হি) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের (৬৮ হি) নিকট পত্র লিখে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন আমাকে কিছু নির্বাচিত প্রয়োজনীয় বিষয় লিখে দেন। তখন তিনি বলেন:

وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الأُمُورَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِي عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إِلا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ

"বিশ্বস্ত ও কল্যাণকামী যুবক। আমি তার জন্য কিছু বিষয় পছন্দ করে লিখব এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিব। তখন তিনি আলী (রা) এর বিচারের লিখিত পাণ্ডুলিপি চেয়ে নেন। তিনি তা থেকে কিছু বিষয় লিখেন। আর কিছু কিছু বিষয় পড়ে তিনি বলেন: আল্লাহর কসম, আলী এ বিচার কখনোই করতে পারেন না। বিভ্রান্ত না হলে কেউ এ বিচার করতে পারে না।"[৫৯]

অর্থাৎ আলীর কিছু অতি-উৎসাহী ও অতি-ভক্ত সহচর তাঁর নামে এমন কিছু মিথ্যা কথা এসব পাণ্ডুলিপির মধ্যে লিখেছে যা তাঁর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে, যদিও তারা তার মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এগুলো বাড়িয়েছে।

এ বিষয়ে অন্য তাবিয়ী তাঊস ইবনু কাইসান (১০৬ হি) বলেন:

أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَحَاهُ إِلا قَدْرَ وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ

"ইবনু আব্বাস (রা) এর কাছে আলী (রা) এর বিচারের পাণ্ডুলিপি আনয়ন করা হয়। তিনি এক হাত পরিমাণ বাদে সে পাণ্ডুলিপির সব কিছু মুছে ফেলেন।"[৬০]

প্রখ্যাত তাবিয়ী আবু ইসহাক আস-সাবীয়ী (১২৯ হি) বলেন, যখন আলী (রা)-এর এ সকল অতিভক্ত অনুসারী তাঁর ইন্তেকালের পরে এ সকল নতুন বানোয়াট কথার উদ্ভাবন ঘটালো তখন আলীর (রা) অনুসারীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলেন: আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন! কত বড় ইলম এরা নষ্ট করল![৬১]

তাবিয়ী মুগীরাহ ইবনু মিকসাম আদ-দাব্বী (১৩৬ হি) বলেন,

لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ إِلا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه.

(আলীর (রা) নামে মিথ্যাচারের কারণে) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের সাহচর্য লাভ করেছে এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ আলী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করলে তা সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হতো না।[৬২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে ক্রমান্বয়ে মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থে ও উদ্দেশ্যে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার প্রবণতা দেখা দেয়। যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে এ সব প্রবণতা বাড়তে থাকে। হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে ক্রমেই মিথ্যাবাদীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং মিথ্যার প্রকার ও পদ্ধতিও বাড়তে থাকে। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে জালিয়াতদের পরিচয় ও জালিয়াতির কারণ আলোচনা করব। তবে তার আগেই আমরা মিথ্যা প্রতিরোধে মুসলিম উম্মাহর কর্মপন্থা আলোচনা করতে চাই।

## ৩. মিথ্যা প্রতিরোধে সাহাবীগণ

ওহীর জ্ঞানের নির্ভুল সংরক্ষণের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক নির্দেশ, ওহীর নামে মিথ্যা বা আন্দাজে কথা বলার ভয়াবহ পরিণতি, হাদীসের নির্ভুল সংরক্ষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ নির্দেশ ও হাদীসের নামে মিথ্যা বলার নিষেধাজ্ঞার আলোকে সাহাবীগণ হাদীসে রাসূল (ﷺ)-কে সকল প্রকার অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞতাপ্রসূত বা ইচ্ছাকৃত ভুল, বিকৃতি বা মিথ্যা থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। **প্রথমত:** তাঁরা নিজেরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। পরিপূর্ণ ও নির্ভুল মুখস্থ সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিত না হলে তাঁরা হাদীস বলতেন না। **দ্বিতীয়ত:** তাঁরা সবাইকে এভাবে পূর্ণরূপে হুবহু ও নির্ভুলভাবে মুখস্থ করে হাদীস বর্ণনা করতে উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান করতেন। **তৃতীয়ত:** তাঁরা সাহাবী ও তাবিয়ী যে কোনো হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীসের নির্ভুলতার বিষয়ে সামান্যতম দ্বিধা হলে তা বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করার পরে গ্রহণ করতেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, তাঁদের যুগে ইচ্ছাকৃত ভুলের কোনো প্রকার সম্ভাবনা ছিল না। মানুষের জাগতিক কথাবার্তা ও লেনদেনেও কেউ মিথ্যা বলতেন না। সততা ও বিশ্বস্ততা ছিলই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞতাপ্রসূত বা অসাবধানতাজনিত সামান্যতম ভুল থেকে হাদীসে রাসূল (ﷺ) এর রক্ষায় তাঁদের কর্মধারা দেখলে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

### ৩. ১. অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা থেকে আত্মরক্ষা

আমরা দেখেছি যে, অনিচ্ছাকৃত ভুলও মিথ্যা বলে গণ্য। সাহাবীগণ নিজে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত 'মিথ্যা' থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্ভুলভাবে ও আক্ষরিকভাবে হাদীস বলার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের সতর্কতার অগণিত ঘটনা হাদীস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

তাবিয়ী আমর ইবনু মাইমূন আল-আযদী (৭৪ হি) বলেন,

مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلا أَتَيْتُهُ فِيهِ، قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا

كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَنَكَسَ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَهُوَ قَائِمٌ مُحَلَّلَةً أَزْرَارُ قَمِيصِهِ قَدِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، قَالَ: أَوْ دُونَ ذَلِكَ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ.

"আমি প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) এর কাছে আগমন করতাম। তিনি তাঁর কথাবার্তার মধ্যে 'রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেছেন' একথা কখনো বলতেন না। এক বিকালে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন', এরপর তিনি মাথা নিচু করে ফেলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর জামার বোতামগুলো খোলা। তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে গিয়েছে এবং গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। তিনি বললেন: অথবা এর কম, অথবা এর বেশি, অথবা এর মত, অথবা এর কাছাকাছি কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।"[৬৩]

তাবিয়ী মাসরূক ইবনুল আজদা' আবু আইশা (৬১ হি) বলেন,

إن عبد الله حَدَّثَ يَوْماً عَنْ رَسُولِ اللهِ فَارْتَعَدَ وَارْتَعَدَتْ ثِيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ نَحْوَ هَذَا.

"একদিন আব্দুলাহ ইবনু মাসউদ রাসূলুলাহ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তখন তিনি কেঁপে উঠেন এমনকি তাঁর পোশাকেও কম্পন পরিলক্ষিত হয়। এরপর তিনি বলেন: অথবা অনুরূপ কথা তিনি বলেছেন।"[৬৪]

তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন:

كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَفَرَغَ مِنْهُ قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

আনাস ইবনু মালিক (রা) যখন হাদীস বলতেন তখন হাদীস বর্ণনা শেষ করে বলতেন: অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন (আমার বর্ণনায় ভুল হতে পারে)।"[৬৫]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীগণ জ্ঞাতসারে একটি শব্দেরও পরিবর্তন করতেন না। আক্ষরিকভাবে হুবহু বর্ণনা করতেন তাঁরা। তাবিয়ী সা'দ ইবনু উবাইদাহ সুলামী (১০৩ হি) বলেন: সাহাবী আব্দুলাহ ইবনু উমার ﷺ(৭৩ হি) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ. فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ. قَالَ: لاَ، «صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ»، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

"পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত বা তাওহীদ, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রামাদানের সিয়াম পালন এবং হজ্জ।" তখন একব্যক্তি বলে: "হজ্জ ও রামাদানের সিয়াম"। তিনি বলেন: না, "রামাদানের সিয়াম ও হজ্জ।" এভাবেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি।"[৬৬]

ইয়াফুর ইবনু রূযী নামক তাবিয়ী বলেন, আমি শুনলাম, উবাইদ ইবনু উমাইর (৭২ হি) নামক প্রখ্যাত তাবিয়ী ও মক্কার সুপ্রসিদ্ধ ওয়ায়িয একদিন ওয়াযের মধ্যে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ.

"মুনাফিকের উদাহরণ দু'টি ছাগলের পালের মধ্যে **অবস্থানরত** ছাগীর ন্যায়।"

একথা শুনে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (৭৩ হি) বলেন:

وَيْلَكُمْ لاَ تَكْذِبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ»

"দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছেন: "মুনাফিকের উদাহরণ হলো দু'টি ছাগলের পালের মধ্যে **যাতায়াতরত** (wandering, roaming) ছাগীর ন্যায়।"[৬৭]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা ও পরিপূর্ণ নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য অধিকাংশ সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন। শুধুমাত্র যে কথাগুলো বা ঘটনাগুলো তাঁরা পরিপূর্ণ নির্ভুলভাবে মুখস্থ রেখেছেন বলে নিশ্চিত থাকতেন সেগুলোই বলতেন। অনেকে কখনোই রাসূলুলাহ ﷺ-এর নামে কিছু বলতেন না। সাহাবীগণের সংখ্যা ও হাদীস-বর্ণনাকারী

সাহাবীগণের সংখ্যার মধ্যে তুলনা করলেই আমরা বিষয়টি বুঝতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কমবেশি সাহচর্য লাভ করেছেন এমন সাহাবীর সংখ্যা লক্ষাধিক। নাম পরিচয় সহ প্রসিদ্ধ সাহাবীর সংখ্যা ১০ সহস্রাধিক। অথচ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা মাত্র দেড় হাজার।

সাহাবীদের নামের ভিত্তিতে সংকলিত প্রসিদ্ধ সর্ববৃহৎ হাদীস গ্রন্থ মুসনাদ আহমাদ। ইমাম আহমাদ এতে মোটামুটি গ্রহণ করার মত সকল সহীহ ও যয়ীফ হাদীস সংকলিত করেছেন। এতে ৯০৪ জন সাহাবীর হাদীস সংকলিত হয়েছে। পরিচিত, অপরিচিত, নির্ভরযোগ্য, অনির্ভরযোগ্য সকল হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা একত্রিত করলে ১৫৬৫ হয়।

আরো লক্ষণীয় যে, হাদীস বর্ণনাকারী সহস্রাধিক সাহাবীর মধ্যে অধিকাংশ সাহাবী মাত্র ১ থেকে ২০/৩০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ১০০ টির অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন সাহাবীর সংখ্যা মাত্র ৩৮ জন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ৭ জন সাহাবী থেকে এক হাজারের অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বাকী ৩১ জন সাহাবী থেকে একশত থেকে কয়েকশত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৬৮]

অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকার অনেক ঘটনা সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত। সাইব ইবনু ইয়াযিদ (৯১ হি) সাহাবী ছিলেন। ছোট বয়সে তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্য লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি সাহাবীগণের সাহচর্যে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি বলেন,

صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ، وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إلاَّ أَنِّيْ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَتَحَدَّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ.

"আমি আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা), তালহা ইবনু উবাইদুলাহ (রা), সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা), মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) প্রমূখ সাহাবীর সাহচর্যে সময় কাটিয়েছি। তাঁদের কাউকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বলতে শুনিনি। তবে শুধুমাত্র তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহকে আমি উহদ যুদ্ধ সম্পর্কে বলতে শুনেছি।"[৬৯]

তিনি আরো বলেন:

صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ

"আমি সা'দ ইবনু মালিক (রা) এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত গিয়েছি, অথচ তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদীসও বলতে শুনিনি।"[৭০]

হিজরী প্রথম শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী শা'বী (২০৪ হি) বলেন:

جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا.

"আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) সাথে একটি বছর থেকেছি, অথচ তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কিছুই বলতে শুনিনি।"[৭১]

অন্যত্র তিনি বলেন:

قَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا (حديثاً واحداً).

"আমি দুই বছর বা দেড় বছর আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) কাছে বসেছি। এ দীর্ঘ সময়ে তাঁকে মাত্র একটি হাদীস বলতে শুনেছি...।"[৭২]

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) বলেন, আমি আমার পিতা যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-কে বললাম, কোনো কোনো সাহাবী যেমন হাদীস বর্ণনা করেন আপনাকে তদ্রূপ হাদীস বলতে শুনিনা কেন? তিনি বলেন:

أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ (مُتَعَمِّداً) فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"(ইসলাম গ্রহণের পর থেকে) আমি কখনই তাঁর সাহচর্য থেকে দূরে যাই নি। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আমার নামে (ইচ্ছাকৃতভাবে) যে ব্যক্তি মিথ্যা বলবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে বসবাস করতে হবে।"[৭৩]

তাহলে যুবাইর ইবনুল আওয়াম (৩৬ হি)-এর হাদীস না বলার কারণ অজ্ঞতা নয়। তিনি নবুয়তের প্রথম পর্যায়ে কিশোর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এরপর দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে তিনি প্রায় ২৫ বছর বেঁচে ছিলেন। অথচ তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৪০ টিরও কম। মুসনাদ আহমদে তাঁর থেকে ৩৬ টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইবনু হাযাম উল্লেখ করেছেন যে, নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য সনদে তাঁর নামে বর্ণিত সকল

হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৩৮ টি।[৭৪]

আমরা দেখছি যে, অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে তিনি হাদীস বলা থেকে বিরত থাকতেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার শাস্তি জাহান্নাম। আর অনিচ্ছাকৃত ভুল বা শব্দগত পরিবর্তন ও তাঁর নামে মিথ্যা বলা হতে পারে। এজন্য তিনি হাদীস বর্ণনা থেকে অধিকাংশ সময় বিরত থাকতেন।

অন্যান্য সাহাবীও এভাবে অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকতেন। তাবিয়ী আব্দুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা (৮৩ হি) বলেন,

قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَبِرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَدِيدٌ.

"আমরা সাহাবী যাইদ ইবনু আরকাম (৬৮ হি) কে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বলেন: আমরা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি এবং বিস্মৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে হাদীস বলা খুবই কঠিন দায়িত্ব।"[৭৫]

সাহাবী সুহাইব ইবনু সিনান (রা) বলতেন:

هَلُمُّوْا أُحَدِّثْكُمْ مِنْ مَغَازِيْنَا، فَأَمَّا أَنْ أَقُوْلَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَلاَ

"তোমরা এস, আমি তোমাদেরকে আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী বর্ণনা করব। তবে কোনো অবস্থাতেই আমি 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন' একথা বলব না।"[৭৬]

তাবিয়ী হাশিম হুরমুযী বলেন, আনাস ইবনু মালিক (রা) বলতেন:

لَوْلا أَنْ أَخْشَى أَنْ أُخْطِئَ لَحَدَّثْتُكُمْ بِأَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَكِنَّهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"আমার ভয় হয় যে, আমি অনিচ্ছাকৃত ভুল করে ফেলব। এ ভয় না থাকলে আমি অনেক কিছু তোমাদেরকে বলতাম যা আমি তাঁকে বলতে শুনেছি। কিন্তু তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে বসবাস করতেই হবে।"[৭৭]

তাবিয়ী আব্দুর রাহমান ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (৯৮ হি) বলেন: আমি আবু কাতাদাহ (রা) কে বললাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখ থেকে যা শুনেছেন সেসব হাদীস থেকে কিছু আমাকে বলুন। তিনি বলেন:

إني أَخْشَى أَنْ يَزِلَّ لِسَانِي بِشَيْءٍ لَمْ يَقُلْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، إِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنِّي، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"আমার ভয় হয় যে, আমার জিহ্বা পিছলে এমন কিছু বলবে যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন নি। আর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, সাবধান, তোমরা আমার নামে বেশি হাদীস বলা পরিহার করবে। যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে বসবাস করতে হবে।"[৭৮]

এভাবে সাহাবীগণ অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকতেন। এখানে লক্ষণীয় যে, আনাস ইবনু মালিক ও আবু কাতাদাহ দুজনেই বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর নামে মিথ্যা বলার শাস্তি বর্ণনা করেছেন।' কিন্তু তাঁরা অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে হাদীস বর্ণনা পরিহার করছেন। কারণ ভুল হতে পারে জেনেও সাবধান না হওয়ার অর্থ 'ইচ্ছাকৃতভাবে অনিচ্ছাকৃত ভুলের সুযোগ দেয়া।' অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে সর্বাত্মক সতর্ক না হওয়ার অর্থ ইচ্ছাকৃত বিকৃতিকে প্রশ্রয় দেয়া। কাজেই যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে সতর্ক না হওয়ার কারণে ভুল করল, সে ইচ্ছাকৃতভাবেই রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামে মিথ্যা বলল। কোনো মুমিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের বিষয়ে অসতর্ক হতে পারেন না।

### ৩. ২. অন্যের বলা হাদীস যাচাই পূর্বক গ্রহণ করা

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাহাবীগণ নিজেরা হাদীস বর্ণনার সময় আক্ষরিকভাবে নির্ভুল বলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন এবং কোনো প্রকারের দ্বিধা বা সন্দেহ হলে হাদীস বলতেন না। হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তাঁদের দ্বিতীয় কর্মধারা ছিল অন্যের বর্ণিত হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা। অন্য কোনো সাহাবী বা তাঁদের সমকালীন তাবিয়ীর বর্ণিত হাদীসের আক্ষরিক নির্ভুলতা বা যথার্থতা (Accuracy) সম্বন্ধে সামান্যতম সন্দেহ হলে তাঁরা তা যাচাই না করে গ্রহণ করতেন না।

অর্থাৎ তাঁরা নিজে হাদীস বলার সময় যেমন 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা' থেকে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন, তদ্রূপভাবে অন্যের বর্ণিত হাদীস সঠিক বলে গণ্য করার পূর্বে তাতে কোনো মিথ্যা বা ভুল আছে কিনা তা যাচাই করতেন। এ সুক্ষ্ম যাচাই ও নিরীক্ষাকে তাঁরা হাদীসের বিশুদ্ধতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত অন্যতম দায়িত্ব বলে মনে করতেন। এজন্য এতে কেউ কখনো আপত্তি করেন নি বা অসম্মানবোধ করেন নি।

**৩. ২. ১. নির্ভুলতা নির্ণয়ে তুলনামূলক নিরীক্ষা**

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, মিথ্যা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় প্রকারের হতে পারে। উভয় ধরনের মিথ্যা বা ভুল থেকে হাদীসকে রক্ষার জন্য সাহাবায়ে কেরাম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তাঁদের যুগে কোনো সাহাবী মিথ্যা বলতেন না এবং নির্ভুলভাবে হাদীস বলার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করতেন না। তবুও তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর কোনো ভুল হতে পারে সন্দেহ হলেই তাঁর বর্ণনাকে তুলনামূলক নিরীক্ষার (معارضة ومقابلة وموازنة) মাধ্যমে যাচাই করে তা গ্রহণ করতেন। তুলনামূলক নিরীক্ষার প্রক্রিয়া ছিল বিভিন্ন ধরনের:

১. বর্ণিত হাদীস অর্থাৎ বাণী, নির্দেশ বা বর্ণনাকে মূল নির্দেশদাতার নিকট পেশ করে তার যথার্থতা ও নির্ভুলতা (Accuracy) নির্ণয় করা।

২. বর্ণিত বাণী, নির্দেশ বা বর্ণনা (হাদীস)-কে অন্য কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তির বর্ণনার সাথে মিলিয়ে এর যথার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয় করা।

৩. বর্ণিত বাণী, নির্দেশ বা বর্ণনা (হাদীস)-কে বর্ণনাকারীর বিভিন্ন সময়ের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে এর যথার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয় করা।

৪. বর্ণিত হাদীসটির বিষয়ে বর্ণনাকারীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বা শপথ করিয়ে বর্ণনাটির যথার্থতা বা নির্ভুলতা নির্ধারণ করা।

৫. বর্ণিত বাণী, নির্দেশ বা হাদীসটির অর্থ কুরআন ও হাদীসের প্রসিদ্ধ অর্থ ও নির্দেশের সাথে মিলিয়ে দেখা।

এ সকল নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারী হাদীসটি সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে ও বর্ণনা করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করতেন। হাদীসের পরিভাষায় একে 'ضبط' বিচার বলা হয়। বাংলায় আমরা (ضبط) অর্থ 'বর্ণনার নির্ভুলতা' বা 'নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা' বলতে পারি।

সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী সকল যুগে হাদীসের 'বর্ণনার নির্ভুলতা' ও বিশুদ্ধতা নির্ধারণে এ সকল পদ্ধতিতে নিরীক্ষাই ছিল মুহাদ্দিসগণের মূল পদ্ধতি। আমরা জানি যে, বিশ্বের সকল দেশের সকল বিচারালয়ে প্রদত্ত সাক্ষ্যের যর্থার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্যও এ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। কোনো বর্ণনা বা সাক্ষ্যের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্য এটিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আমরা এখানে সাহাবীগণের যুগের কিছু উদাহরণ আলোচনা করব।

**৩. ২. ২. মুল বক্তব্যদাতাকে প্রশ্ন করা**

কোনো সাক্ষ্য বা বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাইয়ের সর্বোত্তম উপায় বক্তব্যদাতার কাছে প্রশ্ন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় কোনো সাহাবী অন্য কোনো সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের নির্ভুলতার বিষয়ে সন্দীহান হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করে নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়ক অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বিদায় হজ্জের বর্ণনার মধ্যে বলেন:

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ ... فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا قَالَ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ".

(বিদায় হজ্জের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা) কে ইয়ামানের প্রশাসক রূপে প্রেরণ করেন। ফলে) আলী (রা) ইয়ামান থেকে মক্কায় হজ্জে আগমন করেন। তিনি মক্কায় এসে দেখেন যে, ফাতিমা (রা) উমরা পালন করে 'হালাল' হয়ে গিয়েছেন। তিনি রঙিন সুগন্ধময় কাপড় পরিধান করেছেন এবং সুরমা ব্যবহার করেছেন। আলী এতে আপত্তি করলে তিনি বলেন: আমার আব্বা আমাকে এভাবে করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আলী বলেন: আমি ফাতিমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে অভিযোগ করলাম, সে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের কথা বলেছে তাও বললাম এবং আমার আপত্তির কথাও বললাম। ... তখন রাসূলুলাহ ﷺ বলেন: "সে ঠিকই বলেছে, সে সত্যই বলেছে।"[৭৯]

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, আলী (রা) ফাতেমার (রা) বর্ণনার যথার্থতার বিষয়ে সন্দীহান হন। তিনি তাঁর সত্যবাদীতায় সন্দেহ করেন নি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝা ও বর্ণনা করার বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হয়। অর্থাৎ তিনি 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার' বিষয়ে সন্দীহান হন। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করে নির্ভুলতা যাচাই করেন।

২. উবাই ইবনু কা'ব বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ وَهُوَ قَائِمٌ فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرٍّ يَغْمِزُنِي، فَقَالَ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ؟ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلا الآنَ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ. فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِي؟ فَقَالَ أُبَيٌّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاتِكَ الْيَوْمَ إِلا مَا لَغَوْتَ. فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أُبَيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَدَقَ أُبَيٌّ".

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিনে খুতবায় দাঁড়িয়ে সূরা তাবারাকা (সূরা ২৫- আল-ফুরকান) পাঠ করেন এবং আমাদেরকে আল্লাহর নেয়ামত ও শাস্তি সম্পর্কে ওয়ায করেন। এমতাবস্থায় আবু দারদা বা আবু যার আমার দেহে মৃদু চাপ দিয়ে বলেন: এ সূরা কবে নাযিল হলো, আমি তো এখনই প্রথম সূরাটি শুনছি। তখন উবাই তাঁকে ইশারায় চুপ করতে বলেন। সালাত শেষ হলে তিনি (আবু যার বা আবু দারদা) বলেন: আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সূরাটি কখন নাযিল হয়েছে, অথচ আপনি আমাকে কিছুই বললেন না! তখন উবাই বলেন: আপনি আজ আপনার সালাতের কোনোই সাওয়াব লাভ করেন নি, শুধুমাত্র যে কথাটুকু বলেছেন সেটুকুই আপনার (কারণ খুতবার সময়ে কথা বললে সালাতের সাওয়াব নষ্ট হয়)। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে যেয়ে বিষয়টি বলেন: তিনি বলেন: "উবাই সত্য কথাই বলেছে।"[৮০]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন:

حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ

"আমাকে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কোনো ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করলে তা অর্ধেক সালাত হবে। তখন আমি তাঁর কাছে গমন করলাম। আমি দেখলাম যে, তিনি বসে সালাত আদায় করছেন। তখন আমি তাঁর মাথার উপর আমার হাত রাখলাম। তিনি বললেন: হে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, তোমার বিষয় কি? আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনি বলেছেন, কোনো ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করলে তা অর্ধ-সালাত হবে, আর আপনি বসে সালাত আদায় করছেন। তিনি বললেন: হ্যাঁ, (আমি তা বলেছি), তবে আমি তোমাদের মত নই।"[৮১]

এভাবে অনেক ঘটনা আমরা হাদীসে দেখতে পাই যে, কারো বর্ণিত হাদীসের যথার্থতা বা নির্ভুলতার বিষয়ে সন্দেহ হলে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করে যথার্থতা যাচাই করতেন। তাঁরা বর্ণনাকারীর সততার বিষয়ে প্রশ্ন তুলতেন না। মূলত তিনি বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝেছেন কিনা এবং নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন কিনা তা তাঁরা যাচাই করতেন। এভাবে তাঁরা হাদীসের নামে 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা' বা ভুলক্রমে বিকৃতি প্রতিরোধ করতেন।

**৩. ২. ৩. অন্যদেরকে প্রশ্ন করা**

সাক্ষ্য বা বক্তব্যের যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতি বক্তব্যটি অন্য কেউ শুনেছেন কিনা এবং কিভাবে শুনেছেন তা খোঁজ করা। যে কোনো সাক্ষ্য বা বক্তব্যের নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্য তা সর্বজনীন পদ্ধতি। সকল বিচারালয়ে বিচারপতিগণ একাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্যের তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমেই রায় প্রদান করেন। একাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্যের মিল বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত করে এবং অমিল প্রামাণ্যতা নষ্ট করে।

রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পরে সাহাবীগণ এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। কোনো সাহাবীর বর্ণিত কোনো হাদীসের যথার্থতা বা নির্ভুলতা বিষয়ে তাঁদের কারো দ্বিধা হলে তাঁরা অন্যান্য সাহাবীকে প্রশ্ন করতেন বা বর্ণনাকারীকে সাক্ষী আনতে বলতেন। যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি বলতেন যে, তাঁরাও সে হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখ থেকে শুনেছেন, তখন তাঁরা হাদীসটি গ্রহণ করতেন। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) এ পদ্ধতির শুরু করেন। পরবর্তী খলীফাগণ ও সকল যুগের মুহাদ্দিসগণ তা অনুসরণ করেন। এখানে সাহাবীগণের যুগের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

১. সাহাবী কাবীসাহ ইবনু যুআইব (৮৪ হি) বলেন:

جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ.

"এক দাদী আবু বাকর (রা) এর কাছে এসে মৃত পৌত্রের সম্পত্তিতে তার উত্তরাধিকার দাবী করেন। আবু বাকর (রা) তাকে বলেন: আল্লাহর কিতাবে আপনার জন্য (দাদীর উত্তরাধিকার বিষয়ে) কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতেও আমি আপনার জন্য কিছু আছে বলে জানি না। আপনি পরে আসবেন, যেন আমি এ বিষয়ে অন্যান্য মানুষকে প্রশ্ন করে জানতে পারি। তিনি এ বিষয়ে মানুষদের প্রশ্ন করেন। তখন সাহাবী মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রা) বলেন: আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাদীকে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করেন। তখন আবু বাকর (রা) বলেন: আপনার সাথে কি অন্য কেউ আছেন? তখন অন্য সাহাবী মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ আনসারী (রা) উঠে দাঁড়ান এবং মুগীরার অনুরূপ কথা বলেন। তখন আবু বাকর সিদ্দীক (রা) দাদীর জন্য ১/৬ অংশ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন।"[৮২]

এখানে আমরা দেখছি যে, আবু বাকর সিদ্দীক (রা) হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা শিক্ষা দিলেন। মুগীরাহ ইবনু শু'বার একার বর্ণনার উপরেই তিনি নির্ভর করতে পারতেন। কারণ তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং কুরাইশ বংশের অত্যন্ত সম্মানিত নেতা ছিলেন। সমাজের যে কোনো পর্যায়ে তাঁর একার সাক্ষ্যই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবু বাকর (রা) সাবধানতা অবলম্বন করলেন। মুগীরাহর (রা) বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত হলেও তাঁর স্মৃতি বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে বা তাঁর অনুধাবনে ভুল হতে পারে। এজন্য তিনি দ্বিতীয় আর কেউ হাদীসটি জানেন কিনা তা প্রশ্ন করেন। দু'জনের বিবরণের উপর নির্ভর করে তিনি হাদীসটি গ্রহণ করেন।

এজন্য মুহাদ্দিসগণ আবু বাকর (রা)-কে হাদীস সমালোচনার জনক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫ হি) বলেন:

أَوَّلُ مَنَ وَقَى الْكَذِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"তিনিই (আবূ বকর সিদ্দীকই) সর্বপ্রথম রাসূলুলাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।"[৮৩]

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু তাহির ইবনুল কাইসুরানী (৫০৭ হি) সিদ্দীকে আকবারের জীবনী আলোচনা কালে বলেন:

وَهُوَ أَوَّلُ مَنِ احْتَاطَ فِيْ قَبُوْلِ الأَخْبَارِ.

"তিনিই সর্বপ্রথম হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেন।"[৮৪]

২. দ্বিতীয় খলীফ উমার (রা) এ বিষয়ে সিদ্দীকে আকবারের অনুসরণ করেছেন। বিভিন্ন ঘটনায় তিনি সাহাবীগণকে বর্ণিত হাদীসের জন্য দ্বিতীয় কোনো সাহাবীকে সাক্ষী হিসাবে আনয়ন করতে বলতেন। এ জাতীয় কতিপয় ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন:

كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ". فَقَالَ: "وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ"! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لا يَقُومُ مَعَكَ إِلا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ

"আমি আনসারদের এক মাজলিসে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় আবু মূসা আশআরী (রা) সেখানে আগমন করেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি অস্থির বা উৎকণ্ঠিত। তিনি বলেন: আমি উমার (রা) এর ঘরে প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করি। অনুমতি না দেয়ায় আমি ফিরে আসছিলাম। উমার (রা) আমাকে ডেকে বলেন: আপনার ফিরে যাওয়ার কারণ কি? আমি বললাম: আমি তিনবার অনুমতি প্রাথনা করি, কিন্তু অনুমতি জানানো হয় নি। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যদি তোমরা তিনবার অনুমতি প্রার্থনা কর এবং অনুমতি না দেয়া হয় তাহলে তোমরা ফিরে যাবে।" তখন উমার (রা) বলেন: আল্লাহর শপথ, এই বর্ণনার উপর আপনাকে অবশ্যই সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (আবু মুসা বলেন): আপনাদের মধ্যে কেউ কি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে থেকে শুনেছেন? তখন উবাই ইবনু কা'ব (রা) বলেন: আমাদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে কম সে আপনার সাথে যাবে। (আবু সাঈদ খুদরী বলেন) আমি উপস্থিতদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়স্ক ছিলাম। আমি আবু মুসার (রা) সাথে যেয়ে উমারকে (রা) বললাম যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলেছেন।"[৮৫]

৩. তাবিয়ী উরওয়া ইবনুয যুবাইর (৯৪ হি) বলেন:

إِنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي السِّقْطِ؟ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا.

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মানুষদের কাছে জানতে চান, আঘাতের ফলে গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হলে তার দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কী বিধান দিয়েছেন তা কেউ জানে কিনা? তখন মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রা) বলেন: আমি তাঁকে এ বিষয়ে একজন দাস বা দাসী প্রদানের বিধান প্রদান করতে শুনেছি। উমার (রা) বলেন: আপনার সাথে এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কাউকে আনয়ন করুন। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ বলেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনুরূপ বিধান দিয়েছেন।"[৮৬]

৪. সাহাবী আমর ইবনু উমাইয়াহ আদ-দামরী (রা) বলেন:

إِنَّ عُمَرَ مَرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يُسَاوِمُ بِمِرْطٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَأَتَصَدَّقَ بِهِ. فَاشْتَرَاهُ فَدَفَعَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ فَهُوَ صَدَقَةٌ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَأَتَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَامَ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ عَمْرٌو. قَالَت: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ فَهُوَ صَدَقَةٌ». قَالَتْ: نَعَمْ.

"তিনি একটি চাদর ক্রয়ের জন্য তা দাম করছিলেন। এমতাবস্থায় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন। উমার বলেন: এটি কি? তিনি বলেন: আমি এ চাদরটি ক্রয় করে দান করতে চাই। এরপর তিনি তা ক্রয় করে তাঁর স্ত্রীকে প্রদান করেন এবং বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: 'তোমরা স্ত্রীগণকে যা প্রদান করবে তাও দান বলে গণ্য হবে।' তখন উমার বলেন: আপনার সাথে সাক্ষী কে আছে? তখন তিনি আয়েশা (রা) এর কাছে গমন করেন এবং দরজার বাইরে দাঁড়ান। আয়েশা (রা) বলেন? কে? তিনি বলেন: আমি আম্র। আয়েশা বলেন: কি জন্য আপনি এসেছেন? তিনি বলেন: আপনি কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা স্ত্রীগণকে যা প্রদান করবে তা দান? আয়েশা বলেন: হ্যাঁ।"[৮৭]

৫. ওয়ালীদ ইবনু আব্দুর রাহমান আল-জুরাশী নামক তাবিয়ী বলেন:

إن عبد الله بن عمر مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَبَا هُرَيْرَةَ انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

"আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) আবু হুরাইরা (রা) এর কাছে দিয়ে গমন করছিলেন। সে সময় আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। হাদীস বর্ণনার মধ্যে তিনি বলেন: 'কেউ যদি কারো জানাযার অনুগমন করে ও সালাতে অংশ গ্রহণ করে তবে সে এক 'কীরাত' সাওয়াব অর্জন করবে। আর যদি সে তার দাফনে (কবরস্থ করায়) উপস্থিত থাকে তাহলে সে দুই কীরাত সাওয়াব অর্জন করবে। এক কীরাত উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড়।' তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বলেন: আবু হুরাইরা, আপনি ভেবে দেখুন তো আপনি রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নামে কি বলছেন! তখন আবু হুরাইরা (রা) তাকে সাথে নিয়ে আয়েশা (রা)-এর কাছে গমন করেন এবং তাঁকে বলেন: হে উম্মুল মুমিনীন, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে কসম করে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, 'কেউ যদি কারো জানাযার অনুগমন করে ও সালাতে অংশ গ্রহণ করে তবে সে এক 'কীরাত' সাওয়াব অর্জন করবে। আর যদি সে তার দাফনে উপস্থিত থাকে তাহলে সে দুই কীরাত সাওয়াব অর্জন করবে।' তিনি বলেন: হ্যাঁ, অবশ্যই শুনেছি।"[৮৮]

**৩. ২. ৪. বিভিন্ন সময়ের বর্ণনার মধ্যে তুলনা**

কোনো সাক্ষ্য বা বক্তব্যের নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্য অন্য একটি পদ্ধতি হলো তাকে একই বিষয়ে একাধিক সময়ে প্রশ্ন করা। যদি দ্বিতীয় বারের উত্তর প্রথম বারের উত্তরের সাথে হুবহু মিলে যায় তবে তার নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়। আর উভয়ের বৈপরীত্য অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে। সাহাবীগণ হাদীসের নির্ভুলতা নির্ণয়ে এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একটি উদাহরণ দেখুন।

তাবিয়ী উরওয়া ইবনু যুবাইর বলেন:

قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَارٌّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْقَهُ فَسَائِلْهُ فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِلْمًا كَثِيرًا. قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ عُرْوَةُ: فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُءُوسًا جُهَّالا يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ. قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذَلِكَ أَعْظَمَتْ ذَلِكَ وَأَنْكَرَتْهُ، قَالَتْ: أَحَدَّثَكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟! قَالَ عُرْوَةُ: حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلٌ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ فَالْقَهُ ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ. قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ فَذَكَرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَرَّتِهِ الأُولَى. قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ قَالَتْ: "مَا أَحْسَبُهُ إِلا قَدْ صَدَقَ، أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ.

"আমার খালাম্মা আয়েশা (রা) আমাকে বলেন: ভাগ্নে,শুনেছি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আম্র ইবনুল আস (রা) আমাদের এলাকা দিয়ে হজ্জে গমন করবেন। তুমি তাঁর সাথে দেখা কর এবং তার থেকে প্রশ্ন করে শিখ। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন। উরওয়া বলেন: আমি তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করি। তিনি সে সব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি যে সকল কথা বলেন, তার মধ্যে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ থেকে জ্ঞান ছিনিয়ে নিবেন না। কিন্তু তিনি জ্ঞানীদের কব্জা করবেন (মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের গ্রহণ করবেন), ফলে তাদের সাথে জ্ঞানও উঠে যাবে। মানুষের মধ্যে মুর্খ নেতৃবৃন্দ অবশিষ্ট থাকবে, যারা ইলম ছাড়াই ফাতওয়া প্রদান করবে এবং এভাবে নিজেরা বিভ্রান্ত হবে এবং অন্যদেরও বিভ্রান্ত করবে।" উরওয়া বলেন: আমি যখন আয়েশাকে (রা) একথা বললাম তখন তিনি তা গ্রহণ করতে আপত্তি করলেন। তিনি বলেন: তিনি কি তোমাকে বলেছেন যে, একথা তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শুনেছেন?

উরওয়া বলেন: পরের বছর আয়েশা (রা) আমাকে বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর আগমন করেছেন। তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর সাথে কথাবার্তা বল। কথার ফাঁকে ইলম উঠে যাওয়ার হাদীসটির বিষয়েও কথা তুলবে। উরওয়া বলেন: আমি তখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করি এবং তাঁকে প্রশ্ন করি। তিনি তখন আগের বার যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই হাদীসটি বললেন। উরওয়া বলেন: আমি যখন আয়েশা (রা) কে বিষয়টি জানালাম তখন তিনি বলেন: আমি বুঝতে পারলাম যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আম্র ঠিকই বলেছেন। আমি দেখছি যে, তিনি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি বা কমিয়ে বলেন নি।[৮৯]

এখানেও আমরা হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের অকল্পনীয় সাবধানতার নমুনা দেখি। আয়েশা (রা) আব্দুল্লাহ (রা)-এর সত্যবাদিতায় সন্দেহ করেন নি। কিন্তু সত্যবাদী ব্যক্তিরও ভুল হতে পারে। কাজেই বিনা নিরীক্ষায় তাঁরা কিছুই গ্রহণ করতে চাইতেন না। রাসূলুলাহ ﷺ-এর নামে কথিত কোনো হাদীস তারা নিরীক্ষার আগেই ভক্তিভরে হৃদয়ে স্থান দিতেন না।

### ৩. ২. ৫. বর্ণনাকারীকে শপথ করানো

বর্ণনা বা সাক্ষ্যের নির্ভুলতা যাচাইএর জন্য প্রয়োজনে বর্ণনাকারী বা সাক্ষীকে শপথ করানো হয়। সত্যপরায়ণ ও আল্লাহভীরু মানুষ ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলেন না। তবে তাঁর স্মৃতি তাকে ধোঁকা দিতে পারে বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের মধ্যে তিনি নিপতিত হতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর নামে শপথ করতে হলে তিনি কখনো পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলবেন না। এজন্য সত্যপরায়ণ ব্যক্তির জন্য শপথ করানো বক্তব্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য কার্যকর পদ্ধতি। তবে মিথ্যাবাদীর জন্য শপথ যথেষ্ট নয়। তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্ন (cross interrogation)-এর মাধ্যমে তার বক্তব্যের যথার্থতা যাচাই করতে হয়।

সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন সত্যপরায়ণ অত্যন্ত আল্লাহভীরু মানুষ। তা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভুলের সম্ভাবনা দূর করার জন্য সাহাবীগণ কখনো কখনো হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীকে শপথ করাতেন। আলী (রা) বলেন:

إِنِّي كُنْتُ رَجُلا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ. وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ.

"আমি এমন একজন মানুষ ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো কথা নিজে শুনলে আল্লাহ আমাকে তা থেকে তাঁর মর্জিমত উপকৃত হওয়ার তাওফীক প্রদান করতেন। আর যদি তাঁর কোনো সাহাবী আমাকে কোনো হাদীস শুনাতেন তবে আমি তাকে শপথ করাতাম। তিনি শপথ করলে আমি তার বর্ণিত হাদীস সত্য বলে গ্রহণ করতাম।"[৯০]

### ৩. ২. ৬. অর্থ ও তথ্যগত নিরীক্ষা

'ওহী'র জ্ঞান সাধারণ মানবীয় জ্ঞানের অতিরিক্ত, কিন্তু কখনোই মানবীয় জ্ঞানের বিপরীত বা বিরুদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে হাদীসের

মাধ্যমে প্রাপ্ত 'ওহী' কুরআনের মাধ্যমে প্রাপ্ত 'ওহী'র ব্যাখ্যা, সম্পূরণ বা অতিরিক্ত সংযোজন হতে পারে, কিন্তু কখনোই তা কুরআনের বিপরীত বা বিরুদ্ধ হতে পারে না।

সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা এ সব মূলনীতির ভিত্তিতে বর্ণিত হাদীসের অর্থগত নিরীক্ষা করতেন। আমরা দেখেছি যে, সাধারণভাবে তাঁরা কুরআনের অতিরিক্ত ও সম্পূরক অর্থের জন্যই হাদীসের সন্ধান করতেন। কুরআন কারীমে যে বিষয়ে কোনো তথ্য নেই তা হাদীসে আছে কিনা তা জানতে চাইতেন। পাশাপাশি তাঁরা প্রদত্ত তথ্যের অর্থগত নিরীক্ষা করতেন। তাঁদের অর্থ নিরীক্ষা পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ:

(১) হাদীসের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য হলো, তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে প্রমাণিত কিনা। যদি বর্ণনাকারীর বর্ণনা, শপথ বা অন্যান্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তবে সেক্ষেত্রে তাঁদের নীতি ছিল তাকে কুরআনের সম্পূরক নির্দেশনা হিসাবে গ্রহণ করা এবং তারই আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। ইতোপূর্বে দাদীর উত্তরাধিকার ও গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনার বিষয়ে আমরা তা দেখতে পেয়েছি। দাদীর বিষয়ে কুরআনে কিছু বলা হয় নি। এক্ষেত্রে হাদীসের বিবরণটি অতিরিক্ত সংযোজন। অনুমতি প্রার্থনার ক্ষেত্রে কুরআনে বলা হয়েছে যে, অনুমতি চাওয়ার পরে "যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে, 'তোমরা ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে।"[৯১] এক্ষেত্রে হাদীসের নির্দেশনাটি বাহ্যত এ কুরআনী নির্দেশনার 'বিরুদ্ধ'। কারণ তা কুরআনী নির্দেশনাকে আংশিক পরিবর্তন করে বলছে যে, তিন বার অনুমতি প্রার্থনার পরে 'তোমরা ফিরে যাও' বলা না হলেও ফিরে যেতে হবে।

সাহাবীগণ উভয় হাদীসকে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা কখনোই চিন্তা করেন নি যে, এগুলো কুরআনের নির্দেশের বিপরীত, বিরুদ্ধ বা অতিরিক্ত কাজেই তা গ্রহণ করা যাবে না।

(২) কোনো কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন নি বলে প্রমাণিত হলে বা গভীর সন্দেহ হলে, কোনোরূপ অর্থ বিবেচনা না করেই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমরা দেখেছি যে, বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততায় ও নির্ভরযোগ্যতায় সন্দেহ হলে তাঁরা কোনোরূপ অর্থ বিবেচনা ছাড়াই সে বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করতেন।

(৩) কখনো দেখা গিয়েছে যে, বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার কারণে বর্ণিত হাদীস বাহ্যত গ্রহণযোগ্য। তবে বর্ণনাকারীর অনিচ্ছাকৃত ভুলের জোরালো সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁরা সে হাদীসের অর্থ কুরআন কারীম ও তাঁদের জানা হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করেছেন এবং হাদীসটির অর্থ কুরআন ও প্রসিদ্ধ সুন্নাতের সুস্পষ্ট বিপরীত হলে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এরূপ অর্থ বিচার ও নিরীক্ষার কয়েকটি উদাহরণ দেখুন:

১. আবু হাস্‌সান আল-আ'রাজ নামক তাবিয়ী বলেন:

إِنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالدَّارِ. قَالَ: فَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشِقَّةٌ فِي الأَرْضِ!– وفي رواية: فَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدًا فَطَارَتْ شُقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشُقَّةٌ فِي الأَرْضِ!– فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ مَا هَكَذَا كَانَ يَقُولُ، وَلَكِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ"، ثُمَّ قَرَأَتْ عَائِشَةُ: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ﴾.

"দুই ব্যক্তি আয়েশা (রা) -এর কাছে গমন করে বলেন: আবু হুরাইরা (রা) বলছেন যে, নাবীউল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: নারী, পশু বা বাহন ও বাড়ি-ঘরের মধ্যে অযাত্রা ও অশুভত্ব আছে। একথা শুনে আয়েশা (রা) এত বেশি রাগন্বিত হন যে, মনে হলো তাঁর দেহ ক্রোধে ছিন্নভিন্ন হয়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বলেন: আবুল কাসিম (ﷺ)-এর উপর যিনি কুরআন নাযিল করেছেন তাঁর কসম, তিনি এভাবে বলতেন না। নাবীউল্লাহ (ﷺ) বলতেন: "জাহিলিয়্যাতের যুগের মানুষেরা বলত: নারী, বাড়ি ও পশু বা বাহনে অশুভত্ব আছে। এরপর আয়েশা (রা) কুরআন কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করেন:[৯২] "পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদিগের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করবার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে।"[৯৩]

এখানে আয়েশা (রা) আবু হুরাইরা (রা) এর বর্ণনা গ্রহণ করেন নি। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে যা শুনেছেন এবং কুরআনের যে আয়াত পাঠ করেছেন তার আলোকে এ বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২. আমরাহ বিনতু আব্দুর রাহমান বলেন:

أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: (سمعت رسول الله ﷺ يقول) إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ (وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ) (وَلَكِنَّهُ وَهِمَ)؛

إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ: "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا" (لا تزر وازرة وزر أخرى).

আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন যে, 'জীবিতের ক্রন্দনে মৃতব্যক্তি শাস্তি পায়।' তখন আয়েশা (রা) বলেন: আল্লাহ ইবনু উমারকে ক্ষমা করুন। তিনি মিথ্যা বলেন নি। তবে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন বা ভুল করেছেন (দ্বিতীয় বর্ণনায়: শুনতে অনেক সময় ভুল হয়)। প্রকৃত কথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদী মহিলার (কবরের) কাছ দিয়ে গমন করেন, যার জন্য তার পরিজনেরা ক্রন্দন করছিল। তিনি তখন বলেন: 'এরা তার জন্য ক্রন্দন করছে এবং সে তার কবরে শাস্তি পাচ্ছে।' আল্লাহ বলেছেন[৯৪]: 'এক আত্মা অন্য আত্মার পাপের বোঝা বহন করবে না।'"[৯৫]

৩. ফাতিমা বিনতু কাইস (রা) নামক একজন মহিলা সাহাবী বলেন, তাঁর স্বামী তাঁকে তিন তালাক প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন যে, তিনি (সে মহিলা) ইদ্দত-কালীন আবাসন ও ভরণপোষণের খরচ পাবেন না। তাঁর এ কথা শুনে খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন:

لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ (لا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ)، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

"আমরা আল্লাহর গ্রন্থ ও আমাদের নবী (ﷺ)-এর সুন্নাত একজন মহিলার কথায় ছেড়ে দিতে পারি না; আমরা বুঝতে পারছি না যে, তিনি বিষয়টি মুখস্থ রেখেছেন না ভুলে গিয়েছেন। তিন-তালাক প্রাপ্ত মহিলাও ইদ্দত-কালীন আবাসন ও খোরপোশ পাবেন। আল্লাহ বলেছেন[৯৬]: "তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়।"[৯৭]

৪. অর্থগত নিরীক্ষার আরেকটি উদাহরণে আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস যখন তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকার জন্য 'আলীর বিচার' পুস্তিকা থেকে কিছু বিবরণ নির্বাচন করেন, তখন তিনি কিছু কিছু বিচারের বিষয়ে বলেন: "আল্লাহর কসম, আলী এ বিচার কখনোই করতে পারেন না। বিভ্রান্ত না হলে কেউ এ বিচার করতে পারে না।"

এখানেও আমরা দেখছি যে, ইবনু আব্বাস অর্থ বিচার করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এগুলো আলী (রা)-এর নামে বানোয়াট কথা; কারণ কোনো বিভ্রান্ত মানুষ ছাড়া এরূপ বিচার কেউ করতে পারে না।

**৩. ৩. ইচ্ছাকৃত মিথ্যার সম্ভাবনা রোধ করা**

সাহাবীগণের যুগের প্রথম দিকে সাহাবীগণই হাদীস বর্ণনা করতেন। এক সাহাবী অন্য সাহাবীকে অথবা পরবর্তী প্রজন্ম তাবিয়ীগণকে হাদীস শুনাতেন ও শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের ২০/২৫ বছরের মধ্যে একদিকে যেমন অনেক সাহাবী ইন্তেকাল করেন, তেমনি অপরদিকে অনেক তাবিয়ী হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদান শুরু করেন। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, এ সময় থেকে কোনো কোনো নও মুসলিম তাবিয়ীর মধ্যে ইচ্ছাকৃত মিথ্যার প্রবণতা দেখা দেয়। তখন সাহাবীগণ হাদীস গ্রহণের বিষয়ে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকেন।

এক সাহাবী অন্য সাহাবীকে হাদীস বর্ণনা করলে শ্রোতা বা শিক্ষার্থী সাহাবী বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত সততা ও সত্যপরায়ণতায় কোনো সন্দেহ করতেন না বা তিনি নিজ কর্ণে হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শুনেছেন না অন্য কেউ তাকে বলেছেন সে বিষয়েও প্রশ্ন করতেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্য প্রাপ্ত সকল মানুষই ছিলেন তাঁরই আলোয় আলোকিত মহান মানুষ এবং সত্যবাদিতায় আপোষহীন। তবে বিস্মৃতি, অনিচ্ছাকৃত ভুল বা হৃদয়ঙ্গমের অপূর্ণতা-জনিত ভুল হতে পারে বিধায় উপরোক্ত বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাঁরা বর্ণিত হাদীসের নির্ভুলতা যাচাই করতেন।

তাবিয়ী বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা উপরোক্ত নিরীক্ষার পাশাপাশি অতিরিক্ত দু'টি বিষয় যুক্ত করেন। **প্রথমত:** তাঁরা বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে অনুসন্ধান করতেন এবং **দ্বিতীয়ত:** তাঁরা বর্ণনাকারী কার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন তা (reference) জানতে চাইতেন। প্রথম বিষয়টিকে হাদীস বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'عدالة' যাচাই করা বলা হয়। আমরা বাংলায় একে 'ব্যক্তিগত সততা ও সত্যপরায়ণতা' যাচাই বলে অভিহিত করতে পারি। দ্বিতীয় বিষয়টিকে হাদীসের পরিভাষায় 'سند' বর্ণনা বলা হয়। বাংলায় আমরা একে 'সূত্র (reference) উল্লেখ করা' বলতে পারি।

উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে (২৩-৩৫হি) মদীনার কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত নও-মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তিকর প্রচারণার কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি ও হানাহানি ঘটে এবং নও-মুসলিমদের মধ্যে সত্যপরায়ণতার কমতি দেখা দেয়। তখন থেকেই

সাহাবীগণ উপরের দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন। প্রথম হিজরী শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন:

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

"তাঁরা (সাহাবীগণ) সনদ বা তথ্যসূত্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতেন না। যখন (উসমানের খেলাফতের শেষদিকে: ৩০-৩৫ হি) ফিতনা-ফাসাদ ঘটে গেল তখন তাঁরা বললেন: তোমাদেরকে যারা হাদীস বলেছেন তাদের নাম উল্লেখ কর। কারণ দেখতে হবে, তারা যদি আহলুস সুন্নাত বা সুন্নাত-পন্থী হন তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর তারা যদি আহলুল বিদ'আত বা বিদ'আত-পন্থী হন তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।"[৯৮]

প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (৬৮ হি) বলেন:

إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ فَهَيْهَاتَ.

"আমরা তো হাদীস মুখস্থ করতাম এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস (যে কোনো বর্ণনাকারী থেকে) মুখস্থ করা হতো। কিন্তু তোমরা যেহেতু খানাখন্দক ও ভালমন্দ সব পথেই চলে গেলে সেহেতু এখন (বর্ণনাকারীর বিচার-নিরীক্ষা ছাড়া) কোনো কিছু গ্রহণ করার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।"[৯৯]

তাবিয়ী মুজাহিদ (১০৪ হি) বলেন:

جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَالِي لا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلا تَسْمَعُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلا مَا نَعْرِفُ.

"(তাবিয়ী) বাশীর ইবনু কা'ব আল-আদাবী ইবনু আব্বাসের (রা) কাছে আগমন করেন এবং হাদীস বলতে শুরু করেন। তিনি বলতে থাকেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। কিন্তু ইবনু আব্বাস (রা) তার দিকে কর্ণপাত ও দৃষ্টিপাত করলেন না। তখন বাশীর বলেন: হে ইবনু আব্বাস, আমার কি হলো! আপনি আমার হাদীস শুনছেন কি? আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বর্ণনা করছি অথচ আপনি কর্ণপাত করছেন না!? তখন ইবনু আব্বাস বলেন: একসময় ছিল যখন আমরা যদি কাউকে বলতে শুনতাম: 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন' তখনই আমাদের দৃষ্টিগুলো তার প্রতি আবদ্ধ হয়ে যেত এবং আমরা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার প্রতি কর্ণপাত করতাম। কিন্তু যখন মানুষ খানাখন্দক ভালমন্দ সব পথেই চলে গেল তখন থেকে আমরা আর মানুষদের থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করি না, শুধুমাত্র সুপরিচিত ও পরিজ্ঞাত বিষয় ব্যতিরেকে।[১০০]

**৩. ৪. হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণে সতর্কতার নির্দেশ**

এভাবে সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। পাশাপাশি তাঁরা অন্য সবাইকে এভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান করতেন। এক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা বা ঢিলেমি তাঁরা সহ্য করতেন না। তাঁরা বিনা যাচাইয়ে হাদীস গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন। অনেক সময় কারো হাদীস বর্ণনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা শ্রোতাদের মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তাঁকে হাদীস বলতে নিষেধ করতেন। এখানে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

১. আবু উসমান আন-নাহদী বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন,

بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"একজন মানুষের মিথ্যা বলার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে সবই বর্ণনা করবে।"[১০১]

২. আবুল আহওয়াস বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন:

بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"একজন মানুষের মিথ্যা বলার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে সবই বর্ণনা করবে।"[১০২]

৩. সাহাবী আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা) এর পুত্র মদীনার প্রখ্যাত আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবরাহীম ইবনু আব্দুর

রাহমান (৯৫ হি) বলেন:

بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَإِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَإِلَى أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَدِيْثُ الَّذِيْ تُكْثِرُوْنَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَحَبَسَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَتَّى اسْتُشْهِدَ.

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা), আবু দারদা (রা) ও আবু মাসঊদ (রা) কে ডেকে পাঠান। তিনি তাঁদেরকে বলেন: আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এত বেশি হাদীস বলছেন কেন? এরপর তিনি তাঁদেরকে মদীনাতেই অবস্থানের নির্দেশ দেন। তাঁর শাহাদত পর্যন্ত তাঁরা মদীনাতেই ছিলেন।"[১০৩]

এ তিনজন সাহাবী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁদের নির্ভুল হাদীস বলার ক্ষমতা বা যোগ্যতার বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন নি। কিন্তু বেশি হাদীস বললে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। বিশেষত, কূফা বা সিরিয়ার মত প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে ইসলামী বিজয়ের সে প্রথম দিনগুলোতে অধিকাংশ নও মুসলিম অনারব বসবাস করতেন, তাদের মধ্যে বেশি হাদীস বর্ণনা করলে অনেক শ্রোতা তা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম ও মুখস্থ করতে পারবেন না বলে আশঙ্কা থাকে। এজন্য হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য উমার ইবনুল খাত্তাব তাঁদেরকে মদীনায় অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন।

অন্য ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নিজে কুরআন ও হাদীসের কিছু বিষয় হজ্জ মাওসূমে মক্কায় জনসমক্ষে আলোচনা করতে চান। কিন্তু সাহাবী আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা) তাঁকে বলেন যে, মক্কায় উপস্থিত অগণিত অনারব ও নওমুসলিম হজ্জ-পালনকারী হয়ত আপনার কথা ঠিকমত বুঝতে পারবেন না। এতে ভুল বুঝা ও অপব্যাখ্যার সুযোগ এসে যাবে। কাজেই আপনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পরে বিষয়গুলো আলোচনা করবেন। উমার (রা) এ পরামর্শ অনুসারে মক্কায় বিষয়গুলো আলোচনার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন।[১০৪]

## ৪. জালিয়াতি প্রতিরোধে মুসলিম উম্মাহ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাই যে, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, অনুধাবনগত বা অসাবধানতাজনিত সকল প্রকার মিথ্যা থেকে বিশুদ্ধ হাদীসকে নির্ভেজালভাবে সংরক্ষণের জন্য সাহাবীগণ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা একদিকে যেমন যৌক্তিক, প্রায়োগিক, বৈজ্ঞানিক ও সুক্ষ্ম, অন্যদিকে তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একক ও অনন্য। অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীগণ তাঁদের ধর্মের মূল শিক্ষা বা ওহী সংরক্ষণের জন্য এরূপ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। যা প্রচারিত হয়েছে তাই সংকলিত করা হয়েছে। অবশেষে ওহীর সাথে মানবীয় জ্ঞানের মিশ্রণের মাধ্যমে ওহীর বিকৃতি ও অবলুপ্তি ঘটেছে।

তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ সাহাবীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আপোষহীন ছিলেন। তাঁরা হাদীসের সংরক্ষণ এবং বানোয়াট কথা থেকে বিশুদ্ধ হাদীসের বাছাই-এর জন্য তাঁদের জীবনের সকল আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করেছেন। এ পরিচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে তাঁদের মূলনীতিগুলো আলোচনা করব।

### ৪. ১. হাদীস শিক্ষা ও সংরক্ষণ

মহান আল্লাহ উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রথম যুগের মানুষদেরকে তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস সংরক্ষণের বিষয়ে একটি সঠিক ও সময়োপযোগী কর্মের তাওফীক প্রদান করেন। প্রথম হিজরী শতক থেকে সাহাবী, তাবিয়ী ও তৎপরবর্তী যুগের আলিমগণ মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি গ্রামগঞ্জ, শহর ও জনপদ ঘুরে ঘুরে সকল হাদীস ও বর্ণনাকারীগণের তথ্যাদি সংগ্রহ করতেন। হাদীস শিক্ষা, লিখে রাখা, শেখানো ও হাদীস কেন্দ্রিক আলোচনাই ছিল ইসলামের প্রথম তিন-চার শতকের মানুষদের অন্যতম কর্ম, পেশা, নেশা ও আনন্দ।

তাবিয়ীগণের যুগ থেকে বা হিজরী প্রথম শতকের মাঝামাঝি থেকে পরবর্তী প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে আমরা দেখতে পাই যে, হাদীস বর্ণনাকারীগণ দুই প্রকারের :

অনেকে নিজ এলাকার 'রাবী' বা মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে এবং সম্ভব হলে অন্যান্য কিছু দেশের কিছু মুহাদ্দিসের কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এরপর তিনি হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষায় রত থেকেছেন। তাঁর কাছে যে শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছে তাঁকে সে হাদীসগুলো শিক্ষা দিয়েছেন। এরা সাধারণভাবে 'রাবী' বা বর্ণনাকারী নামে পরিচিত।

অপরদিকে এ যুগগুলোতে অনেক মুহাদ্দিস নিজ এলাকার সকল 'রাবী'র কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা ও লিপিবদ্ধ করার পরে বেরিয়ে পড়েছেন তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি জনপদ সফর করতে। তাঁরা প্রত্যেকে দীর্ঘ কয়েক বছর বা কয়েক যুগ এভাবে প্রতিটি জনপদে গমন করে সকল জনপদের সকল 'রাবী' বা মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন ও লিপিবদ্ধ করেছেন। একজন সাহাবীর বা একজন তাবিয়ীর একটিমাত্র হাদীস বিভিন্ন 'রাবী'র মুখ থেকে শুনতে ও সংগ্রহ করতে তাঁরা মক্কা, মদীনা, খোরাসান, সমরকন্দ, মারভ, ওয়াসিত, বাসরা, কূফা, বাগদাদ, দামেশক, হালাব, কায়রো, সান'আ... ইত্যাদি অগণিত শহরে সফর করেছেন। একটি হাদীসই তাঁরা শত শত সনদে সংগ্রহ করে তুলনার মাধ্যমে নির্ভুল ও ভুল বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

একটি নমুনা দেখুন। তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবরাহীম ইবনু সাঈদ আল-জাউহারী আল-বাগদাদী (২৪৭ হি)। তার সমসাময়িক মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফার ইবনু খাকান বলেন: আমি ইবরাহীম ইবনু সাঈদকে আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি তার খাদেমকে বললেন: গ্রন্থাগারে ঢুকে আবু বাকর সিদ্দীক (রা)-এর হাদীস-সংকলনের ২৩তম খণ্ডটি নিয়ে এস। আমি বললাম: আবু বাকর (রা) থেকে ২০টি হাদীসও সহীহ সনদে পাওয়া যায় না, আপনি কিভাবে তাঁর হাদীস ২৩ খণ্ডে সংকলন করলেন? তিনি উত্তরে বলেন: কোনো একটি হাদীস যদি আমি কমপক্ষে ১০০ টি সনদে সংগ্রহ করতে না পারি তাহলে আমি সে হাদীসের ক্ষেত্রে নিজেকে এতিম বলে মনে করি।[১০৫]

হাদীস গ্রহণের সময় তাঁরা সংশ্লিষ্ট 'রাবী'-কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে তার বর্ণনার যথার্থতা যাচাইয়ের চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে তার ব্যক্তিগত সততা (عدالة), তার শিক্ষকগণ এবং এলাকার অন্যান্য রাবীগণের বিষয়ে সে এলাকার প্রসিদ্ধ আলিম, মুহাদ্দিস ও শিক্ষার্থীগণকে প্রশ্ন করেছেন। এভাবে সংগৃহীত সকল তথ্য তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা সকল 'রাবী' ও তাদের বর্ণিত সকল হাদীসের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রদান করেছেন। এ সকল নিরীক্ষক ও সমালোচক হাদীস-বিশেষজ্ঞগণ একদিকে 'রাবী' বা হাদীস বর্ণনাকারী এবং সাথে সাথে 'নাকিদ' বা হাদীস সমালোচক ও হাদীসের ইমাম বলে পরিচিত। ইসলামের প্রথম ৪ শতাব্দীতে এ ধরনের শতাধিক 'ইমাম' ও 'নাকিদ' আমরা দেখতে পাই। হাদীসে রাসূলের খেদমতে এদের পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ বিশ্বের ইতিহাসে নযিরবিহীন। জ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে এর সামান্যতম নযির নেই। তাঁদের কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্যও শত শত পৃষ্ঠার গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন।

এ সকল নাকিদ মুহাদ্দিস বা ইমাম এভাবে সকল হাদীস ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা চিহ্নিত করেছেন, মিথ্যাবাদীদেরকে চিহ্নিত করেছেন, বিশুদ্ধ হাদীসকে মিথ্যা ও সন্দেহজনক বর্ণনা থেকে পৃথক করেছেন। তাঁরা নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছেন।

১. সকল হাদীসের সনদ অর্থাৎ সূত্র বা reference সংরক্ষণ।
২. সনদের সকল 'রাবী'-র ব্যক্তিগত পরিচয়, জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা, উস্তাদ, ছাত্র, কর্ম, সফর ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ।
৩. 'রাবী'গণের ব্যক্তিগত সততা, বিশ্বস্ততা ও সত্যপরায়ণতা যাচাই করা।
৪. বর্ণিত হাদীসের অর্থগত নিরীক্ষা ও যাচাই করা।
৫. সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক 'রাবী' তার উর্ধ্বতন 'রাবী'-র কাছ থেকে স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেছেন কিনা তা যাচাই করা।
৬. সংগৃহীত সকল হাদীসের তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা থেকে নির্ভুল বর্ণনাগুলো পৃথক করা।
৭. সংগৃহীত তথ্যাদি ও তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সকল 'রাবী'র মিথ্যাচার ধরা পড়েছে তাদের মিথ্যাচার উম্মাহর সামনে তুলে ধরা।
৮. সংগৃহীত সকল হাদীস সনদসহ গ্রন্থায়িত করা।
৯. রাবীদের নির্ভুলতা বা মিথ্যাচার বিষয়ক তথ্যাদি গ্রন্থায়িত করা।
১০. পৃথক গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদীস সংকলিত করা।
১১. পৃথক গ্রন্থে মিথ্যা ও জাল হাদীসগুলো সংকলিত করা।
১২. জাল বা মিথ্যা হাদীস সহজে চেনার নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করা।

নিম্নে আমরা এ সকল বিষয়ে আলোচনা করব।

### ৪. ২. সনদ সংরক্ষণ

আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ হাদীসের সনদ বা তথ্য-সূত্র বলার রীতি চালু করেন। যেন সূত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে হাদীসের সত্যাসত্য যাচাই করা যায়। পরবর্তী যুগগুলোতে সনদ সংরক্ষণের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তির প্রসিদ্ধি, সততা, মহত্ব, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি যত বেশিই হউক না কেন, তিনি কার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন এবং তিনি কোন্ সূত্রে হাদীসটি বলেছেন তা উল্লেখ না করলে মুহাদ্দিসগণ কখনোই তার বর্ণিত হাদীসকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেন নি। উপরন্তু তিনি এবং তার সনদে বর্ণিত প্রত্যেক রাবী পরবর্তী রাবী থেকে হাদীসটি নিজে শুনেছেন কিনা তা যাচাই করেছেন। সনদের গুরুত্ব বুঝাতে অনেক কথা তাঁরা বলেছেন।

প্রথম হিজরী শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন:

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

এ জ্ঞান হলো দীন (ধর্ম); কাজেই কার কাছ থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছ তা দেখে নেবে।[১০৬]

সুফিয়ান ইবনু উ'আইনাহ (১৯৮ হি) বলেন, একদিন ইবনু শিহাব যুহরী (১২৫ হি) হাদীস বলছিলেন। আমি বললাম: আপনি সনদ ছাড়াই হাদীসটি বলুন। তিনি বলেন: তুমি কি সিঁড়ি ছাড়াই ছাদে আরোহণ করতে চাও?[১০৭]

দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনু সাঈদ আস-সাওরী (১৬১ হি) বলেন: "সনদ মুমিনের অস্ত্র স্বরূপ।"[১০৮]

উতবাহ ইবনু আবী হাকীম (১৪০ হি) বলেন, একদিন আমি ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী ফারওয়া (১৪৪ হি) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে ইবনু শিহাব যুহরী (১২৫ হি) উপস্থিত ছিলেন। ইবনু আবী ফারওয়া হাদীস বর্ণনা করে বলতে থাকেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ...। তখন ইবনু শিহাব যুহরী তাকে বলেন, হে ইবনু আবী ফারওয়া, আল্লাহ আপনাকে ধ্বংস করুন! আল্লাহর নামে কথা বলতে আপনার কত বড় দুঃসাহস! আপনি হাদীস বলছেন অথচ হাদীসে সনদ বলছেন না। আপনি আমাদেরকে লাগামহীন হাদীস বলছেন!"[১০৯]

প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) বলেন:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

"সনদ বর্ণনা ও সংরক্ষণ দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সনদ বর্ণনার ব্যবস্থা না থাকলে যে যা চাইত তাই বলত।"[১১০]

তৃতীয় হিজরী শতকের মুহাদ্দিস আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনু ইসহাক ইবনু ঈসা (২১৫ হি) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি)-কে বললাম, একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'তোমার সালাতের সাথে পিতামাতার জন্য সালাত আদায় করা এবং তোমার সিয়ামের সাথে পিতামাতার জন্য সিয়াম পালন করা নেককর্মের অন্তর্ভুক্ত।' তিনি বলেন: হাদীসটি আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন? আমি বললাম: শিহাব ইবনু খিরাশ থেকে। তিনি বলেন: শিহাব নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তিনি কার কাছে শুনেছেন? আমি বললাম: তিনি হাজ্জাজ ইবনু দীনার থেকে। তিনি বলেন: হাজ্জাজ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তিনি কার কাছ থেকে শুনেছেন? আমি বললাম: তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন। ইবনুল মুবারাক বললেন: হে আবু ইসহাক, হাজ্জাজ ইবন দীনার ও রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর মাঝে বিশাল দূরত্ব রয়েছে, যে দূরত্ব অতিক্রম করতে অনেক বাহনের প্রয়োজন। অর্থাৎ হাজ্জাজ দ্বিতীয় হিজরীর শেষ দিকের একজন তাবি-তাবিয়ী। অন্তত ২/৩ জন ব্যক্তির মাধ্যম ছাড়া তিনি রাসূলুলাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছাতে পারেন না। তিনি যেহেতু বাকী সনদ বলেন নি, সেহেতু হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।[১১১]

এভাবে প্রথম হিজরী শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 'সনদ' (uninterrupted chain of authorities) উল্লেখ অপরিহার্য বলে গণ্য করেছেন। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে দুটি অংশের সমন্বিত রূপকে বুঝায়। **প্রথম অংশ:** হাদীসের সূত্র বা সনদ ও **দ্বিতীয় অংশ:** হাদীসের মূল বক্তব্য বা 'মতন'।

একটি উদাহরণ দেখুন। ইমাম মালিক (১৭৯ হি) ২য় হিজরী শতকের একজন প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলক। তিনি তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বলেন:

مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

"মালিক, আবুয্ যিনাদ (১৩০হি) থেকে, তিনি আ'রাজ (১১৭হি) থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা (৫৯হি) থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শুক্রবারের কথা উল্লেখ করে বলেন: এ দিনের মধ্যে একটি সময় আছে কোনো মুসলিম যদি সে সময়ে দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন যে, এ সুযোগটি স্বল্প সময়ের জন্য।"[১১২]

উপরের হাদীসের প্রথম অংশ "মালিক আবুয্ যিনাদ থেকে.... আবু হুরাইরা থেকে" হাদীসের সনদ বা সূত্র। শেষে উল্লিখিত রাসূলুলাহ ﷺ-এর বাণীটুকু হাদীসের "মতন" বা বক্তব্য। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে শুধু শেষের বক্তব্যটুকুই নয়, বরং সনদ ও মতনের সম্মিলিত রূপকেই হাদীস বলা হয়। একই বক্তব্য দুটি পৃথক সনদে বর্ণিত হলে তাকে দুটি হাদীস বলে গণ্য করা হয়। অনেক সময় শুধু সনদকেই হাদীস বলা হয়।[১১৩]

### ৪. ৩. সনদ বনাম লিখিত পাণ্ডুলিপি

উপরের হাদীস ও হাদীস-গ্রন্থসমূহে সংকলিত অনুরূপ অগণিত হাদীস থেকে কেউ ধারণা করতে পারেন যে, সাহাবী, তাবিয়ী বা

তাবি-তাবিয়ীগণ সম্ভবত হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন না, শুধুমাত্র মুখস্থ ও মৌখিক বর্ণনা করতেন। এজন্য বোধহয় মুহাদ্দিসগণ এভাবে সনদ উল্লেখ করে হাদীস সংকলিত করেছেন। অনেকেই ধারণা করেন যে, হাদীস তৃতীয় বা চতুর্থ হিজরী শতকেই লিপিবদ্ধ হয়েছে, এর পূর্বে তা মৌখিতভাবে প্রচলিত ছিল।

বিষয়টি কখনোই তা নয়। হাদীস বর্ণনা ও সংকলনের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অগভীর ভাসাভাসা জ্ঞানই এ সব কঠিন বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। বস্তুত হাদীস বর্ণনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ সুক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাঁরা মৌখিক বর্ণনা ও লিখিত পাণ্ডুলিপির সমন্বয়ের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনায় ভুলভ্রান্তি অনুপ্রবেশের পথ রোধ করেছেন। হাদীস শিক্ষা, সংগ্রহ ও সনদ বর্ণনায় সর্বদা মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির পাশাপাশি লিখনি ও পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করা হতো। অনুরূপভাবে হাদীস নিরীক্ষা ও জালিয়াতি নির্ধারণেও পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করা হতো।

**৪. ৩. ১ হাদীস শিক্ষা, সংগ্রহ ও সনদ বর্ণনায় পাণ্ডুলিপি**

সাহাবীগণ সাধারণত হাদীস মুখস্থ করতেন ও কখনো কখনো লিখেও রাখতেন। সাহাবীগণের হাদীস লিখে রাখার প্রয়োজনও তেমন ছিল না। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, অধিকাংশ সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীস ২০/৩০ টির অধিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্যে কাটানো দিনগুলোর স্মৃতি থেকে ২০/৩০ টি বা ১০০ টি, এমনকি হাজারটি ঘটনা বা কথা বলার জন্য লিখে রাখার প্রয়োজন হতো না। তাছাড়া তাঁদের জীবনে আর কোনো বড় বিষয় ছিল না। রাসূলুল্লাহর (ﷺ) স্মৃতি আলোচনা, তাঁর নির্দেশাবলি হুবহু পালন, তাঁর হুবহু অনুকরণ ও তাঁর কথা মানুষদের শোনানোই ছিল তাঁদের জীবনের অন্যতম কাজ। অন্য কোনো জাগতিক ব্যস্ততা তাঁদের মন-মগজকে ব্যস্ত করতে পারত না। আর যে স্মৃতি ও যে কথা সর্বদা মনে জাগরুক এবং কর্মে বিদ্যমান তা তো আর পৃথক কাগজে লিখার দরকার হয় না। তা সত্ত্বেও অনেক সাহাবী তাঁদের মুখস্থ হাদীস লিখে রাখতেন এবং লিখিত পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ করতেন।[১১৪]

সাহাবীগণের ছাত্রগণ বা তাবিয়ীগণের যুগ থেকে হাদীস শিক্ষা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল লিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা। অধিকাংশ তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদীস শুনতেন, লিখতেন ও মুখস্থ করতেন। পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে বা পাণ্ডুলিপি থেকে মুখস্থ করে তা তাঁদের ছাত্রদের শোনাতেন। তাঁদের ছাত্ররা শোনার সাথে সাথে তা তাদের নিজেদের পাণ্ডুলিপিতে লিখে নিতেন এবং শিক্ষকের পাণ্ডুলিপির সাথে মেলাতেন। তাবিয়ীগণের যুগ, অর্থাৎ প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষাংশ থেকে এভাবে সকল পঠিত হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখা হাদীস শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এ বিষয়ক অগণিত বিবরণ হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দুএকটি উদাহরণ দেখুন।

তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আকীল (১৪০ হি) বলেন:

كُنْتُ أَذْهَبُ أَنَا وَأَبُوْ جَعْفَرٍ إِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَمَعَنَا أَلْوَاحٌ صِغَارٌ نَكْتُبُ فِيْهَا الْحَدِيْثَ

"আমি এবং আবু জা'ফর মুহাম্মাদ আল-বাকির (১১৪হি) সাহাবী জাবির ইবনু আব্দুলাহ (৭০ হি) এর নিকট গমন করতাম। আমরা সাথে ছোট ছোট বোর্ড বা শ্লেট নিয়ে যেতাম যেগুলোতে আমরা হাদীস লিপিবদ্ধ করতাম।"[১১৫]

তাবিয়ী সাঈদ ইবনু জুবাইর (৯৫ হি) বলেন:

كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِذَا امْتَلأَتِ الصَّحِيْفَةُ أَخَذْتُ نَعْلِيْ فَكَتَبْتُ فِيْهَا حَتَّى تَمْتَلِئَ

"আমি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (৬৮ হি) এর কাছে বসে হাদীস লিপিবদ্ধ করতাম। যখন লিখতে লিখতে পৃষ্ঠা ভরে যেত তখন আমি আমার সেণ্ডেল নিয়ে তাতে লিখতাম। লিখতে লিখতে তাও ভরে যেত।"[১১৬]

তাবিয়ী আমির ইবনু শারাহীল শা'বী (১০২ হি) বলেন:

اُكْتُبُوْا مَا سَمِعْتُمْ مِنِّيْ وَلَوْ عَلَى جِدَارٍ

"তোমরা যা কিছু আমার কাছ থেকে শুনবে সব লিপিবদ্ধ করবে। প্রয়োজনে দেওয়ালের গায়ে লিখতে হলেও তা লিখে রাখবে।"[১১৭]

তাবিয়ী আবু কিলাবাহ আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ (১০৪ হি) বলেন:

اَلْكِتَابَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النِّسْيَانِ

"ভুলে যাওয়ার চেয়ে লিখে রাখা আমার কাছে অনেক প্রিয়।"[১১৮]

তাবিয়ী হাসান বসরী (১১০ হি) বলেন:

إِنَّ لَنَا كُتُباً نَتَعَاهَدُهَا

"আমাদের কাছে পাণ্ডুলিপি সমূহ রয়েছে, যেগুলো আমরা নিয়মিত দেখি এবং সংরক্ষণ করি।"[১১৯]

প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) বলেন:

لَوْلاَ الْكِتَابُ لَمَا حَفِظْنَا

"হাদীস শিক্ষার সময় পাণ্ডুলিপি আকারে লিখে না রাখলে আমরা মুখস্থই করতে পারতাম না।"[১২০]

এ বিষয়ক অগণিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে পৃথক গ্রন্থের প্রয়োজন।[১২১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস শিক্ষার সাথে সাথে তা লিখে রাখতেন। হাদীস শিক্ষা দানের সময় তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণ সাধারণত পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস পড়ে শেখাতেন। কখনো বা মুখস্থ পড়ে হাদীস শেখাতেন তবে পাণ্ডুলিপি নিজের হেফাজতে রাখতেন যেন প্রয়োজনের সময় তা দেখে নেয়া যায়।

তাবিয়ীগণের যুগে বা তৎপরবর্তী যুগে কতিপয় মুহাদ্দিস ছিলেন যাঁরা পাণ্ডুলিপি ছাড়াই হাদীস মুখস্থ রাখতেন এবং বর্ণনা করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়েছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, এরা পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর না করায় মাঝে মাঝে বর্ণনায় ভুল করতেন। বস্তুত মৌখিক শ্রবণ ও পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণের মাধ্যমেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনা করা সম্ভব। এজন্য যে সকল 'রাবী' শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে বা শুধুমাত্র মুখস্থশক্তির উপর নির্ভর করে হাদীস বর্ণনা করতেন তাঁদের হাদীস মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কারণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে এদের বর্ণনায় ভুল ও বিক্ষিপ্ততা ধরা পড়ে। এ জাতীয় অগণিত বিবরণ আমরা রিজাল ও জারহু ওয়াত তা'দীল বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে দেখতে পাই। দুইএকটি উদাহরণ দেখুন:

আবু আম্মার ইকরিমাহ ইবনু আম্মার আল-ইজলী (১৬০ হি) দ্বিতীয় শতকের একজন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হাদীস মুখস্থকারী (حافظ) হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মুখস্থ হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রাখতেন না, ফলে প্রয়োজনে তা দেখতে পারতেন না। এজন্য তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কিছু ভুল পাওয়া যেত। ইমাম বুখারী (১৫৬ হি) বলেন:

لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ فَاضْطَرَبَ حَدِيْثُهُ

"তাঁর কোনো পাণ্ডুলিপি ছিল না; এজন্য তাঁর হাদীসে বিক্ষিপ্ততা পাওয়া যায়।"[১২২]

দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস জারীর ইবনু হাযিম ইবনু যাইদ (১৭০ হি)। তাঁর বিষয়ে ইবনু হাজার বলেন:

ثِقَةٌ ... وَلَهُ أَوْهَامٌ إِذَا حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ

তিনি নির্ভরযোগ্য।...তবে তিনি যখন পাণ্ডুলিপি না দেখে শুধুমাত্র মুখস্থ স্মৃতির উপর নির্ভর করে হাদীস বলতেন তখন তার ভুল হতো।[১২৩]

দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন রাবী আব্দুল আযীয ইবনু ইমরান ইবনু আব্দুল আযীয (১৭০হি)। তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন এবং সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনু আউফের বংশধর ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কারণ তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুলভ্রান্তি ব্যাপক। আর এ ভুল ভ্রান্তির কারণ হলো পাণ্ডুলিপি ব্যতিরেকে মুখস্থ বর্ণনা করা। তৃতীয় হিজরী শতকের মদীনার মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক উমার ইবনু শাব্বাহ (২৬২ হি) তাঁর 'মদীনার ইতিহাস' গ্রন্থে এ ব্যক্তির সম্পর্কে বলেন:

كَانَ كَثِيْرَ الْغَلَطِ فِيْ حَدِيْثِهِ لأَنَّهُ احْتَرَقَتْ كُتُبُهُ فَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ

"তিনি হাদীস বর্ণনায় অনেক ভুল করতেন; কারণ তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি পুড়ে যাওয়ার ফলে তিনি স্মৃতির উপর নির্ভর করে মুখস্থ হাদীস বলতেন।"[১২৪]

ইবনু হাজার আসকালানীর ভাষায়:

مَتْرُوْكٌ، احْتَرَقَتْ كُتُبُهُ فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ فَاشْتَدَّ غَلَطُهُ

"তিনি পরিত্যক্ত রাবী। তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি পুড়ে যায়। এজন্য তিনি স্মৃতির উপর নির্ভর করে হাদীস বলতেন। এতে তাঁর ভুল

হতো খুব বেশি।"[১২৫]

তৃতীয় শতকের একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাজিব ইবনু সুলাইমান আল-মানবিজী (২৬৫ হি)। তিনি ইমাম নাসাঈর উস্তাদ ছিলেন। তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডুলিপি না থাকার কারণে তার ভুল হতো। ইমাম দারাকুতনী (৩৮৫ হি) বলেন:

كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ، وَهِمَ فِيْ حَدِيْثِهِ

"তিনি হাদীস মুখস্থ বলতেন এবং স্মৃতিশক্তির উপরেই নির্ভর করতেন। তাঁর কোনো পাণ্ডুলিপি ছিল না। এজন্য তার হাদীসে ভুল দেখা দেয়।"[১২৬]

তৃতীয় শতকের একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু মুসলিম, আবু উমাইয়া (২৭৩ হি)। তাঁর সম্পর্কে তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান (৩৫৪ হি) বলেন:

...وَكَانَ مِنَ الثِّقَاتِ دَخَلَ مِصْرَ فَحَدَّثَهُمْ مِنْ حِفْظِهِ مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ بِأَشْيَاءَ أَخْطَأَ فِيْهَا فَلاَ يُعْجِبُنِيْ الاِحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ إِلاَّ مَا حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ

"... তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তিনি মিশরে আগমন করেন এবং তথায় কোনো পাণ্ডুলিপি ছাড়া মুখস্থ কিছু হাদীস বর্ণনা করেন; যে সকল হাদীস বর্ণনায় তিনি ভুল করেন। এজন্য তাঁর বর্ণিত কোনো হাদীস আমি দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। শুধুমাত্র যে হাদীসগুলো তিনি পাণ্ডুলিপি দেখে বর্ণনা করেছেন সেগুলোই গ্রহণ করা যায়।"[১২৭]

ইমাম শাফিয়ী (২০৪ হি) দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম আলিম। তিনি লিখেছেন: যে মুহাদ্দিসের ভুল বেশি হয় এবং তার কোনো বিশুদ্ধ লিখিত পাণ্ডুলিপি নেই তার হাদীস গ্রহণ করা যাবে না।[১২৮]

এভাবে আমরা দেখছি যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য শিক্ষকের কাছ থেকে মৌখিক শ্রবণ ও লিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ উভয়ের সমন্বয়ের উপর নির্ভর করা হতো। সুপ্রসিদ্ধ 'হাফিয-হাদীসগণ', যাঁরা আজীবন হাদীস শিক্ষা করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন এবং লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ রেখেছেন, তাঁরাও পাণ্ডুলিপি না দেখে হাদীস শিক্ষা দিতেন না বা বর্ণনা করতেন না।

৩য় শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আলী ইবনুল মাদীনী (২৩৪ হি) বলেন:

لَيْسَ فِيْ أَصْحَابِنَا أَحْفَظُ مِنْ أَبِيْ عَبْدِاللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ إِنَّهُ لاَ يُحَدِّثُ إِلاَّ مِنْ كِتَابِهِ وَلَنَا فِيْهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"হাদীস মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আমাদের সাথীদের মধ্যে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি) -এর চেয়ে বড় বা বেশি যোগ্য কেউই ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি কখনো পাণ্ডুলিপি সামনে না রেখে হাদীস বর্ণনা করতেন না। আর তাঁর মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"[১২৯]

অপরদিকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি) বলেন: "অনেকে আমাদেরকে স্মৃতি থেকে হাদীস শুনিয়েছেন এবং অনেকে আমাদেরকে পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস শুনিয়েছেন। যাঁরা পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস শুনিয়েছেন তাঁদের বর্ণনা ছিল বেশি নির্ভুল।"[১৩০]

এভাবে আমরা দেখছি যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের সমন্বয়কে অত্যন্ত জরুরী মনে করতেন: প্রথমত হাদীসটি উস্তাদের মুখ থেকে শাব্দিকভাবে শোনা বা তাকে মুখে পড়ে শোনানো ও দ্বিতীয়ত পঠিত হাদীসটি নিজে হাতে লিখে নেয়া ও তৃতীয়ত উস্তাদের পাণ্ডুলিপির সাথে নিজের লেখা পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে সংশোধন করে নেয়া। কোনো মুহাদ্দিস স্বকর্ণে শ্রবণ ব্যতীত শুধু পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস শেখালে বা পাণ্ডুলিপি ছাড়া শুধু মুখস্থ হাদীস শেখালে তা গ্রহণ করতে তাঁরা আপত্তি করতেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের পুত্র আব্দুল্লাহ (২৯০ হি) বলেন,

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَالَ لِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ: اكْتُبْ عَنِّي وَلَوْ حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ، فَقُلْتُ: لا، وَلا حَرْفًا.

"ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন (২৩৩ হি) বলেন: ইমাম আব্দুর রাযযাক সান'আনী (২১১ হি) আমাকে বলেন : তুমি আমার কাছ থেকে অন্তত একটি হাদীস লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাড়া গ্রহণ কর। আমি বললাম: কখনোই না, আমি লিখিত পাণ্ডুলিপির প্রমাণ ছাড়া মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে একটি অক্ষরও গ্রহণ করতে রাজী নই।"[১৩১]

আব্দুর রাযযাক সান'আনীর মত সুপ্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসের কাছ থেকেও লিখিত ও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সমন্বয় ব্যতিরেকে একটি হাদীস গ্রহণ করতেও রাজী হন নি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন!

এ বিষয়ে তাঁদের মূলনীতি দেখুন। তৃতীয় শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩হি) বলেন: যদি কোনো 'রাবী'র হাদীস তিনি সঠিকভাবে মুখস্থ ও বর্ণনা করতে পেরেছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয় তাহলে তার কাছে তার পুরাতন পাণ্ডুলিপি চাইতে হবে। তিনি যদি পুরাতন পাণ্ডুলিপি দেখাতে পারেন তাহলে তাকে ইচ্ছাকৃত ভুলকারী বলে গণ্য করা যাবে না। আর যদি তিনি বলেন যে, আমার মূল প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমার কাছে তার একটি অনুলিপি আছে তাহলে তার কথা গ্রহণ করা যাবে না। অথবা যদি বলেন যে, আমার পাণ্ডুলিপিটি আমি পাচ্ছি না তাহলেও তাঁর কথা গ্রহণ করা যাবে না। বরং তাকে মিথ্যাবাদী বলে বুঝতে হবে।[১৩২]

**৪. ৩. ২. সনদে শ্রুতি বর্ণনার অর্থ ও প্রেক্ষাপট**

এভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে, প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই হাদীস লিখে মুখস্থ করা হতো। মুহাদ্দিসগণ লিখিত পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস বর্ণনা করতেন, নিরীক্ষা করতেন, বিশুদ্ধতা যাচাই করতেন এবং প্রত্যেকেই তাঁর শ্রুত হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে তাঁরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে লিখিত পুস্তকের রেফারেন্স প্রদান না করে শুধুমাত্র 'মৌখিক বর্ণনা'র উপর কেন নির্ভর করতেন। তাঁরা কেন (حدثنا، أخبرنا), অর্থাৎ 'আমাকে বলেছেন', 'আমাকে সংবাদ দিয়েছেন' ইত্যাদি বলতেন? তাঁরা কেন বললেন না, অমুক পুস্তকে এ কথাটি লিখিত আছে... ইত্যাদি?

প্রকৃত বিষয় হলো, সাহাবীগণের যুগ থেকেই 'পুস্তক'-এর চেয়ে 'ব্যক্তি'র গুরুত্ব বেশি দেয়া হয়েছে। পাণ্ডুলিপি-নির্ভরতা ও এতদসংক্রান্ত ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা দূর করার জন্য মুহাদ্দিসগণ পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনাকারী উস্তাদ থেকে স্বকর্ণে শ্রবণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। এজন্য হাদীস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থের বা পাণ্ডুলিপির রেফারেন্স প্রদানের নিয়ম ছিল না। বরং বর্ণনাকারী শিক্ষকের নাম উল্লেখ করার নিয়ম ছিল। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় (حدثنا، أخبرنا) অর্থাৎ 'আমাকে বলেছেন' কথাটির অর্থ হলো আমি তাঁর পুস্তকটি তাঁর নিজের কাছে বা তাঁর অমুক ছাত্রের কাছে পড়ে স্বকর্ণে শুনে তা থেকে হাদীসটি উদ্ধৃত করছি। কেউ কেউ 'আমি তাঁকে পড়তে শুনেছি', বা 'আমি পড়েছি' এরূপ বললেও, সাধারণত 'হাদ্দাসানা' বা 'আখবারানা' বা 'আমাদেরকে বলেছেন' বলেই তাঁরা এক বাক্যে বিষয়টি উপস্থাপন করতেন।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, উপরে উল্লিখিত মুয়াত্তা গ্রন্থের সনদটির অর্থ এটাই নয় যে, মালিক আবুয যিনাদ থেকে শুধুমাত্র মৌখিক বর্ণনা শুনেছেন এবং তিনি আ'রাজ থেকে মৌখিক বর্ণনা শুনেছেন এবং তিনি আবূ হুরাইরা থেকে মৌখিক বর্ণনা শুনেছেন। বরং এখানে সনদ বলার উদ্দেশ্য হলো এ সনদের রাবীগণ প্রত্যেকে তাঁর উস্তাদের মুখ থেকে হাদীসটি শুনেছেন, লিখেছেন এবং লিখিত পাণ্ডুলিপি মৌখিক বর্ণনার সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন।

তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (২৫৬ হি) এ হাদীসটি মুয়াত্তা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামা বলেছেন, মালিক থেকে আবুয যিনাদ থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শুক্রবারের কথা উল্লেখ করে বলেন: এ দিনের মধ্যে একটি সময় আছে কোনো মুসলিম যদি সে সময়ে দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন যে, এ সুযোগটি স্বল্প সময়ের জন্য।"[১৩৩]

এখানে ইমাম বুখারী মুয়াত্তা গ্রন্থের হাদীসটি হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি এখানে মুয়াত্তা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেন নি। বরং তিনি ইমাম মালিকের একজন ছাত্র থেকে হাদীসটি শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। বাহ্যত পাঠকের কাছে মনে হতে পারে যে, ইমাম বুখারী মূলত শ্রুতির উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় কখনোই তা নয়। ইমাম মালিকের কাছ থেকে শতাধিক ছাত্র মুয়াত্তা গ্রন্থটি পূর্ণরূপে শুনে ও লিখে নেন। তাঁদের বর্ণিত লিখিত মুয়াত্তা গ্রন্থ তৎকালীন বাজারে 'ওয়াররাক' বা 'হস্তলিখিত পুস্তক' ব্যবসায়ীদের দোকানে পাওয়া যেত। ইমাম বুখারী যদি এইরূপ কোনো 'পাণ্ডুলিপি' কিনে তার বরাত দিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করতেন তবে মুহাদ্দিসগণের বিচারে বুখারীর উদ্ধৃতিটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হতো। কারণ পাণ্ডুলিপি নির্ভরতার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য ইমাম মালিকের 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটি তাঁর মুখ থেকে আগাগোড়া শুনে ও পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করতেন যে সকল মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী তাঁদের কাছে যেয়ে মুয়াত্তা গ্রন্থটি স্বকর্ণে শুনেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে মুয়াত্তা গ্রন্থের হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেন নি, বরং যাদের কাছে তিনি গ্রন্থটি পড়েছেন তাদের সূত্র প্রদান করেছেন। যেমন এখানে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামার সূত্র উল্লেখ করেছেন। এখানে তাঁর কথার অর্থ: আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামার কাছে মুয়াত্তার এ হাদীসটি আমি

স্বকর্ণে শুনেছি।

৩য় শতাব্দীর অন্যতম মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিমও (২৬২হি) এ হাদীসটি মুয়াত্তা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ...

"আমাদেরকে কুতাইবা ইবনু সাঈদ বলেন, মালিক থেকে, আবুয যিনাদ থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শুক্রবারের কথা উল্লেখ করে বলেন: ..."[১৩৪]

এখানে ইমাম মুসলিমও একইভাবে পুস্তকের উদ্ধৃতি না দিয়ে পুস্তকটির বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতি প্রদান করছেন।

৫ম শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম বাইহাকী (৪৫৮ হি) তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' নামক হাদীস গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ...

"আমাদেরকে আলী ইবনু আহমাদ ইবনু আবদান বলেন, আমাদেরকে আহমাদ ইবনু উবাইদ সাফ্‌ফার বলেন, আমাদেরকে ইসমাঈল কাযী বলেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামা কা'নাবী বলেন, তিনি মালিক থেকে, তিনি আবুয যিনাদ থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শুক্রবারের কথা উল্লেখ করে বলেন: ... ।"[১৩৫]

সনদটি দেখে কেউ ভাবতে পারেন যে, ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শুধু মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে গ্রন্থকার পর্যন্ত মাঝে ৮ জন বর্ণনাকারী! সকলেই শুধু মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির উপর নির্ভর করেছেন! কাজেই ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা খুবই বেশি!!

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইমাম বাইহাকীর এই সনদের অর্থ হলো: ইমাম মালিকের লেখা মুয়াত্তা গ্রন্থটি আমি আলী ইবনু আহমাদ ইবনু আবদান-এর নিকট পঠিত শুনেছি। তিনি তা আহমাদ ইবনু উবাইদ সাফ্‌ফার-এর কাছে পড়েছেন। তিনি পুস্তকটি ইসমাঈল কাযীর নিকট পাঠ করেছেন। তিনি পুস্তকটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামা কা'নাবীর কাছে পাঠ করেছেন। তিনি মালিক থেকে....। এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি মুয়াত্তা গ্রন্থটি বাজার থেকে ক্রয় করে নিজে পাঠ করে তার থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন নি। বরং তিনি মুয়াত্তার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে এমন একটি ব্যক্তির কাছে তা পাঠ করে শুনেছেন যিনি নিজে গ্রন্থটি বিশুদ্ধ পাঠের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছেন... এভাবে শেষ পর্যন্ত। বাইহাকী এ হাদীসটি আরো অনেকগুলো সনদে উল্লেখ করেছেন। সকল সনদেই তিনি মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মূলত বলেছেন যে, ইমাম মালিকের মুয়াত্তা গ্রন্থটি তিনি বিভিন্ন উস্তাদের কাছে বিভিন্ন সনদে বিশুদ্ধরূপে পড়ে শ্রবণ করেছেন।[১৩৬]

এভাবে আমরা দেখছি যে, লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির সমন্বয়ের জন্য মুহাদ্দিসগণ পাণ্ডুলিপি বা পুস্তকের বরাত প্রদানের পরিবর্তে শ্রবণের বরাত প্রদানের নিয়ম প্রচলন করেন। তাঁদের এ পদ্ধতিটি ছিল অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক। বর্তমান যুগে প্রচলিত গ্রন্থের নাম, পৃষ্ঠা সংখ্যা ইত্যাদি উল্লেখ করে 'Reference' বা তথ্যসূত্র দেয়ার চেয়ে এভাবে শিক্ষকের নাম উল্লেখ করে 'Reference' দেয়া অনেক নিরাপদ ও যৌক্তিক। তৎকালীন হস্তলিখিত গ্রন্থের যুগে শুধুমাত্র গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থ পাঠে ভুলের সম্ভাবনা, গ্রন্থের মধ্যে অন্যের সংযোজনের সম্ভাবনা ও অনুলিপিকারের ভুলের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু গ্রন্থকারের মুখ থেকে গ্রন্থটি পঠিতরূপে গ্রহণ করলে এ সকল ভুল বা বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে না।

ইহূদী-খৃস্টানগণ তাঁদের ধর্মগ্রন্থ লিখতেন পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে। এতে বিকৃতি সহজ হয়েছিল। ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে অনেক বিকৃতি বিদ্যমান, যেগুলোকে তাঁরা (erratum): ভুল এবং (Various readings): পাঠের ভিন্নতা বলে অভিহিত করেন।[১৩৭] পণ্ডিত মিল প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলের মধ্যে এরূপ ত্রিশহাজার ভুল রয়েছে। আর পণ্ডিত ক্রিসবাখ প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলের মধ্যে এরূপ একলক্ষ পঞ্চাশহাজার ভুল রয়েছে। আর শোলয-এর মতে এইরূপ বিকৃতি বাইবেলের মধ্যে এত বেশি যে তা গণনা করে শেষ করা যায় না।[১৩৮]

এ বিকৃতি ও ভুলের প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে পেরেছিলেন মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির বিষয়ে গুরুত্বারোপের মাধ্যমে।

আমরা আরো দেখছি যে, হাদীস তৃতীয় শতাব্দীতে বা পরবর্তী কালে সংকলিত হয়েছে মনে করাও ভুল। মূলত প্রথম শতাব্দী থেকেই হাদীস সংকলন করা হয়েছে। পরবর্তী সংকলকগণ তাঁদের গ্রন্থে পূর্ববর্তী সংকলকদের সংকলিত পুস্তকগুলো সংকলিত করেছেন। তবে মুহাদ্দিসগণ কখনোই হাদীস বর্ণনার তথ্যসূত্র হিসাবে পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেন নি। বরং পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির উপরে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

### ৪. ৪. ব্যক্তিগত সততা যাচাই

বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত হাদীসকে হাদীসের নামে কথিত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল বা মিথ্যা থেকে পৃথক করার জন্য মুহাদ্দিসগণের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল সনদে উল্লিখিত সকল 'রাবী'-র ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং তাদের ব্যক্তিগত সততা, সত্যপরায়ণতা ও ধার্মিকতা (عدالة) সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। এ বিষয়ে তাঁরা নিজেরা 'রাবী'র কর্ম পর্যবেক্ষণ করতেন এবং প্রয়োজনে সমকালীন আলিম, মুহাদ্দিস ও শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করতেন।

১ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী আবুল আলিয়া রুফাই' ইবনু মিহরান (৯০ হি) বলেন: কোনো স্থানে কোনো ব্যক্তি হাদীস বলেন বা শিক্ষাদান করেন জানলে আমি হাদীস সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তার কাছে গমন করতাম। সেখানে যেয়ে আমি তার সালাত পর্যবেক্ষণ করতাম। যদি দেখতাম, তিনি সুন্দর ও পূর্ণরূপে সালাত প্রতিষ্ঠা করছেন তবে আমি তার কাছে অবস্থান করতাম এবং তার কাছ থেকে হাদীস লিখতাম। আর যদি তার সালাতের বিষয়ে অবহেলা দেখতাম তাহলে আমি তার কাছে থেকে হাদীস শিক্ষা না করেই ফিরে আসতাম। আমি বলতাম: যে সালাতে অবহেলা করতে পারে সে অন্য বিষয়ে বেশি অবহেলা করবে।[১৩৯]

তাঁরা শুধু হাদীস বর্ণনাকারীর বাহ্যিক কর্মই দেখতেন না, তার আচরণ, আখলাক, সততা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদিও জানার চেষ্টা করতেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আসিম ইবনু সুলাইমান আল-আহওয়াল (১৪০ হি) বলেন, আমি আবুল আলিয়া (৯০ হি)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা (দ্বিতীয় শতকের তাবিয়ীগণ) তোমাদের পূর্ববর্তীদের চেয়ে সালাত- সিয়াম বেশি পালন কর বটে, কিন্তু মিথ্যা তোমাদের জিহ্বায় প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে।[১৪০]

এছাড়া উক্ত রাবীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে এবং তার পাণ্ডুলিপির সাথে মুখের বর্ণনা মিলিয়ে তাঁর সততা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। নিজেদের পর্যবেক্ষণের পাশাপশি মূলত সমকালীন আলিমদের মতামতের মাধ্যমে তারা রাবীর সততা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করতেন। ইয়াহইয়া ইবনু মুগীরাহ (২৫৩ হি) বলেন: আমি প্রখ্যাত তাবি-তাবিয়ী জারীর ইবনু আব্দুল হামীদ (১৮৮ হি)-কে তার ভাই আনাস ইবনু আব্দুল হামীদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তার হাদীস লিখবে না; কারণ সে মানুষের সাথে কথাবার্তায় মিথ্যা বলে। সে হিশাম ইবনু উরওয়াহ, উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিখেছে। কিন্তু যেহেতু মানুষের সাথে কথাবার্তায় তার মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে সেহেতু তার হাদীস গ্রহণ করবে না।[১৪১]

তবে সর্বাবস্থায় তাঁদের মূল সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতো ব্যক্তির প্রদত্ত তথ্যের তুলনামূলক নিরীক্ষা। এজন্য অগণিত ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, একজন মুহাদ্দিস কোনো একজন রাবী সম্পর্কে অনেক প্রশংসা শুনে প্রবল ভক্তি ও আগ্রহ সহকারে তার কাছে হাদীস শিখতে গিয়েছেন। কিন্তু যখনই তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা ও ভুল দেখতে পেয়েছেন তখনই সে ব্যক্তির বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত পাল্টে গিয়েছে।

আব্দুলাহ ইবনুল মুহার্‌রির আল-জাযারী ২য় শতকের একজন আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন। খলীফা মনসূরের শাসনামলে (১৩৬-১৫৮ হি) তিনি বিচারকের দায়িত্বও পালন করেন। তবে তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তিনি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলতেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১হি) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুহার্‌রিরের নেক আমল, বুজুর্গী ও প্রসিদ্ধির কথা শুনে আমার মনে তার প্রতি এত প্রবল ভক্তি জন্মেছিল যে, আমাকে যদি ইখতিয়ার দেয়া হতো যে, তুমি জান্নাতে যাবে অথবা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুহাররিরের সাথে সাক্ষাত করবে, তাহলে আমি তার সাথে সাক্ষাতের পরে জান্নাতে যেতে চেতাম। কিন্তু যখন আমি তার সাথে সাক্ষাত করলাম তখন তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে মিথ্যার ছড়াছড়ি দেখে আমার মনের সব ভক্তি উবে গেল। ছাগলের শুকনো লাদিও আমার কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয়।[১৪২]

### ৪. ৫. সাহাবীগণের সততা

এভাবে প্রত্যেক রাবীর ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ ব্যক্তিগত সততা ও বর্ণনার যথার্থতা অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে নিরীক্ষা ও যাচাই করেছেন। 'রাবী'র ব্যক্তিগত প্রসিদ্ধি, যশ, খ্যাতি ইত্যাদি কোনো কিছুই তাঁদেরকে এ যাচাই ও নিরীক্ষা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, যাচাই ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে অনেক দেশ বরেণ্য সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকেও তাঁরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন সাহাবীগণ। একমাত্র সাহাবীগণের

ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ ব্যক্তিগত সততা ও বিশ্বস্ততা নিরীক্ষা করেন নি। তাঁরা সকল সাহাবীকে ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও সত্যপরায়ণ বলে মেনে নিয়েছেন।

ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ এবং শিয়াগণ মুহাদ্দিসগণের এ সব মূলনীতির সমালোচনা করেন। তাঁরা সাহাবীগণের সততায় বিশ্বাস করেন না। বরং তারা সাহাবীগণকেই জালিয়াত বলে অভিযুক্ত করেন।

সাহাবীগণের সততা ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তাঁদের সততার বিষয়ে 'হাদীসের' নির্দেশনাও আমি এখানে আলোচনা করব না। আমি এখানে যুক্তি, বিবেক ও কুরআনের আলোকে সাহাবীগণের সততার বিষয়টি আলোচনা করব।

(১) মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ সাহাবীগণের বিষয়ে মূলত 'বিশ্বজনীন' মানবীয় মূলনীতির ভিত্তিতে কাজ করেছেন। বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত মূলনীতি হলো, যতক্ষণ না কোনো মানুষের বিষয়ে মিথ্যাচার প্রমাণিত হবে, ততক্ষণ তাকে 'সত্যবাদী' বলে গণ্য করতে হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। 'তার সাথে তার ভাইয়ের মামলা বা শত্রুতা আছে' এ অভিযোগে অন্যান্য ক্ষেত্রে তার বর্ণিত সংবাদ বা তথ্য বাতিল করা যায় না। মুসলিম উম্মাহ এ নীতির ভিত্তিতেই সাহাবীগণের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। সাহাবীগণ পরস্পরে যুদ্ধ করেছেন, বিভিন্ন বিরোধিতা ও জাগতিক সমস্যায় পড়েছেন, কিন্তু কখনো কোনোভাবে প্রমাণিত হয়নি যে, তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কোনো অবস্থাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলেছেন। সাহাবীদের বিরুদ্ধে যারা বিষোদগার করেন, তাঁরা একটিও প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি যে, অমুক ঘটনায় অমুক সাহাবী হাদীসের নামে মিথ্যা বলেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ইতিহাসে সাহাবীদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখিত রয়েছে। কিন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলেছেন বলে কোনো তথ্য প্রমাণিত হয় নি। কাজেই তাঁদের দেয়া তথ্য গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কোনো সাধারণ সন্দেহের ভিত্তিতে, হয়ত তিনি মিথ্যা বলেছেন এ ধারণার উপরে কারো সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

(২) আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ হাদীস গ্রহণ ও বিচারের সময় তা নিরীক্ষা করতেন। অন্যান্য সাহাবীর বর্ণনা তারা অনেক সময় যাচাই করেছেন। একটি ঘটনাতেও কারো ক্ষেত্রে কোনো মিথ্যা বা জালিয়াতি ধরা পড়ে নি। বরং সাহাবীগণের সত্যবাদিতা, সততা, ও এক্ষেত্রে তাঁদের আপোসহীনতা ইতিহাস-খ্যাত। হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের সতর্কতা ছিল অতুলনীয়।

(৩) যে কোনো ধর্ম-প্রচারক বা মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় তাঁর সহচরদের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। এজন্য সকল ধর্মেই নবী, রাসূল বা ধর্ম-প্রবর্তকের সহচরদেরকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়। এদের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনোভাবেই নবী-রাসূলের বাণী ও আদর্শ জানা সম্ভব নয়। সাহাবীগণের প্রতি সন্দেহ বা অনাস্থার অর্থই হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অস্বীকার করা এবং ইসলামকে ব্যবহারিক জীবন থেকে মুছে দেয়া। কারণ কুরআন, হাদীস বা ইসলাম সবই এ সকল সাহাবীর মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি।

(৪) সাহাবীগণের সততায় অবিশ্বাস করার অর্থ রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নবুওয়ত অবিশ্বাস করা। যারা মনে করেন যে, অধিকাংশ সাহাবী স্বার্থপর, অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী ছিলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে মনে করেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন ব্যর্থ নবী ছিলেন (নাঊযূ বিল্লাহ!)। লক্ষ মানুষের সমাজে অজ্ঞাত অখ্যাত দুই চার জন্য মুনাফিক থাকা কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। কিন্তু যারা দীর্ঘদিন রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর সাহচর্যে থেকেছেন এবং সাহাবী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদেরকেও যদি কেউ 'প্রবঞ্চক' বলে দাবি করেন, তবে তিনি মূলত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যর্থতার দাবি করছেন।

একজন ধর্ম প্রচারক যদি নিজের সহচরদের হৃদয়গুলিকে ধার্মিক বানাতে না পারেন, তবে তিনি কিভাবে অন্যদেরকে ধার্মিক বানাবেন! তাঁর আদর্শ শুনে, ব্যবহারিকভাবে বাস্তবায়িত দেখে ও তাঁর সাহচর্যে থেকেও যদি মানুষ 'সততা' অর্জন করতে না পারে, তবে শুধু সে আদর্শ শুনে পরবর্তী মানুষদের 'সততা' অর্জনের কল্পনা বাতুলতা মাত্র।

আজ যিনি মনে করেন যে, কুরআন পড়ে তিনি সততা শিখেছেন, অথচ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে কুরাআন পড়ে, জীবন্ত কুরআনের সাহচর্যে থেকেও আবূ হুরাইরা সততা শিখতে পারেন নি, তিনি মূলত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুওয়তকেই অস্বীকার করেন। মানবীয় দুর্বলতা, ক্রোধ, দলাদলি ইত্যাদি এক বিষয় আর প্রবঞ্চনা বা জালিয়াতি অন্য বিষয়। ধর্মের নামে জালিয়াতি আরো অনেক কঠিন বিষয়। কোনো ধর্ম-প্রবর্তক যদি তাঁর অনুসারীদের এ সব কঠিনতম পাপের পঙ্কিলতা থেকে বের করতে না পারেন, তবে তাকে কোনোভাবেই সফল বলা যায় না। কোনো স্কুলের সফলতা যেমন ছাত্রদের পাশের হারের উপর নির্ভর করে, তেমনি ধর্মপ্রচারকের সফলতা নির্ভর করে তার সাহচর্য-প্রাপ্তদের ধার্মিকতার উপর।

(৫) সর্বোপরি কুরআনে বিশ্বাসী কোনো মুসলিম কখনোই সাহাবীদের সততায় সন্দেহ করতে পারে না। কুরআনে বারংবার সাহাবীগণের ধার্মিকতার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। অল্প কয়েকটি নমুনা দেখুন। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা

চিরস্থায়ী হবে। এ মহাসাফল্য।"[১৪৩]

এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভকারীদেরকে দু ভাগ করা হয়েছে: (১) প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারগণ এবং (২) তাঁদেরকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণকারীগণ। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ অধিকাংশই ছিলেন প্রথম পর্যায়ের, অন্যেরা ছিলেন তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী।

কুরআন কারীমে অন্যান্য অনেক স্থানে সকল মুহাজির ও সকল আনসারকে 'প্রকৃত মুমিন' ও জান্নাতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪৪]

হুদাইবিয়ার প্রান্তরে 'বাইয়াতে রেদওয়ান' সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"মুমিনগণ যখন বৃক্ষতলে আপনার কাছে 'বাইয়াত' গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।"[১৪৫]

হাদীস-বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সকল সাহাবীই এ 'বাইয়াতে' অংশগ্রহণ করেছিলেন। একজন মুনাফিকও এতে অংশ নেয় নি।

তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীর প্রশংসায় বলা হচ্ছে:

لَكِنْ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

"কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; তাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং তারাই সফলকাম।"[১৪৬]

হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সকল সাহাবীই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। একজন মুনাফিকও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি।

রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর সকল সাহাবীর ঢালাও প্রশংসা করে ও তাঁদের ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার 'ঢালাও' ঘোষণা দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। তিনি কুফ্‌রী, পাপ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।"[১৪৭]

অন্যত্র মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে ইসলামগ্রহণকারী উভয় প্রকারের সাহাবীগণকে 'ঢালাওভাবে' কল্যাণ বা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে:

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

"তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়েরই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"[১৪৮]

এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ সকলেই মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সংগ্রাম করেছেন।

সাহাবীগণের প্রশংসায়, তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা, ঈমান ও জান্নাতের সাক্ষ্য সম্বলিত আরো অনেক আয়াত কুরআন কারীমে রয়েছে।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছেন আবূ হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আনাস ইবনু মালিক, আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আবূ সাঈদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, আলী ইবনু আবী তালিব, উমার ইবনুল খাত্তাব, উম্মু সালামাহ, আবূ মূসা আশ'আরী, বারা ইবনু আযিব, আবূ যার গিফারী, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, আবূ উমামা বাহিলী, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, সাহল ইবনু সাদ, উবাদা ইবনুস সামিত, ইমরান ইবনুল হুসাইয়িন, আবূ দারদা, আবূ কাতাদা, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক, উবাই ইবনু কা'ব মু'আয ইবনু জাবাল, উসমান ইবনু আফ্‌ফান প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী।

তাঁরা সকলেই ছিলেন রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর প্রসিদ্ধ সহচর, মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণকারী, তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারী বা প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার।

এখন যদি কেউ বলেন যে, তিনি কুরআন বিশ্বাস করেন, তবে এ সকল সাহাবীর সকলের বা কারো কারো সততায় বিশ্বাস করেন না, তবে তিনি মিথ্যাচারী প্রবঞ্চক অথবা জ্ঞানহীন মুর্খ। কুরআন যাকে সফলকাম বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং কুরআন যার জন্য 'কল্যাণের' প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে তার সততার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার অর্থ কুরআনের সাক্ষ্য অস্বীকার করা।

## ৪. ৬. তুলনামুলক নিরীক্ষা

হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় এবং বিশুদ্ধ হাদীসকে অশুদ্ধ হাদীস থেকে পৃথক করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের অন্যতম পদ্ধতি ছিল সার্বিক নিরীক্ষা (Cross Examine)। এ ক্ষেত্রে তাঁরা মূলত সাহাবীগণের কর্মধারার অনুসরণ করেছেন।

### ৪. ৬. ১. তুলনামূলক নিরীক্ষার মূল প্রক্রিয়া

আবু হুরাইরা (রা) একজন সাহাবী। অনেক তাবিয়ী তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এদের মধ্যে কেউ দীর্ঘদিন এবং কেউ অল্প দিন তাঁর সাথে থেকেছেন। কোনো সাহাবী বা মুহাদ্দিস একেক ছাত্রকে একেকটি হাদীস শিখাতেন না। তাঁরা তাঁদের কাছে সংগৃহীত হাদীসগুলো সকল ছাত্রকেই শিক্ষা দিতেন। ফলে সাধারণভাবে আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত সকল হাদীসই তাঁর অধিকাংশ ছাত্র শুনেছেন। তাঁরা একই হাদীস আবু হুরাইরার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ আবু হুরাইরার (রা) সকল ছাত্রের বর্ণিত হাদীস সংগ্রহ ও সংকলিত করে সেগুলো পরস্পরের সাথে মিলিয়ে নিরীক্ষা করেছেন।

যদি দেখা যায় যে, ৩০ জন তাবিয়ী একটি হাদীস আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করছেন, তন্মধ্যে ২০/২৫ জনের হাদীসের শব্দ একই প্রকার কিন্তু বাকী ৫/১০ জনের শব্দ অন্য রকম, তবে বুঝা যাবে যে, প্রথম ২০/২৫ জন হাদীসটি আবূ হুরাইরা যে শব্দে বলেছেন হুবহু সে শব্দে মুখস্থ ও লিপিবদ্ধ করেছেন। আর বাকী কয়জন হাদীসটি ভালভাবে মুখস্থ রাখতে পারেন নি। এতে তাদের মুখস্থ ও ধারণ শক্তির দুর্বলতা প্রমাণিত হলো।

যদি আবূ হুরাইরার (রা) কোনো ছাত্র তাঁর কাছ থেকে ১০০ টি হাদীস শিক্ষা করে বর্ণনা করেন এবং তন্মধ্যে সবগুলো বা অধিকাংশ হাদীস তিনি হুবহু মুখস্থ রেখে বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণনা করতে পারেন তাহলে তা তার গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। অপরদিকে যদি এরূপ কোনো তাবিয়ী ১০০ টি হাদীসের মধ্যে অধিকাংশ হাদীসই এমন ভাবে বর্ণনা করেন যে, তার বর্ণনা অন্যান্য তাবিয়ীর বর্ণনার সাথে মেলে না তাহলে বুঝা যাবে যে তিনি হাদীস ঠিকমত লিখতেন না ও মুখস্থ রাখতে পারতেন না। এ বর্ণনাকারী তাঁর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। তিনি "যয়ীফ" বা দুর্বল রাবী হিসাবে চিহ্নিত হন।

ভুলের পরিমাণ ও প্রকারের উপর নির্ভর করে তার দুর্বলতার মাত্রা বুঝা যায়। যদি তার কর্মজীবন ও তার বর্ণিত এ সকল উল্টো পাল্টা হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হতো যে তিনি ইচ্ছা পূর্বক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশি কম করেছেন অথবা ইচ্ছাপূর্বক হাদীসের নামে বানোয়াট কথা বলেছেন তাহলে তাকে "মিথ্যাবাদী" রাবী বলে চিহ্নিত করা হতো। যে হাদীস শুধুমাত্র এই ধরনের "মিথ্যাবাদী" বর্ণনাকারী একাই বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে কোন অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসাবে গ্রহণ করা হতো না। বরং তাকে "মিথ্যা" বা "মাউযূ" হাদীস রূপে চিহ্নিত করা হতো।

অনেক সময় দেখা যায় যে, আবূ হুরাইরার (রা) কোন ছাত্র এমন একটি বা একাধিক হাদীস বলছেন যা অন্য কোন ছাত্র বলছেন না। এক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ উপরের নিয়মে নিরীক্ষা করেছেন। যদি দেখা যায় যে, উক্ত তাবিয়ী ছাত্র আবূ হুরাইরার সাহচর্যে অন্যদের চেয়ে বেশি ছিলেন, তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস তিনি সঠিকভাবে হুবহু লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ রাখতেন বলে নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর সততা ও ধার্মিকতা সবাই স্বীকার করেছেন, সে ক্ষেত্রে তার বর্ণিত অতিরিক্ত হাদীসগুলোকে সহীহ (বিশুদ্ধ) বা হাসান (সুন্দর বা গ্রহণযোগ্য) হাদীস হিসাবে গ্রহণ করা হতো।

আর যদি উপরোক্ত তুলনামূলক নিরীক্ষায় প্রমাণিত হতো যে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে অধিকাংশ হাদীস বা অনেক হাদীস গ্রহণযোগ্য রাবীদের বর্ণনার সাথে কমবেশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ তবে তার বর্ণিত এ অতিরিক্ত হাদীসটিও উপরের নিয়মে দুর্বল বা মিথ্যা হাদীস হিসেবে চিহ্নিত করা হতো।

সাধারণত একজন তাবিয়ী একজন সাহাবী থেকেই হাদীস শিখতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেক তাবিয়ী চেষ্টা করতেন যথা সম্ভব বেশি সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করতে। এজন্য তাঁরা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের যে শহরেই কোনো সাহাবী বাস করতেন সেখানেই গমন করতেন । মুহাদ্দিসগণ উপরের নিয়মে সকল সাহাবীর হাদীস, তাদের থেকে সকল তাবিয়ীর হাদীস, তাঁদের থেকে বর্ণিত তাবে-তাবিয়ীগণের হাদীস একত্রিত করে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে ও বর্ণনাকারীগণের ব্যক্তিগত জীবন, সততা, ধার্মিকতা ইত্যাদির আলোকে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপন করতেন।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এ ধারা অব্যহত থাকে। একদিকে মুহাদ্দিসগণ সনদসহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কথিত সকল হাদীস সংকলিত করেছেন। অপরদিকে 'রাবী'গণের বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তাদের বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৪৯]

ইমাম তিরমিযী আবু ইসা মুহাম্মাদ ইবনু ইসা (২৭৫ হি) বলেন, আমাদেরকে আলী ইবনু হুজর বলেছেন, আমাদেরকে হাফস

ইবনু সুলাইমান বলেছেন, তিনি কাসীর ইবনু যাযান থেকে, তিনি আসিম ইবনু দামুরাহ থেকে, তিনি আলী ইবনু আবী তালিব থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, মুখস্থ করবে, কুরআনের হালালকে হালাল হিসেবে পালন করবে ও হারামকে হারাম হিসেবে বর্জন করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের দশ ব্যক্তির বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।"[১৫০]

হাদীসটি এভাবে সংকলিত করার পরে ইমাম তিরমিযী হাদীসটির দুর্বলতা ও অগ্রহণযোগ্যতার কথা উল্লেখ করে বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ وَحَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ

এ হাদীসটি "গরীব"। এ একটিমাত্র সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটি জানা যায় না। এর সনদ সহীহ নয়। হাফস ইবনু সুলাইমান (১৮০ হি) হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

তিরমিযীর এ মতামত তাঁর ও দীর্ঘ তিন শতকের অগণিত মুহাদ্দিসের নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রদত্ত। তাঁদের নিরীক্ষার সংক্ষিপ্ত পর্যায়গুলো নিম্নরূপ:

১. তাঁরা হাফস ইবনু সুলাইমান বর্ণিত সকল হাদীস সংগ্রহ করেছেন।
২. হাফস যে সকল শিক্ষকের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের অন্যান্য ছাত্র বা হাফসের 'সহপাঠী' রাবীদের বর্ণনা সংগ্রহ করে তাঁদের বর্ণনার সাথে তার বর্ণনার তুলনা করেছেন।
৩. এ হাদীসে হাফসের উস্তাদ কাসীর ইবনু যাযানের সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীস সংগ্রহ করে হাফসের বর্ণনার সাথে তুলনা করেছেন।
৪. কাসীরের উস্তাদ আসিম ইবনু দামুরাহ বর্ণিত সকল হাদীস তার অন্যান্য ছাত্রদের সূত্রে সংগ্রহ করে হাফসের এ বর্ণনার সাথে তুলনা করেছেন।
৫. আলী (রা) এর অন্যান্য ছাত্রদের সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীস সংগ্রহ করে তুলনা করেছেন।
৬. আলী (রা) ছাড়া অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসের সাথে এ বর্ণনার তুলনা করেছেন।

এ নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা দেখেছেন:

**ক.** এ হাদীসটি এ একটিমাত্র সূত্র ছাড়া কোনো সূত্রে বর্ণিত হয় নি। অন্য কোনো সাহাবী থেকে কেউ বর্ণনা করেন নি। আলী (রা)-এর অন্য কোনো ছাত্র হাদীসটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেন নি। আসিমের অন্য কোনো ছাত্র তা তাঁর থেকে বর্ণনা করেন নি। কাসীরের অন্য কোনো ছাত্র তা বর্ণনা করেন নি। এভাবে তাঁরা দেখেছেন যে, দ্বিতীয় হিজরীর শেষ প্রান্তে এসে হাফস ইবনু সুলাইমান দাবী করছেন যে, এ হাদীসটি তিনি এ সূত্রে শুনেছেন। তাঁর দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য কোনো 'সাক্ষী' পাওয়া গেল না।

**খ.** এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাদীসটি গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হলো। কারণ সাধারণভাবে এরূপ ঘটে না যে, আলী (রা) বর্ণিত একটি হাদীস তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আসিম ছাড়া কেউ জানবেন না। আবার আসিম একটি হাদীস শেখাবেন তা একমাত্র যাযান ছাড়া কেউ জানবেন না। আবার যাযান একটি হাদীস শেখাবেন তা হাফস ছাড়া কেউ জানবেন না।

**গ.** এখন দেখতে হবে যে, হাফস বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের অবস্থা কী? মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন যে, হাফস তার উস্তাদ যাযান এবং অন্যান্য সকল উস্তাদের সূত্রে যত হাদীস বর্ণনা করেছেন প্রায় সবই ভুলে ভরা। এজন্য তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, হাফস যদিও কুরআনের বড় কারী ও আলিম ছিলেন, কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনায় 'দুর্বল' ছিলেন। তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা না বললেও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বা ভুল করতেন খুব বেশি। এজন্য তাঁরা তাকে 'দুর্বল' ও 'পরিত্যক্ত' বলে গণ্য করেছেন।[১৫১]

হাদীস বর্ণনাকারী বা 'রাবী'র বর্ণনার যথার্থতা নির্ণয়ের এ সুক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনেকেই বুঝতে পারেন না। ফলে মুহাদ্দিস যখন কোনো 'রাবী' বা হাদীসের বিষয়ে বিধান প্রদান করেন তখন তাঁরা অবাক হয়েছেন বা আপত্তি করেছেন। কেউ বলেছেন: এ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বিচারের ধৃষ্টতা। কেউ বলেছেন: এ হলো অকারণে, না জেনে বা আন্দাজে নেককার মানুষদের সমালোচনা। বর্তমান যুগেই নয়, ইসলামের প্রথম যুগগুলোতেও অনেক মানুষ এ প্রকারের ধারণা পোষণ করতেন।[১৫২]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, 'রাবী' ও 'হাদীসের' সমালোচনায় হাদীসের ইমামগণের সকল বিধান ও হাদীস বিষয়ক মতামত এ নিরীক্ষার ভিত্তিতে। কোনো মুহাদ্দিস যখন কোনো রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেন যে, তিনি ( ثقة، ضابط، حافظ، صدوق، لا بأس به، ضعيف، كثير الوهم، منكر الحديث، متروك، كذاب، وضاع): নির্ভরযোগ্য, পরিপূর্ণ মুখস্থকারী, মুখস্থকারী,

সত্যপরায়ণ, চলনসই, দুর্বল, অনেক ভুল করেন, আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী, পরিত্যক্ত, মিথ্যাবাদী, হাদীস বানোয়াটকারী ইত্যাদি তখন বুঝতে হবে যে, তাঁর এ 'সংক্ষিপ্ত মতামতটি' তাঁর আজীবনের অক্লান্ত পরিশ্রম, হাদীস সংগ্রহ ও তুলনামূলক নিরীক্ষার ফল।

অনুরূপভাবে যখন তিনি কোনো হাদীসের বিষয়ে বলেন:

صحيح، ضعيف، منكر، موضوع، مرسل، الصحيح وَقْفُهُ...

হাদীসটি সহীহ, যয়ীফ, আপত্তিকর, বানোয়াট, মুরসাল, সহীহ হলো যে হাদীসটি সাহাবীর বাণী... ইত্যাদি তাহলেও আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি তাঁর আজীবনের সাধনার নির্যাস আমাদেরকে দান করলেন।

এভাবে আমরা মুহাদ্দিসগণের কর্মধারা সম্পর্কে জানতে পারছি। এবার আমরা এ কর্মধারার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আলোচনা করব।

**৪. ৬. ২. নিরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলি**

মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে রাবীর ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা যাচাই করার চেষ্টা করতেন। এ বিষয়ক ২/১ টি ঘটনা দেখুন:

১. দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন তাবিয়ী উফাইর ইবনু মা'দান বলেন: "উমর ইবনু মুসা আল-ওয়াজিহী আমাদের কাছে হিমস শহরে করেন আগমন। আমরা হিমসের মসজিদে তার কাছে (হাদীস শিক্ষার্থে) সমবেত হই। তিনি বলতে থাকেন: আপনাদের নেককার শাইখ আমাদেরকে হাদীস বলেছেন। আমরা বললাম: নেককার শাইখ বলতে কাকে বুঝাচ্ছেন? তিনি বলেন: খালিদ ইবনু মাদান। আমি বললাম: আপনি কত সনে তার কাছে থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি বলেন: আমি ১০৮ হিজরীতে তার কাছে হাদীস শিক্ষা করি। আমি বললাম: কোথায় তাঁর সাথে আপনার সাক্ষাত হয়েছিল? তিনি বলেন: আরমিনিয়ায় যুদ্ধের সময়। আমি বললাম: আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকুন। খালিদ ইবনু মা'দান ১০৪ হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আপনি তার মৃত্যুর ৪ বছর পরে তার কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। অপরদিকে তিনি কখনই আরমিনিয়ায় যুদ্ধে যান নি। তিনি শুধু বাইযান্টাইন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।"[১৫৩]

এভাবে এ রাবীর মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হওয়ার কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যক্ত ও মিথ্যাবাদী 'রাবী' রূপে চিহ্নিত করেছেন। আবু হাতেম রাযী বলেন: উমর ইবনু মূসা পরিত্যক্ত, সে মিথ্যা হাদীস তৈরী করত। বুখারী বলেন: তার বর্ণিত হাদীস আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য। ইবনু মাঈন বলেন: লোকটি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু আদী বলেন: লোকটি বানোয়াটভাবে হাদীসের সনদ ও মতন তৈরি করত। দারাকুতনী, নাসাঈ প্রমূখ মুহাদ্দিস বলেন: সে পরিত্যক্ত।[১৫৪]

২. আবুল ওয়ালীদ তাইয়ালিসী হিশাম ইবনু আব্দুল মালিক (২২৭ হি) বলেন: "আমি আমির ইবনু আবী আমির আল-খাযযায-এর কাছ থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছিলাম। একদিন হাদীসের সনদে তিনি বললেন: 'আমাদেরকে আতা ইবনু আবী রাবাহ (১১৪ হি) বলেছেন'। আমি প্রশ্ন করলাম: আপনি কত সালে আতা থেকে হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন: ১২৪ হি. সালে। আমি বললাম: আতা তো ১১৩/১১৪ সালে ইন্তেকাল করেছেন!"

এভাবে তার বর্ণনার মিথ্যা ধরা পড়ে। এ মিথ্যা ইচ্ছাকৃত হতে পারে বা অনিচ্ছাকৃত হতে পারে। ইমাম যাহাবী (৭৪৮ হি) বলেন: যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে একথা বলে থাকেন তাহলে তিনি একজন মিথ্যাবাদী ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। আর যদি তিনি ভুলক্রমে আতা ইবনুস সাইব (১৩৬ হি) নামের অন্য তাবিয়ীকে আতা ইবনু আবী রাবাহ বলে ভুল করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি একজন অত্যন্ত অসতর্ক, জাহিল ও পরিত্যক্ত রাবী।"[১৫৫]

৩. ১ম হিজরী শতকের একজন রাবী সুহাইল ইবনু যাকওয়ান আবু সিনদী ওয়াসিতী। তিনি আয়িশা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন বলে দাবি করতেন। মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে তার মিথ্যাচার ধরা পড়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন, আমাদেরকে আব্বাদ বলেছেন: সুহাইল ইবনু যাকওয়ানকে আমরা বললাম: আপনি কি আয়িশা (রা) কে দেখেছেন? তিনি বলেন: হ্যাঁ, দেখেছি। আমরা বললাম: বলুনতো তিনি কেমন দেখতে ছিলেন। তিনি বলেন: তাঁর গায়ের রং কাল ছিল। সুহাইল আরো দাবি করেন যে, তিনি ইবরাহীম নাখয়ীকে দেখেছেন, তাঁর চোখ দুটি ছিল বড় বড়।

সুহাইলের এই বক্তব্য তার মিথ্যা ধরিয়ে দিয়েছে। কারণ আয়েশা (রা) ফর্সা ছিলেন। আর ইবরাহীম নাখয়ীর চোখ নষ্ট ছিল।[১৫৬]

**৪. ৬. ৩. শব্দগত ও অর্থগত নিরীক্ষা**

হাদীসের সংগ্রহ ও নিরীক্ষার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের শব্দ, বাক্য বিন্যাস ও অর্থের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন।

বর্ণিত হাদীসটির মধ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলি, বাক্যের ব্যবহার ইত্যাদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষা ও ভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা লক্ষ্য করতেন। বর্ণিত হাদীসটির অর্থ মানবীয় যুক্তি, জ্ঞান, বিবেক বিরোধী কি না, অথবা কুরআন ও হাদীসের সুপরিচিত বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী কি না তা বিবেচনা করতেন। ফলে অনেক সময় বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত সততা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বর্ণিত হাদীসকে তাঁরা মিথ্যা বা বানোয়াট বলে প্রত্যাখ্যান করতেন। পরবর্তী আলোচনায় পাঠক এ বিষয়ক অনেক উদাহরণ দেখতে পাবেন।

**৪. ৬. ৪. 'রাবী'-র উস্তাদকে প্রশ্ন করা**

মুহাদ্দিসগণ কোনো রাবীর কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহের পরে চেষ্টা করতেন তিনি যে উস্তাদের সূত্রে হাদীসটি বলেছেন তাঁর কাছে যেয়ে সরাসরি তাকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে বর্ণনাটি যাচাই করার। এজন্য প্রয়োজনে তাঁরা হাজার মাইল পরিভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করতেন। উক্ত শিক্ষকের মৃত্যুর কারণে তার কাছে প্রশ্ন করা সম্ভব না হলে তাঁরা তার অন্যান্য ছাত্রের বর্ণনা সংগ্রহ করে তুলনা করতেন। এ জাতীয় একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন তাবিয়ী হাদীস বর্ণনা কারী 'রাবী' হাসান ইবনু উমারাহ আল-বাজালী (১৫৩ হি) তিনি বড় আলিম ও ফকীহ ছিলেন এবং কিছুদিন বাগদাদের বিচারপতি ছিলেন। কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি খুবই দুর্বল ছিলেন। সমকালীন নাকিদ বা সমালোচক হাদীসের ইমামগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তার দুর্বলতা প্রমাণিত করেন। এ বিষয়ে দ্বিতীয় হিজরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, নাকিদ ও ইমাম আল্লামা শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (১৬০ হি) বলেন: "হাসান ইবনু উমারাহ আমাকে ৭ টি হাদীস বলেন। তিনি বলেন যে, তিনি হাদীসগুলো হাকাম ইবনু উতাইবাহ (১১৩ হি) এর কাছ থেকে শুনেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবনুল জাযযার থেকে শুনেছেন। আমি হাকাম ইবনু উতাইবাহ-এর সাথে সাক্ষাত করে সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন: এগুলো মধ্যে একটি হাদীসও আমি বলি নি।"[১৫৭]

আবু দাউদ তায়ালিসী সুলাইমান ইবনু দাউদ (২০৪ হি) বলেন: শু'বা আমাকে বলেন: আমাকে হাসান ইবনু উমারাহ বলেন, আমাকে হাকাম ইবনু উতাইবাহ বলেছেন, আব্দুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা বলেছেন, আলী (রা) বলেছেন: "উহুদের শহীদগণকে গোসল দেয়া হয়, কাফন পরানো হয় এবং জানাযার সালাত আদায় করা হয়।" এরপর আমি হাকামের কাছে গমন করে উহুদের শহীদগণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন: তাঁদের গোসল করানো হয় নি এবং কাফন পরানো হয় নি। আমি বললাম: তাহলে হাসান ইবনু উমারাহ যে আপনার সূত্রে এ সব কথা বর্ণনা করছে? তিনি বলেন: আমি কখনোই তাকে এ হাদীস বলি নি।"[১৫৮]

আবু দাউদ তায়ালিসী আরো বলেন: আমাকে শু'বা বললেন: তুমি জারীর ইবনু হাযিম (১৭০ হি) এর নিকট গমন করে তাকে বল: আপনার জন্য হাসান ইবনু উমারাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করা জায়েয নয়; কারণ সে মিথ্যা বলে। তায়ালিসী বলেন: আমি প্রশ্ন করলাম: কিভাবে তা জানলেন? তিনি বলেন: তিনি আমাকে হাকাম ইবনু উতাইবাহর সূত্রে অনেক হাদীস শুনিয়েছেন যেগুলোর কোনো ভিত্তি আমি পাই নি।

তায়ালিসী বলেন: আমি বললাম: সেগুলো কি? শু'বা বলেন: আমি হাকামকে বললাম: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি উহদ যুদ্ধের শহীদগণের সালাতুল জানাযা আদায় করেছিলেন? তিনি বলেন: না, তিনি তাঁদের সালাতুল জানাযা আদায় করেন নি। আর হাসান ইবনু উমারাহ বলছেন, তাকে হাকাম বলেছেন, তাকে মুকসিম বলেছেন, তাকে ইবনু আব্বাস বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহদের শহীদগণের সালাতুল জানাযা আদায় করেন এবং দাফন করেন। আমি হাকামকে বললাম: জারজ সন্তানের বিষয়ে আপনার মত কি? তিনি বলেন: তাদের জানাযা পড়া হবে। আমি বললাম: এ হাদীস কার থেকে বর্ণিত? হাকাম বলেন: হাসান বসরী থেকে বর্ণিত। অথচ হাসান ইবনু উমারাহ বলছেন: তাকে হাকাম হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনুল জাযযার থেকে আলীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।"[১৫৯]

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শু'বা হাসান ইবনু উমারাহ-এর বর্ণিত হাদীসগুলো তার উস্তাদের কাছে পেশ করে হাসানের বর্ণনার অযথার্থতা ও তার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত করলেন। এইরূপ অগণিত ঘটনা আমরা রিজাল গ্রন্থসমূহে দেখতে পাই। মূলত মুহাদ্দিসগণের সফরের একটি বড় অংশ ব্যয় করতেন সংকলিত হাদীস সমূহ 'রাবী'র উস্তাদের কাছে পেশ করে সেগুলোর যথার্থতা যাচাইয়ের কাজে।

**৪. ৬. ৫. বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনার তুলনা**

মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষার অন্যতম দিক ছিল রাবীর সতীর্থ বা 'সহপাঠি'-গণের বর্ণনা সংগ্রহ ও তুলনা করে তার যর্থার্থতা নির্ণয় করা। তুলনা ও নিরীক্ষার এ প্রক্রিয়া ছিল তাঁদের সার্বক্ষণিক হাদীস চর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য। হাদীস শোনার সাথে সাথে তাঁরা সে হাদীসকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত অন্যদের বর্ণিত হাদীসগুলোর সাথে তুলনা করতেন। এরপর প্রয়োজন ও সুযোগ অনুসারে অন্যান্য রাবীদেরকে প্রশ্ন করতেন, তাঁদের বর্ণনার সাথে এ বর্ণনার তুলনা করতেন এবং প্রয়োজন মত পাণ্ডুলিপির সাথে মেলাতেন।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু দাউদ তায়ালিসী (২০৪ হি) বলেন, আমরা একদিন আমাদের উস্তাদ শু'বা ইবনুল হাজ্জাজের (১৬০ হি) কাছে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় সমসাময়িক রাবী হাসান ইবনু দীনার সেখানে আগমন করেন। শু'বা তাকে বলেন, আপনি এখানে বসুন। তিনি বসেন এবং হাদীস বলেন: আমাদেরকে হামীদ ইবনু হিলাল বলেছেন, তিনি মুজাহিদ (২১-১০৪ হি) থেকে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবকে (২৩ হি) বলতে শুনেছেন...। হাদীসটি শুনে শু'বা অবাক হয়ে বলেন: মুজাহিদ উমার থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন? এ কিভাবে সম্ভব? এসময় হাসান ইবনু দীনার উঠে চলে যান। অন্য একজন রাবী আবুল ফাদল বাহর ইবনু কুনাইয আস-সাক্কা (১৬০ হি) সেখানে আগমন করেন। শু'বা তাকে বলেন: আবুল ফাদল, আপনি হামীদ ইবনু হিলাল থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন। তিনি বলেন, হ্যাঁ, শুনেছি। আমাদেরকে হামীদ ইবনু হিলাল বলেছেন, আমাদেরকে বনী আদী গোত্রের আবু মুজাহিদ নামের একজন আলিম বলেছেন, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবকে বলতে শুনেছেন...। তখন শু'বা বলেন: তাহলে এ হলো আসল বিষয়।[১৬০]

হাসান ইবনু দীনার তার হাদীস বর্ণনায় ভুল করেছেন। প্রসিদ্ধ রাবী মুজাহিদের জন্ম উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর শাহাদতের দুই এক বছর পূর্বে। তিনি উমার (রা)-এর নিকট থেকে কোনো হাদীস শুনেন নি। তিনি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে রাবীর নামে ভুল করেছেন। বাহর আস-সাক্কা-এর বর্ণনার সাথে তুলনা করে শু'বা বুঝতে পারলেন হাসান ইবনু দীনারের ভুল কোথায়। তিনি হামীদ ইবনু হিলালের উস্তাদের নাম ঠিকমত মনে রাখতে পারেন নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা না বললেও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেন। তিনি হাদীস নির্ভুলরূপে মুখস্থ রাখতে বা বর্ণনা করতে পারেন না।

তৃতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'নাকিদ' মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩ হি) মূসা ইবনু ইসমাঈল (২২৩ হি)-এর কাছে গমন করে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ইবনু দীনারের (১৬৭ হি) বর্ণিত হাদীসগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মূসা বলেন: আপনি এ পাণ্ডুলিপিগুলো আর কারো কাছে শুনেন নি? ইয়াহইয়া বলেন: আমি ইতোপূর্বে হাম্মাদের ১৭ জন ছাত্রের কাছে তাদের কাছে সংকলিত হাম্মাদের বর্ণিত হাদীসগুলোর পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনেছি। আপনি ১৮তম ব্যক্তি যার কাছে আমি হাম্মাদের বর্ণিত হাদীসগুলো পড়তে চাই। মূসা বলেন: কেন? ইয়াহইয়া বলেন: কারণ হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুই এক স্থানে ভুল করতেন; এজন্য আমি তার ভুল এবং তার ছাত্রদের ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে চাই। যদি দেখি যে, হাম্মাদের সকল ছাত্রই একইভাবে বর্ণনা করছেন তাহলে বুঝতে পারব যে, হাম্মাদ এভাবেই বলেছেন এবং এক্ষেত্রে ভুল হলে তা হাম্মাদেরই ভুল। আর যদি দেখি যে, ছাত্রদের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তাহলে বুঝতে পারবে যে, এক্ষেত্রে ভুল ছাত্রের নিজের। এভাবে আমি হাম্মাদের নিজের ভুল এবং তাঁর ছাত্রদের ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।[১৬১]

মুহাদ্দিসগণের 'তুলনামূলক নিরীক্ষা'-র অগণিত উদাহরণ ও ব্যাখ্যা ইমাম মুসলিম বিস্তারিতভাবে তার "আত-তাময়ীয' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় একটি উদাহরণ এখানে পেশ করছি। তিনি বলেন:

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল হাদীসের সনদে বা মতনে হতে পারে। মতনে ভুলের একটি উদাহরণ। আমাকে হাসান হুলওয়ানী ও আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ দারিমী বলেছেন, আমাদেরকে উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল মাজীদ বলেছেন, আমাদেরকে কাসীর ইবনু যাইদ বলেছেন, আমাকে ইয়াযিদ ইবনু আবী যিয়াদ বলেছেন, কুরাইব ইবনু আবী মুসলিম (৯৮ হি) থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি বলেন: আমি আমার খালা (নবী-পত্নী) মাইমূনার ঘরে রাত্রি যাপন করি।... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রে উঠে ওযু করে (তাহাজ্জুদের) সালাতে দাঁড়ান। তখন আমি তাঁর ডান পার্শে দাঁড়াই। তিনি আমাকে ধরে তাঁর বাম পার্শে দাঁড় করিয়ে দেন।...."

ইমাম মুসলিম বলেন: এ হাদীসটি ভুল। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনায় এর বিপরীত কথা বর্ণনা করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু আব্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ বামে দাঁড়িয়েছিলেন এরপর তিনি তাঁকে তাঁর ডানদিকে দাঁড় করিয়ে দেন। ... আমি এখানে কুরাইব ইবনু আবী মুসলিম থেকে তাঁর অন্যান্য ছাত্রদের বর্ণনা এবং এরপর ইবনু আব্বাস থেকে ইবনু আব্বাসের অন্যান্য ছাত্রদের বর্ণনা উল্লেখ করব, যারা কুরাইবের সতীর্থ ছিলেন এবং তাঁরই অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১. আমাদেরকে ইবনু আবী উমর বলেন, আমাদেরকে সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, আমর ইবনু দীনার থেকে, কুরাইব থেকে ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি মাইমূনার গৃহে রাত্রি যাপন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে উঠে ওযু করে সালাতে দাঁড়ান। ইবনু আব্বাস বলেন: আমি তখন উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে ওযু করেন সেভাবে ওযু করে তাঁর কাছে আগমন করি এবং তাঁর বামে দাঁড়াই। তিনি তখন আমাকে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দেন।
২. মাখরামাহ ইবনু সুলাইমান কুরাইব থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।
৩. সালামা ইবনু কুহাইল কুরাইব থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে অনুরূপভাবে।
৪. সালিম ইবনু আবীল জা'দ কুরাইব থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে এভাবেই।
৫. হুশাইম আবু বিশর থেকে সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে ইবনু আব্বাস থেকে।
৬. আইউব সাখতিয়ানী, আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে, তাঁর পিতা সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে।

৭. হাকাম ইবনু উতাইবাহ সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে।
৮. ইবনু জুরাইজ আতা ইবনু আবী রাবাহ থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে।
৯. কাইস ইবনু সা'দ আতা ইবনু আবী রাবাহ থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে।
১০. আবু নাদরাহ (মুনযির ইবনু মালিক) ইবনু আব্বাস থেকে।
১১. শা'বী ইবনু আব্বাস থেকে।
১২. তাঊস ইকরামাহ থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে।

ইমাম মুসলিম বলেন: এভাবে কুরাইব থেকে এবং ইবনু আব্বাসের অন্যান্য ছাত্রদের থেকে সহীহ বর্ণনায় প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনু আব্বাসকে তাঁর বামে দাঁড় করিয়েছিলেন বলে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে ভুল।[১৬২]

পাঠক, এখানে ইমাম মুসলিমের নিরীক্ষার গভীরতা ও প্রামণ্যতা লক্ষ্য করুন। তিনি এ একটি হাদীস ইবনু আব্বাস থেকে ১৩টি সূত্রে সংকলিত করে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক বর্ণনাকে ভুল বা মিথ্যা বর্ণনা থেকে পৃথক করলেন। তিনি প্রথমে উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াযিদ ইবনু আবী যিয়াদ নামক 'রাবী'র সূত্রে বর্ণনা করলেন যে, কুরাইব তাকে বলেছেন, ইবনু আব্বাস তাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডানে দাঁড়ান এবং তিনি তাঁকে বামে দাঁড় করিয়ে দেন। এরপর তিনি ইয়াযিদের উস্তাদ 'কুরাইবের' অন্যান্য ছাত্রদের বর্ণনার সাথে তা মেলালেন। কুরাইবের অন্য তিন জন প্রসিদ্ধ ছাত্র মাখরামাহ, সালামা ও সালিমের বর্ণনা ইয়াযিদের বর্ণনার বিপরীত। তাঁরা তিন জনেই বলছেন যে, কুরাইব বলেছেন, ইবনু আব্বাস বামে দাঁড়িয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ডানে দাঁড় করান। এতে প্রমাণিত হলো যে, ইয়াযিদ ইবনু আবী যিয়াদ হাদীসটি মুখস্থ রাখতে পারেন নি।

ইমাম মুসলিম এখানেই থামেন নি। তিনি এরপর কুরাইব ছাড়াও ইবনু আব্বাসের অন্য ৫ জন ছাত্র: সাঈদ ইবনু জুবাইর, আতা ইবনু আবী রাবাহ, আবু নুদরাহ, শা'বী ও ইকরিমাহ থেকে হাদীসটির বিবরণ সংকলিত করে তার সাথে উপরের বর্ণনাটির তুলনা করলেন। এ ৫ জনের বর্ণনাও প্রমাণ করে যে, ইয়াযিদ ইবনু আবী যিয়াদ হাদীসটির ভুল বর্ণনা দিয়েছেন। এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, ইবনু আব্বাস তাঁর সকল ছাত্রকে বলেছেন যে, তিনি প্রথমে বামে দাঁড়িয়েছিলেন, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ডানে দাঁড় করিয়ে দেন। ইবনু আব্বাসের সকল ছাত্রের ন্যায় কুরাইবও তাঁর ছাত্রদেরকে এ কথায় বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু ইয়াযিদ তাঁর স্মৃতির দুর্বলতার কারণে হাদীসটি ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন।

এরূপ ব্যাপক তুলনা ও নিরীক্ষা মুহাদ্দিসগণ প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রে করতেন। হাদীস ও রাবীর বিধান বর্ণনায় তাঁদের প্রতিটি মতামতই এরূপ গভীর ও ব্যাপক তুলনা ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রদত্ত।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের মিশরের একজন প্রসিদ্ধ আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন আবু আব্দুর রাহমান আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'য়াহ ইবনু উক্বা আল-হাদরামী আল-গাফিকী (১৭৪ হি)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন এবং অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর বর্ণিত সকল হাদীস তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে দেখতে পেয়েছেন যে, তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুলের পরিমাণ খুবই বেশি। নাকিদ মুহাদ্দিসগণ তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো তাঁর কাছে থেকে বা তাঁর ছাত্রদের কাছে থেকে সংকলিত করেছেন। এরপর তিনি যেসকল উস্তাদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের অন্যান্য ছাত্রদের থেকে হাদীসগুলো সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। এরপর এ সকল বর্ণনার সনদ ও মতনের তারতম্য দেখতে পেয়ে 'ইবনু লাহীয়াহ'-কে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনু লাহীয়াহ-এর মারাত্মক ভুলের উদাহরণ হিসাবে ইমাম মুসলিম বলেন: আমাদেরকে যুহাইর ইবনু হারব বলেছেন, আমাদেরকে ইসহাক ইবনু ঈসা বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু লাহীয়াহ বলেছেন, মূসা ইবনু উকবাহ (১৪১ হি) আমার কাছে লিখে পাঠিয়েছেন, আমাকে বুসর ইবনু সাঈদ বলেছেন, যাইদ ইবনু সাবেত (রা) থেকে, তিনি বলেছেন:

اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের মধ্যে হাজামত করেন বা সিংগার মাধ্যমে দেহ থেকে রক্ত বের করেন।" ইবনু লাহীয়াহর ছাত্র ইসহাক ইবনু ঈসা বলেন: আমি ইবনু লাহীয়াহকে বললাম: তাঁর বাড়ীর মধ্যে কোনো নামাযের স্থানে? তিনি বলেন: মসজিদে নাবাবীর মধ্যে।"

ইমাম মুসলিম বলেন: হাদীসটির বর্ণনা সকল দিক থেকে বিকৃত। এর সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল হয়েছে। ইবনু লাহীয়াহ এর মতনের শব্দ বিকৃত করেছেন এবং সনদে ভুল করেছেন। এ হাদীসের সহীহ বিবরণ আমি উল্লেখ করছি।

আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম বলেন, আমাদেরকে বাহয ইবনু আসাদ বলেন, আমাদেরকে উহাইব ইবনু খালিদ ইবনু আজলান (১৬৫ হি) বলেন, আমাকে মূসা ইবনু উকবাহ বলেন, আমি আবুন নাদর সালিম ইবনু আবু উমাইয়াহ (১২৯ হি)- কে বলতে শুনেছি, তিনি বুসর ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি যাইদ ইবনু সাবিত থেকে বলেছেন:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى ... فِيهَا لَيَالِيَ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদের মধ্যে চাটাই দিয়ে একটি ছোট ঘর বানিয়ে তার মধ্যে কয়েক রাত সালাত আদায় করেন.... ।"

ইমাম মুসলিম বলেন: "আমাকে মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আবী হিনদ আল-ফারাযী (১৪৫ হি) বলেছেন, আমাদেরকে আবুন নাদর সালিম বলেছেন, তিনি বুসর ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি যাইদ ইবনু সাবিত থেকে, তিনি বলেন:

احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُجَيْرَةً بِخَصَفَةٍ أَوْ حَصِيرٍ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চাটাই দিয়ে মসজিদের মধ্যে একটি ঘর বানিয়ে নেন... ।"

ইমাম মুসলিম বলেন: এভাবে আমরা সঠিক বর্ণনা পাচ্ছি উহাইব ইবনু খালিদ (১৬৫ হি) থেকে মূসা ইবনু উকবাহ থেকে, আবুন নাদর থেকে। এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আবী হিনদ আল-ফারাযী (১৪৫ হি) দ্বিতীয় সূত্রে আবুন নাদর থেকে যে বর্ণনা করেছেন তাও উল্লেখ করলাম। ইবন লাহিয়াহ এখানে হাদীসের মতন বর্ণনায় ভুল করেছেন তার কারণ তিনি হাদীসটি মূসার কাছ থেকে স্বকর্ণে শুনেন নি। শুধুমাত্র লিখে পাঠানো পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেছেন, যা তিনি উল্লেখ করেছেন। (এজন্য তিনি احتجر বা ঘর বানিয়েছেন শব্দটিকে احتجم বা রক্ত বের করেছেন বলে পড়েছেন।) যারা মুহাদ্দিসের নিজের মুখ থেকে স্বকর্ণে না শুনে বা মুহাদ্দিসকে নিজে পড়ে না শুনিয়ে শুধুমাত্র লিখিত পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে হাদীস বর্ণনা করেন তাদের সকলের ক্ষেত্রেই আমরা এ বিকৃতির ভয় পাই।

আর সনদের ভুল হলো, মূসা ইবনু উকবাহ হাদীসটি আবুন নাদর সালিম-এর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। আবুন নাদর হাদীসটি বুসর ইবনু সাঈদ থেকে শিখেছেন। কিন্তু ইবনু লাহিয়াহ সনদ বর্ণনায় আবুন নাদর- এর নাম উল্লেখ না করে বলেছেন: মূসা হাদীসটি বুসর থেকে শুনেছেন।[১৬৩]

এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম মুসলিম দুই পর্যায়ে তুলনা করেছেন। প্রথমত ইবনু লাহীয়াহর উস্তাদ মূসার অন্য ছাত্র উহাইবের বর্ণনার সাথে ইবনু লাহীয়ার বর্ণনার তুলনা করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে মূসার উস্তাদ আবনু নাদরের অন্য ছাত্রের বর্ণনার সাথে মূসার দুই ছাত্রের বর্ণনার তুলনা করেছেন। উভয় বর্ণনা প্রমাণ করেছে যে, ইবনু লাহিয়াহ সনদ বর্ণনায় ও মতন উল্লেখে মারাত্মক ভুল করেছেন।

### ৪. ৬. ৬. বিভিন্ন সময়ের বর্ণনার তুলনা

সাক্ষ্য বা বক্তব্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের অন্যতম পদ্ধতি বর্ণনাকারীকে বিভিন্ন সময়ে একই বিষয়ে প্রশ্ন করা। এ পদ্ধতি সাহাবীগণ ব্যবহার করতেন হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণনার নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণও এ পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। এখানে ২ টি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

১. উমাইয়া শাসক মারওয়ান ইবনুল হাকাম (৬৫ হি) এর সেক্রেটারী আবুয যুআইযাহ বলেন, একদিন মারওয়ান আমাকে বলেন: আবু হুরাইরাহ (রা) কে ডেকে আনাও। আবু হুরাইরা উপস্থিত হলে তিনি আবু হুরাইরাকে বিভিন্ন বিষয়ে হাদীস জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আর আমাকে পর্দার আড়ালে বসে সেগুলো লিখতে নির্দেশ দিলেন। এরপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে মারওয়ান পুনরায় আবু হুরাইরাকে ডেকে পাঠান এবং আমাকে পর্দার আড়ালে আগের বছরে লেখা পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসতে বলেন। তিনি আবু হুরাইরাকে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে আবারো প্রশ্ন করেন এবং আবু হুরাইরা গত বছরে বলা হাদীসগুলো পুনরায় বলেন। আমি মিলিয়ে দেখলাম যে, তিনি একটুও কমবেশি করেন নি বা কোনো শব্দ আগে পিছেও করেন নি।[১৬৪]

২.উমারাহ ইবনুল কা'কা বলেন, আমাকে ইবরাহীম নাখয়ী (৯৬ হি) বলেন: তুমি আমাকে আবু যুর'আ ইবনু আমর ইবনু জারীর থেকে হাদীস বর্ণনা কর। আবু যুর'আর নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ হলো, আমি তাকে একটি হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করি। এরপর দুই বছর পরে আমি তাকে হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। দ্বিতীয়বার তিনি হুবহু প্রথম বারের মতই বর্ণনা করেন, একটি অক্ষরও বেশিকম করেন নি।"[১৬৫]

### ৪. ৬. ৭. স্মৃতি ও শ্রুতির সাথে পাণ্ডুলিপির তুলনা

আমরা দেখেছি যে, তাবিয়ীগণের যুগ থেকে 'রাবী' ও মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা করা হাদীসগুলো পৃথকভাবে পাণ্ডুলিপি আকারে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতেন। তাঁরা পাণ্ডুলিপির সাথে মুখস্থ বর্ণনার তুলনা করে নির্ভুলতা যাচাই করতেন। প্রয়োজনে তাঁরা পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর, কালি ইত্যাদি পরীক্ষা করতেন। এখানে বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণের কয়েকটি নযির উল্লেখ করছি।

(১) দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন মুহাদ্দিস খলীফা ইবনু মূসা বলেন, আমি গালিব ইবনু উবাইদুল্লাহ আল-জাযারী নামক একজন মুহাদ্দিসের কাছে হাদীস শিক্ষা করতে গমন করি। তিনি আমাদেরকে হাদীস লেখাতে শুরু করে তার পাণ্ডুলিপি দেখে বলতে

থাকেন: আমাকে মাকহূল (১১৫ হি) বলেছেন..., আমাকে মাকহূল বলেছেন ...., এভাবে তিনি মাকহূলের সূত্রে হাদীস লেখাতে থাকেন। এমন সময় তাঁর পেশাবের বেগ হয় তিনি উঠে যান। তখন আমি তার পাণ্ডুলিপির মধ্যে নযর করে দেখি সেখানে লেখা রয়েছে: আমাকে আবান ইবনু আবী আইয়াশ (১৪০ হি) বলেছেন, আনাস থেকে, আবান বলেছেন, অমুক থেকে...। তখন আমি তাকে পরিত্যাগ করে সেখান থেকে উঠে আসলাম।[১৬৬]

অর্থাৎ, এ রাবী তার হাদীসগুলো আবানের কাছ থেকে শুনেছেন ও লিখেছেন। তবে আবান মুহাদ্দিসগণের কাছে দুর্বল বলে ও অনির্ভরযোগ্য বলে পরিচিত। এজন্য তিনি হাদীস পড়ার সময় তার নাম বাদ দিয়ে প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মাকহূলের নামে হাদীসগুলো বলছিলেন। খলীফা সুযোগ পেয়ে তার মুখের বর্ণনার সাথে লিখিত পাণ্ডুলিপির তুলনা করে তার জালিয়াতি ধরে ফেলেন।

(২) দ্বিতীয় শতকের নাকিদ ইমাম, আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী (১৯৮ হি) বলেন, একদিন সুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি) একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: হাদীসটি আমাকে বলেছেন হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান (১২০ হি), তিনি আমর ইবনু আতিয়্যাহ আত-তাইমী (মৃত্যু ১০০ হিজরীর কাছাকাছি) নামক তাবিয়ী থেকে তিনি সালমান ফারিসী (৩৪ হি) থেকে।

আব্দুর রাহমান বলেন: আমি বললাম: হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান তো এ হাদীস রিবয়ী ইবনু হিরাশ (১০০ হি) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সালমান ফারিসী থেকে। (অর্থাৎ, আপনার সনদ বর্ণনায় ভুল হয়েছে, হাম্মাদের উস্তাদ আমর ইবনু আতিয়াহ নয়, বরং রিবয়ী ইবনু হিরাশ।) সুফিয়ান সাওরী বলেন: এ সনদ কে বলেছেন? আমি বললাম: আমাকে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (১৬৭ হি) বলেছেন, তিনি হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান থেকে এ সনদ উল্লেখ করেছেন। সুফিয়ান বললেন: আমি যা বলছি তাই লিখ। আমি বললাম: শু'বা ইবনুল হাজ্জাজও (১৬০ হি) আমাকে এই সনদ বলেছেন। তিনি বললেন: আমি যা বলছি তাই লিখ। আমি বললাম: হিশাম দাসতুআয়ীও (১৫৪ হি) আমাকে এ সনদ বলেছেন। তিনি বললেন: হিশাম? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন: আমি যা বলছি তাই লিখ। আমি হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি আমর ইবনু আতিয়্যাহ থেকে হাদীসটি শুনেছেন।

আব্দুর রাহমান বলেন: আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, এখানে সুফিয়ান সাওরী ভুল করলেন। অনেকদিন যাবত আমি এ ধারণা পোষণ করে থাকলাম যে, এ সনদ বলতে সাওরী ভুল করলেন। এরপর একদিন আমি আমার উস্তাদ মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার গুনদার (১৯৩ হি) এর মাধ্যমে শু'বা ইবনুল হাজ্জাজের যে হাদীসগুলো শুনেছিলাম সেগুলোর লিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে দেখলাম যে, শু'বা বলেছেন, আমাকে হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান বলেছেন, তাকে রিবয়ী ইবনু হিরাশ বলেছেন, সালমান ফারিসী থেকে। শু'বা বলেন: হাম্মাদ একবার বলেন যে, তিনি আমর ইবনু আতিয়্যাহ থেকে হাদীসটি শুনেছেন।

আব্দুর রহমান বলেন: পাণ্ডুলিপি দেখার পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, সুফিয়ান সাওরী ঠিকই বলেছিলেন। তাঁর নিজের মুখস্থের বিষয়ে তাঁর গভীর আস্থা থাকার কারণে অন্যান্যদের বিরোধিতাকে তিনি পাত্তা দেন নি।[১৬৭]

(৩) দ্বিতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) বলেন, যদি মুহাদ্দিসগণ শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (১৬০) থেকে বর্ণিত হাদীসের সঠিক বর্ণনার বিষয়ে মতভেদ করেন তাহলে মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার গুনদার (১৯৩ হি) এর পাণ্ডুলিপিই তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফাইসালা করবে। গুনদার-এর পাণ্ডুলিপির বর্ণনাই সঠিক ও নির্ভুল বলে গৃহীত হবে।[১৬৮]

(৪) তৃতীয় শতকের তিনজন মুহাদ্দিস, মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু উসমান আর-রাযী (২৭০ হি), ফাদল ইবনু আব্বাস ও আবু যুরু'আ রাযী উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল কারীম (২৬৪ হি) একত্রে বসে হাদীস আলোচনা করছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম একটি হাদীস বলেন যাতে ফাদল আপত্তি উঠান। তিনি অন্য একটি বর্ণনা বলেন। দুজনের মধ্যে হাদীসটির বিষয়ে বচসা হয়। তাঁরা তখন আবু যুরআকে সালিস মানেন। আবু যুরআ মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম চাপাচাপি করতে থাকেন। তিনি বলেন: আপনার নীরবতার কোনো অর্থ নেই। আমার ভুল হলে তাও বলেন। আর তাঁর ভুল হলে তাও বলেন। আবু যুর'আ তখন তার পাণ্ডুলিপি আনতে নির্দেশ দেন। তিনি ছাত্র আবুল কাসিমকে বলেন, তুমি গ্রন্থাগারে ঢুকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারি বাদ দেবে। এরপরের সারির বই গুণে প্রথম থেকে ১৬ খণ্ড পাণ্ডুলিপি রেখে ১৭ তম খণ্ডটি নিয়ে এস। তিনি পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে এসে আবু যুরআকে প্রদান করলেন। আবু যুরআ পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকেন এবং একপর্যায়ে হাদীসটি বের করেন। এরপর তিনি পাণ্ডুলিপিটি মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিমের হাতে দেন। মুহাম্মাদ পাণ্ডুলিপিতে সংকলিত হাদীসটি পড়ে বলেন: হ্যাঁ, তাহলে আমারই ভুল হয়েছে। আর ভুল তো হতেই পারে।"[১৬৯]

(৫) তৃতীয় হিজরীর একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুর রাহমান ইবনু উমার আল-ইসপাহানী রুস্তাহ (২৫০ হি)। তিনি একদিন হাদীসের আলোচনাকালে আবু যুরআ রাযী (২৬৪ হি) ও আবু হাতিম রাযী মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (২৭৭ হি) উভয়ের উপস্থিতিতে একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন: আমাদেরকে আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী বলেছেন, তিনি সুফিয়ান সাওরী থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে তিনি আবু হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যোহরের সালাত ঠাণ্ডা করে আদায় করবে; কারণ উত্তাপের কাঠিন্য জাহান্নামের প্রশ্বাস থেকে।"। একথা শুনেই প্রতিবাদ করেন আবু যুর'আ রাযী। তিনি বলেন: আপনি (তাবিয়ী আবু সালিহ-এর উস্তাদ

সাহাবীর নাম আবু হুরাইরা উল্লেখ করে) ভুল বললেন। সকলেই তো হাদীসটি (তাবিয়ী আবু সালিহ-এর মাধ্যমে) সাহাবী আবু সাঈদ খুদরীর সূত্রে বর্ণনা করেন। কথাটি আব্দুর রাহমানের মনে খুবই লাগে। তিনি বাড়ি ফিরে নিজের কাছে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে আবু যুরআর কাছে চিঠি লিখে বলেন: "আমি আপনাদের উপস্থিতিতে একটি হাদীস আবু হুরাইরার সূত্রে বর্ণনা করেছিলাম। আপনি বলেছিলেন যে, আমার বর্ণনা ভুল, সবাই হাদীসটি আবু সাঈদের সূত্রে বর্ণনা করেন। কথাটি আমার মনে খুবই আঘাত করেছিল। আমি বিষয়টি ভুলতে পারি নি। আমি বাড়িতে ফিরে আমার নিকট সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখেছি। সেখানে দেখলাম যে হাদীসটি আবু সাঈদের সূত্রেই বর্ণিত। যদি আপনার কষ্ট না হয় তাহলে আবু হাতিম ও অন্য সকল বন্ধুকে জানিয়ে দেবেন যে, আমার ভুল হয়েছিল। আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন। ভুল স্বীকার করে লজ্জিত হওয়া (ভুল গোপন করে) জাহান্নামে পোড়ার চেয়ে উত্তম।"[১৭০]

(৬) তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস সুলাইমান ইবনু হারব (২২৪ হি) বলেন: আমি যখন আমার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ 'নাকিদ' মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনু মা'য়ীন (২৩৩ হি) এর সাথে বিভিন্ন হাদীস আলোচনা করতাম, তখন তিনি মাঝে মাঝে বলতেন: এ হাদীসটি ভুল। আমি বলতাম: এর সঠিক রূপ কি হবে? তিনি বলতেন তা জানি না। তখন আমি আমার পাণ্ডুলিপি দেখতাম। আমি দেখতে পেতাম যে, তাঁর কথাই ঠিক। হাদীসগুলো পাণ্ডুলিপিতে অন্যভাবে লিখা রয়েছে।[১৭১]

(৭) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি) কে প্রশ্ন করা হয়: আবুল ওয়ালীদ কি পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্য? তিনি বলেন: না। তার পাণ্ডুলিপিগুলিতে নোকতা দেওয়া ছিল না এবং হরকত দেয়া ছিল না। তবে তিনি শু'বা ইবনুল হাজ্জাজের কাছ থেকে যে হাদীসগুলো শুনেছিলেন ও লিখেছিলেন সেগুলো তিনি বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৭২]

(৮) তৃতীয় শতকের একজন হাদীস বর্ণনাকারী ইয়াকূব ইবনু হুমাইদ ইবনু কাসিব (২৪০ হি)। ইমাম আবু দাউদ (২৭৫ হি) বলেন, ইয়াকূব- এর বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে অনেক হাদীস দেখতে পেলাম যেগুলো অন্য কেউ এভাবে বর্ণনা করেন না। এজন্য আমরা তাকে তার মূল পাণ্ডুলিপিগুলি দেখাতে অনুরোধ করি। তিনি কিছুদিন যাবত আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করেন। এরপর তিনি তার পাণ্ডুলিপি বের করে আমাদেরকে দেখান। আমরা দেখলাম তার পাণ্ডুলিপিতে অনেক হাদীস নতুন তাজা কালি দিয়ে লেখা। পুরাতন লিখা ও নতুন লিখার মধ্যে পার্থক্য ধরা পড়ে। আমরা দেখলাম অনেক হাদীসের সনদের মধ্যে রাবীর নাম ছিল না, তিনি সেখানে নতুন করে রাবীর নাম বসিয়েছেন। কোনো কোনো হাদীসের ভাষার মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ বা বাক্য যোগ করেছেন। এজন্য আমরা তার হাদীস গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকি।[১৭৩]

(৯) ৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আবু আহমাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আদী (৩৬৫ হি) বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আশ'আশ নামক এক ব্যক্তি মিশরে বসবাস করতেন এবং হাদীস বর্ণনা করতেন। আমি হাদীস সংগ্রহের সফরকালে মিশরে তার কাছে গমন করি। তিনি আমাদেরকে একটি পাণ্ডুলিপি বের করে দেন। পাণ্ডুলিপিটির কালি তাজা এবং কাগজও নতুন। এতে প্রায় এক হাজার হাদীস ছিল, যেগুলো তিনি আলী (রা)-এর বংশধর মূসা ইবনু ইসমাঈল ইবনু মুসা ইবনু জা'ফার সাদিক ইবনু মুহাম্মাদ বাকির ইবনু যাইনুল আবিদীন ইবনু হুসাইন ইবনু আলী থেকে তাঁর পিতা-পিতামহদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন বলে দাবী করেন। এর প্রায় সকল হাদীসই অজ্ঞাত, অন্য কেউ এ সনদে বা অন্য কোনো সনদে তা বর্ণনা করেনি। কিছু হাদীসের শব্দ বা মতন অন্যান্য সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়, তবে এই সনদে নয়। তখন আমি সনদে উল্লিখিত মুসা ইবনু ইসমাঈল সম্পর্কে আলী-বংশের সমকালীন অন্যতম নেতা হুসাইন ইবনু আলীকে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন: এই মূসা ৪০ বছর যাবত মদীনায় আমার প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি কখনোই কোনোদিন বলেন নি যে, তিনি তাঁর পিতা-পিতামহদের সূত্রে বা অন্য কোনো সূত্রে কোনো হাদীস তিনি শুনেছেন বা বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন: এ পাণ্ডুলিপির হাদীসগুলোর কোনো ভিত্তি আমরা খুজে পাই নি। এগুলো তিনি বানিয়েছিলেন বলে বুঝা যায়।[১৭৪]

### ৪. ৭. নিরীক্ষার ভিত্তিতে হাদীসের প্রকারভেদ

নিরীক্ষার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে মূলত তিনভাগে ভাগ করেছেন: সহীহ বা বিশুদ্ধ, হাসান বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ও যয়ীফ বা দুর্বল। যয়ীফ হাদীস দুর্বলতার কারণ ও পর্যায়ের ভিত্তিতে বিভিন্নভাগে বিভক্ত।

এখানে সাধারণ পাঠকের অনুধাবনের জন্য সহজ ব্যাখ্যার চেষ্টা করব। মনে করুন একজন বিচারক একজন হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত সাক্ষ্য প্রমাণাদি নিরীক্ষা করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, সে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঠাণ্ডা মাথায় এক ব্যক্তিকে খুন করেছে। প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে তিনি সাম্ভাব্য ৪ প্রকার রায় প্রদান করতে পারেন: ১. মৃত্যুদণ্ড, ২. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৩. কয়েক বছরের কারাদণ্ড বা ৪. বেকসুর খালাস। মোটামুটিভাবে হাদীসের নির্ভরতার ক্ষেত্রেও এ পর্যায়গুলো রয়েছে।

#### ৪. ৭. ১. সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীস

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদীসের মধ্যে ৫টি শর্ত বিদ্যমান তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়: (১) 'আদালত': হাদীসের সকল রাবী

পরিপূর্ণ সৎ বলে প্রমাণিত, (২) 'যাবত': সকল রাবীর 'নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা' পূর্ণরূপে বিদ্যমান বলে প্রমাণিত, (৩)'ইত্তিসাল': সনদের প্রত্যেক রাবী তাঁর উর্ধ্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেছেন বলে প্রমাণিত, (৪) 'শুযূয মুক্তি': হাদীসটি অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনার বিপরীত নয় বলে প্রমাণিত এবং (৫) 'ইল্লাত মুক্তি': হাদীসটির মধ্যে সুক্ষ্ম কোনো সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি নেই বলে প্রমাণিত।[১৭৫]

প্রথম তিনটি শর্ত সনদ কেন্দ্রিক ও শেষের দুটি শর্ত মূলত অর্থ কেন্দ্রিক। এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক। তবে সাধারণ পাঠকের জন্য আমরা বলতে পারি যে, প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির বিষয়ে যতটুকু নিশ্চয়তা অনুভব করলে একজন বিচারক মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারেন, বর্ণিত হাদীসটি সত্যিই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন বলে অনুরূপভাবে নিশ্চিত হতে পারলে মুহাদ্দিসগণ তাকে "সহীহ" বা বিশুদ্ধ হাদীস বলে গণ্য করেন। নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সকল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস এ মানের নির্ভুল বা সহীহ বলে গণ্য করা হয় তাদের নির্ভরযোগ্যতা বুঝাতে মুহাদ্দিসগণ আরবীতে (ثقة، ثبت، حجة): নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন।

### ৪. ৭. ২. 'হাসান' অর্থাৎ 'সুন্দর' বা গ্রহণযোগ্য হাদীস

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাসান হাদীসের মধ্যেও উপর্যুক্ত ৫টি শর্তের বিদ্যমানতা অপরিহার্য। তবে দ্বিতীয় শর্তের ক্ষেত্রে যদি সামান্য দুর্বলতা দেখা যায় তবে হাদীসটিকে 'হাসান' বলা হয়। অর্থাৎ হাদীসের সনদের রাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে সৎ, প্রত্যেকে হাদীসটি উর্ধ্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে শুনেছেন বলে প্রমাণিত, হাদীসটির মধ্যে 'শুযূয' ও 'ইল্লাত' নেই। তবে সনদের কোনো রাবীর 'নির্ভুল বর্ণনা'র ক্ষমতা বা 'যাবত' কিছুটা দুর্বল বলে বুঝা যায়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এরূপ 'রাবী'র বর্ণিত হাদীস 'হাসান' বলে গণ্য।[১৭৬]

পরিভাষার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক। তবে সাধারণ পাঠকের জন্য আমরা বলতে পারি যে, যে পর্যায়ের প্রমাণাদির ভিত্তিতে একজন বিচারক খুনের অভিযোগে অভিযুক্তকে দীর্ঘ মেয়াদী শাস্তি দেন, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন শাস্তি প্রদান করেন না, সে পর্যায়ের প্রমাণাদির ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ একটি হাদীসকে 'হাসান' বলে গণ্য করেন। যে সকল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস "হাসান" বা গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বুঝাতে মুহাদ্দিসগণ আরবীতে (صدوق، لا بأس به، شيخ، صالح الحديث) সত্যপরায়ণ, অসুবিধা নেই, চলনসই ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন।

### ৪. ৭. ৩. 'যয়ীফ' বা দুর্বল হাদীস

যে 'হাদীসের' মধ্যে হাসান হাদীসের শর্তগুলোর কোনো একটি শর্ত অবিদ্যমান দেখা যায়, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তাকে 'যয়ীফ' হাদীস বলা হয়। অর্থাৎ রাবীর বিশ্বস্ততার ঘাটতি, তাঁর বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা বা স্মৃতির ঘাটতি, সনদের মধ্যে কোনো একজন রাবী তাঁর উর্ধ্বতন রাবী থেকে সরাসরি ও স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেননি বলে প্রমাণিত হওয়া বা দৃঢ় সন্দেহ হওয়া, হাদীসটির মধ্যে 'শুযূয' অথবা 'ইল্লাত' বিদ্যমান থাকা... ইত্যাদি যে কোনো একটি বিষয় কোনো হাদীসে মধ্যে থাকলে হাদীসটি যয়ীফ বলে গণ্য।[১৭৭]

শর্ত পাঁচটির ভিত্তিতে 'যয়ীফ' হাদীসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন মুহাদ্দিসগণ। সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক। তবে আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো হাদীসকে 'যয়ীফ' বলে গণ্য করার অর্থ হলো, হাদীসটি 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয় বলেই প্রতীয়মান হয়। বর্ণনাকারীগণের দুর্বলতা বুঝাতে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন ( ضعيف، ليس بشيء، لا يعرف، منكر الحديث، متروك، كذاب): দুর্বল, কিছুই নয়, মূল্যহীন, অজ্ঞাত পরিচয়, জঘন্য উল্টোপাল্টা হাদীস বর্ণনাকারী, পরিত্যক্ত, মিথ্যাবাদী, ইত্যাদি।

"যয়ীফ" বা দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার তিনটি পর্যায় রয়েছে:

#### ৪. ৭. ৩. ১. কিছুটা দুর্বল

বর্ণনাকারী ভুল বলেছেন বলেই প্রতীয়মান হয়, কারণ তিনি যতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে বেশ কিছু ভুল রয়েছে। তবে তিনি ইচ্ছা করে ভুল বলতেন না বলেই প্রমাণিত। এরূপ "যয়ীফ" হাদীস যদি অন্য এক বা একাধিক এ পর্যায়ের "কিছুটা" যয়ীফ সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে তা "হাসান" বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বলে গণ্য হয়।

#### ৪. ৭. ৩. ২. অত্যন্ত দুর্বল (যায়ীফ জিদ্দান, ওয়াহী)

এরূপ হাদীসের বর্ণনাকারীর সকল হাদীস তুলনামূলক নিরীক্ষা করে যদি প্রমাণিত হয় যে, তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ বা প্রায় সকল হাদীসই অগণিত ভুলে ভরা, যে ধরনের ভুল সাধারণত অনিচ্ছাকৃতভাবে হয় তার চেয়েও মারাত্মক ভুল, তবে তার বর্ণিত হাদীস "পরিত্যক্ত", একেবারে অগ্রহণযোগ্য বা অত্যন্ত দুর্বল বলে গণ্য করা হবে। এরূপ দুর্বল হাদীস অনুরূপ অন্য দুর্বল সুত্রে বর্ণিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

### ৪. ৭. ৩. ৩. মাউযূ বা বানোয়াট হাদীস

যদি প্রমাণিত হয় যে এরূপ দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে বানোয়াট কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে সমাজে প্রচার করতেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীসের সূত্র (সনদ) বা মূল বাক্যের মধ্যে কমবেশি করতেন, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে "মাওযূ" বা বানোয়াট হাদীস বলে গণ্য করা হয়। বানোয়াট হাদীস জঘন্যতম দুর্বল হাদীস।[১৭৮]

### ৪. ৮. গ্রন্থাকারে হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

জালিয়াতি ও মিথ্যা থেকে হাদীস হেফাযতের জন্য মুহাদ্দিসগণের অন্যতম কর্ম ছিল গ্রন্থাকারে সনদসহ সকল হাদীস সংকলন করা। আমরা দেখেছি যে, তাবিয়ীগণের যুগ বা প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই শিক্ষা, মুখস্থ ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হাদীস লিখে রাখার প্রচলন ছিল। তবে নির্দিষ্ট নিয়মে গ্রন্থাকারে হাদীস সংকলন শুরু হয় দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে। তৃতীয় হিজরী শতকে এ কর্ম পূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তী দুই শতাব্দীতেও সনদসহ হাদীস সংকলনের ধারা চালু থাকে এবং কিছু গ্রন্থ সংকলিত হয়। প্রত্যেক যুগের মুহাদ্দিসগণ পূর্ববর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণের সংকলিত হাদীসগুলো সনদসহ সংকলিত করেন। এছাড়া তাঁরা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সফর ও হাদীস সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কথিত সকল 'হাদীস' সংগ্রহ ও সনদ-সহ সংকলিত করেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এসকল গ্রন্থ সংকলিত হয়:

১. সনদসহ প্রচলিত সকল হাদীস সংকলন করা।
২. শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীস সংকলন করা।
৩. বর্ণনাকারীদের বিবরণসহ তাদের বর্ণিত হাদীস সংকলন করা।
৪. শুধুমাত্র অনির্ভরযোগ্য বা বানোয়াট হাদীস সংকলন করা।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় ৪ শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস সংকলনের যে ধারা চালু থাকে এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে কথিত ও প্রচারিত সকল হাদীস সংকলিত করা। যাতে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষাভিত্তিক বিধানের আলোকে এগুলোর মধ্য থেকে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হাদীস বেছে নিতে পারেন। অনেকে বর্ণনাকারী রাবী বা বর্ণনাকারী সাহাবীর নামের ভিত্তিতে হাদীস সংকলন করতেন। কেউ বা বিষয়ভিত্তিক হাদীস সংকলন করতেন। সবারই মূল উদ্দেশ্য ছিল হাদীস নামে প্রচলিত সব কিছু সংকলিত করা।

এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থে সহীহ, যয়ীফ, মাউযূ সকল প্রকারের হাদীস সংকলিত হয়েছে। এখানে অজ্ঞতার কারণে অনেকে ভুল ধারণার কবলে পড়েন। উপরের পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচিত সাহাবী ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসদের হাদীস বিচার, সনদ যাচাই, নিরীক্ষা ইত্যাদি থেকে অনেকে মনে করেন যে, মুহাদ্দিসদের এসকল বিচার ও নিরীক্ষার মাধ্যমে যাদের ভুল বা মিথ্যা ধরা পড়েছে তাদের হাদীস তো তারা গ্রহণ করেন নি এবং সংকলনও করেন নি। কাজেই কোনো হাদীসের গ্রন্থে হাদীস সংকলনের অর্থ হলো এসকল হাদীস নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে বলেই উক্ত মুহাদ্দিস হাদীসগুলোকে তাঁর গ্রন্থে সংকলিত করেছেন।

এ ধারণাটি একেবারেই অজ্ঞতা প্রসূত এবং প্রকৃত অবস্থার একেবারেই বিপরীত। কয়েকজন সংকলক বাদে কোনো সংকলকই শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করেন নি। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, মুফাসসির, আলিম ও ইমাম হাদীস সংকলন করেছেন সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট সকল প্রকার হাদীস সনদসহ একত্রিত করার উদ্দেশ্যে; যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কথিত বা প্রচারিত সবকিছুই সংরক্ষিত হয়। তাঁরা কোনো হাদীসই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বা কাজ হিসাবে সরাসরি বর্ণনা করেননি। বরং সনদসহ, কে তাদেরকে হাদীসটি কার সূত্রে বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা মূলত বলেছেন : "অমুক ব্যক্তি বলেছেন যে, 'এ কথাটি হাদীস', আমি তা সনদসহ সংকলিত করলাম"। হাদীস প্রেমিক পাঠকগণ এবার সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট বেছে নিন। এ সকল সংকলকের কেউ কেউ আবার হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে তার সনদের আলোচনা করেছেন এবং দুর্বলতা বা সবলতা বর্ণনা করেছেন।

অল্প কয়েকজন সংকলক শুধু সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (২৫৬ হি) ও ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (২৬১ হি) অন্যতম। তাঁদের পরে আব্দুল্লাহ ইবনু আলী ইবনুল জারূদ (৩০৭ হি), মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমা (৩১১ হি), আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ, ইবনুশ শারকী (৩২৫ হি), কাসিম ইবনু ইউসূফ আল-বাইয়ানী (৩৪০ হি), সাঈদ ইবনু উসমান, ইবনুস সাকান (৩৫৩ হি), আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুসতি (৩৫৪ হি), আবু আব্দুলাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুলাহ হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫ হি), যিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী (৬৪৩ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস শুধু সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেন।[১৭৯] কিন্তু পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসদের চুলচেরা নিরীক্ষার মাধ্যমে শুধুমাত্র বুখারী ও মুসলিমের গ্রন্থদ্বয়ের সকল হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাকী কোনো গ্রন্থেরই সকল হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয় নি। বরং কোনো কোনো গ্রন্থে যয়ীফ, বাতিল ও মিথ্যা হাদীস সংকলিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বাদশ হিজরী শতকের অন্যতম আলিম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১১৭৬হি/ ১৭৬২খৃ) হাদীসের গ্রন্থগুলোকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে তিনটি গ্রন্থ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক। এ গ্রন্থগুলোর সকল সনদসহ বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থগুলো মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও সেগুলোতে কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীসও রয়েছে। মোটামুটিভাবে মুসলিম উম্মাহ এসকল গ্রন্থকে গ্রহণ করেছেন ও তাদের মধ্যে এগুলো প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ পর্যায়ে রয়েছে তিনখানা গ্রন্থ: সুনানে আবী দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযী। ইমাম আহমদের মুসনাদও প্রায় এ পর্যায়ের।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ঐ সকল গ্রন্থ যা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসের আগের বা পরের যুগে সংকলিত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে বিশুদ্ধ, দুর্বল, মিথ্যা, ভুল সব ধরনের হাদীসই রয়েছে, যার ফলে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস ভিন্ন এসকল গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। এ সকল গ্রন্থ মুহাদ্দিসদের মধ্যে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। এ পর্যায়ে রয়েছে : মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, মুসনাদে আবদ ইবন হুমাইদ, মুসনাদে তায়ালিসী, ইমাম বাইহাকীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (সুনানে কুবরা, দালাইলুন নুবুওয়াত, শুয়াবুল ঈমান,... ইত্যাদি), ইমাম তাহাবীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (শারহ মায়ানীল আসার, শারহ মুশকিলিল আসার,... ইত্যাদি), তাবারানীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ (আল-মু'জামুল কবীর, আল-মু'জামুল আওসাত, আল-মু'জামুস সাগীর,... ইত্যাদি)। এ সকল গ্রন্থের সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল যা পেয়েছেন তাই সংকলন করা। তাঁরা নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের দিকে মন দেন নি।

চতুর্থ পর্যায়ের গ্রন্থগুলো হলো সে সকল গ্রন্থ যা কয়েক যুগ পরে সংকলিত হয়। এ সকল গ্রন্থের সংকলকরা মূলত নিম্ন প্রকারের হাদীস সংকলন করেছেন : (১). যে সকল 'হাদীস' পূর্ব যুগে অপরিচিত বা অজানা থাকার কারণে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়নি, (২). যে সকল হাদীস কোনো অপরিচিত গ্রন্থে সংকলিত ছিল, (৩). লোকমুখে প্রচলিত বা ওয়ায়েযদের ওয়াযে প্রচারিত বিভিন্ন কথা, যা কোনো হাদীসের গ্রন্থে স্থান পায় নি, (৪). বিভিন্ন দুর্বল ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কথাবার্তা, (৫). যে সকল 'হাদীস' মূলত সাহাবী বা তাবিয়ীদের কথা, ইহুদিদের গল্প বা পূর্ববর্তী যামানার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা, যেগুলোকে ভুলক্রমে বা ইচ্ছাপূর্বক কোনো বর্ণনাকারী হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৬). কুরআন বা হাদীসের ব্যাখ্যা জাতীয় কথা যা ভুলক্রমে কোনো সৎ বা দরবেশ মানুষ হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৭). হাদীস থেকে উপলব্ধিকৃত অর্থকে কেউ কেউ ইচ্ছাপূবক হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন, অথবা (৮). বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের বাক্যকে একটি হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। এধরনের হাদীসের সংকলন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইবন হিব্বানের আদ-দুয়াফা, ইবন আদীর আল-কামিল, খতীব বাগদাদী, আবু নুয়াইম আল-আসফাহানী, ইবন আসাকের, ইবনুন নাজ্জার ও দাইলামী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থসমূহ। খাওয়ারিজমী কর্তৃক সংকলিত মুসনাদ ইমাম আবু হানীফাও প্রায় এ পর্যায়ে পড়ে। এ পর্যায়ের গ্রন্থসমূহের হাদীস হয় দুর্বল অথবা বানোয়াট।

পঞ্চম পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে ঐসকল হাদীস রয়েছে যা ফকীহগণ, সূফীগণ বা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রচলিত ও তাঁদের লেখা বইয়ে পাওয়া যায়। যে সকল হাদীসের কোনো অস্তিত্ব পূর্বের চার পর্যায়ের গন্থে পাওয়া যায় না। এসব হাদীসের মধ্যে এমন হাদীসও রয়েছে যা কোনো ধর্মচ্যুত ভাষাজ্ঞানী পণ্ডিত পাপাচারী মানুষ তৈরি করেছেন। তিনি তার বানোয়াট হাদীসের জন্য এমন সনদ তৈরি করেছেন যার ত্রুটি ধরা দুঃসাধ্য, আর তার বানোয়াট হাদীসের ভাষাও এরূপ সুন্দর যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে সহজেই বিশ্বাস হবে। এ সকল বানোয়াট হাদীস ইসলামের মধ্যে সুদূর প্রসারী বিপদ ও ফিতনা সৃষ্টি করেছে। তবে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ হাদীসের ভাষা ও সূত্রের (সনদের) তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তার ত্রুটি খুঁজে বের করতে সক্ষম হন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন: প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থের উপরেই মুহাদ্দিসগণ নির্ভর করেছেন। তৃতীয় পর্যায়ের গ্রন্থসমূহ থেকে হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী রিজাল ও ইলাল শাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ ছাড়া কেউ উপকৃত হতে পারেন না, কারণ এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহের মধ্য থেকে মিথ্যা হাদীস ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের পার্থক্য শুধু তাঁরাই করতে পারেন। আর চতুর্থ পর্যায়ের হাদীসগ্রন্থসমূহ সংকলন করা বা পাঠ করা এক ধরনের জ্ঞান বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। সত্য বলতে, রাফেযী, মুতাযিলী ও অন্যান্য সকল বিদ'আতী ও বাতিল মতের মানুষেরা খুব সহজেই এসকল গ্রন্থ থেকে তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন হাদীস বের করে নিতে পারবেন। কাজেই, এ সকল গ্রন্থের হাদীস দিয়ে কোনো মত প্রতিষ্ঠা করা বা কোনো মতের পক্ষে দলীল দেয়া আলিমদের কাছে বাতুলতা ও অগ্রহণযোগ্য।[১৮০]

এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় এবং সহীহ হাদীসকে দুর্বল ও মাউযূ হাদীস থেকে পৃথক করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের দৃঢ়তা ছিল আপোষহীন ও অনমনীয়। দুনিয়ার বুকে কোনো যুগে কোনো ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ বা আলিম কখনো বলেন নি যে, কোনো হাদীসের গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত থাকলেই হাদীসকে সহীহ বলা যাবে। অমুক আলিম যেহেতু হাদীসটি সংকলন করেছেন, কাজেই হাদীসটি হয়ত সহীহ হবে।

তেমনিভাবে সংকলক যত মর্যাদাসম্পন্নই হোন, তাঁর সংকলিত কোনো হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা বা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার

সম্ভাবনা থাকলে তা সুস্পষ্টরূপে বলতে কোনো দ্বিধা তাঁরা কখনোই করেন নি। হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষাকে তাঁরা সকল ব্যক্তিগত ভালবাসা ও শ্রদ্ধার উপরে স্থান দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহর (ﷺ) হাদীসের নামে সকল মিথ্যা ও ভুল চিহ্নিত করে বিশুদ্ধ হাদীসকে ভুল ও মিথ্যা 'হাদীস' থেকে পৃথক রাখার এ প্রবল দৃঢ়তার কারণেই মুহাদ্দিসগণ কখনোই কারো দাবী বিনা যাচাইয়ে মেনে নেন নি। তাঁরা কখনোই মনে করেন নি যে, অমুক মহান ব্যক্তিত্ব যেহেতু হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন, সেহেতু তাঁর মতামত বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়া উচিত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ও উপরের সকল 'সহীহ' গ্রন্থে সংকলিত প্রতিটি হাদীসের সনদ পরবর্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিরীক্ষা পদ্ধতিতে বিচার ও যাচাই করেছেন। এ বিচারের মাধ্যমেই তাঁরা ঘোষণা দিয়েছেন যে, বুখারী ও মুসলিম তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সংকলিত সকল হাদীস 'সহীহ' বলে মেনে নেয়ার কারণ এ নয় যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসগুলোকে সহীহ বলেছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত মর্যাদা এখানে একেবারেই মূল্যহীন। প্রকৃত বিষয় হলো, তাঁরা হাদীসগুলোকে সহীহ বলে দাবী করেছেন এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে মুহাদ্দিসগণ তাঁদের সংকলিত হাদীসগুলোর সনদ যাচাই করেছেন এবং তাঁদের দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

অন্য আরো লেখক শুধু সহীহ অথবা সহীহ ও হাসান হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কেউ কেউ সহীহ ও যয়ীফ হাদীস সংকলন করবেন ও জাল বা মাউদূ হাদীস বাদ দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ তাঁদের দাবি কখনোই বিনা যাচাইয়ে মেনে নেন নি। বরং তাঁদের সংকলিত সকল হাদীস যাচাই করে তাদের গ্রন্থাবলির বিষয়ে বিধান প্রদান করেছেন। এ সকল যাচাইয়ে দেখা গিয়েছে যে, অধিকাংশ লেখক ও সংকলকই তাঁদের ঘোষণা ও সংকল্প পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারো দাবিই মুহাদ্দিসগণ বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ করেন নি।

### ৪. ৯. গ্রন্থাকারে রাবীগণের বিবরণ সংরক্ষণ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখি যে, দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে মুহাদ্দিসগণ সনদসহ সকল হাদীস সংকলন করেন, যেন সনদ পর্যালোচনা করে বিশুদ্ধ হাদীসকে মিথ্যা বা ভুল থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলনের পাশাপাশি রাবীগণের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক তথ্যাবলি গ্রন্থাকারে সংকলন করতে থাকেন; যেন এ সকল তথ্যের আলোকে হাদীসগ্রন্থগুলোতে সংকলিত হাদীসগুলোর সনদ বিচার করা যায়। এ জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়নেও ক্রম বিবর্তন ঘটে।

২য় হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে মুহাদ্দিসগণ প্রথমে নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য সকল বর্ণনাকারীর বিবরণ একত্রে সংকলন করতে শুরু করেন। ইমাম লাইস ইবনু সা'দ (১৭৫ হি), আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি থেকে এই জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু করেন। এসকল গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য, অনির্ভরযোগ্য, মিথ্যাবাদী সকল রাবীর জীবনী, তাদের বর্ণিত কিছু হাদীস ও তাদের বর্ণিত হাদীসের নিরীক্ষার ভিত্তিতে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক বিধান সংকলিত হয়েছে। পরবর্তী শতকগুলোতে এ প্রকারের গ্রন্থ রচনার ধারা অব্যাহত থাকে। তৃতীয় হিজরী শতকে আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আলী ইবনুল মাদীনী, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ,ও পরবর্তী যুগের অগণিত মুহাদ্দিস এ জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মুহাদ্দিসগণ শুধুমাত্র অনির্ভরযোগ্য ও মিথ্যাবাদী রাবীদের বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। দ্বিতীয় শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান (১৯৮ হি) সর্বপ্রথম 'আদ-দুআফা' নামে এ জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তী শতকগুলোতে এ জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়নের ধারা অব্যাহত থাকে। এ সকল গ্রন্থে দুর্বল ও মিথ্যাবাদী রাবীগণ, তাদের বর্ণিত কিছু হাদীস ও তাদের বিষয়ে ইমামদের মতামত সংকলন করা হয়েছে। এগুলোর পাশাপাশি তৃতীয় হিজরী শতক থেকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীদের বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা শুরু করেন।

বস্তুত, রাবীগণের বিবরণ সংগ্রহ ও সংকলন মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণের একটি অতুলনীয় কর্ম। প্রথম হিজরী শতাব্দী থেকে পরবর্তী ৬০০ বছর যাবত মুহাদ্দিসগণ মুসলিম দেশের প্রতিটি জনপদে ঘুরে প্রত্যেক রাবীর নাম, জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা, কর্ম, শিক্ষক, ছাত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগত সকল তথ্য সহ তাঁর বর্ণিত হাদীসের নিরীক্ষা ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে তার সম্পর্কে তার সমসাময়িক ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের মতামত ইত্যাদি বিস্তারিত সংরক্ষণ করেছেন। হাদীসে রাসূলকে বিকৃতি ও জালিয়াতি থেকে রক্ষার জন্য তাঁরা এভাবে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের তথ্য সংরক্ষণ করেছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এর কোনো নযির নেই। এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে যে কোনো যুগে যে কোনো গবেষক যে কোনো হাদীসের সনদ বিচার করতে সক্ষম হন।

### ৪. ১০. জাল হাদীস গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ

#### ৪. ১০. ১. মিথ্যাবাদী ও সন্দেহভাজনদের পরিচয় সংকলন

হাদীসের নামে মিথ্যা চিহ্নিত করার জন্য অন্যতম পদক্ষেপ ছিল মিথ্যাবাদীদের জালিয়াতি পৃথকভাবে সংকলন করা। এক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতি ছিল দুর্বল ও মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীদের বিষয়ে সংকলিত গ্রন্থগুলো।

ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলো ছিল ইসলামী জ্ঞান ও বিশেষত হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ। হাজার হাজার শিক্ষার্থী হাদীস শিক্ষা করতেন। শত শত মুহাদ্দিস, ইমাম সমাজে বিদ্যমান। সবাই সনদসহ হাদীস শুনতেন ও শেখাতেন। সনদের মধ্যে উল্লিখিত কোনো

ব্যক্তির পরিচয় জানা না থাকলে জেনে নিতেন। সে যুগে মিথ্যাবাদী রাবীদের নাম ও পরিচয় জানা থাকলেই তাদের মিথ্যা ও জালিয়াতী থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব ছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে সংকলিত অনেক হাদীস গ্রন্থই বিষয়ভিত্তিক না সাজিয়ে বর্ণনাকারী রাবী বা সাহাবীর নামের ভিত্তিতে সাজানো হতো। কারণ রাবীর ভিত্তিতেই হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা। এছাড়া সবাই সকল হাদীস পড়তেন। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়ের হাদীস পড়ার প্রবণতা তখন ছিল না।

এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, দ্বিতীয় হিজরী থেকে ৬ষ্ঠ হিজরী পর্যন্ত ৪ শতাব্দী যাবৎ হাদীসের নামে প্রচারিত ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম কর্ম ছিল দুর্বল ও মিথ্যাবাদী রাবীদের বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা করা। এসকল গ্রন্থে এ শ্রেণীর রাবীদের নাম, পরিচয়, তাদের বর্ণিত কিছু ভুল বা মিথ্যা 'হাদীস', তাদের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের তুলনামূলক নিরীক্ষার ফলাফল ও মতামত সংকলিত করা হতো।

### ৪. ১০. ২. মিথ্যা বা জাল হাদীস সংকলন

৬ষ্ঠ হিজরী শতক পর্যন্ত এ জাতীয় গ্রন্থগুলোই ছিল হাদীসের নামে মিথ্যাচারী ও তাদের মিথ্যাচার সম্পর্কে জানার প্রধান উৎস। ৬ষ্ঠ শতকের পরেও এ জাতীয় গ্রন্থ রচনা অব্যাহত থাকে। তবে জাল হাদীস চিহ্নিত করণ প্রক্রিয়ায় নতুন ধারার সৃষ্টি হয়।

কালের আবর্তনে হাদীস চর্চাসহ জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে স্থবিরতা দেখা দেয়। বর্ণনাকারীদের পরিচয় জানার আগ্রহ কমতে থাকে। স্বল্প সময়ে ও স্বল্প কষ্টে যে কোনো বিষয় শিখে নেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। রাবীদের নামের ভিত্তিতে সংকলিত গ্রন্থ থেকে মিথ্যা হাদীস জেনে নেয়ার সময় ও আগ্রহ হ্রাস পায়। এজন্য মুহাদ্দিসগণ বিষয়ভিত্তিক জাল ও বানোয়াট হাদীস সংকলন শুরু করেন, যেন পাঠক সহজেই কোনো বিষয়ে কোনো হাদীস জাল কিনা তা জেনে নিতে পারেন। ৫ম হিজরী শতক থেকে এ জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু হয়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইবনুল জাওযীর কর্মের মাধ্যমে এ ধারা বিশেষভাবে গতি লাভ করে। বর্তমান যুগ পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে। প্রথম দিকে মুহাদ্দিসগণ এ সকল মাউদূ হাদীস সনদ সহকারে উল্লেখ করে সনদ আলোচনার মাধ্যমে এগুলির মিথ্যাচার প্রমাণ করতেন। পরবর্তী সময়ে সনদ উল্লেখ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বানোয়াট হাদীসগুলো একত্রে সংকলন করা হয়।

এ সকল গ্রন্থের মধ্যে কিছু বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত। কিছু গ্রন্থে হাদীসের প্রথম অক্ষর অনুসারে (Alphabeticlly) সাজানো হয়। অধিকাংশ মুহাদ্দিস শুধুমাত্র মাউযূ হাদীস একত্রিত করেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস সমাজে প্রচলিত হাদীস সমূহ একত্রিত করে সেগুলোর মধ্যে কোনটি সহীহ এবং কোনটি বানোয়াট তা বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বানোয়াট হাদীস ছাড়াও দুর্বল হাদীসও সংকলিত করেছেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ বিষয়ে গত ৯ শতাব্দীতে অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এখানে এ জাতীয় প্রধান গ্রন্থগুলো ও লেখকদের নাম উল্লেখ করছি।

১. আল-মাউদূআত, আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ইবনু আলী আন-নাক্কাশ (৪১৪হি)।
২. যাখীরাতুল হুফ্ফায, মুহাম্মাদ ইবনু তাহির ইবনুল কাইসুরানী (৫০৭হি)।
৩. আল-আবাতীল ওয়াল মানাকীর ওয়াস সিহাহ ওয়াল মাশাহীর, হুসাইন ইবনু ইবরাহীম আল-হামাযানী আল-জূযকানী (৫৪৩হি)।
৪. কিতাবুল কুস্সাস্, আব্দুর রাহমান ইবনু আলী ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি)।
৫. আল-মাউদূআত, আবুল ফারাজ, ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি)।
৬. আল-ইলালুল মুতানাহিয়া, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি)।
৭. আল-আহাদীসুল মাউদূআহ ফীল আহকামিল মাশরূআ, আবু হাফস উমার ইবনু বাদর আল-মাউসিলী (৬২২ হি)।
৮. আল-মুগনী আন হিফযিল কিতাব, উমার আল-মাউসিলী (৬২২ হি)।
৯. আল-উকূফ আলাল মাউকূফ, উমার আল-মাউসিলী (৬২২ হি)।
১০. আল-মাউদূআত, হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আস-সাগানী (৬৫০ হি)।
১১. আদ-দুররুল মুলতাকিত, আস-সাগানী (৬৫০ হি)।
১২. আহাদীসুল কুস্সাস, আহমাদ ইবনু আব্দুল হালীম, ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি)।
১৩. মুখতাসারুল আবাতীল, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ যাহাবী (৭৪৮হি)।
১৪. তারতীবু মাউদূআতি ইবনিল যাওযী, যাহাবী (৭৪৮ হি)।
১৫. আল-মাউদূআত ফিল মাসাবীহ, উমার ইবনু আলী কাযবীনী (৭৫০হি)।
১৬. আল-মানারুল মুনীফ, ইবনু কাইয়িম আল-জাউযিয়্যাহ (৭৫১ হি)।
১৭. আল-আহাদীস আলল্‌তী লা আসলা লাহা ফিল এহইয়া, আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু আলী আস-সুবকী (৭৭১ হি)।
১৮. আত-তাযকিরা ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরা, মুহাম্মাদ ইবনু বাহাদুর আয-যারকাশী (৭৯৪ হি)
১৯. তাবঈনুল আজাব ফী মা ওরাদা ফী শাহরি রাজাব, ইবনু হাজর আসকালানী আহমাদ ইবনু আলী (৮৫২ হি)।
২০. আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান সাখাবী (৯০২হি)।
২১. আল-লাআলী আল-মাসনূআহ, জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান সুয়ূতী (৯১১হি)।
২২. আত-তাআক্কুবাত আলাল মাউদূআত, সুয়ূতী (৯১১ হি)।
২৩. আদ-দুরারুল মুনতাশিরাহ, সুয়ূতী (৯১১ হি)।

২৪. তাহযীরুল খাওয়াস মিন আহাদীসিল কুস্‌সাস, সুয়ূতী (৯১১ হি)।
২৫. আল-গাম্মায আলাল লাম্মায, আলী ইবনু আব্দুল্লাহ আস-সামহূদী (৯১১হি)
২৬. তাময়ীযুত তাইয়িবি মিনাল খাবীস, আব্দুর রাহমান আয যাবীদী (৯৪৪হি)।
২৭. আশ-শাযারাহ ফীল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ, মুহাম্মাদ ইবনু আলী আদ-দিমাশকী (৯৫৩ হি)।
২৮. তানযীহুশ শারীয়াহ, আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবন আর্‌রাক (৯৬৩ হি)।
২৯. তাযকিরাতুল মাউদূআত, মুহাম্মাদ তাহির পাটনী (ফাতানী) (৯৮৬ হি)।
৩০. আল-আসরারুল মারফূআহ, মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি)।
৩১. আল-মাসনূ ফী মা'রিফাতিল মাউদূ, মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি)।
৩২. মুখতাসারুল মাকাসিদ, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী যারকানী (১১২২হি)।
৩৩. আল-জাদ্দুল হিস্‌সীস ফী বায়ানি মা লাইসা বিহাদীস, আহমাদ ইবনু আব্দুল কারীম আমিরী (১১৪৩ হি)।
৩৪. কাশফুল খাফা, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আল-আজলূনী (১১৬২ হি)।
৩৫. আল-কাশফুল ইলাহী আন শাদীদিদ দা'ফি ওয়াল মাউদূ ওয়াল ওয়াহী, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তারাবলুসী (১১৭৭ হি)
৩৬. আন-নাওয়াফিহুল আতিরাহ, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আস-সান'আনী (১১৮১ হি)
৩৭. আন-নুখবাতুল বাহিয়্যাহ, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আস-সাবনাবী (১২৩২ হি)
৩৮. আল-ফাওয়াইদুল মাজমূআ, মুহাম্মাদ ইবনু আলী শাওকানী (১২৫০হি)।
৩৯. আসনাল মাতালিব, মুহাম্মাদ ইবনু সাইয়িদ দারবীশ (১২৭৬ হি)।
৪০. হুসনুল আসার, মুহাম্মাদ দারবীশ (১২৭৬ হি)।
৪১. আল-আসারুল মারফূআহ, আব্দুল হাই লাখনাবী (১৩০৪ হি)।
৪২. আল-লু'লু আল-মারসূ, মুহাম্মাদ ইবনু খালীল আল-মাশীশী আল-কাওকাজী (১৩০৫হি)।
৪৩. তাহযীরুল মুসলিমীন, মুহাম্মাদ ইবনুল বাশীর আল-মাদানী (১৩২৯হি)।
৪৪. আল-মাউযূআত, আবূ জাফর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী (১৪২৩হি/ ২০০২ খৃ)

বর্তমান সময়েও এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে।

প্রিয় পাঠক, এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, একই বিষয়ে এত গ্রন্থের প্রয়োজন কি? আসল বিষয় হলো, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে শুরু হওয়ার পরে হাদীসের নামে জালিয়াতির প্রচেষ্টা কখনো থামে নি। বিভিন্ন মুসলিম দেশে নতুন নতুন কথা হাদীসের নামে প্রচারিত হয়েছে। তখন সে দেশের প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ গবেষণার মাধ্যমে সেগুলোর সত্যতা ও অসত্যতা নির্ণয় করেছেন। এছাড়া পূর্ববর্তী গবেষকদের সিদ্ধান্তে কোনো ভুল থাকলে তা পরবর্তী লেখকগণ আলোচনা করেছেন। এভাবে এ বিষয়ে লেখনি ও গবেষণার ধারা অব্যাহত থেকেছে।

## ৫. মিথ্যার কারণ ও মিথ্যাবাদীদের প্রকারভেদ

আমরা দেখেছি যে, ইসলামের গোপন শত্রুরা মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য সর্বপ্রথম হাদীসের নামে মিথ্যা কথা মুসলিম সমাজে ছড়াতে থাকে। ওহীর উপরেই ধর্মের ভিত্তি। ওহীর মাধ্যমে কোনো কথা প্রমাণিত করতে পারলেই তা মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায়। কুরআন অগণিত মানুষের মুখস্থ, কুরআনের নামে সরাসরি মিথ্যা বা বানোয়াট কিছু বলার সুযোগ কখনোই ছিল না। এজন্য হাদীসের নামে মিথ্যা বলার চেষ্টা তারা করেছে।

ক্রমান্বয়ে আরো অনেক মানুষ বিভিন্ন প্রকারের উদ্দেশ্যে হাদীসের নামে মিথ্যা বলতে থাকে। এছাড়া অনেক মানুষ অজ্ঞতা, অবহেলা বা অসাবধানতা বশত হাদীসের নামে মিথ্যা বলেন। কারো মুখে কোনো ভাল কথা, কোনো প্রাচীন প্রজ্ঞাময় বাক্য, কোনো সাহাবী বা তাবিয়ীর কথা শুনে কারো কাছে ভাল লেগেছে। পরবর্তীতে তা বলার সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে বর্ণনা করেছেন। এভাবে বিভিন্ন কারণে হাদীসের নামে জালিয়াতি চলতে থাকে।

আমরা দেখেছি যে, মিথ্যা দু প্রকার: ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার কারণ মূলত স্মৃতির বিভ্রাট, হাদীস মুখস্থকরণে অবহেলা বা হাদীস গ্রহণে অসতর্কতা। আর ইচ্ছাকৃত মিথ্যার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষতি বা উপকার (!) করা।

আমরা জানি যে, ওহীর সম্পর্ক ধর্মের সাথে। কাজেই ওহীর নামে মিথ্যা বলার সকল উদ্দেশ্যই ধর্ম কেন্দ্রিক। কেউ ধর্মের নামে ধর্মের ক্ষতি করার জন্য হাদীস বানিয়েছেন। কেউ ধর্মের নামে কামাই রুজি করার জন্য বা নিজের ফাতওয়া, দল বা বংশকে শক্তিশালী করার জন্য হাদীস বানিয়েছেন। কেউ ধর্মের নামে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হাদীস বানিয়েছেন। কেউ নিঃস্বার্থভাবে (!) মানুষদের ভালকাজে উৎসাহ দান ও খারাপ কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য হাদীস বানিয়েছেন। এ সকল কারণ আমরা তিন শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি: ১. ধর্মের ক্ষতি করা, ২. ধর্মের উপকার করা ও ৩. নিজের জাগতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।

মিথ্যার কারণ ও মিথ্যাবাদীদের প্রকরণ সম্পর্কে ৭ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনুস সালাহ আবু আমর উসমান

ইবনু আব্দুর রাহমান (৬৪৩হি) বলেন: হাদীস বানোয়াটকারী জালিয়াতগণ বিভিন্ন প্রকারের। এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক একদল মানুষ যারা নেককার ও দরবেশ বলে সমাজে পরিচিত। এরা এদের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির কারণে সাওয়াবের আশায় বানোয়াট কথা হাদীসের নামে সমাজে প্রচার করতেন। এদের বাহ্যিক পরহেযগারী, নির্লোভ জীবনযাপন ইত্যাদি দেখে মানুষ সরল মনে এদের কথা বিশ্বাস করে এসকল বানোয়াট কথা হাদীস বলে গ্রহণ করতো। এরপর হাদীসের অভিজ্ঞ ইমামগণ সুক্ষ্ম নিরীক্ষার মাধ্যমে এদের মিথ্যাচার ও জালিয়াতি ধরে ফেলেন এবং প্রকাশ করে দেন।... সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নেককাজের ফযীলত ও অন্যায় কাজের শাস্তি বিষয়ক মিথ্যা ও বানোয়াট কথাকে হাদীস নামে প্রচার করাকে এধরনের কেউ কেউ জায়েয মনে করত।[১৮১]

আল্লামা যাইনুদ্দীন ইরাকী (৮০৬হি) বলেন: হাদীস জালকারীগণ তাদের জালিয়াতির উদ্দেশ্য ও কারণের দিক থেকে বিভিন্ন প্রকারের :

১. অনেক যিনদীক মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য হাদীস বানিয়েছে। হাম্মাদ ইবনু যাইদ বলেছেন: যিনদীকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে দশ হাজার হাদীস তৈরি করেছে।

২. অনেকে নিজের ধর্মীয় মতের সমর্থনে হাদীস জাল করেছে।

৩. কিছু মানুষ খলীফা ও আমীরদের পছন্দসই বিষয়ে হাদীস জাল করে তাদের প্রিয়ভাজন হতে চেষ্টা করেছে।

৪. কিছু মানুষ ওয়ায ও গল্প বলে অর্থ কামাই করার মানসে হাদীস জাল করেছে।

৫. কিছু মানুষ নিজে ভাল ছিলেন, কিন্তু তাদের পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য তাদের পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখতো। তারা বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতেন।

৬. কেউ কেউ নিজেদের ফাতওয়া বা মাসআলার দলীল প্রতিষ্ঠার জন্য হাদীস বানাতেন।

৭. কেউ কেউ নতুনত্ব ও অভিনবত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন অপ্রচলিত সনদ ও মতন তৈরি করতেন।

৮. কিছু মানুষ এভাবে মিথ্যা হাদীস তৈরি করাকে দীনদারী মনে করতেন। তারা তাদের বিভ্রান্তির কারণে মনে করতেন যে, মানুষদের ভালর পথে ডাকার জন্য মিথ্যা বলা যায়। এরা নেককার, সংসারত্যাগী বুযুর্গ হিসাবে সমাজে পরিচিত। হাদীস জালিয়াতির ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি ও মারাত্মক। কারণ তারা এ কঠিন পাপকে নেককর্ম ও সাওয়াবের কাজ মনে করতেন; ফলে কোনোভাবেই তাদেরকে এথেকে বিরত করা যেত না। আর তাদের বাহ্যিক তাকওয়া, নির্লোভ জীবন ও দরবেশী দেখে মানুষেরা প্রভাবিত হতেন এবং তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ ও প্রচার করতেন। এজন্যই ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ কাত্তান (১৯৮ হি) বলতেন, হাদীসের বিষয়ে নেককার বুযুর্গদের চেয়ে বেশি মিথ্যাবাদী আমি দেখিনি।[১৮২] তিনি নেককার বুযুর্গ বলতে বুঝাচ্ছেন সে সব জাহিলকে যারা নিজেদের নেককার মনে করেন এবং বুযুর্গীর পথে চলেন, কিন্তু হালাল হারাম বুঝেন না।[১৮৩]

আমরা এখানে হাদীসের নামে জালিয়াতির প্রধান কারণগুলো ও এতে লিপ্ত মানুষদের বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করব।

### ৫. ১. যিনদীক ও ইসলামের গোপন শত্রুগণ

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম অর্ধ শতকের মধ্যে ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবেশ করে। এসব দেশের অনেক অমুসলিম নাগরিক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। অনেকে তাদের পূর্ব ধর্ম অনুসরণ করতে থাকেন। ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে কিছু মানুষ তাদের পূর্বের ধর্ম ও মতবাদের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা বলেন। তারা সমাজে মুসলিম বলে গণ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো ও তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে মুসলিমগণের বিশ্বাস ও কর্ম নষ্ট করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর মানুষদেরকে 'যিনদীক' বলা হতো। এরা তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অগণিত মিথ্যা কথা সমাজে হাদীস হিসাবে প্রচার করতো। আমার দেখেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু সাবার নেতৃত্বে এ শ্রেণির মানুষেরাই প্রথম বানোয়াট হাদীস প্রচার শুরু করে।

এসকল ভণ্ড যিনদীক কখনো আলীর (রা) ভক্ত সেজে তাঁর ও তাঁর বংশের পক্ষে বানোয়াট হাদীস প্রচার করতো। কখনো বা সূফী-দরবেশ সেজে মানুষদের ধোঁকা দিত এবং পারসিক বা ইহুদী-খৃস্টানদের বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-মার্কা দরবেশীর পক্ষে হাদীস বানাতো। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী বিশ্বাস নষ্ট করা ও তাকে হাস্যাস্পদ ও অযৌক্তিক হিসাবে পেশ করা।

এখানে লক্ষণীয় যে, তারা সনদসহ হাদীস বানাতো। তৎকালীন সময়ে সনদ ছাড়া হাদীস বলার কোনো উপায় ছিল না। তারা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নির্ভরযোগ্য রাবীগণের নাম জানতো। বিভিন্ন সহীহ হাদীসের সনদ তাদের মুখস্থ ছিল। এসকল সনদের নামে তারা হাদীস বানাতো।

এগুলো দিয়ে সাধারণ মানুষদের ধোঁকা দেয়া খুবই সহজ ছিল। তবে 'নাকিদ' মুহাদ্দিসদের কাছে এ ধোঁকার কোনো কার্যকরিতা ছিল না। তাঁরা উপরে বর্ণিত নিরীক্ষার মাধ্যমে এদের জালিয়াতি ধরে ফেলতেন। যেমন একজন বলল যে, আমাকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন, তিনি সুফিয়ান সাওরী থেকে, তিনি ইবনু সিরীন থেকে, তিনি আনাস ইবনু মালিক থেকে

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে... । তখন তাঁরা উপরের পদ্ধতিতে সনদে বর্ণিত সকল রাবীর অন্যান্য ছাত্রদের বর্ণিত হাদীসের সাথে এর তুলনা করতেন । পাশাপাশি এ ব্যক্তির অন্যান্য বর্ণনা ও তার কর্ম বিচার করে অতি সহজেই জালিয়াতি ধরে ফেলতেন ।

এদের বানানো একটি হাদীস দেখুন । মুহাম্মাদ ইবনু শুজা' নামক একব্যক্তি বলছে, আমাকে হিব্বান ইবনু হিলাল, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামা থেকে, তিনি আবুল মাহযাম থেকে তিনি আবু হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের প্রভুর সৃষ্টি কী থেকে? তিনি বলেন: তিনি একটি ঘোড়া সৃষ্টি করেন, এরপর ঘোড়াটিকে দাবড়ান । ঘোড়াটির দেহ থেকে যে ঘাম নির্গত হয় সে ঘাম থেকে তিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন ।[১৮৪]

আমরা সুস্পষ্টত বুঝতে পারছি যে, মহান আল্লাহ সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বাসকে হাস্যাস্পদরূপে তুলে ধরা ও মুসলিম বিশ্বাসকে তামাশার বিষয়ে পরিণত করাই এরূপ জালিয়াতির উদ্দেশ্য ।

এসকল জালিয়াত অনেক সময় তাদের জালিয়াতির কথা বলে বড়াই করত । আব্দুল করীম ইবনু আবীল আরজা দ্বিতীয় হিজরী শতকের এরূপ একজন জালিয়াত । ধর্মদ্রোহিতা, জালিয়াতি ইত্যাদি অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন তৎকালীন প্রশাসক মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান ইবনু আলী । শাস্তির পূর্বে সে বলে, আল্লাহর কসম, আমি চার হাজার বানোয়াট হাদীস জালিয়াতি করে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছি ।[১৮৫]

তৃতীয় আব্বাসীয় খলীফা মাহদী (শাসনকাল ১৫৮-১৬৯ হি) বলেন, আমার কাছে একজন যিনদীক স্বীকার করেছে যে, সে ৪০০ হাদীস বানোয়াট করেছে, যেগুলো এখন মানুষের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে ।[১৮৬]

### ৫. ২. ধর্মীয় ফিরকা ও দলমতের অনুসারীগণ

সাধারণত মানুষ নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও সীমাবদ্ধতা অনুভব করতে চায় না । প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অগণিত মানুষ নিজের বুদ্ধি, বিবেক, বিচার ও প্রজ্ঞা দিয়ে 'ওহী'-র দুর্বলতা (!) ও অপূর্ণতা (!!) দূর (!!!) করতে চেষ্টা করেছে ও করছে । সকলেরই চিন্তা ওহীর মধ্যে এ কথাটি কেন থাকল না! এ কথাটি না হলে ধর্মের পূর্ণতা আসছে না । ঠিক আছে আমি কথাটি ওহীর নামে বলি । তাহলে ধর্ম পূর্ণতা লাভ করবে!!!

এদের মধ্যে অনেকে নিজে কোনো মনগড়া ধর্মীয় মতবাদ তৈরী করেছে বা অনুসরণ করেছে এবং এ মতের পক্ষে 'ওহী' জালিয়াতি করেছে । রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হতে না হতেই মুসলিম সমাজে নও-মুসলিমদের মধ্যে পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, ইসলামের গোপন শত্রুদের অপপ্রচার ও বিভিন্ন সমাজের সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির প্রভাবে নতুন নতুন ধর্মীয় মতবাদের উদ্ভাবন ঘটে । আলী (রা) ও সকল সাহাবীর বিরুদ্ধে জিহাদ ও মনগড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় খারিজী মতবাদ । আলী (রা) এর ভক্তি ও ভালবাসার ছদ্মাবরণে মুসলমানদের মধ্যে ইহুদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজকদের মতবাদ ছড়ানোর জন্য প্রচারিত হয় শিয়া মতবাদ । মহান আল্লাহর মর্যাদা রক্ষার ভুয়া দাবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কাদারিয়া' মতবাদ, যাতে তাকদীর বা মানুষের ভাগ্যের বিষয়ে মহান আল্লাহর জ্ঞানকে অস্বীকার করা হতো । মহান আল্লাহর ক্ষমতা প্রমাণের বাড়াবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাবারিয়া' মতবাদ, যাতে মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতাকে অস্বীকার করা হতো । মহান আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠার মনগড়া দাবিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাহ্মিয়া', 'মুতাজিলা' ইত্যাদি মতবাদ, যেখানে মহান আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করা হতো ।

রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা হুবহু আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস ও পালন করেছেন । সাহাবীগণকে ভালবাসতে হবে আবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশধরদেরকেও ভালবাসতে হবে । উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, নেই কোনো বাড়াবাড়ির অবকাশ । মানুষের ভাগ্যের বিষয়ে আল্লাহর জ্ঞান ও নির্ধারণ যেমন সত্য, তেমনি সত্য মানুষের কর্মক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি । উভয় বিষয়ের সকল আয়াত ও হাদীস সহজভাবে বিশ্বাস করেছেন তাঁরা । এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য তাঁরা দেখেন নি ।

কিন্তু নতুন মতের উদ্ভাবকগণ কুরআন-হাদীসের কিছু নির্দেশনা মানতে যেয়ে বাকীগুলো অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করেছেন । প্রত্যেকে নিজের মতকেই সঠিক বলে মনে করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, তার মতই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) পক্ষে এবং এ মতের পক্ষে হাদীস বানানোর অর্থ হলো আল্লাহ ও তার রাসূলের (ﷺ) পক্ষে হাদীস বানানো । কিছু বানোয়াট বা মিথ্যা কথাকে ওহীর নামে বা হাদীসের নামে বলে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (ﷺ) 'সঠিক পছন্দের (!!) মতকে' শক্তিশালী করা যায় তাহলে অসুবিধা কি?! এ তো ভাল কাজ বলে গণ্য হওয়া উচিত । এজন্য তাদের কেউ কেউ যখন তাদের মতের পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো হাদীস পান নি তখন প্রয়োজনে নিজেদের পক্ষে ও বিরোধীদের বিপক্ষে হাদীস বানিয়ে প্রচার করেছেন । ফিকহী ও মাসআলাগত মতভেদের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো মিথ্যা হাদীস তৈরী করা হয়েছে ।[১৮৭]

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন শিয়াগণ । নবী-বংশের ভক্তির নামে তাঁরা অগণিত বানোয়াট কথা ধর্মবিশ্বাসের অংশ

বানিয়েছিলেন। এরপর সেগুলোর সমর্থনে অগণিত হাদীস বানিয়ে প্রচার করেছেন। নবীদের পরে সকল মানুষের মধ্যে আলীর শ্রেষ্ঠত্ব, আলীর অগণিত অলৌকিক ক্ষমতা, আলীর পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসা, আলী বংশের মাহাত্ম্য, তাঁকে ও তাঁর বংশধরদেরকে বাদ দিয়ে যারা খলীফা হয়েছেন তাঁদের যুলুম ও শাস্তি, যারা তাঁর বিরোধিতা করেছেন তাঁদের ভয়ঙ্কর পরিণতি ও শাস্তি, যারা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানেন নি বা অন্যান্য সাহাবীদেরকে ভালবেসেছেন তাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে অগণিত বানোয়াট কথাকে তারা হাদীস নামে প্রচার করেছেন।

তাঁদের জালিয়াতি এতই ব্যাপক ছিল যে, তাদের আলিমগণও সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ৭ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত শীয়া আলিম, আলী (রা)-এর বক্তৃতা সংকলন বলে কথিত ও প্রচারিত 'নাহজুল বালাগাত' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার ইবনু আবীল হাদীদ আব্দুল হামীদ ইবনু হিবাতুল্লাহ (৬৫৬ হি) বলেন: "ফযীলত বা মর্যাদা জ্ঞাপক হাদীসের ক্ষেত্রে প্রথম মিথ্যাচারের শুরু হয়েছিল শিয়াদের দ্বারা। তারা প্রথমে তাদের নেতার পক্ষে বিভিন্ন হাদীস জালিয়াতি করে প্রচার করেন। বিরোধীদের সাথে প্রচণ্ড শত্রুতা ও হিংসা তাদেরকে এ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে।..."[১৮৮]

**৫. ৩. নেককার সংসারত্যাগী সরল বুযুর্গগণ**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা বলা ও প্রচার করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন ও ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করেছে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষার বিষয়ে অজ্ঞ কিছু ধার্মিক মানুষের 'মানুষকে ভাল পথে নেয়ার আগ্রহ।' কুরআনের ফযীলত, বিভিন্ন সূরার ফযীলত, বিভিন্ন সময়ে বা দিনে বিভিন্ন প্রকারের সালাতের ফযীলত, বিভিন্ন প্রকার যিকিরের ফযীলত ইত্যাদি সর্বপ্রকারের নেক কর্মের ফযীলত, বিভিন্ন পাপ বা অন্যায় কাজের শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য হাদীস বানানো হয়েছে এ উদ্দেশ্যে।[১৮৯]

জাল হাদীস তৈরী ও প্রচারের ক্ষেত্রে এ সকল নেককার মানুষরা ছিলেন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। এদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু নেককার মানুষ অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলতেন। এরা এদের সরলতার কারণে হাদীস নামে যা শুনতেন তাই বিশ্বাস করতেন এবং বর্ণনা করতেন। অনেক সময় কোনো সুন্দর কথা বা জ্ঞানের বাক্য শুনলে তারা তা অসতর্কভাবে হাদীস বলে বর্ণনা করতেন। আর কিছু নেককার বলে পরিচিত মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলতেন।

**৫. ৩. ১. নেককারগণের অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা**

সূফী দরবেশ আল্লাহওয়ালা মানুষেরা সরলমনা ভালো মানুষ। সবাইকে সরল মনে বিশ্বাস করা ও দয়া করাই তাঁদের কাজ। আর মুহাদ্দিসের কাজ দারোগার কাজ। দরবেশের শুরু বিশ্বাস দিয়ে আর দারোগার শুরু অবিশ্বাস দিয়ে। কোনো মানুষ যদি তার কোনো বিপদের কথা বলে, বা কোনো অপরাধের জন্য ওজর পেশ করে তখন সাধারণত সরল প্রাণ মানুষেরা তা বিশ্বাস করে ফেলেন। কিন্তু একজন দারগা প্রথমেই অবিশ্বাস দিয়ে শুরু করেন। তিনি তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করেন, সে ধোঁকা দিচ্ছে না সত্য কথা বলছে। এরপর তিনি তা বিশ্বাস করেন।

কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের অগণিত নির্দেশের আলোকে সাহাবীগণের যুগ থেকে সাহাবীগণ ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ ওহী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় সদাজাগ্রত প্রহরী বা দারোগার দায়িত্ব পালন করছেন। সুক্ষ্ম নিরীক্ষা ও যাচাই ছাড়া তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলা কোনো কথা সঠিক বলে গ্রহণ করেন নি।

পক্ষান্তরে সরলপ্রাণ 'যাহিদ' সূফী-দরবেশগণ রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামে কোনো কথা শোনামাত্র আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামে কেউ মিথ্যা বলতে পারে তা কখনো তাঁরা চিন্তা করেননি। তাঁরা যা শুনেছেন সবই ভক্তের হৃদয় দিয়ে শুনেছেন, সরল বিশ্বাসে মেনে নিয়েছেন, আমল করেছেন এবং অন্যকে আমল করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এজন্য তাবে-তাবিয়ীদের যুগ থেকেই মুহাদ্দিসগণ এধরনের নেককার দরবেশদের হাদীস গ্রহণ করতেন না। ইমাম মালিক (১৭৯ হি.) বলতেন: মদীনায় অনেক দরবেশ আছেন, যাদের কাছে আমি লাখ টাকা আমানত রাখতে রাজি আছি, কিন্তু তাঁদের বর্ণিত একটি হাদীসও আমি গ্রহণ করতে রাজি নই।[১৯০]

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (১৯৮ হি.) বলেন : "নেককার বুযুর্গরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের বিষয়ে যত বেশি মিথ্যা বলেন অন্য কোনো বিষয়ে তাঁরা এমন মিথ্যা বলেন না।" ইমাম মুসলিম (২৬১ হি) এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন: এ সকল নেককার মানুষেরা ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেন না, কিন্তু বেখেয়ালে তাঁরা মিথ্যাচারে লিপ্ত হন। কারণ তাঁরা হাদীস সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে পারেন না, উল্টে পাল্টে ফেলেন, অধিকাংশ সময় মনের আন্দাজে হাদীস বলেন, ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাচারে লিপ্ত হন।"[১৯১]

ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি), নাবাবী (৬৭৬ হি), ইরাকী (৮০৬) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার একটি উদাহরণ উলেখ করেছেন। এ অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ্ তাঁর সুনানে সংকলন করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আত-তালহী বলেছেন, আমাদেরকে সাবিত ইবনু মূসা আবু ইয়াযিদ বলেছেন, তিনি শারীক থেকে, তিনি আ'মাশ

থেকে, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ

"যার রাতের সালাত অধিক দিবসে তার চেহারা সৌন্দর্যময় হয়।"[১৯২]

মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছেন যে, এ কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বানোয়াট কথা। তবে তা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা না অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা সে বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন।

ইবনু মাজাহর উস্তাদ ইসমাঈল ও অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস এ হাদীসটি আবু ইয়াযিদ সাবিত ইবনু মূসা ইবনু আব্দুর রাহমান (২২৯ হি) থেকে শুনেছেন ও লিখেছেন। একমাত্র তিনিই এ হাদীসটির বর্ণনাকারী। তিনি দাবী করেন যে, শারীক ইবনু আব্দুল্লাহ (১৭৮ হি) তাকে এ হাদীসটি বলেছেন।

মুহাদ্দিসগণ শারীকের সকল ছাত্রের হাদীস, শারীকের উস্তাদ সুলাইমান ইবনু মিহরান আল-আ'মাশ (১৪৭ হি)-এর সকল ছাত্রের হাদীস, আ'মাশের উস্তাদ আবু সুফিয়ান তালহা ইবনু নফি'-এর সকল ছাত্রের হাদীস এবং জাবির (রা)-এর অন্যান্য ছাত্রের হাদীস সংগ্রহ করে তুলনা করেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন যে এ হাদীসটি একমাত্র সাবিত ছাড়া কেউ বর্ণনা করেন নি। তাঁরা দেখেছেন যে, 'সাবিত' 'শারীক'-এর এমন কোনো ঘনিষ্ঠ ছাত্র বা দীর্ঘকালীন সহচর ছিলেন না যে, শারীক অন্য কোনো ছাত্রকে না বলে শুধুমাত্র তাঁকেই এ হাদীসটি বলবেন। এছাড়া সাবিত বর্ণিত অন্যান্য হাদীস নিরীক্ষা করে তাঁরা সেগুলোর কিছু কিছু হাদীসে মারাত্মক ভুল দেখতে পেয়েছেন। এভাবে সামগ্রিক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, সাবিত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেছেন।

সাবিত ইবনু মূসা তৃতীয় হিজরী শতকের একজন নেককার আবিদ ও দরবেশ ছিলেন। তাঁর ধার্মিকতার কারণে সাধারণভাবে অনেক মুহাদ্দিস তাঁর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করতেন। তবে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা দেখেছেন যে, তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশ কিছু হাদীস ভুল বা মিথ্যা বলে প্রমাণিত। তিনি যে সকল উস্তাদের সূত্রে হাদীসগুলো বলছেন, সে সকল উস্তাদের দীর্ঘদিনের বিশেষ ছাত্র বা অন্য কোনো ছাত্র সে হাদীস বলছেন না। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে 'মিথ্যাবাদী' বলেছেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩ হি) সাবিত সম্পর্কে বলেন: 'তিনি মিথ্যাবাদী'।[১৯৩]

পক্ষান্তরে আবু হাতিম রাযী (২৭৭ হি), ইবনু আদী (৩৬৫ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস সাবিতের এ মিথ্যাকে 'অনিচ্ছাকৃত' বলে মনে করেছেন। তাঁরা বলেন যে, সাবিত মূলত হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন না। সাধারণ আবিদ ছিলেন। তিনি ৭/৮ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে দুটি হাদীস বাদে বাকীগুলো তিনি ঠিকমতই বর্ণনা করেছেন। এতে মনে হয় তাঁর ভুল অনিচ্ছাকৃত। এজন্য তাঁরা তাকে সুস্পষ্টভাবে 'মিথ্যাবাদী' না বলে 'দুর্বল' বলেছেন।[১৯৪]

কোনো কোনো মুহাদ্দিস সাবিতের 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা'র কারণ উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু নুমাইর (২৩৪ হি) বলেন, হাদীসটি বাতিল। সাবিত বুঝতে না পেরে হাদীসটি বলেছেন। শারীক ইবনু আব্দুল্লাহ হাসি-মশকরা করতে ভালবাসতেন। আর সাবিত ছিলেন নেককার আবিদ মানুষ। সম্ভবত, শারীক যখন হাদীস বলছিলেন তখন সাবিত সেখানে উপস্থিত হন। শারীক বলছিলেন: আমাদেরকে আ'মাশ, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে। এমতাবস্থায় সাবিত সেখানে প্রবেশ করেন। সাবিতকে দেখে শারীক হাদীস বলা বন্ধ করে তার সরলতা মণ্ডিত উজ্জল চেহারা লক্ষ্য করে বলেন: 'যার রাতের সালাত অধিক হয়, দিবসে তার চেহারা সৌন্দর্যময় হয়।' শারীকের এ কথা সাবিত ভুলবশত উপরের সনদে বর্ণিত হাদীস মনে করেন। এভাবে তিনি শারীকের একটি কথাকে ভুলবশত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে বর্ণনা করেন। এ কারণে ইবনু সালাহ, নাবাবী, ইরাকী ও অন্যান্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা'-র উদাহরণ হিসাবে পেশ করেছেন।[১৯৫]

**৫. ৩. ২. 'নেককার'গণের ইচ্ছাকৃত মিথ্যা**

'নেককার' বলে পরিচিত কিছু মানুষ এর চেয়েও জঘন্য কাজে লিপ্ত হতেন। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বানোয়াট কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলতেন। হাদীস জালিয়াতিতে এরাই ছিলেন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকারক। তারা যে সকল বিষয়ে হাদীস বানিয়েছেন, তার অনেক বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। কিন্তু এসকল নেককার (!) মানুষ অনুভব করেছেন যে, এ সকল সহীহ হাদীসের ভাষা ও সেগুলিতে বর্ণিত পুরস্কার বা শাস্তিতে মানুষের আবেগ আসে না। তাই তারা আরো জোরালো ভাষায়, বিস্তারিত কথায়, অগণিত পুরস্কার ও কঠিনতম শাস্তির কথা বলে হাদীস বানিয়েছেন, যেন মানুষেরা তা শুনেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এভাবে তাঁরা 'ওহীর' অপূর্ণতা (!) মানবীয় বুদ্ধি দিয়ে পূরণ (!) করতে চেয়েছেন। সবচেয়ে কঠিন বিষয়, তাদের 'ধার্মিকতা'র কারণে সমাজের অনেক মানুষই তাদের এসকল জালিয়াতির খপ্পরে পড়তেন। তাঁরা এগুলোকে হাদীস বলে বিশ্বাস করেছেন। শুধুমাত্র 'নাকিদ' মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদের জালিয়াতি ধরেছেন।

শয়তান এদেরকে বুঝিয়েছিল যে, আমরা তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে নয়, পক্ষেই মিথ্যা বলছি। এ সকল মিথ্যা ছাড়া মানুষদের হেদায়েত করা সম্ভব নয়। কাজেই ভাল উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা শুধু জায়েযই নয় বরং ভাল কাজ। শয়তান তাদেরকে বুঝতে দেয় নি যে, মিথ্যা ছাড়া মানুষদেরকে ভাল পথে আনা যাবে না একথা ভাবার অর্থ হলো, ওহী মানুষের হেদায়েত করতে সক্ষম নয় বলে চিন্তা করা! কুরআন-হাদীস তার কার্যকরিতা হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই আজগুবি মিথ্যা দিয়ে মানুষকে হেদায়েত করতে হবে! কি জঘন্য চিন্তা!

তাদের এসব মনগড়া কথা যে, ওহীর পক্ষে বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) পক্ষে সে কথা দাবী করার অধিকার তাদের কে দিয়েছে? তারা যে কথাকে ইসলামের পক্ষে বলে বলে মনে করেছে তা সর্বদা ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। আজগুবি গল্প, অল্প কাজের অকল্পনীয় সাওয়াব, সামান্য অন্যায়ের বা পাপের ঘোরতর শাস্তি, সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাল্পনিক কাহিনী, কাল্পনিক অলৌকিক কাহিনী, বিভিন্ন বানোয়াট ফযীলতের কাহিনী ইত্যাদি মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করেছে। অগণিত কুসংস্কার ছড়িয়েছে তাদের মধ্যে। নফল 'ইবাদতের' সাওয়াবে বানানো মনগড়া সাওয়াবের কল্প কাহিনী মুসলিম উম্মাহকে ফরয দায়িত্ব ভুলিয়ে দিয়েছে। অগণিত মনগড়া 'আমল' মুসলমানদেরকে কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত কর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বানোয়াট হাদীসগুলো আলোচনার সময় এসবের অনেক উদাহরণ দেখতে পাব।

'ওহীর পক্ষে মিথ্যা বলার' কারণেই যুগে যুগে সকল ধর্ম বিকৃত হয়েছে। ওহীর পক্ষে মিথ্যা বলে বিভ্রান্ত হওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ খৃস্টধর্মের বিকৃতিকারী পৌল নামধারী শৌল এবং তার অনুসারী খৃস্টানগণ। এরা 'ঈশ্বরের' মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, 'যীশু'-র মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ও অধিক সংখ্যক মানুষকে 'সুপথে' আনয়ন করার জন্য ওহীর নামে মিথ্য বলেছে। এরা ভেবেছে যে, আমরা ঈশ্বরের বা যীশুর পক্ষে বলছি, কাজেই এ মিথ্যায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু তারা মূলত শয়তানের খেদমত করেছে। আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

"বল হে কেতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীন (ধর্ম) সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না; এবং যে-সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।"[১৯৬]

মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও এ ধরনের পথভ্রষ্ট খেয়াল-খুশীমত ওহী বানানো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখা দিয়েছে। তবে সনদ ও সনদ নিরীক্ষা ব্যবস্থার ফলে এদের জালিয়াতি ধরা পড়ে গিয়েছে। এ সকল 'নেককার জালিয়াত' বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাদীস তৈরি করতেন।

**ক.** কিছু মানুষ কুরআন এবং কুরআনের বিভিন্ন সূরা তিলাওয়াতের 'অগণিত' কাল্পনিক সাওয়াব বর্ণনা করে হাদীস তৈরি করতেন।

**খ.** অন্য অনেকে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত বিভিন্ন নেক আমলের সাওয়াব বর্ণনায় হাদীস তৈরি করতেন। যেমন তাসবীহ, যিকির, তাহাজ্জুদ, চাশত ইত্যাদি ইবাদতের জন্য সহীহ হাদীসে অনেক সাওয়াব বর্ণিত হয়েছে। তারা মনে করতেন যে, এসকল হাদীস মানুষের চিত্তাকর্ষণ করতে পারে না। এজন্য এ সকল বিষয়ে 'আকর্ষণীয়' হাদীস তৈরি করতেন। অনুরূপভাবে সুন্নাতের পক্ষে ও বিদ'আতের বিপক্ষে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। এ সকল জালিয়াত সেগুলোতে খুশি হতে পারেন নি। তাঁরা সুন্নাতের সাওয়াব, মর্যাদা এবং বিদ'আতের পাপ ও বিদ'আতীদের কঠিন পরিণতি ও ভয়ঙ্কর শাস্তির বিষয়ে অনেক হাদীস বানিয়েছেন।

**গ.** কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকারের 'নেক আমল' তৈরি করে তার ফযীলতে হাদীস বানাতেন। যেমন বিভিন্ন মাসের জন্য বিশেষ পদ্ধতির সালাত, সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের জন্য বিশেষ সালাত, আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখা, জান্নাতে নিজের স্থান দেখা ইত্যাদি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ সালাত। অনুরূপভাবে বিভিন্ন 'দরুদ', 'যিকির', 'দোয়া', 'মুনাজাত' ইত্যাদি বানিয়ে সেগুলোর বানোয়াট ফযীলত উল্লেখ করে হাদীস তৈরি করেছেন। এরূপ অগণিত 'ইবাদত' তারা তৈরি করেছেন এবং এগুলির ফযীলতে কল্পনার ফানুস উড়িয়ে অগণিত সাওয়াব ও ফযীলতের কাহিনী বলেছেন।

**ঘ.** অনেক মানুষের অন্তর নরম করার জন্য সংসার ত্যাগ, লোভ ত্যাগ, ক্ষুধার ফযীলত, দারিদ্র্যের ফযীলত, বিভিন্ন কাহিনী, শাস্তি, পুরস্কার বা অনুরূপ গল্প কাহিনী বানিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে চালিয়েছেন।

এখানে এ ধরনের দু'এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি উল্লেখ করছি। এ সকল মানুষ মুহাদ্দিসগণের কাছে তাদের মিথ্যা সনদগুলো প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত। তবে তাঁদের নিরীক্ষামূলক প্রশ্নের মুখে অনেক সময় স্বীকার করতো যে, তারা হাদীস জালিয়াতি করেছে।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন প্রখ্যাত আলিম, আবিদ ও ফকীহ আবু ইসমাহ নূহ ইবনু আবু মারিয়াম (১৭৩ হি)। হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তার চৌকস পাণ্ডিত্যের কারণে তাকে 'আল-জামি' বলা হতো। খলীফা মানসূরের সময়ে (১৩৬-১৫৮ হি) তাকে খোরাসানের মারভ অঞ্চলের বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। তাকে সে এলাকার অন্যতম আলিম বলে গণ্য করা

হতো। মু'তাযিলা, জাহমিয়া, আহলুর রাই ফকীহ ও বিদ'আতী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ছিলেন।

এত কিছু সত্ত্বেও তিনি হাদীসের নামে মিথ্যা কথা বলতেন। তিনি কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফযীলতে কিছু হাদীস বর্ণনা করতেন। মুহাদ্দিসগণ তাকে প্রশ্ন করেন: আপনি ইকরিমাহ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে কুরআনের প্রত্যেক সূরার ফযীলতে যে হাদীস বলেন তা আপনি কোথায় পেলেন? ইকরিমাহ-এর ঘনিষ্ট ছাত্রগণ বা অন্য কোনো ছাত্র এ হাদীস বর্ণনা করেন না, অথচ আপনি কিভাবে তা পেলেন? তখন তিনি বলেন: আমি দেখলাম, মানুষ কুরআন ছেড়ে দিয়েছে। তারা আবু হানীফার ফিকহ এবং ইবনু ইসহাকের মাগাযী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এজন্য আমি তাদেরকে কুরআনের দিকে ফিরিয়ে আনতে এ হাদীস বানিয়েছি।[১৯৭]

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আবিদ, আলিম ও ওয়ায়িয আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু গালিব গুলাম খালীল (২৭৫ হি)। তিনি রাজধানী বাগদাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংসারত্যাগী আবিদ বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সর্বদা শাক সব্জি খেতেন, অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ওয়ায করতেন। 'আহলুর রাই' বলে কথিত (হানাফী) ফকীহগণের বিরুদ্ধে, মু'তাযিলা, শিয়া, কাদারিয়া, জাবারিয়া ও অন্যান্য বিদআতী মতের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। সাধারণের মধ্যে তার ওয়াজের প্রভাব ছিল অনেক। শ্রোতাদের মন নরম করতে ও তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে তিনি নিত্যনতুন গল্প কাহিনী হাদীসের নামে জালিয়াতি করে বলতেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নামে সনদ তৈরি করে তিনি মিথ্যা হাদীসগুলো বলতেন।

আবু জা'ফার ইবনুশ শুআইরী বলেন, একদিন গুলাম খালীল হাদীস বলতে গিয়ে বলেন, আমাকে বাকর ইবনু ঈসা (২০৪ হি) বলেছেন, তিনি আবু উওয়ানা থেকে....। আমি বললাম, বাকর ইবনু ঈসা তো অনেক পুরাতন মানুষ। ইমাম আহমাদ (২৪১ হি) ও তাঁর প্রজন্মের মানুষেরা তার কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। আপনি তাকে জীবিত দেখেন নি। একথা বলার পরে তিনি চুপ করে চিন্তা করতে থাকেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তিনি আমার বিরুদ্ধে কিছু বলে ফেলেন কিনা। এজন্য আমি বললাম: হতে পারে যে, আপনার উস্তাদ বাকর ইবনু ঈসা অন্য আরেক ব্যক্তি। তিনি চুপ করে থাকলেন। পরদিন তিনি আমাকে বললেন: আমি গতরাতে চিন্তা করে দেখেছি, বসরায় আমি 'বাকর ইবনু ঈসা' নামের ৬০ ব্যক্তির কাছ থেকে হাদীস শুনেছি![১৯৮]

মিথ্যার বাহাদুরি দেখুন! হাদীসের 'নকিদ' ইমামদের কাছে এ ধরনের 'ঠান্ডা' মিথ্যার কোনো মূল্য নেই। বসরায় কোন্ যুগে কতজন 'রাবী' ছিলেন নামধামসহ তাদের বর্ণিত হাদীস তারা সংগ্রহ ও সংকলিত করেছেন। এজন্য এরা অনেক সময় এঁদের কাছে জালিয়াতি স্বীকার করতে বাধ্য হতো।

চতুর্থ শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনু আদী (৩৬৫ হি) বলেন, হাদীস সংগ্রহের সফরে যখন হাররান শহরে ছিলাম তখন আবু আরূবার মাজলিসে আবু আব্দুল্লাহ নাহাওয়ান্দী বলেন, আমি গুলাম খালীলকে বললাম, শ্রোতাদের হৃদয়-কাড়া যে হাদীসগুলো বলছেন সেগুলো কোথায় পেলেন? তিনি বলেন: মানুষের হৃদয় নরম করার জন্য আমি এগুলো বানিয়েছি।[১৯৯]

এ সকল নেককার মানুষের জালিয়াতির ক্ষতি সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রের সকল ইমামই আলোচনা করেছেন। ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে ইবনুস সালাহ, নাবাবী ও ইরাকীর বক্তব্য দেখেছি। এ বিষয়ে আল্লামা সাইয়্যেদ শরীফ জুরজানী হানাফী (৮১৬ হি.) লিখেছেন: "মাওযূ বা বানোয়াট হাদীসের প্রচলনে সবচেয়ে ক্ষতি করেছেন দুনিয়াত্যাগী দরবেশগণ, তাঁরা অনেক সময় সাওয়াবের নিয়্যাতেও মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলেছেন।"[২০০]

ইবন হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) বলেন : "বর্ণিত আছে যে, কোনো কোনো সূফী সাওয়াবের বর্ণনায় ও পাপাচারের শাস্তির বর্ণনায় মিথ্যা হাদীস বানানো ও প্রচার করা জায়েয বলে মনে করতেন।"[২০১]

সুয়ূতী (৯১১ হি) বলেন, জালিয়াতির উদ্দেশ্য অনুসারে মিথ্যাবাদী জালিয়াতগণ বিভিন্ন প্রকারের। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকর ছিলেন কিছু মানুষ যাদেরকে সংসারত্যাগী নির্লোভ নেককার বলে মনে করা হতো। তাঁরা তাঁদের বিভ্রান্তির কারণে আল্লাহর কাছে সাওয়াব পাওয়ার আশায় মিথ্যা হাদীস বানাতেন।... (২য় শতকের প্রখ্যাত দরবেশ) আবু দাউদ নাখয়ী সুলাইমান ইবনু আমর রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায়ে ও দিনের পর দিন নফল সিয়াম পালনে ছিলেন অতুলনীয়। তা সত্ত্বেও তিনি মিথ্যা হাদীস বানিয়ে প্রচার করতেন।... আবু বিশর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী খোরাসানের অন্যতম ফকীহ, আবিদ ও সুন্নাতের সৈনিক ছিলেন। সুন্নাতের পক্ষে এবং বিদ'আত ও বিদ'আতপন্থীদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়গহস্ত। কিন্তু তিনি মিথ্যা কথাকে হাদীসের নামে প্রচার করতেন। ... ওয়াহ্ব ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হাফস (২৫০ হি) তার যুগের অন্যতম নেককার আবিদ ও ওয়ায়িয ছিলেন। ২০ বছর তিনি কারো সাথে কোনো জাগতিক কথা বলেন নি। তিনিও হাদীসের নামে জঘন্য মিথ্যা কথা বলতেন।[২০২]

আল্লামা আলী কারী (১০১৪ হি.) লিখেছেন: অত্যধিক ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত সংসারত্যাগী দরবেশগণ শবে-বরাতের নামায, রজব মাসের নামায ইত্যাদি বিভিন্ন ফযীলতের বিষয়ে অনেক বানোয়াট কথা হাদীস নামে প্রচার করেছেন। তাঁরা মনে করতেন এতে তাঁদের

সাওয়াব হবে, দীনের খেদমত হবে। বানোয়াট হাদীসের ক্ষেত্রে নিজেদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন এ সকল মানুষ। তাঁরা এ কাজকে নেককাজ ও সাওয়াবের কাজ মনে করতেন, কাজেই তাঁদেরকে কোনো প্রকারেই বিরত রাখা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে তাঁদের নেককর্ম, সততা, ইবাদত বন্দেগি ও দরবেশীর কারণে সাধারণ মুসলিম ও আলিমগণ তাঁদের ভালবাসতেন ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের কথাবার্তা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতেন ও বর্ণনা করতেন। অনেক সময় ভালো মুহাদ্দিসও তাঁদের আমল আখলাকে ধোঁকা খেয়ে তাঁদের বানোয়াটি ও মিথ্যা হাদীস অসতর্কভাবে গ্রহণ করে নিতেন।[২০৩]

## ৫. ৪. আমীরদের মোসাহেবগণ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যগুলো মুলত ধর্মীয়। ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়াও জাগতিক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অনেক মানুষ হাদীস বানিয়েছেন। অর্থ কামাই, সম্মান বা সুনাম অর্জন, রাজা-বাদশাহদের দৃষ্টি আকর্ষণ, দরবারে মর্যাদা লাভ, রাজনৈতিক বা গোষ্ঠিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে তারা হাদীস বানিয়েছেন।

শাসক-প্রশাসকদের কাছে যাওয়ার ও তাদের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য মানুষ অনেক কিছুই করে থাকে। দ্বিতীয় হিজরী শতকে কোনো কোনো দুর্বল ঈমান 'আলিম' খলীফা বা আমীরদের মন জয় করার জন্য তাদের পছন্দ মোতাবেক হাদীস বানানোর চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস যুহাইর ইবনু হারব (২৩৪ হি) বলেন: তৃতীয় আব্বাসী খলীফা মুহাম্মাদ মাহ্দী (রাজত্ব ১৫৮-১৬৯ হি)-এর দরবারে কয়েকজন মুহাদ্দিস আগমন করেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন গিয়াস ইবনু ইবরাহীম আন-নাখয়ী। খলীফা মাহ্দী উন্নত জাতের কবুতর উড়াতে ও কবুতরের প্রতিযোগিতা করাতে ভালবাসতেন। খলীফার পছন্দের দিকে লক্ষ্য করে গিয়াস নামক এ ব্যক্তি তার সনদ উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তীর নিক্ষেপ, ঘোড়া ও পাখি ছাড়া আর কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।' একথা শুনে মাহদী খুশী হন এবং উক্ত মুহাদ্দিসকে ১০ হাজার টাকা হাদিয়া প্রদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু যখন গিয়াস দরবার ত্যাগ করছিলেন তখন মাহদী বলেন, আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি মিথ্যা বলেছেন। আমি আপনাকে মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করেছি। তিনি কবুতরগুলো জবাই করতে নির্দেশ দেন। তিনি আর কখনো উক্ত মুহাদ্দিসকে তার দরবারে প্রবেশ করতে দেন নি।[২০৪]

এখানে লক্ষণীয় যে, মূল হাদীসটি সহীহ, যাতে ঘোড়দৌড়, উটদৌড় ও তীর নিক্ষেপে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদানে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।[২০৫] এ ব্যক্তি খলীফার মনোরঞ্জনের জন্য সেখানে 'পাখি' শব্দটি যোগ করেছে।

পঞ্চম আব্বাসী খলীফা হারূন আর-রাশীদ (শাসনকাল ১৯৩-১৭০ হি) রাষ্ট্রীয় সফরে মদীনা আগমন করেন। তিনি মসজিদে নাবাবীর মিম্বারে উঠে বক্তৃতা প্রদানের ইচ্ছা করেন। তাঁর পরনে ছিল কাল শেরোয়ানী। তিনি এ পোশাকে মিম্বারে নাবাবীতে আরোহণ করতে দ্বিধা করছিলেন। মদীনার মশহুর আলিম ও বিচারক ওয়াহ্ব ইবনু ওয়াহ্ব আবুল বুখতুরী তখন বলেন: আমাকে জা'ফর সাদিক বলেছেন, তাঁকে তাঁর পিতা মুহাম্মাদ আল-বাকির বলেছেন, জিবরাঈল (আ) কালো শেরোয়ানী পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করেন।[২০৬]

এভাবে তিনি খলীফার মনোরঞ্জনের জন্য একটি মিথ্যা কথাকে হাদীস বলে চালালেন। আবুল বুখতুরী হাদীস জালিয়াতিতে খুবই পারদর্শী ছিলেন।

## ৫. ৫. গল্পকার ওয়ায়েযগণ

ওয়াযের মধ্যে শ্রোতাদের দৃষ্টি-আকর্ষণ, মনোরঞ্জন, তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার ও নিজের সুনাম, সুখ্যাতি ও নগদ উপার্জন বৃদ্ধির জন্য অনেক মানুষ ওয়াযের মধ্যে বানোয়াট কথা হাদীস নামে বলেছেন। মিথ্যা ও জাল হাদীসের প্রসারে এসকল ওয়ায়েয ও গল্পকারদের ভূমিকা ছিল খুব বড়। হাদীসের নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলতে এদের দুঃসাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিতা ছিল খুবই বেশি। তাদের অনেকেই শ্রোতাদের অবাক করে পকেট খালি করার জন্য শ্রোতাদের চাহিদা মত মিথ্যা বানিয়ে নিতেন দ্রুত। এছাড়া কোনো জালিয়াতের জাল হাদীস বা গল্প কাহিনী আকর্ষণীয় হলে অন্যান্য ওয়ায়িয জালিয়াতরা তা চুরি করত এবং নিজের নামে সনদ বানিয়ে প্রচার করত।[২০৭]

এদের বুদ্ধি ও দুঃসাহসের নমুনা দেখুন। তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩ হি) ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি)। তৃতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে বাগদাদে ও পুরো মুসলিম বিশ্বে তাঁদের পরিচিতি। তাঁরা দুজন একদিন বাগদাদের এক মসজিদে সালাত আদায় করেন। সালাতের পরে একজন ওয়ায়িয ওয়ায করতে শুরু করেন। ওয়াযের মধ্যে তিনি বলেন: আমাকে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন দুজনেই বলেছেন, তাঁদেরকে আব্দুর রাযযাক, তাঁকে মা'মার, তাকে কাতাদাহ, তাকে আনাস বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে তবে এর প্রত্যেক অক্ষর থেকে একটি

পাখি তৈরি করা হয়, যার ঠোঁট স্বর্ণের, পালকগুলো মহামূল্য পাথরের.... । এভাবে সে তার আজগুবি গল্প ও অগণিত সাওয়াবের কাল্পনিক কাহিনী বর্ণনা করে। ওয়ায শেষে উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকেই তাকে কিছু কিছু 'হাদিয়া' প্রদান করেন।

ওয়ায চলাকালীন সময়ে আহমাদ ও ইয়াহইয়া অবাক হয়ে একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করেন, এ হাদীস কি আপনি সে ব্যক্তিকে বলেছেন? উভয়েই বলেন, জীবনে আজই প্রথম এ 'হাদীস'টি শুনছি। ওয়ায শেষে মানুষের ভীড় কমে গেলে ইয়াহইয়া লোকটিকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করেন। লোকটি কিছু হাদীয়া পাবে ভেবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে। ইয়াহইয়া তাকে জিজ্ঞাসা করেন, এ হাদীসটি তোমাকে কে বলেছেন? সে বলে: ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল। তিনি বলেন: আমি তো ইয়াহইয়া এবং ইনি আহমাদ। আমরা দুজনের কেউই এ হাদীস জীবনে শুনিনি, কাউকে শেখানো তো দূরের কথা। মিথ্যা যদি বলতেই হয় অন্য কারো নামে বল, আমাদের নামে বলবে না। তখন লোকটি বলে, আমি সবসময় শুনতাম যে, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন একজন আহাম্মক এখন সে কথার প্রমাণ পেলাম। ইয়াহইয়া বলেন, কিভাবে? সে বলে, আপনারা কি মনে করেন যে, দুনিয়াতে আপনারা ছাড়া আর কোনো ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল নেই? আমি আপনার সাথী আহমাদ ছাড়া ১৬ জন আহমাদ ইবনু হাম্বালের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেছি। একথা শুনে আহমাদ ইবনু হাম্বাল মুখে কাপড় দিয়ে বলেন, লোকটিকে যেতে দিন। তখন লোকটি দুজনের দিকে উপহাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে গেল।[২০৮]

৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুসতী (৩৫৪ হি) বলেন: আমি আমার হাদীস সংগ্রহের সফর কালে সিরিয়ার 'তাজরোয়ান' নামক শহরে প্রবেশ করি। শহরের জামে মসজিদে সালাত আদায়ের পরে এক যুবক দাঁড়িয়ে ওয়ায শুরু করে। ওয়াযের মধ্যে সে বলে: আমাকে আবু খালীফা বলেছেন, তাঁকে ওয়ালীদ বলেছেন, তাঁকে শু'বা বলেছেন, তাঁকে কাতাদা বলেছেন, তাঁকে আনাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি কেউ কোনো মুসলিমের প্রয়োজন পূরণ করে তাহলে আল্লাহ তাকে এত এত পুরস্কার প্রদান করবেন... এভাবে সে অনেক কথা বলে। তার কথা শেষ হলে আমি তাকে ডেকে বললাম, তোমার বাড়ি কোথায়? সে বলে: আমি বারদায়া এলাকার মানুষ। আমি বললাম, তুমি কি কখনো বসরায় গিয়েছ? সে বলল: না। আমি বললাম: তুমি কি আবু খালীফাকে দেখেছ? সে বলল: না। আমি বললাম: তাহলে কিভাবে তুমি আবু খালীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করছ, অথচ তুমি তাকে কোনোদিন দেখনি? যুবকটি বলল: এ বিষয়ে প্রশ্ন করা ভদ্রতা ও আদবের খেলাফ। এ একটি মাত্র সনদই আমার মুখস্থ আছে। আমি যখনই কোনো হাদীস বা কথা কারো মুখে শুনি, আমি তখন সে কথার আগে এ সনদটি বসিয়ে দিয়ে কথাটি বর্ণনা করি। ইবনু হিব্বান বলেন, তখন আমি যুবকটিকে রেখে চলে আসলাম।[২০৯]

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি) বলেন, আমাদের এলাকায় একজন ওয়ায়িয আছেন। তিনি বাহ্যত পরহেযগার ও আল্লাহভীরু মানুষ। কাজে কর্মে দরবেশী ও তাকওয়া প্রকাশ করেন। তার বিষয়ে আমাকে আমার দুজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য আলিম বন্ধু বলেছেন, এক আশুরার দিনে ঐ লোকটি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আশুরার দিনে এ কাজ করবে তার এই পুরস্কার, যে এ কাজ করবে তার এ পুরস্কার... এভাবে অনেক কাজের অনেক প্রকার পুরস্কার বিষয়ক অনেক হাদীস তিনি বলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এই হাদীসগুলো আপনি কোথা থেকে মুখস্থ করলেন? তিনি বলেন: আল্লাহর কসম, আমি কখনোই হাদীসগুলো শিখিনি বা মুখস্থ করিনি। এ মুহূর্তেই এগুলো আমার মনে এল এবং আমি বললাম।[২১০]

ইবনুল জাওযী বলেন, আমার সমকালীন একজন ওয়ায়িয এসব মিথ্যা হাদীস দিয়ে একটি বইও লিখেছে। সে বইয়ের একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ:

একদিন হাসান (রা) ও হুসাইন (রা) খলীফা উমার (রা) এর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন। উমার (রা) ব্যস্ত ছিলেন। হাতের কাজ শেষ করে মাথা উঠিয়ে তিনি তাঁদের দুজনকে দেখতে পান। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে চুমু খান, প্রত্যেককে ১০০০ মুদ্রা প্রদান করেন এবং বলেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাদের আগমন বুঝতে পারিনি। তাঁরা দুজন ফিরে যেয়ে তাঁদের পিতা আলী (রা)-এর কাছে উমারের আদব ও বিনয়ের কথা উল্লেখ করেন। তখন আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, উমার ইবনুল খাত্তাব ইসলামের নূর ও জান্নাতবাসীদের প্রদীপ। তাঁরা দুজন উমারের কাছে ফিরে যেয়ে তাঁকে এ হাদীস শোনান। তখন তিনি কাগজ ও কালি চেয়ে নিয়ে লিখেন: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, জান্নাতের যুবকদের দুই নেতা আমাকে বলেছেন, তাঁরা তাঁদের পিতা আলী মুরতাযা থেকে, তাঁদের নানা নবী মুসতাফা (ﷺ) থেকে, তিনি বলেছেন, উমার ইসলামের নূর ও জান্নাতবাসীদের প্রদীপ। উমার ওসীয়ত করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে যেন তাঁর কাফনের মধ্যে বুকের উপরে এ কাগজটি রাখা হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ওসীয়ত মত কাজ করা হয়। পরদিন সকালে সকলে দেখতে পান যে, কাগজটি কবরের উপরে রয়েছে এবং তাতে লিখা রয়েছে: হাসান ও হুসাইন সত্য বলেছেন, তাঁদের পিতা সত্য বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন, উমার ইসলামের নূর ও জান্নাতবাসীদের প্রদীপ।

ইবনুল জাওযী বলেন, সবচেয়ে দুঃখ ও আফসোসের বিষয় হলো, এ জঘন্য বানোয়াট মিথ্যা ও আজগুবি কথা লিখেই সে

সন্তুষ্ট থাকে নি। আমাদের যুগের অনেক আলিমকে তা দেখিয়েছে। হাদীসের সনদ ও বিশুদ্ধতা বিষয়ক জ্ঞানের অভাব আলিমদের মধ্যেও এত প্রকট যে, অনেক আলিম এ জঘন্য মিথ্যাকেও সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন।[২১১]

### ৫. ৬. আঞ্চলিক, পেশাগত বা জাতিগত বৈরিতা

বিভিন্ন বংশ, জাতি, দেশ বা শহরের মানুষেরা নিজেদের প্রাধান্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক সময় জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। আরব জাতি ও আরবী ভাষা এবং পারসিক জাতি ও ফার্সী ভাষার পক্ষে ও বিপক্ষে হাদীস জালিয়াতি করা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণের বা পেশার পক্ষে বা বিপক্ষে হাদীস বানানো হয়েছে। এ সকল বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে: 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ভাষা হলো ফারসী ভাষা।' 'আল্লাহ যখন ক্রোধান্বিত হন তখন আরবীতে ওহী নাযিল করেন। আর যখন তিনি সন্তুষ্ট থাকেন তখন ফার্সী ভাষায় ওহী নাযিল করেন।' 'আরশের আশেপাশে যে সকল ফিরিশতা রয়েছেন তারা ফার্সী ভাষায় কথা বলেন।' অনুরূপভাবে তাঁতীদের বিরুদ্ধে, স্বর্ণকারদের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য পেশার বিরুদ্ধে কুৎসা ও নিন্দা মূলক হাদীস তৈরি করা হয়েছে পেশাগত হিংসাহিংসির কারণে।

বিভিন্ন শহর, দেশ বা জনপদের ফযীলতে বা নিন্দায় হাদীস বানানো হয়েছে। বলতে গেলে তৃতীয় হিজরী শতকের পরিচিত প্রায় সকল শহর ও দেশের প্রশংসায় বা নিন্দায় হাদীস বানানো হয়েছে। মক্কা, মদীনা ইত্যাদি যে সকল শহরের ফযীলতে সহীহ হাদীস রয়েছে সেগুলোর জন্যও অনেক 'চিত্তাকর্ষক' জাল হাদীস বানানো হয়েছে।[২১২]

### ৫. ৭. প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা

আমরা বলেছি যে, তৎকালীন যুগে সনদ ও মতন ছিল হাদীসের অবিচ্ছেদ্য দুটি অংশ। সনদ ও মতনের সমন্বিত রূপকেই হাদীস বলা হত। এ সমন্বিতরূপের হাদীস মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। অনেক সময় কোনো মুহাদ্দিস প্রসিদ্ধির বা স্বকীয়তার জন্য এ সমন্বিত রূপের মধ্যে পরিবর্তন করতেন। এক সনদের হাদীস অন্য সনদে বা এক রাবীর হাদীস অন্য রাবীর নামে বর্ণনা করতেন। মিথ্যার প্রকারভেদের মধ্যে আমরা মিথ্যা সনদ বানানোর বিষয়ে দু একটি উদাহরণ উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ।

## ৬. মিথ্যার প্রকারভেদ

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় 'হাদীসের নামে মিথ্যা' বলার বিভিন্ন প্রকার ও পদ্ধতি রয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আমরা সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করব।

### ৬. ১. সনদে মিথ্যা

'সনদ' ও 'মতন' এর সম্মিলিত রূপই হাদীস। হাদীস বানাতে হলে সনদ জালিয়াতি অত্যাবশ্যক। আবার অনেক সময় সনদ জালিয়াতিই ছিল জালিয়াতের মূখ্য উদ্দেশ্য। মিথ্যাবাদীগণ তাদের উদ্দেশ্য ও সামর্থ্য অনুসারে সনদে জালিয়াতি করত। এদের জালিয়াতি কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

#### ৬. ১. ১. বানোয়াট কথার জন্য বানোয়াট সনদ

সনদ ছাড়া কোনো হাদীস গ্রহণ করা হতো না। কাজেই একটি মিথ্যা কথাকে হাদীস বলে চালাতে হলে তার সাথে একটি সনদ বলতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জালিয়াতগণ নিজেরা মনগড়াভাবে বিভিন্ন সুপরিচিত আলিমদের নামে একটি সনদ বানিয়ে নিত। অথবা তাদের মুখস্থ কোনো সনদ সকল বানোয়াট হাদীসের আগে জুড়ে দিত। আমরা উপরে আলোচিত বিভিন্ন বানোয়াট হাদীসে এর উদাহরণ দেখতে পেয়েছি। এভাবে অধিকাংশ বানোয়াট হাদীসের সনদও মনগড়া। একটি উদাহরণ দেখুন:

ইমাম ইবনু মাজাহ বলেন আমাকে সাহল ইবনু আবী সাহল ও মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বলেছেন তাদেরকে আব্দুস সালাম ইবনু সালিহ আবুস সালত হারাবী বলেছেন: আমাকে আলী রেযা, তিনি তাঁর পিতা মুসা কাযিম, তিনি তাঁর পিতা জা'ফর সাদিক, তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মাদ বাকির, তিনি তার পিতা আলী যাইনুল আবেদীন, তিনি তাঁর পিতা ইমাম হুসাইন (রা), তিনি তাঁর পিতা আলী (রা) থেকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

اَلإِيْمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ

"ঈমান হলো অন্তরের জ্ঞান, মুখের কথা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্ম।"[২১৩]

তাহলে অন্তরের জ্ঞান, মুখের স্বীকৃতি ও কর্মের বাস্তবায়নের সামষ্টিক নাম হলো ঈমান বা বিশ্বাস। কথাটি খুবই আকর্ষণীয়। অনেক তাবিয়ী ও পরবর্তী আলিম এভাবে ঈমানের পরিচয় প্রদান করেছেন। ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ ইবনু হাম্বাল প্রমুখ এ মত গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা বলেন: ঈমান মূলত মনের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতির নাম। কর্ম ঈমানের অংশ নয়, ঈমানের দাবী ও পরিণতি। ঈমান ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম। এ হাদীসটি সহীহ হলে তা ইমাম আবু হানীফার মতের বিভ্রান্তি প্রমাণ করে। কিন্তু

মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষায় হাদীসটি ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পাঠক লক্ষ্য করুন। এ সনদের রাবীগণ রাসূলুল্লাহর (ﷺ) বংশের অন্যতম বুযুর্গ ও শিয়া মযহাবে ১২ ইমামের ৭ জন ইমাম। এ জন্য সহজেই আমরা সরলপ্রাণ মানুষেরা ধোঁকা খেয়ে যাই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের হেফাজতে নিয়োজিত মুহাদ্দিসগণকে এভাবে প্রতারণা করা সম্ভব ছিল না। তাঁরা তাঁদের নিয়মে হাদীসটি পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা তাদের নিরীক্ষায় দেখেছেন যে, সনদে উল্লিখিত ৭ প্রসিদ্ধ ইমামের কোনো ছাত্র এ হাদীসটি বর্ননা করেন নি এবং অন্য কোনো সনদেও হাদীসটি বর্ণিত হয় নি।

শুধু আব্দুস সালাম আবুস সাল্ত দাবী করলেন যে, ইমাম আলী রেযা (২০৩হি:) তাকে এ হাদীসটি বলেছেন। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের ২০০ বছর পরে এসে আবুস সাল্ত নামের এ ব্যক্তি হাদীসটি প্রচার করছেন। মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন যে, আবূস সাল্ত আব্দুস সালাম নামক এই ব্যক্তি অনেক হাদীস শিক্ষা করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে অগণিত ভুল। তিনি এমন সব হাদীস বিভিন্ন মুহাদ্দিস ও আলেমের নামে বলেন যা তাদের অন্য কোন ছাত্র বলেন না। এতে প্রমাণিত হয় যে তিনি হাদীস ঠিকমত মুখস্থ রাখতে পারতেন না। তবে তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা হাদীস বলতেন কিনা তা নিয়ে তাঁরা কিছুটা দ্বিধা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও কতিপয় ইমাম বলেছেন যে, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ভাল ছিলেন বলেই দেখা যায়। শিয়া হলেও বাড়াবাড়ি করতেন না। কিন্তু তিনি অগণিত উল্টোপাল্টা ও ভিত্তিহীন (মুনকার) হাদীস বলেছেন, যা আর কোন বর্ণনাকারী কখনো বর্ণনা করেন নি। তবে তিনি ইচ্ছা করে মিথ্যা বলতেন না বলে বুঝা যায়। অপরপক্ষে আল-জুযানী, উকাইলী প্রমুখ ইমাম বলেছেন যে, তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন।[২১৪]

যারা তিনি অনিচ্ছাকৃত ভুল বলেছেন বলে মনে করেছেন তাঁরা হাদীসটিকে "বাতিল", "ভিত্তিহীন" "খুবই যয়ীফ" ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন। আর যারা তাকে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবাদী বলে দেখেছেন, তাঁরা হাদীসটিকে "মাওযূ", বা বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন।[২১৫]

অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনুল কাইয়িম মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৭৫১ হি) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন ও কর্মকে ঈমানের অংশ বলে গণ্য করতেন। তাঁর মতে ঈমান হলো অন্তরের জ্ঞান, মুখের স্বীকৃতি ও বিধিবিধান পালন। তিনি এ মতের পক্ষে দীর্ঘ আলোচনার পরে বলেন, তবে এ বিষয়ে আব্দুস সালাম ইবনু সালিহ বর্ণিত যে হাদীসটি ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন, সে হাদীসটি মাউযূ, তা রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর কথা নয়।"[২১৬]

আমরা দেখছি যে, এ সনদের সকল রাবী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। এ হলো জাল হাদীসের একটি বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জালিয়াতগণ তাদের জালিয়াতি চালানোর জন্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে সনদ তৈরী করতো। তাদের এ জালিয়াতি সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিলেও নিরীক্ষক মুহাদ্দিসদের ধোঁকা দিতে পারত না। কারণ সনদে জালিয়াতের নাম থেকে যেত। জালিয়াত যাকে উস্তাদ বলে দাবী করেছে তার নাম থাকত। উস্তাদের অন্যান্য ছাত্রের বর্ণিত হাদীস এবং এ জালিয়াতের বর্ণিত হাদীসের তুলনা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ জালিয়াতি ধরে ফেলতেন।

জালিয়াতির আরেকটি উদাহরণ দেখুন। ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি বলেন: আমাকে সাওর ইবনু ইয়াযিদ (১৫৫হি:) বলেছেন, তিনি খালিদ ইবনু মা'দান (মৃ: ১০৩ হি:) থেকে, তিনি মু'আয ইবনু জাবাল থেকে বর্ণনা করেছেন, আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কি বিনা ওযূতে কুরআন স্পর্শ করতে পারব? তিনি বলেন: হাঁ, তবে যদি গোসল ফরয থাকে তাহলে কুরআন স্পর্শ করবে না। আমরা বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহলে কুরআনের বাণী: (পবিত্রগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করে না)[২১৭] এর অর্থ কি? তিনি বলেন: এর অর্থ হলো: কুরআনের সাওয়াব মুমিনগণ ছাড়া কেউ পাবে না।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ হাদীসটি বানোয়াট। হাদীসের ইমামগণ ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ (আবী যিয়াদ) নামক এ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসসমূহ সংগ্রহ করে অন্যান্য সকল বর্ণনার সাথে তার তুলনামূলক নিরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছেন যে, এ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস কোনটিই সঠিক নয়। তিনি একজন ভাল আলিম ছিলেন ও মাওসিল নামক অঞ্চলের বিচারক ছিলেন। কিন্তু তিনি শু'বা (১৬০হি:), ইবনু জুরাইজ (১৫০হি:), সাওর (১৫৫হি:) প্রমুখ তৎকালীন বিভিন্ন সুপরিচিত মুহাদ্দিসের নামে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন যা তারা কখনো বলেন নি বা তাদের কোন ছাত্র তাদের থেকে বর্ণনা করেন নি।

যেমন এখানে সাওর-এর নামে তিনি হাদীসটি বলেছেন। সাওর দ্বিতীয় হিজরী শতকের সিরিয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তাঁর অগণিত ছাত্র ছিল। অনেকে বছরের পর বছর তাঁর কাছে থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। কোনো ছাত্রই তার থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করে নি। অথচ ইসমাঈল তার নামে এ হাদীসটি বললেন। অবস্থা দেখে মনে হয় তিনি ইচ্ছাপূর্বক এভাবে বানোয়াট হাদীস বলতেন। ইমাম দারাকুতনী, ইবনু আদী, ইবনু হিব্বান, ইবনুল জাওযী ও অন্যান্য ইমাম এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন,

তাকে দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদী বলেছেন। তার বর্ণিত সকল হাদীস, যা শুধুমাত্র তিনিই বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ বর্ণনা করেনি, এরূপ সকল হাদীসকে তাঁরা মাওযূ বা বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন।

এ ইসমাঈল বর্ণিত আরেকটি বানোয়াট ও মিথ্যা কথা যা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন: আমাকে গালিব আল-কাত্তান, তিনি আবু সাঈদ মাকবুরী থেকে তিনি আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أَبْغَضُ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ الْفَارِسِيَّةُ وَكَلاَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ভাষা হলো ফার্সী ভাষা, আর জান্নাতের অধিবাসীদের ভাষা হলো আরবী ভাষা।"[২১৮]

**৬. ১. ২. প্রচলিত হাদীসের জন্য বানোয়াট সনদ**

আমরা দেখেছি যে, অনেক সময় জালিয়াতের উদ্দেশ্য হতো নিজের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তারা প্রচলিত 'মতন' বা বক্তব্যের জন্য বিশেষ সনদ তৈরি করত। এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

ইমাম মালিক ২য় হিজরী শতকের মুহাদ্দিসগণের অন্যতম ইমাম। তিনি তাঁর উস্তাদ নাফি' থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এজন্য (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) "মালিক, নাফি' থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে" অত্যন্ত সহীহ ও অতি প্রসিদ্ধ সনদ। এ সনদে বর্ণিত সকল হাদীসই মুহাদ্দিসগণের কাছে সংরক্ষিত। তৃতীয় হিজরী শতকের একজন রাবী আব্দুল মুনইম ইবনু বাশীর বলেন, আমাকে মালিক বলেছেন, তিনি নাফি' থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا

"হে আল্লাহ, আমার উম্মতের জন্য তাদের সকালের সময়ে বরকত দান করুন।"[২১৯]

৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা খালীল ইবনু আব্দুল্লাহ আল-খালীলী (৪৪৬ হি) বলেন: এটি একটি মাউদূ বা বানোয়াট হাদীস। আব্দুল মুনইম নামক এ ব্যক্তি ছিল একজন মিথ্যাবাদী জালিয়াত। ইমাম আহমদের পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, আমি একদিন আমার পিতাকে বললাম: আমি আব্দুল মুনইম ইবনু বাশীরকে বাজারে দেখলাম। তিনি বলেন: বেটা, সে মিথ্যাবাদী জালিয়াত এখনো বেঁচে আছে? এ হাদীস এ সনদে একেবারেই ভিত্তিহীন ও অস্তিত্বহীন। কখনোই কেউ তা মালিক থেকে বা নাফি' থেকে বর্ণনা করেনি। এ হাদীস মূলত সাখর আল-গামিদী নামক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।[২২০]

এখানে আমরা দেখছি যে, আল্লামা খালীলী হাদীটিকে মাউযূ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আবার তিনি নিজেই উল্লেখ করছেন যে, হাদীসটি অন্য সাহাবী থেকে বর্ণিত। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, এ সনদে এ হাদীসটি মাউদূ। এ সনদ ও মতনের সম্মিলিত রূপটি বানোয়াট। তিনি সংক্ষেপে মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষার ফলাফলও বলে দিয়েছেন। ইমাম মালিকের অগণিত ছাত্রের কেউ এই হাদীসটি তাঁর সূত্রে এ সনদে বর্ণনা করেনি। একমাত্র আব্দুল মুনইম দাবী করছে যে, ইমাম মালিক তাকে হাদীসটি বলেছেন। আর আব্দুল মুনইমের বর্ণিত অন্যান্য সকল হাদীসের আলোকে মুহাদ্দিসগণ তার মিথ্যাচার ধরেছেন এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন।

লক্ষণীয় যে, সনদটি জাল হলেও হাদীসের মতনটি মিথ্যা নয়। মতনটি অন্য বিভিন্ন সনদে সাখর আল-গামিদী ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষায় তা সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে।[২২১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, আব্দুল মুনইম একটি প্রচলিত ও সহীহ 'মতন' এর জন্য একটি 'সুপ্রসিদ্ধ সহীহ সনদ' জাল করেছে। আর সে যুগে প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য এরূপ বানোয়াট সনদের কি গুরুত্ব ছিল তা আমাদের যুগে অনুধাবন করা অসম্ভব। মুহাদ্দিসগণ সাখার আল-গামিদীর সূত্রে হাদীসটি জানতেন। কিন্তু তাঁরা যখনই শুনেছেন যে, অমুক শহরে এক ব্যক্তি মালিকের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে হাদীসটি বর্ণনা করছেন তখন তাঁরা তার কাছে গিয়েছেন, তার হাদীস লিখেছেন ও নিরীক্ষা করেছেন। যখন নিরীক্ষার মাধ্যমে লোকটির জালিয়াতি ধরা পড়েছে তখন তারা তা প্রকাশ করেছেন। আবার অন্যান্য মুহাদ্দিস তার কাছে গিয়েছেন। মোটামুটি লোকটি বেশ মজা অনুভব করেছে যে, কত মানুষ তার কাছে হাদীস শুনতে আসছে! কিভাবে সে সবাইকে বোকা বানাচ্ছে!! কিন্তু তার জালিয়াতি যে ধরা পড়বে তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় নি। কোনো জালিয়াতই ধরা পড়ার চিন্তা করে জালিয়াতি করে না।

ইবরাহীম ইবনুল হাকাম ইবনু আবান তৃতীয় হিজরী শতকের একজন হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি এভাবে হাদীস বর্ণনায় কিছু জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করতেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের মত প্রসিদ্ধ ইমামও তার কাছে হাদীস শিখতে গমন করেন। ইমাম

আহমাদ পরবর্তীকালে বলতেন: "ইবরাহীম ইবনুল হাকামের কাছে হাদীস শিখতে বাগদাদ থেকে ইয়ামানের এডেন পর্যন্ত সফর করলাম। সফরের টাকাগুলো 'ফী সাবিলিল্লাহ' চলে গেল!"[২২২]

### ৬. ১. ৩. সনদের মধ্যে কমবেশি করা

রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর কথা যেভাবে শুনতে হবে ঠিক অবিকল সেভাবেই বলতে হবে। সনদের মধ্যে কমবেশি করাও জালিয়াতি। মুহাদ্দিসগণ এজন্য সনদের মধ্যে কমবেশি করাকে জালিয়াতি বলে গণ্য করেছেন। মাউকূফ বা মাকতূ' হাদীসকে অর্থাৎ সাহাবীর কথা বা তাবিয়ীর কথাকে মারফূ হাদীস রূপে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (ﷺ)-এর কথা রূপে বর্ণনা করা, মুরসাল বা মুনকাতি' হাদীসকে মুত্তাসিল রূপে বর্ণনা করা, সনদের কোনো একজন দুর্বল বর্ণনাকারীর পরিবর্তে অন্য একজন প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীর নাম ঢুকানো বা যে কোনো প্রকারে হাদীসের সনদের মধ্যে পরিবর্তন করা হাদীসের নামে মিথ্যাচার বলে গণ্য। এধরনের মিথ্যাচার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হতে পারে। ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচারী 'মিথ্যাবাদী' ও জালিয়াত বলে গণ্য। অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাচারী অগ্রহণযোগ্য, দুর্বল ও পরিত্যক্ত বলে গণ্য। এ বিষয়ে দু-একটি উদাহরণ দেখুন।

আবু সামুরাহ আহমাদ ইবনু সালিম ২য়-৩য় হিজরী শতকের একজন 'রাবী'। তিনি বলেন: আমাদেরকে শারীক বলেছেন, আ'মাশ থেকে, তিনি আতিয়্যা থেকে তিনি আবু সাঈদ খুদরী থেকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: (علي خير البرية) "আলী সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।"

মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেন যে, আবু সালামাহ আহমাদ ইবনু সালিম অত্যন্ত দুর্বল রাবী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মুহাদ্দিস থেকে তাদের নামে এমন সব হাদীস বর্ণনা করেছেন যা অন্য কেউ বর্ণনা করেন নি। তার একটি মিথ্যা বা ভুল বর্ণনা হলো এ হাদীসটি। এ হাদীসটি শারীক ইবনু আব্দুল্লাহর অন্যান্য ছাত্রও বর্ণনা করেছেন, এছাড়া শারীকের উস্তাদ আ'মাশ থেকে শারীক ছাড়াও অন্য অনেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা বলেছেন: আ'মাশ থেকে, তিনি আতিয়্যাহ থেকে বলেছেন, জাবির (রা) বলতেন: (كنا نعد عليا خيرنا) "আমরা আলীকে আমাদের মধ্যে উত্তম বলে মনে করতাম।"

তাহলে আমরা দেখছি যে, আবু সালামাহ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনটি বিষয় পরিবর্তন করেছেন।

**প্রথমত:** হাদীসটি আতিয়্যাহ জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন, অথচ আবু সালামাহ আতিয়্যার উস্তাদের নাম ভুল করে আবু সাঈদ খুদরী বলে উল্লেখ করেছেন। এভাবে তিনি সনদের মধ্যে সাহাবীর নাম পরিবর্তন করেছেন।

**দ্বিতীয়ত:** তিনি হাদীসটির শব্দ বা মতনও পরিবর্তন করেছেন।

**তৃতীয়ত:** তিনি সনদের মধ্যে পরিবর্তন করে জাবিরের কথাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি মূলত জাবিরের (রা) নিজের কথা, অথচ তিনি একে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই হলো সবচেয়ে মারাত্মক পরিবর্তন। কারণ এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেন নি তা তার নামে বলা হয়েছে, যা অত্যন্ত বড় অপরাধ। কোন সাহাবী, তাবিয়ী বা বুজুর্গের কথা বা জ্ঞান মূলক প্রবাদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা হিসাবে উল্লেখ করা মাওযূ বা বানোয়াট হাদীসের একটি বিশেষ প্রকার।[২২৩] আমরা একটু পরেই বিষয়টি আবারো উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ।

ইবরাহীম ইবনুল হাকাম ইবনু আবান তৃতীয় হিজরী শতকের একজন রাবী। তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে জালিয়াতি করতেন। তবে সনদের মধ্যে। তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিস আব্বাস ইবনু আব্দুল আযীম বলেন: ইবরাহীম ইবনুল হাকাম তার পিতার সূত্রে তাবিয়ী ইকরিমাহ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু হাদীস শিক্ষা করেন ও লিখে রাখেন। এ হাদীসগুলো তার পাণ্ডুলিপিতে এভাবে মুরসাল রূপেই লিখিত ছিল। কোনো সাহাবীর নাম তাতে ছিল না। পরবর্তী সময়ে তিনি এগুলোতে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবু হুরাইরা প্রমুখ সাহাবীর (রা) নাম উল্লেখ করে বর্ণনা করতেন। এ সনদগত মিথ্যাচারের ফলে তিনি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন।[২২৪]

### ৬. ১. ৪. সনদ চুরি বা হাদীস চুরি

হাদীস জালিয়াতির ক্ষেত্রে মিথ্যাচারীদের একটি বিশেষ পদ্ধতি হলো 'চুরি' (**سرقة**)। 'হাদীস চুরি' অর্থ হলো, কোনো মিথ্যাচারী রাবী অন্য একজন 'রাবী'র কোনো হাদীস শুনে সে হাদীস উক্ত রাবীর সূত্রে বর্ণনা না করে বানোয়াট সনদে তা বর্ণনা করবে। চুরি কয়েক প্রকারে হতে পারে:

**ক.** 'চোর' জালিয়াত মূল সনদ ঠিক রাখবে। তবে যার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছে তার নাম না বলে তার উস্তাদের নাম বলবে এবং নিজেই সে উস্তাদের কাছ থেকে শুনেছে বলে দাবী করবে।

**খ.** চোর জালিয়াত মূল সনদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করবে। সনদের মধ্যে একজন রাবীর নাম পরিবর্তন করে সে নতুন সনদ বানাবে।

**গ.** চোর জালিয়াত হাদীসটির মতন-এর জন্য নতুন সনদ বানাবে। একজন দুর্বল বা মিথ্যাচারী রাবীর বর্ণিত কোনো হাদীস তার

মুখে বা কোনো স্থানে শুনে তার ভাল লাগে। হাদীসটির 'আকর্ষণীয়তার' কারণে তারও ইচ্ছা হয় হাদীসটি বলার। তবে হাদীসটি মূল জালিয়াতের নামে বললে তার 'সম্মান' কমে যায়। এছাড়া এতে আকর্ষণীয়তা ও নতুনত্ব থাকে না। এজন্য সে এ 'জাল' হাদীসটির জন্য আরেকটি 'জাল' সনদ তৈরি করবে।

জাল হাদীস চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে চুরির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দুর্বল বা জাল হাদীস অনেক সময় ১০/১৫ টি সনদে বর্ণিত থাকে। এতগুলো সনদ দেখে অনেক সময় মুহাদ্দিস ধোঁকা খেতে পারেন। তিনি ভাবতে পারেন, হাদীসের সনদগুলো দুর্বল হলেও যেহেতু এতগুলো সনদ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেহেতু হয়ত এর কোনো ভিত্তি আছে। এক্ষেত্রে তাকে দুইটি বিষয় নিশ্চিত হতে হবে। প্রথমতঃ তাকে দেখতে হবে যে, প্রত্যেক সনদেই মিথ্যাবাদী রাবী আছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে হবে যে, এখানে চুরি আছে কিনা। যদি দেখা যায় যে, হাদীসটি নির্দিষ্ট কোনো যুগে নির্দিষ্ট কোনো রাবীর বর্ণনায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। সে যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে সে রাবীর হাদীস বলে চিহ্নিত করেছেন। এরপর কোনো কোনো দুর্বল বা জালিয়াত রাবী তা উক্ত রাবীর উস্তাদ থেকে বা অন্য কোনো সনদে বর্ণনা করছেন। এক্ষেত্রে বুঝা যাবে যে, পরের রাবীগণ 'চুরি' করেছেন। এখানে চুরির কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

আমরা ইতোপূর্বে নেককারদের অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার উদাহরণ হিসাবে তৃতীয় হিজরী শতকের মাশহুর আবিদ সাবিত ইবনু মূসা (২২৯ হি) বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছি, যে হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'যার রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) অধিক হবে দিবসে তার চেহারা সৌন্দর্যময় হবে।' এ হাদীসটি সর্বপ্রথম সাবিতই বলেন। মুহাদ্দিসগণ সাবিতের মুখে হাদীসটি শোনার পরে বিস্তারিত নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে, সাবিত ছাড়া কেউ হাদীসটি ইতোপূর্বে বলেন নি। কিন্তু এ হাদীসটি সাবিতের মাধ্যমে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করার পরে কোনো কোনো দুর্বল ও মিথ্যাচারী রাবী এই হাদীসটি সাবিতের উস্তাদ শারীক থেকে বা অন্যান্য সনদে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ এগুলোকে চুরি বলে চিহ্নিত করেছেন। এ সকল চোর জালিয়াতের একজন আব্দুল হামীদ ইবনু বাহ্‌র আবুল হাসান আসকারী, তিনি সাবিতের পরের যুগে দাবী করেন যে, তিনিও হাদীসটি শারীক থেকে শুনেছেন। ৪র্থ হিজরীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনু আদী বলেন, আমাকে হাসান ইবনু সুফিয়ান বলেন, আমাকে আব্দুল হামীদ ইবনু বাহ্‌র বলেছেন, আমাদেরকে শারীক বলেছেন, আ'মাশ থেকে, আবু সুফিয়ান থেকে জাবির থেকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি রাত্রে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করে তবে দিনে তার চেহারা সৌন্দর্যময় হবে।' ইবনু আদী বলেন, হাদীসটি সাবিত ইবনু মুসা থেকে প্রসিদ্ধ। তার থেকে পরবর্তীতে অনেক দুর্বল রাবী হাদীসটি চুরি করেছে। আব্দুল হামীদ তাদের একজন।[২২৫]

চতুর্থ হিজরী শতকের একজন জালিয়াত রাবী হাসান ইবনু আলী ইবনু সালিহ আল-আদাবী। আল্লামা ইবনু আদী বলেনঃ আমি লোকটির কাছ থেকে হাদীস শুনেছি ও লিখেছি। লোকটি হাদীস জাল করত এবং চুরি করত। একজনের হাদীস আরেকজনের নামে বর্ণনা করতো। এমন সব লোকের নাম বলে হাদীস বলতো যাদের কোনো পরিচয় জানা যায় না।

এরপর তিনি এ হাসান ইবনু আলীর হাদীস চুরির অনেক উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু আদী বলেনঃ আমাকে হাসান ইবনু আলী আদাবী বলেন, আমাদেরকে হাসান ইবনু আলী ইবনু রাশিদ বলেছেন, তিনি শারীক থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি জাবির থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ 'যার রাতের সালাত অধিক হবে দিবসে তার চেহারা সৌন্দর্যময় হবে।' ইবনু আদী বলেনঃ হাদীসটি সাবিত ইবনু মুসার হাদীস। সাবিতের পরে অনেক দুর্বল রাবী হাদীসটি চুরি করে বিভিন্ন রাবীর নাম দিয়ে চালিয়েছে। এ সনদে হাসান ইবনু আলী আল-আদাবী হাদীসটিকে হাসান ইবনু আলী ইবনু রাশিদের নামে চালাচ্ছে। অথচ হাসান ইবনু আলী ইবনু রাশিদ প্রসিদ্ধ ও সত্যপরায়ণ রাবী ছিলেন, তিনি কখনোই এ হাদীসটি শারীক থেকে বা অন্য কোনো সনদে বর্ণনা করেন নি। তাঁর পরিচিত কোনো ছাত্র হাদীসটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেন নি।[২২৬]

২য় শতকের একজন দুর্বল রাবী 'হুযাইল ইবনুল হাকাম'। তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ (১৫৯ হি) বলেছেন, তিনি ইকরিমাহ থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَوْتُ الْغَرِيْبِ (مَوْتُ غُرْبَةٍ) شَهَادَةٌ

"প্রবাসের মৃত্যু শাহাদত বলে গণ্য।"[২২৭]

হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী হুযাইল নামক এ রাবী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের মুহাদ্দিসগণ বিস্তারিত সন্ধান ও নিরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, এ হাদীসটি একমাত্র এ ব্যক্তি ছাড়া কোনো রাবী আব্দুল আযীয থেকে বা অন্য কোনো সূত্রে বর্ণনা করেন নি।

এ যুগের অন্য একজন রাবী ইবরাহীম ইবনু বাকর আল-আ'ওয়ার। তিনি এসে দাবী করলেন যে, তিনি হাদীসটি আব্দুল আযীয থেকে শুনেছেন। তিনিও বললেনঃ আমাদেরকে আব্দুল আযীয বলেছেন, ইকরিমাহ থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে...। মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করলেন যে, ইবরাহীম নামক এ ব্যক্তি হাদীসটি চুরি করেছেন। তাঁরা দেখলেন যে, ইবরাহীম আব্দুল আযীয থেকে হাদীস শুনেন নি। যখন হুযাইল হাদীস বলতেন তখনও তিনি বলেন নি যে, তিনিও হাদীসটি শুনেছেন। হুযাইলের সূত্রে যখন

হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে তখন তিনিও হাদীসটি হুযাইলের সূত্রে জানতে পারেন। এখন হুযাইলের সূত্রে হাদীসটি বললে তার 'মর্যাদা' কমে যাবে। এজন্য তিনি হুযাইলের সনদ চুরি করলেন। হুযাইলের উস্তাদকে নিজের উস্তাদ দাবী করে তিনি হাদীসটি বলতে শুরু করলেন।[২২৮]

### ৬. ২. মতনে মিথ্যা

জালিয়াতির প্রধান ক্ষেত্র হলো হাদীসের 'মতন' বা মূল বক্তব্য। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচারিত মিথ্যা কথা মূলত দুই প্রকারের হতে পারে: জালিয়াত নিজের মনগড়া কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলবে অথবা প্রচলিত কোনো কথাকে তাঁর নামে বলবে। উভয় প্রকারের মিথ্যা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হতে পারে।[২২৯]

#### ৬. ২. ১. নিজের মনগড়া কথা হাদীস নামে চালানো

অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে, মিথ্যাবাদী রাবী নিজের বানানো কথা হাদীস বলে চালাচ্ছে। আল্লামা সুয়ূতী (৯১১ হি) উল্লেখ করেছেন যে, মাউযূ বা মিথ্যা হাদীসের মধ্যে এ প্রকারের হাদীসের সংখ্যায় বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জালিয়াত প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে একটি বক্তব্য বানিয়ে তা হাদীস নামে চালায়।[২৩০] উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন উদাহরণের মধ্যে আমরা এ প্রকারের অনেক 'জাল হাদীস' দেখতে পেয়েছি। কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফযীলতে বানানো, বিভিন্ন প্রকারের 'বানোয়াট আমলের' বানোয়াট ফযীলতে বানানো, দেশ, জাতি, দল, মত ইত্যাদির পক্ষে বা বিপক্ষে বানানো জাল হাদীসগুলো সবই এ পর্যায়ের।

#### ৬. ২. ২. প্রচলিত কথা হাদীস নামে চালানো

অনেক সময় দুর্বল রাবী বা মিথ্যাবাদী রাবী ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সাহাবী বা তাবিয়ীর কথা, অথবা কোনো প্রবাদ বাক্য, নেককার ব্যক্তির বাণী, পূর্ববর্তী নবীদের নামে প্রচলিত কথা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো কথা, কোনো প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বাণী বা অনুরূপ কোনো প্রচলিত কথাকে 'হাদীসে রাসূল' বলে বর্ণনা করেন। আল্লামা ইরাকী (৮০৬হি) এ জাতীয় মাউদূ হাদীসের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম উদাহরণ

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

'দুনিয়ার ভালবাসা সকল পাপের মূল।' আল্লামা ইরাকী বলেন, এ বাক্যটি মূলত কোনো কোনো নেককার আবিদের কথা। ঈসা (আ)-এর কথা হিসাবেও প্রচার করা হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসেবে এর কোনো ভিত্তি নেই। আর দ্বিতীয় উদাহরণ:

اَلْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ.

'পাকস্থলী রোগের বাড়ি আর খাদ্যভ্যাস নিয়ন্ত্রণ সকল ঔষধের মূল।'

কথাটি চিকিৎসকদের কথা। হাদীস হিসেবে এর কোনো ভিত্তি নেই।[২৩১]

উপরে 'সনদের মধ্যে কমবেশি করা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে আমরা এ জাতীয় কিছু উদাহরণ দেখেছি। এ প্রকারের 'মিথ্যা' বা জালিয়াতির আরো অনেক উদাহরণ আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখতে পাব। এখানে আমাদের দেশে আলিমগণের মধ্যে প্রচলিত এরূপ একটি হাদীসের কথা উল্লেখ করছি।

আমাদের দেশে 'হাদীস' বলে প্রচলিত একটি কথা:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"মুসলিমগণ যা ভাল মনে করবেন তা আল্লাহর কাছে ভাল।"

আমাদের দেশে সাধারণভাবে কথাটি হাদীসে নাবাবী বলে প্রচারিত। কথাটি মূলত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)-এর। একে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসাবে বর্ণনা করলে তাঁর নামে মিথ্যা বলা হবে। ইবনু মাসউদ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর হৃদয়কে সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম হৃদয় হিসাবে পেয়েছেন। এজন্য তিনি তাঁকে নিজের জন্য বেঁছে নেন এবং তাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। এরপর তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর হৃদয়ের পরে অন্যান্য বান্দাদের হৃদয়গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণের হৃদয়গুলোকে সর্বোত্তম হৃদয়

হিসাবে পেয়েছেন। এজন্য তিনি তাঁদেরকে তাঁর নবীর সহচর ও পরামর্শদাতা বানিয়ে দেন, তাঁরা তাঁর দীনের জন্য যুদ্ধ করেন। অতএব, মুসলমানগণ (অর্থাৎ, রাসূলুলাহ ﷺ -এর সহচর পরামর্শদাতা পবিত্র হৃদয় সাহাবীগণ) যা ভালো মনে করবেন তা আল্লাহর কাছেও ভালো। আর তাঁরা যাকে খারাপ মনে করবেন তা আল্লাহর কাছেও খারাপ।"[২৩২]

কোনো কোনো ফকীহ বা আলিম ভুলবশত কথাটি হাদীসে নাবাবী বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদীসের সকল গ্রন্থ তালাশ করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয় নি। আল্লামা যাইলায়ী আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ (৭৬২ হি), ইবনু কাসীর ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪ হি), ইবনু হাজার আসকালানী আহমাদ ইবনু আলী (৮৫২ হি), সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের (রা) কথা হিসাবে হাসান সনদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসাবে কোথাও বর্ণিত হয়নি।[২৩৩]

### ৬. ৩. অনুবাদে, ব্যাখ্যায় ও গবেষণায় মিথ্যা

হাদীসের নামে মিথ্যার একটি ক্ষেত্র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। আমরা সাধারণত বই-পুস্তক ও ওয়ায-নসীহতে হাদীস উল্লেখের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে ১০০% স্বাধীনতা প্রদান করে থাকি। হাদীসের মূল বক্তব্যকে আমরা আমাদের পছন্দমত কমবেশি করে অনুবাদ করি, অনুবাদের মধ্যে ব্যাখ্যা সংযোগ করি এবং সবকিছুকে 'হাদীস' নামেই চালাই। অথচ সাহাবীগণ একটি শব্দের হেরফেরের কারণে গলদঘর্ম হয়ে যেতেন!

কুরআন ও হাদীসের আলোকে কিয়াস ও ইজতিহাদ ইসলামী ফিকহের অন্যতম উৎস। যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট কিছু বিধান দেয়া হয় নি কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে সেগুলোর বিধান নির্ধারণ করতে হয়। যেমন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উম্মাতকে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু কোন কাজটি ফরয, কোনটি মুস্তাহাব ইত্যাদি বিস্তারিত বলেন নি। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে মুজতাহিদ তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। অনুরূপভাবে মাইক, টেলিফোন, প্লেন ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কিছু বলা হয় নি। কুরআন ও হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলির আলোকে কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে এগুলোর বিধান অবগত হওয়ার চেষ্টা করেন মুজতাহিদ।

তবে কিয়াস বা ইজতিহাদ দ্বারা কোনো গাইবী বিষয় জানা যায় না বা ইবাদত বন্দেগি তৈরি করা যায় না। হজ্জের সময় ইহরাম পরিধানের উপর কিয়াস করে সালাতের মধ্যে ইহরাম পরিধানের বিধান দেওয়া যায় না। অনুরূপভাবে মসজিদুল হারামে সালাতের ১ লক্ষগুণ সাওয়াবের উপর কিয়াস করে তথায় যাকাত প্রদানের সাওয়াব ১ লক্ষগুণ বৃদ্ধি হবে বলে বলা যায় না। অথবা আমরা বলতে পারি না যে, রামাদানে যাকাত দিলে ৭০ গুণ সাওয়াব এবং রামাদানে মসজিদে হারামে যাকাত প্রদান করলে ৭০ লক্ষ গুণ সাওয়াব।

এখানে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করছি। ইমাম তিরমিযী জিহাদের ফযীলতের অধ্যায়ে নিম্নের 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য হাদীসটি সংকলন করেছেন। খুরাইম ইবনু ফাতিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

"যদি কেউ আল্লাহর রাস্তায় কোনো ব্যয় করেন তবে তার জন্য সাত শত গুণ সাওয়াব লেখা হয়।"[২৩৪]

ইমাম ইবনু মাজাহ সংকলিত একটি যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

"যে নিজে বাড়িতে অবস্থান করে আল্লাহর রাস্তায় খরচ পাঠিয়ে দেয় সে প্রত্যেক দিরহামের জন্য ৭০০ দিরহাম লাভ করবে। আর যে নিজে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং এ জন্য খরচ করে সে প্রত্যেক দিরহামের জন্য ৭ লক্ষ দিরহাম (সাওয়াব) লাভ করবে। এরপর তিনি (সূরা বাকারার ২৬১ আয়াত) পাঠ করেন: 'আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বৃদ্ধি করে দেন।"[২৩৫]

হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী ইবনু আবী ফুদাইক। তিনি বলেন, 'খালীল ইবনু আব্দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি হাসান বসরীর সূত্রে হাদীসটি বলেছেন। মুহাদ্দিসগণ খালীল ইবনু আব্দুল্লাহ নামক এ ব্যক্তির বিশ্বস্ততা তো দূরের কথা তার কোনো পরিচয়ও জানতে পারেন নি। এজন্য আল্লামা বূসীরী বলেন: "এ সনদটি দূর্বল; কারণ খালীল ইবনু আব্দুল্লাহ অজ্ঞাত পরিচয়।"[২৩৬]

তাবিয়ী মুজাহিদ বলেন, আবূ হুরাইরা (রা) একবার সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন। শত্রুর আগমন ঘটেছে মনে করে হঠাৎ করে ডাকাডাকি করা হয়। এতে সকলেই ছুটে সমুদ্র উপকূলে চলে যান। তখন বলা হয় যে, কোনো অসুবিধা নেই। এতে সকলেই ফিরে আসলেন। শুধু আবূ হুরাইরা দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন একব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করেন, আবূ হুরাইরা, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন?

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

"আলাহর রাস্তায় এক মুহূর্ত অবস্থান করা লাইলাতুল কাদ্‌রে 'হাজারে আসওয়াদ'-এর কাছে কিয়াম (সালাত আদায়) করার চেয়ে উত্তম।"[২৩৭]

উপরের হাদীসগুলোতে 'আল্লাহর পথে' ব্যয়, অবস্থান ইত্যাদির সাওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম একমত যে, এখানে 'আল্লাহর রাস্তায়' বলতে অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধ বা জিহাদ বুঝানো হয়েছে। সকল মুহাদ্দিসই হাদীসগুলোকে 'জিহাদ' বা যুদ্ধের অধ্যায়ে সংকলন করেছেন। এখানে যদি আমরা অনুবাদে 'আল্লাহর রাস্তায়' বলি, অথবা 'জিহাদ' বলি তবে হাদীসগুলোর সঠিক অনুবাদ করা হবে।

অন্য একটি সহীহ হাদীসে কা'ব ইবনু আজুরা (রা) বলেন, একজন উদ্দীপনাময় শক্তিশালী ব্যক্তিকে দেখে সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এ লোকটি যদি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) থাকত! তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

"যদি লোকটি তার ছোটছোট সন্তানদের জন্য উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে। যদি সে তার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে। যদি সে নিজেকে পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত রাখতে উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে তাহলে সে আলাহর রাস্তায় রয়েছে।"[২৩৮]

এখানে অর্থ উপার্জনের জন্য কর্ম করাকে 'আল্লাহর রাস্তায় থাকা' বা 'আলাহর রাস্তায় চলা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যান্য হাদীসে ইলম শিক্ষা, হজ্জ, সৎকাজে আদেশ, ঠাণ্ডার মধ্যে পূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদে সালাতের অপেক্ষা করা, নিজের নফসকে আল্লাহর পথে রাখার চেষ্টা করা ইত্যাদি কর্মকে জিহাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা উপরের হাদীসগুলোর সঠিক ও শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করার পরে বলতে পারি যে, বিভিন্ন হাদীসে হালাল উপার্জন, ইলম শিক্ষা, সৎকাজে আদেশ, হজ্জ আদায় ইত্যাদি কর্মকেও 'আল্লাহর রাস্তায় কর্ম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কাজেই আমরা আশা করি যে, এরূপ কর্মে রত মানুষেরাও এসকল হাদীসে উল্লিখিত 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সাওয়াব পেতে পারেন।

কিন্তু আমরা যদি সেরূপ না করে, সরাসরি বলি যে, 'হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, হালাল উপার্জনে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা হাজারে আসওয়াদের কাছে লাইলাতুল কাদ্‌রের সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম', অথবা 'সৎকাজে আদেশের জন্য র‍্যালি বা মিছিলে একটি টাকা ব্যয় করলে ৭০ লক্ষ টাকার সাওয়াব পাওয়া যাবে' ... তবে তা মিথ্যাচার বলে গণ্য হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনোই এভাবে বলেন নি।

অনুরূপভাবে উপরের হাদীসগুলোতে আল্লাহর পথে যুদ্ধে ব্যায় করলে ৭০০ বা ৭ লক্ষ গুণ সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে:

إِنَّ الصَّلاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

"সালাত, সিয়াম ও যিক্‌র (এগুলোর সাওয়াব) আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার চেয়ে সাত শত গুণ বর্ধিত হয়।"[২৩৯]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, এ হাদীসে সুস্পষ্ট অর্থ হলো, ঘরে বসে সালাত, সিয়াম ও যিক্‌র পালন করলে আলাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয়ের চেয়েও সাত শত গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। কেউ কেউ এখানে কিছু কথা উহ্য রয়েছে বলে মনে করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ হাদীসের অর্থ হলো 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায়' সালাত, সিয়াম ও যিকর পালন করলে সেগুলোর সাওয়াব আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে খরচ করার চেয়ে সাত শত গুণ বর্ধিত হয়।[২৪০] এখানে আমাদের দায়িত্ব হলো হাদীসটি শাব্দিক অর্থ বলার পরে আমাদের ব্যাখ্যা পৃথকভাবে বলা।

এখানে বিভিন্নভাবে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন কেউ গুণভাগ করে বলতে পারেন যে, 'জিহাদে যেয়ে অর্থ ব্যায় করলে ৭ লক্ষগুণ সাওয়াব। আর ঘরে বসে যিক্‌র করলে তার ৭ শত গুণ সাওয়াব। এর অর্থ হলো ঘরে বসে যিক্‌র করলে ৪৯ কোটি নেক আমলের সাওয়াব।' তিনি যদি উপরের হাদীসগুলোর সঠিক অনুবাদ করার পরে পৃথকভাবে এ ব্যাখ্যা করেন তবে অসুবিধা নেই। কিন্তু তিনি যদি এ কথাটিকে হাদীসের কথা বলে বুঝান তবে তিনি হাদীসের নামে মিথ্যা বললেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনোই এভাবে বলেন নি। তিনি আল্লাহর পথে খরচের চেয়ে ৭০০ গুণ বৃদ্ধি বলতে মুল সাওয়াবের চেয়ে ৭০০ গুণ, নাকি

৭০০ গুণের ৭০০ গুণ বুঝাচ্ছেন তাও বলেন নি। কাজেই তিনি যা সুস্পষ্ট করে বলেন নি, তা তাঁর নামে বলা যায় না। তবে পৃথকভাবে ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলেন যে, 'হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, হালাল উপার্জনের জন্য কর্মরত অবস্থায়, হজ্জের সফরে থাকা অবস্থায়, ইলম শিক্ষারত অবস্থায়, দাওয়াতে রত অবস্থায়, সৎকাজের আদেশের জন্য মিছিলে থাকা অবস্থায় বা নফস'কে শাসন করার অবস্থায় যিক্র করলে ৪৯ কোটি গুণ সাওয়াব পাওয়া যায়' তবে তিনিও হাদীসের নামে মিথ্যা বললেন।

হাদীসের নামে মিথ্যা বলার একটি প্রকরণ হলো, অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক অনুবাদ না করে অনুবাদের সাথে নিজের মনমত কিছু সংযোগ করা বা কিছু বাদ দিয়ে অনুবাদ করা। অথবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেছেন তার ব্যাখ্যাকে হাদীসের অংশ বানিয়ে দেয়া। আমাদের সমাজে আমরা প্রায় সকলেই এ অপরাধে লিপ্ত রয়েছি। আত্মশুদ্ধি, পীর-মুরিদী, দাওয়াত-তাবলীগ, রাজনীতিসহ মতভেদীয় বিভিন্ন মাসআলা-মাসাইল-এর জন্য আমরা প্রত্যেক দলের ও মতের মানুষ কুরআন ও হাদীস থেকে দলীল প্রদান করি। এরূপ দলীল প্রদান খুবই স্বাভাবিক কর্ম ও ঈমানের দাবি। তবে সাধারণত আমরা আমাদের এ ব্যাখ্যাকেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে চালাই।

যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, কিন্তু প্রচলিত অর্থে 'দলীয় রাজনীতি' করেন নি, অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের মত কিছু করেন নি। বর্তমানে গণতান্ত্রিক 'রাজনীতি' করছেন অনেক আলিম। ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ বা ইকামতে দীনের একটি নতুন পদ্ধতি হিসেবে একে গ্রহণ করা হয়। তবে যদি আমরা বলি যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাজনীতি করেছেন', তবে শ্রোতা বা পাঠক 'রাজনীতি'র প্রচলিত অর্থ, অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কথাই বুঝবেন। আর এ রাজনীতি তিনি করেন নি। ফলে এভাবে তাঁর নামে মিথ্যা বলা হবে। এজন্য আমাদের উচিত তিনি কী করেছেন ও বলেছেন এবং আমরা কি ব্যাখ্যা করছি তা পৃথকভাবে বলা।

রাসূলুলাহ ﷺ দীন প্রচার করেছেন আজীবন। দীনের জন্য তিনি ও তাঁর অনেক সাহাবী চিরতরে বাড়িঘর ছেড়ে 'হিজরত' করেছেন। কিন্তু তিনি কখনোই দাওয়াতের জন্য সময় নির্ধারণ করে ২/১ মাসের জন্য সফরে 'বাহির' হন নি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেকে হিজরত না করলেও অন্তত কিছুদিনের জন্য বিভিন্ন স্থানে যেয়ে দাওয়াতের কাজ করছেন। কিন্তু আমরা এ কর্মের জন্য যদি বলি যে, রাসূলুলাহ ﷺ দাওয়াতের জন্য 'বাহির' হতেন, তবে পাঠক বা শ্রোতা 'নির্ধারিত সময়ের জন্য বাহির হওয়া' বুঝবেন। অথচ তিনি কখনোই এভাবে দাওয়াতের কাজ করেন নি। এতে তাঁর নামে মিথ্যা বলা হবে।

যদি আমরা বলি যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ মীলাদ মাহফিল করতেন' তবে অনুরূপভাবে তাঁর নামে মিথ্যা বলা হবে। কারণ তাঁরা শুধু 'মীলাদ' আলোচনা বা উদযাপনের জন্য কোনো মাহফিল করেন নি। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্ম বিষয়ক দু চারটি ঘটনা সাহাবীদেরকে বলেছেন। এ সকল হাদীস সাহাবীগণ তাবিয়ীগণকে বলেছেন। এগুলোর জন্য তাঁরা কোনো মাহফিল করেন নি বা এগুলোকে পৃথকভাবে আলোচনা করেন নি। আজ যদি কোনো মুসলিম 'আনুষঙ্গিক আনুষ্ঠানিকতা' ছাড়া অবিকল রাসূলুলাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের পদ্ধতিতে এ সকল হাদীস বর্ণনা করেন, তবে কেউই বলবেন না যে তিনি মীলাদ মাহফিল করছেন। এতে আমরা বুঝি যে, 'মীলাদ মাহফিল' বলতে যে অর্থ আমরা সকলেই বুঝি সে কাজটি তিনি করেন নি।

এজন্য আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি করেছেন বা বলেছেন এবং তা থেকে আমরা কি বুঝলাম তা পৃথকভাবে বলা। আমরা দেখেছি যে, একটি শব্দের হেরফেরের ভয়ে সাহাবীগণ কিভাবে সন্ত্রস্ত হয়েছেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

## ৭. মিথ্যার পরিচয় ও চিহ্নিত করণ

### ৭. ১. মিথ্যা চিহ্নিত করণের প্রধান উপায়

#### ৭. ১. ১. জালিয়াতের স্বীকৃতি

মিথ্যা হাদীসের পরিচিতি ও চিহ্নিত-করণের পদ্ধতি উল্লেখ করে আল্লামা ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি) বলেন: "হাদীস মাউদূ বা জাল কিনা তা জানা যায় জালিয়াতের স্বীকৃতির মাধ্যমে অথবা স্বীকৃতির পর্যায়ের কোনো কিছুর মাধ্যমে। মুহাদ্দিসগণ অনেক সময় বর্ণনাকারীর অবস্থার প্রেক্ষিতে তার জালিয়াতি ধরতে পারেন। কখনো বা বর্ণিত হাদীসের অবস্থা দেখে জালিয়াতি ধরেন। অনেক বড়বড় হাদীস বানোনো হয়েছে যেগুলোর ভাষা ও অর্থের দুর্বলতা সেগুলোর জালিয়াতির সাক্ষ্য দেয়।"[২৪১]

আল্লামা নাবাবী, ইরাকী, সাখাবী, সুয়ূতী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও মিথ্যা বা জাল হাদীস চিহ্নিত করার পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করেছেন।[২৪২]

#### ৭. ১. ২. সনদবিহীন বর্ণনা

সাধারণভাবে জালিয়াতের স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এজন্য মুহাদ্দিসগণ মুলত এর উপর নির্ভর করেন না। তাঁরা সনদ নিরীক্ষার মাধ্যমে 'স্বীকৃতির পর্যায়ের তথ্যাদি' সংগ্রহ করে সেগুলোর ভিত্তিতে জালিয়াতি নির্ণয় করেন। এজন্য নিরীক্ষাই জালিয়াতি নির্ণয়ের প্রধান পন্থা। প্রধানত দুটি কারণে মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে জাল বা মিথ্যা বলে গণ্য করেন: **(ক)** হাদীসের সনদে মিথ্যাবাদীর অস্তিত্ব ও **(খ)**

হাদীসের কোনো সনদ না থাকা।

মূলত, প্রথম কারণটিই জালিয়াতি নির্ধারণের মূল উপায়। দ্বিতীয় পর্যায়টি ইসলামের প্রথম অর্ধ সহস্র বৎসরে দেখা যায় নি। হিজরী ৪র্থ/৫ম শতক পর্যন্ত কোনো মানুষই সনদ ছাড়া কোনো হাদীস বলতেন না বা বললে কেউ তাতে কর্ণপাত করতেন না। এজন্য জঘন্য জালিয়াতকেও তার মিথ্যার জন্য একটি সনদ তৈরি করতে হতো। পরবর্তী যুগগুলোতে ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমাজে কিছু কিছু কথা হাদীস নামে প্রচারিত হয় যেগুলো লোকমুখে প্রচারিত হলেও কোনো গ্রন্থে সনদসহ পাওয়া যায় না। স্বভাবতই মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একবাক্যে সেগুলোকে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও জাল বলে গণ্য করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচারিত সকল প্রকারের মিথ্যা বা ভিত্তিহীন কথাকে প্রতিহত করা এবং তাঁর নামে প্রচলিত কথার উৎস ও সূত্র নির্ণয় করার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ ছিলেন আপোষহীন। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, ৭ম/৮ম হিজরী শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত অগণিত জানবাজ মুহাদ্দিস তাঁদের জীবনপাত করেছেন এ সকল প্রচলিত 'কথা'র সূত্র বা উৎস সন্ধান করতে। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় অর্ধ সহস্র বৎসর ধরে লেখা অগণিত হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, জীবনী ইত্যাদি সকল প্রকার পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে তাঁরা এগুলো সন্ধান করেছেন। এ সন্ধানের পরেও যে সকল হাদীস নামে প্রচলিত কথার কোনো 'সনদ' তাঁরা পান নি সেগুলোকে তাঁরা 'ভিত্তিহীন', 'সূত্র বিহীন', বানোয়াট ও মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন।

### ৭. ১. ৩. মিথ্যাবাদীর বর্ণনা

জাল বা মিথ্যা হাদীস চেনার অন্যতম উপায় হলো যে, হাদীসটির সনদে এমন একজন রাবী রয়েছেন, যাকে মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন এবং একমাত্র তার মাধ্যমে ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয় নি। এজন্য জাল বা মিথ্যা হাদীসের সংজ্ঞায় মুহাদ্দিসগণ বলেছেন: (ما تفرد بروايته كذاب) "যে হাদীস শুধুমাত্র কোনো মিথ্যাবাদী রাবী বর্ণনা করেছে তা মাউযূ হাদীস।"

এ মিথ্যাবাদী রাবীর উস্তাদ বা পূর্ববর্তী রাবীগণ এবং তার ছাত্র বা পরবর্তী রাবীগণ বিশস্ত, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য হলেও কিছু আসে যায় না। মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যদি দেখতে পান যে, এ ব্যক্তি উস্তাদ হিসেবে যার নাম উল্লেখ করেছে তাঁর অন্য কোনো ছাত্রই এই হাদীসটি বর্ণনা করছেন না বা অন্য কোনো সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয় নি, তাহলে তারা নিশ্চিত হন যে, এ মিথ্যাবাদী তার উস্তাদের নামে সনদটি বানিয়ে মিথ্যা হাদীসটি প্রচার করেছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মুহাদ্দিস এ মিথ্যাবাদীর কাছ থেকে হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন নিরীক্ষা, পর্যালোচনা বা সংকলনের জন্য।

### ৭. ১. ৪. মিথ্যাবাদীর পরিচয়

যে সকল রাবী মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেন বলে মুহাদ্দিসগণ বুঝতে পেরেছেন তাদেরকে তাঁরা বিভিন্ন বিশেষণে আখ্যায়িত করেছেন। কখনো তারা তাদেরকে সুস্পষ্টত মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন। কখনো বা তাদেরকে সরাসরি মিথ্যবাদী বা জালিয়াত না বলে অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম তিন শতাব্দীর মুহাদ্দিসগণ সাধারণত সহজে কাউকে 'মিথ্যাবাদী' বলতে চাইতেন না। বিশেষত, যে ব্যক্তির বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেছেন বলে ধারণা করেছেন তার বিষয়ে কিছু 'নরম' শব্দ ব্যবহার করতেন। মিথ্যাবাদী রাবীর বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষাকে আমরা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত কয়েকভাগে ভাগ করতে পারি:

**(ক) সরাসরি মিথ্যাবাদী বা জালিয়াত বলে উল্লেখ করা**

রাবীর মিথ্যাচারিতা বুঝাতে মুহাদ্দিসগণ বলে থাকেন:

كاذب، كذاب، يكذب، دجال، وضاع، يضع، أكذب الناس، متهم...

মিথ্যাবাদী, জঘন্য মিথ্যাবাদী, মিথ্যা বলে, দাজ্জাল, জঘন্য জালিয়াত, জাল করে, অভিযুক্ত, একটি হাদীস জাল করেছে, সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী, মিথ্যার একটি স্তম্ভ, অমুক মুহাদ্দিস তাকে জালিয়াত বলে উল্লেখ করেছেন, অমুক তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করেছেন.... ইত্যাদি।

**(খ) বাতিল হাদীস বা বালা মুসিবত বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করা**

রাবীর মিথ্যাচারিতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর অন্যতম:

يحدث بالأباطيل، له أباطيل، له بلايا، مصائب، طامات، من بلاياه، مصائبه، من آفته، آفته فلان، خبيث الحديث، يسرق الحديث...

বাতিল হাদীস বর্ণনা করে, তার কিছু বাতিল হাদীস আছে, তার কিছু বালা-মুসিবত আছে, তার বর্ণিত বালা-মুসিবতের মধ্যে অমুক হাদীসটি,... এ হাদীসের বিপদ অমুক... খবীস হাদীস বর্ণনা করে... হাদীস চুরি করে....

**(গ) মুনকার (আপত্তিকর) বা মাতরূক (পরিত্যক্ত) বলে উল্লেখ করা**

'মুনকার' অর্থ 'অস্বীকারকৃত', 'আপত্তিকৃত' বা 'গর্হিত'। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন অর্থে রাবীকে এবং হাদীসকে 'মুনকার' বলে অভিহিত করেছেন। অনেকে দুর্বল হাদীস বা দুর্বল রাবীকে 'মুনকার' বলেছেন। কেউ কেউ মিথ্যাবাদী রাবীকে 'মুনকার' বলেছেন। বিশেষত, ইমাম

বুখারী রাবীগণের ত্রুটি উল্লেখের বিষয়ে অত্যন্ত ‘নরম’ শব্দ ব্যবহার করতেন। তিনি সরাসরি কাউকে ‘মিথ্যাবাদী’ বলে উল্লেখ করেন নি। বরং অন্য মুহাদ্দিসগণ যাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, তিনি তাকে ‘মুনকার’ বলেছেন, অথবা ‘মাতরূক’ বা ‘মাসকূত আনহু’, ‘মানযূর ফীহ’ অর্থাৎ ‘পরিত্যক্ত’, ‘তাঁর বিষয়ে আপত্তি রয়েছে’ বলেছেন।

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রচলিত আরেকটি পরিভাষা: “মাতরূক”, অর্থাৎ ‘পরিত্যক্ত’ বা ‘পরিত্যাজ্য’। সাধারণত মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত দুর্বল রাবীকে ‘পরিত্যক্ত’ বলেন। তবে ইমাম বুখারী, নাসাঈ, দারাকুতনী ও অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস মিথ্যাবাদী রাবীকে ‘মাতরূক’ বলে অভিহিত করেছেন। বিশেষত ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ কাউকে ‘মাতরূক’ বা পরিত্যক্ত বলার অর্থই হলো যে, তাঁরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করছেন।

অনুরূপভাবে মুহাদ্দিসগণ যদি বলেন যে ‘অমুকের হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়’ তাহলেও তার মিথ্যাচারিতা বুঝা যায়।

**(ঘ) তার হাদীস কিছুই নয়, মূল্যহীন... বলে উল্লেখ করা**

কেউ কেউ রাবীর মিথ্যাচারিতা বুঝাতে রাবী বা তার বর্ণিত হাদীসকে

ليس بشيء، لا يساوي شيئا، لا يساوي فلسا....

‘মূল্যহীন’, ‘কিছুই নয়’, ‘এক পয়সাতেও নেয়া যায় না’ বা অনুরূপ কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ীর কথা প্রনিধানযোগ্য। ইমাম ইসমাঈল ইবনু ইয়াহইয়া মুযানী (২৬৪ হি) বলেন, একদিন একব্যক্তি সম্পর্কে আমি বলি যে, লোকটি মিথ্যাবাদী। ইমাম শাফিয়ী (২০৪ হি) আমাকে বলেন, তুমি তোমরা কথাবার্তা পরিশীলিত কর। তুমি ‘মিথ্যাবাদী’ (كذاب) না বলে বল, (حديثه ليس بشيء) ‘তার হাদীস কিছুই নয়’।

**(ঙ) পতিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, অত্যন্ত দুর্বল ...ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা**

কিছু শব্দ দ্বারা মুহাদ্দিসগণ রাবীর কঠিন দুর্বলতা ব্যক্ত করেন। যেমন,

ساقط، واه، واه بمرة، هالك، ذاهب الحديث...

পতিত, অত্যন্ত দুর্বল, একেবারেই বাতিল, ধ্বংসগ্রস্থ, তার হাদীস চলে গেছে, উড়ে গেছে... ইত্যাদি। এ সকল রাবীর হাদীস ইচ্ছাকৃত মিথ্যা না হলেও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা এবং একেবারেই অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ের। অনেক মুহাদ্দিস এ পর্যায়ের রাবীর হাদীসকেও জাল বা মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন।

### ৭. ২. মিথ্যা হাদীসের বিভিন্ন নাম

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে জাল বা মিথ্যা হাদীসকে ‘মাউযূ’ (الموضوع) বলা হলেও, জাল হাদীস বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণের আরো কিছু প্রচলিত পরিভাষা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

**১. বাতিল (باطل)**

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, অনেক সময় মুহাদ্দিসগণ মিথ্যা হাদীসকে ‘মাউযূ’ বা জাল না বলে ‘বাতিল’ বলেন। বিশেষত, অনেক মুহাদ্দিস রাবীর ইচ্ছাকৃত মিথ্যার বিষয়ে নিশ্চিত না হলে হাদীসকে ‘মাউযূ’ বলতে চান না। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ‘বাতিল’ শব্দ ব্যবহার করেন। অর্থাৎ হাদীসটি মিথ্যা ও বাতিল, তবে রাবী ইচ্ছা করে তা জাল করেছে কিনা তা নিশ্চিত নয়।

**২. সহীহ নয় (لا يصح)**

জাল হাদীস বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণের অন্যতম পরিভাষা ‘হাদীসটি সহীহ নয়’। এ কথাটি কেউ ভুল বুঝেন। তাঁরা ভাবেন, হাদীসটি সহীহ না হলে হয়ত হাসান বা যয়ীফ হবে। আসলে বিষয়টি তেমন নয়। জাল হাদীস আলোচনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ যখন বলেন যে, হাদীসটি সহীহ বা বিশুদ্ধ নয়, তখন তাঁরা বুঝান যে, হাদীসটি অশুদ্ধ, বাতিল ও ভিত্তিহীন। তবে ফিকহী আলোচনায় কখনো কখনো তাঁরা ‘সহীহ নয়’ বলতে ‘যয়ীফ’ বুঝিয়ে থাকেন।

**৩. কোনো ভিত্তি নেই, কোনো সূত্র নেই (ليس له أصل، لا أصل له)**

মুহাদ্দিসগণ জাল ও মিথ্যা হাদীস বুঝাতে অনেক সময় বলেন, হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই, সূত্র নেই। এদ্বারা তাঁরা সাধারণভাবে বুঝান যে, এ হাদীসটি জনমুখে প্রচলিত একটি সনদ বিহীন বাক্য মাত্র, এর সহীহ, যয়ীফ বা মাউদূ কোনো প্রকারের কোনো সনদ বা সূত্র নেই এবং কোনো গ্রন্থে তা সনদসহ পাওয়া যায় না। কখনো কখনো জাল বা বাতিল সনদের হাদীসকেও তাঁরা এভাবে ‘এর কোনো ভিত্তি নেই’ বলে আখ্যায়িত করেন।

**৪. জানি না, কোথাও দেখি নি, পাই নি (لا أعرفه، لم أره، لم أجده)**

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীস সংকলিত হয়ে যাওয়ার পরে, কোনো প্রচলিত বাক্য যদি সকল প্রকারের অনুসন্ধানের পরেও কোনো গ্রন্থে সনদ-সহ না পাওয়া যায় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে যে, কথাটি বাতিল ও ভিত্তিহীন। যে সকল মুহাদ্দিস তাঁদের জীবন হাদীস সংগ্রহ, অনুসন্ধান, যাচাই ও নিরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের কেউ যদি বলেন, এ হাদীসটি আমি চিনি না, জানি না, কোথাও দেখি নি, কোথাও পাই নি, পরিচিত নয়..., তবে তাঁর কথাটি প্রমাণ করবে যে, এ হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা।

**৫. গরীব (অপরিচিত), অত্যন্ত গরীব (غريب، غريب جدا)**

গরীব অর্থ প্রবাসী, অপরিচিত বা অনাত্মীয়। যে হাদীস কোনো পর্যায়ে শুধু একজন রাবী বর্ণনা করেছেন মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তাকে 'গরীব' হাদীস বলা হয়। এ পরিভাষা অনুসারে গরীব হাদীস সহীহ হতে পারে, যয়ীফও হতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো মুহাদ্দিস জাল হাদীস বুঝাতে এ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। অন্যন্য মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিষয়ে বলেছেন 'জানি না, ভিত্তিহীন..., সেগুলোর বিষয়ে তাঁরা বলেছেন, 'গরীব' বা 'গরীবুন জিদ্দান' অর্থাৎ অপরিচিত বা অত্যন্ত অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী, খতীব বাগদাদী, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস এভাবে এ পরিভাষাটি কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন। এ পরিভাষাটি বেশি ব্যবহার করেছেন ৮ম শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফাকীহ ও মুহাদ্দিস আলামা আব্দুলাহ ইবনু ইউসূফ যাইলায়ী (৭৬২হি)।[২৪৩]

## ৭. ৩. ভাষা, অর্থ ও বুদ্ধিবৃত্তিক নিরীক্ষা

বর্ণনাকারীর বর্ণনার নির্ভুলতা যাচাইয়ের পাশাপাশি মুহাদ্দিসগণ বর্ণনার অর্থও যাচাই করেছেন। কুরআন কারীম, সুপ্রসিদ্ধ সুন্নাত, বুদ্ধি-বিবেক, ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠিত সত্য বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ কোনো বক্তব্য তাঁরা 'হাদীস' হিসাবে গ্রহণ করেন নি।

হাদীসের বিষয়বস্তু, ভাব ও ভাষাও অভিজ্ঞ নাকিদ মুহাদ্দিসগণকে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা বুঝতে সাহায্য করে। আজীবনের হাদীস চর্চার আলোকে তাঁরা কোনো হাদীসের ভাষা, অর্থ বা বিষয়বস্তু দেখেই অনুভব করতে পারেন যে, হাদীসটি বানোয়াট। বিষয়টি খুব কঠিন নয়। যে কোনো বিষয়ের গবেষক সে বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। একজন নজরুল বিশেষজ্ঞকে পরবর্তী যুগের কোনো কবির কবিতা নিয়ে নজরুলের বলে চালালে তা ধরে ফেলবেন। কবিতার ভাব ও ভাষা দেখে তিনি প্রথমেই বলে উঠবেন, এ তো নজরুলের কবিতা হতে পারে না! কোথায় পেয়েছেন এ কবিতা? কীভাবে?? অনুরূপভাবে যে কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট গবেষক সেই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লাভ করেন, যা দিয়ে তিনি সে বিষয়ক তথ্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক বিচারের যোগ্যতা লাভ করেন।

হাদীস শাস্ত্রের প্রাজ্ঞ ইমামগণ, যাঁরা তাঁদের পুরো জীবন হাদীস শিক্ষা, মুখস্থ, তুলনা, নিরীক্ষা ও শিক্ষাদান করে কাটিয়েছেন তাঁরাও রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, পুরস্কার বর্ণনা, শাস্তি বর্ণনা, শব্দ চয়ন, বিষয়বস্তু, ভাব, অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অনুভুতি লাভ করেন। এর আলোকে তাঁরা তাঁর নামে প্রচারিত কোনো বাক্য বা 'হাদীস' শুনলে সাথে সাথে অনুভব করতে পারেন যে, এ বিষয়, এ ভাষা, এ শব্দ বা এ অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস হতে পারে অথবা পারে না। এর পাশাপাশি তাঁরা অন্যান্য নিরীক্ষার মাধ্যমে এর জালিয়াতি নিশ্চিত করেন।

মুহাদ্দিসগণের হাদীস সমালোচনা সাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডারে আমরা অগণিত উদাহরণ দেখতে পাই যে, হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী বলে গণ্য না হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের ভাষা, ভাব ও অর্থের কারণে মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে 'পরিত্যক্ত', জাল বা বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন।

মুহাদ্দিসগণের এ বিষয়ক কর্মধারা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এক্ষেত্রে তাঁরা সাহাবীগণের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। আমরা দেখেছি যে, কোনো হাদীসের বিচারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিবেচ্য হলো, কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে প্রমাণিত কিনা তা যাচাই করা। প্রমাণিত হলে তা গ্রহণ করতে হবে, অপ্রমাণিত হলে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং কোনোরূপ দ্বিধা থাকলে তা অতিরিক্ত নিরীক্ষা করতে হবে। এভাবে ভাষা ও অর্থগত নিরীক্ষায় হাদীসের তিনটি পর্যায় রয়েছে:

### ৭. ৩. ১. মূল নিরীক্ষায় সহীহ বলে প্রমাণিত

যদি বর্ণনাকারীগণের সাক্ষ্য ও সকল প্রাসঙ্গিক নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, কথাটি 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী, কর্ম বা অনুমোদন, তবে তা 'ওহীর' নির্দেশনা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এখানেও 'শুযূয' ও 'ইল্লাতের' বিচার করতে হবে, যেখানে ভাষা ও অর্থগত নিরীক্ষার প্রক্রিয়া বিদ্যমান। তবে এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্যণীয়:

**(ক)** এ পর্যায়ের প্রমাণিত কোনো হাদীসের মধ্যে ভাষাগত বা অর্থগত দুর্বলতা বা অসংলগ্নতা পাওয়া যায় না। কারণ শব্দগত বা অর্থগত ভাবে অসংলগ্ন 'হাদীস' বর্ণনা করা, অথবা বুদ্ধি, বিবেক, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীত কোনো 'হাদীস' বর্ণনা করাকেই 'রাবী'র দুর্বলতা বলে বিবেচনা করা হয়েছে। অনেক সৎ ও প্রসিদ্ধ রাবী এরূপ হাদীস বর্ণনা করার ফলে দুর্বল বলে বিবেচিত হয়েছেন এবং তাঁদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এজন্য সনদ ও সাধারণ অর্থ নিরীক্ষায় (৫টি শর্ত পূরণকারী) 'সহীহ' বলে প্রমানিত কোনো হাদীসের মধ্যে ভাষাগত ও অর্থগত দুর্বলতা পাওয়া যায় না।

**(খ)** অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বিবেক', 'বুদ্ধি' বা 'আকল'-এর নির্দেশনা আপেক্ষিক। একজন মানুষ যাকে 'বিবেক বিরোধী' বলে গণ্য করছেন, অন্যজন তাকে 'বিবেক' বা বুদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করতে পারেন। এজন্য মুসলিম উম্মাহর মূলনীতি হলো, কোনো কিছু 'ওহী' বলে প্রমাণিত হলে তা মেনে নেয়া। যেমন কুরআন কারীমে 'চুরির শাস্তি হিসেবে হস্তকর্তনের' নির্দেশ রয়েছে। বিষয়টি

কারো কাছে 'বিবেক' বিরুদ্ধ মনে হতে পারে। কিন্তু মুমিন কখনোই এ যুক্তিতে এ বিধানটি প্রত্যাখ্যান করেন না। বরং বুদ্ধি, বিবেক ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ বিধানের যৌক্তিকতা বুঝতে চেষ্টা করেন। হাদীসের ক্ষেত্রেও মুমিনগণ একইরূপ মূলনীতি অনুসরণ করেন।

**(গ)** বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক তথ্যের ক্ষেত্রেও মুসলিম উম্মাহ একইরূপ মূলনীতি অনুসরণ করেন। স্বভাবতই কুরআন ও হাদীসে বিজ্ঞান বা ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয় নি। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে এ জাতীয় কিছু কথা আলোচনা করা হয়েছে। 'ওহী' বলে প্রমাণিত কোনো বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ যদি কোনো ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যের বিপরীত হয়, তবে তাঁরা কখনোই সে বক্তব্যকে মিথ্যা বা ভুল বলে মনে করেন না। যেমন কুরআন কারীমের কোনো কোনো আয়াতের ব্যাহ্যিক অর্থ দ্বারা মনে হতে পারে যে, পৃথিবী সমতল বা সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত। এক্ষেত্রে মুমিনগণ এ সকল বক্তব্যের সঠিক অর্থ বুঝার চেষ্টা করেন। হাদীসের ক্ষেত্রেও একই নীতি তাঁরা অনুসরণ করেন।

**(ঘ)** নিরীক্ষায় প্রমাণিত কোনো 'সহীহ হাদীসের' সাথে অন্য কোনো সহীহ হাদীস বা কুরআনের আয়াতের মূলত কোনো বৈপরীত্য ঘটে না। বাহ্যত কোনো বৈপরীত্য দেখা দিলে মুহাদ্দিসগণ ঐতিহাসিক ও পারিপার্শ্বিক তথ্যাদির ভিত্তিতে 'ডকুমেন্টারী' প্রমাণের মাধ্যমে সেই বৈপরীত্য সমাধান করেছেন। কিন্তু কখনোই ঢালাওভাবে শুধু বাহ্যিক বৈপরীত্যের কারণে কোনো প্রমাণিত তথ্যকে অগ্রাহ্য করেন নি। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন্ স্থান থেকে হজ্জের 'তালবিয়া' পাঠ শুরু করেন সে বিষয়ে একাধিক 'সহীহ' বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। মুহাদ্দিসগণ এ বাহ্যিক বৈপরীত্যের সমাধানের জন্য ঐতিহাসিক ও পারিপার্শিক তথ্যাদি বিবেচনা করেছেন, যা আমরা এ পুস্তকের প্রথমে আলোচনা করেছি।

এভাবে কোনো হাদীস 'ডকুমেন্টারী' নিরীক্ষায় 'ওহী' বলে প্রমাণিত হওয়ার পরেও যদি বাহ্যত অন্য কোনো হাদীস বা আয়াতের সাথে তার বৈপরীত্য দেখা যায়, তবে মুহাদ্দিসগণ সে বৈপরীত্যের ইতিহাস, কারণ ও সমাধান অনুসন্ধান করেছেন ও লিপিবদ্ধ করেছেন।

**৭. ৩. ২. মূল নিরীক্ষায় 'মিথ্যা' বলে প্রমাণিত**

যদি কোনো কথা বা বক্তব্যের বিষয়ে প্রমাণিত হয় যে, কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী নয়, বরং বর্ণনাকারী ভুলে বা ইচ্ছায় তাঁর নামে তা বলেছেন, তবে সেক্ষেত্রে সে বক্তব্যটির ভাষা বা অর্থ বিবেচনা করা হয় না। কোনোরূপ বিবেচনা ছাড়াই তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। অধিকাংশ জাল হাদীসই এ পর্যায়ের। জালিয়াতগণ সাধ্যমত সুন্দর অর্থেই হাদীস বানাতে চেষ্টা করেন।

**৭. ৩. ৩. মূল নিরীক্ষায় দুর্বল বলে পরিলক্ষিত**

যদি প্রমাণিত হয় যে, বর্ণনাকারী ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও সত্যপরায়ণ, তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় কিছু ভুল করতেন, তবে সেক্ষেত্রে তার দুর্বলতার মাত্রা অনুসারে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বা যয়ীফ বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া কোনো বর্ণনাকারীর পরিচয় জানা না গেলেও হাদীসটি সাধারণভাবে দুর্বল বলে গণ্য করা হয়। সর্বোপরি যদি দেখা যায় যে বর্ণনাকারী সৎ ও সত্যপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও উদ্ভট অর্থের 'হাদীস' বর্ণনা করছেন, যা অন্য কেউ বর্ণনা করছেন না সেক্ষেত্রেও তাঁর বর্ণিত হাদীস দুর্বল বলে গণ্য। এই পর্যায়ের অনেক হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ শব্দ ও অর্থগত নিরীক্ষার মাধ্যমে 'জাল' বলে গণ্য করেছেন। জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে এরূপ অনেক হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলির সনদে কোনো মিথ্যায় অভিযুক্ত না থাকলেও সেগুলোকে জাল বলা হয়েছে। আবার এ জাতীয় কিছু হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। বাহ্যিক সনদের কারণে কেউ কেউ তা দুর্বল বা 'হাসান' বললেও, অর্থের কারণে অন্যেরা তা জাল বলে গণ্য করেছেন। এখানে দুটি উদাহরণ উল্লেখ করছি:

**(১)** আনাস (রা)-এর সূত্রে 'আরশ'-এর বর্ণনায় একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আনাস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মহান প্রভুর 'আরশ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বলেন আমি জিবরাঈলকে মহান প্রভুর 'আরশ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন, আমি মিকাঈলকে মহান প্রভুর 'আরশ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন আমি ইসরাফীলকে মহান প্রভুর 'আরশ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন, আমি রাফী-কে মহান প্রভুর 'আরশ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন আমি লাওহে মাহফূযকে মহান প্রভুর 'আরশ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন, আমি 'কলম'-কে মহান প্রভুর 'আরশ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন: আরশের ৩ লক্ষ ৬০ হাজার খুটি আছে..... ইত্যাদি...।

হাদীসটির সনদে 'মুহাম্মাদ ইবনু নাসর' নামক একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন, যাকে স্পষ্টত 'মিথ্যাবাদী' বলা হয় নি। তবে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি জাল। ইবনু হাজার বলেন: "এ হাদীসটির মিথ্যাচার সুস্পষ্ট। হাদীস সাহিত্যে যার কিছুটা দখল আছে তিনি কখনোই এ বিষয়ে দ্বিমত করবেন না।"[২৪৪]

**(২)** তাবি-তাবিয়ী ফুদাইল ইবনু মারযূক (১৬০হি) বলেছেন, ইবরাহীম ইবনু হাসান থেকে, ফাতিমা বিনতুল হুসাইন ইবনু আলী (১০০ হি) থেকে, আসমা বিনতু উমাইস (রা) থেকে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। এসময়ে তাঁর মস্তক ছিল আলীর (রা) কোলে। এজন্য আলী আসরের সালাত আদায় করতে পারেন নি। এমতাবস্থায় সূর্য ডুবে যায়। তিনি আলীকে বলেন: তুমি কি সালাত আদায় করেছ? তিনি বলেন না। তখন তিনি বলেন: হে আল্লাহ, আলী যদি আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্যে থেকে থাকেন তবে তাঁর জন্য আপনি সূর্য ফিরিয়ে দিন। আসমা বলেন: আমি দেখলাম, সূর্য ডুবে গেল। এরপর ডুবে যাওয়ার পরে আবার তা

উদিত হলো।"

এ সনদে আসমা বিনতু উমাইস প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবী। ফাতিমা বিনতুল হুসাইন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী। ফুদাইল ইবনু মারযূক সত্যপরায়ণ রাবী, তবে তিনি ভুল করতেন। ইবরাহীম ইবনু হাসান কিছুটা অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। তবে যেহেতু কেউ তাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে সুস্পষ্টত কিছু বলেন নি, এজন্য ইবনু হিব্বান তাঁকে 'গ্রহণযোগ্য' বলে গণ্য করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, সনদ বিচারে হাদীসটি 'হাসান' বলে গণ্য হতে পারে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বাহ্যিক সনদের দিকে তাকিয়ে এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইবনু তাইমিয়া, ইবনু কাসীর, যাহাবী ও অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটির 'মতন' বা 'মূলবক্তব্য' 'জাল' বলে গণ্য করেছেন।

তাঁদের বিস্তারিত আলোচনার সার-সংক্ষেপ হলো, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরে আবার উদিত হওয়া একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা। আর মানবীয় প্রকৃতি 'অস্বাভাবিক' ও 'অলৌকিক' ঘটনা বর্ণনায় সবচেয়ে বেশি আগ্রহবোধ করে। এজন্য স্বভাবতই আশা করা যায় যে, অন্তত বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে তা বর্ণিত হবে। কিন্তু একমাত্র আসমা বিনতু উমাইস (রা) ছাড়া অন্য কোনো সাহাবী থেকে তা বর্ণিত হয় নি। এরূপ ঘটনা সূর্যগ্রহণের চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক বিষয়। আমরা দেখি যে, সূর্যগ্রহণের ঘটনা অনেক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত, অথচ এ ঘটনাটি এ একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত।

এরপর আসমা (রা)-এর ২০ জনেরও অধিক প্রসিদ্ধ ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন। এরূপ একটি অত্যাশ্চার্য ঘটনা তাঁর অধিকাংশ ছাত্রই বর্ণনা করবেন বলে আশা করা যায়। কিন্তু বস্তুত তা ঘটে নি। শুধুমাত্র ফাতেমার সনদে তা বর্ণিত হচ্ছে। ফাতেমার ছাত্র বলে উল্লিখিত 'ইবরাহীম ইবনু হাসান' অনেকটা অজ্ঞাত পরিচয়। তিনি ফাতেমার কাছ থেকে আদৌ কিছু শুনেছেন কিনা তা জানা যায় না। অনুরূপ আরেকটি সনদেও ঘটনাটি আসমা বিনতু উমাইস থেকে বর্ণিত। সে সনদেও দুজন অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী ও একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। এতবড় একটি ঘটনা এভাবে দুই-একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বলবেন না তা ধারণা করা কষ্টকর।

অন্যদিকে এ ঘটনাটি কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার সাথে বাহ্যত সাংঘর্ষিক। খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে ও আলী (রা) সহ অন্যান্য সকল সাহাবী আসরের সালাত আদায় করতে ব্যর্থ হন। সূর্যাস্তের পরে তাঁরা 'কাযা' সালাত আদায় করেন। অন্যদিন ঘুমের কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সহ সাহাবীগণের ফজরের সালাত এভাবে কাযা হয়। এ দুই দিনে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আলী (রা)-সহ সাহাবীগণের জন্য সূর্যকে ফেরত আনা বা নেয়া হলো না, অথচ এ ঘটনায় শুধু আলীর জন্য তা করা হবে কেন? আর ওযরের কারণে সালাতের সময় নষ্ট হলে তো কোনো অসুবিধা হয় না। এছাড়া আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে জামাতে সালাত আদায় করবেন না, আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক/দেড় ঘন্টা যাবত ওহী নাযিল হবে ইত্যাদি বিষয় স্বাভাবিক মনে হয় না।

এ জাতীয় আরো অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে তাঁরা বলেন যে, এ 'মতন'টি ভুল বা বানোয়াট। এ সকল অজ্ঞাত পরিচয় রাবীগণের মধ্যে কেউ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুল করেছেন।[২৪৫]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ভাষা, অর্থ ও বুদ্ধিবৃত্তিক নিরীক্ষার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অত্যন্ত যৌক্তিক ও সুক্ষ্ম। যে কোনো বিচারালয়ে বিচারক বুদ্ধিবৃত্তিক ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণকে ডকুমেন্টারী প্রমাণের পরে বিবেচনা করেন। কোনো অভিযুক্তের বিষয়ে অপরাধের মোটিভ ও যৌক্তিকতা স্পষ্টভাবে দেখতে পারলেও পাশাপাশি প্রমাণাদি না থাকলে তিনি শুধুমাত্র মোটিভ বিচার করে শাস্তি দেন না। অনুরূপভাবে কোনো অভিযুক্তের বিষয়ে যদি তিনি অনুভব করেন যে, তার জন্য অপরাধ করার কোনো যৌক্তিক বা বিবেক সংগত কারণ নেই, কিন্তু সকল ডকুমেন্ট ও সাক্ষ্য সুস্পষ্টরূপে তাকে অপরাধী বলে নির্দেশ করছে, তখন তিনি তাকে অপরাধী বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। মুহাদ্দিসগণও এভাবে সর্বপ্রথম 'ডকুমেন্টারী' প্রমাণগুলোর নিরীক্ষা করেছেন এবং এরপর ভাষা, অর্থ, ও তথ্য বিবেচনা করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে শব্দ ও অর্থগত নিরীক্ষার কিছু মূলনীতি আমরা দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ।

### ৭. ৪. মিথ্যা-হাদীস চিহ্নিতকরণে মতভেদ

জাল হাদীস চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কখনো কখনো মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। এ মতভেদ সীমিত এবং খুবই স্বাভাবিক। আমরা দেখতে পেয়েছি যে, হাদীসের নির্ভুলতা যাচাই করা অবিকল বিচারালয়ে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণের নির্ভুলতা প্রমাণ করার মতই একটি কর্ম। বিভিন্ন 'কেসে' আমরা বিচারকগণের মতভেদ দেখতে পাই। এর অর্থ এ নয় যে, বিচার কার্য একটি অনিয়ন্ত্রিত কর্ম এবং বিচারকগণ ইচ্ছা মাফিক মানুষদের ফাঁসি দেন বা একজনের সম্পত্তি অন্যকে প্রদান করেন। প্রকৃত বিষয় হলো, সাক্ষ্য প্রমাণের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে কখনো কখনো বিচারকগণ মতভেদ করতে পারেন। হাদীসের নির্ভুলতা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিছু সংখ্যক হাদীসের বিষয়ে তাঁদের মতভেদ

রয়েছে। এ মতভেদকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি: ১. পরিভাষাগত মতভেদ ও ২. প্রকৃত মতভেদ।

**৭. ৪. ১. মতভেদ কিন্তু মতভেদ নয়**

অনেক সময় মুহাদ্দিসগণের মতভেদ একান্তই পরিভাষাগত। উপরে আমরা দেখেছি যে, মিথ্যাবাদী রাবীর পরিচয় জ্ঞাপনে এবং জাল হাদীস চিহ্নিতকরণে মুহাদ্দিসগণ একাধিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এতে কখনো দেখা যায় যে, একটি হাদীসকে একজন মুহাদ্দিস 'মুনকার' বা 'বাতিল' বলছেন এবং অন্যজন তাকে 'মাউযূ' বলছেন। এরূপ একটি পরিভাষাগত বিষয় 'যয়ীফ' শব্দের ব্যবহার। ইলমুল হাদীসের পরিভাষায় সকল প্রকার অগ্রহণযোগ্য হাদীসকেই 'যয়ীফ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। যয়ীফ হাদীসের এক প্রকার হলো মাউযূ বা জাল হাদীস। কোনো হাদীসকে যয়ীফ বলে আখ্যায়িত করার অর্থ হাদীসটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। তা জাল হতে পারে নাও হতে পারে।

আমরা দেখতে পাই যে, অনেক মুহাদ্দিস হাদীস সংকলন ও নিরীক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষত বৃহদাকার গ্রন্থাদির ক্ষেত্রে অনেক হাদীস 'দুর্বল' বা 'যয়ীফ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সকল দুর্বল হাদীসের কোনো হাদীসকে অন্যান্য মুহাদ্দিস 'মাউযূ' বা জাল বলে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি বাহ্যত মতভেদ বলে মনে হলেও তা প্রকৃত মতভেদ নয়। কোনো মুহাদ্দিস যদি বলেন যে, হাদীসটি যয়ীফ, তবে মাউযূ নয়, এবং অন্য মুহাদ্দিস বলেন যে, হাদীসটি মাউযূ, তবে তা মতভেদ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যে সকল মুহাদ্দিস সাধারণত 'মাউযূ' পরিভাষা ব্যবহার করেন নি, বরং সকল 'অনির্ভরযোগ্য' হাদীসকে সংক্ষেপে 'দুর্বল' বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি মতভেদ বলে গণ্য নয়।

**৭. ৪. ২. প্রকৃত মতভেদ**

কিছু হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের প্রকৃত মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। এ জাতীয় অধিকাংশ হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ 'যয়ীফ বনাম মাউযূ'। কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, হাদীসটি মাউযূ নয় বরং যয়ীফ, পক্ষান্তরে কেউ তাকে মাউযূ বলে গণ্য করেছেন। অল্প কিছু হাদীসের বিষয়ে 'সহীহ বনাম মাউযূ' মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কোনো মুহাদ্দিস একটি হাদীসকে মাউযূ বলে গণ্য করেছেন, কিন্তু অন্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। এ সকল মতভেদের ক্ষেত্রে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন নিরীক্ষার মাধ্যমে কোনো একজনের মতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। বিষয়টি অনেকটা বিচারের রায়ের ক্ষেত্রে মতভেদ ও আপীলের মত।

**৭. ৪. ৩. মতভেদের কারণ**

**৭. ৪. ৩. ১. সনদের বিভিন্নতা**

অনেক সময় একজন মুহাদ্দিস এক বা একাধিক সনদের ভিত্তিতে একটি হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত করেন। তিনি জানতে পারেন নি যে, হাদীসটি অন্য কোনো সনদে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য একজন মুহাদ্দিস অন্য এক বা একাধিক সনদের কারণে হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন।

**৭. ৪. ৩. ২. রাবীর মান নির্ধারণে মতভেদ**

'রাবী'-র বর্ণিত হাদীসগুলোর তুলনামূলক নিরীক্ষা হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচারের মূল মাপকাঠি। আর এ কারণেই রাবীর বর্ণনা বিচারে কিছু মতভেদ হয়। এদিক থেকে আমরা রাবীগণকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। (১) পূর্ণ গ্রহণযোগ্য রাবীগণ, যাদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সকল নিরীক্ষক মুহাদ্দিস একমত, (২) পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য রাবীগণ, যাদের দুর্বলতা বা জালিয়াতির বিষয়ে নিরীক্ষক মুহাদ্দিসগণ একমত এবং (৩) মতভেদীয় রাবীগণ, যাদের গ্রহণযোগ্যতার মান নির্ধারণে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন।

যে সকল রাবী কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, তাঁদের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশকিছু উল্টাপাল্টা ও ভুল বর্ণনা রয়েছে আবার কিছু বিশুদ্ধ বর্ণনাও রয়েছে এদের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো মতভেদ করেছেন। তাদের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে শুদ্ধ ও ভুল বর্ণনার হার, কারণ ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ মাঝে মাঝে মতভেদ করেছেন।

কখনো বা কোনো মুহাদ্দিস আংশিক তথ্যের উপর নির্ভর করে রায় দিয়েছেন, যা অন্য মুহাদ্দিস সামগ্রিক তথ্যের উপর নির্ভর করে বাতিল করেছেন। যেমন একজন রাবীর কিছু হাদীস বিশুদ্ধ বা ভুল দেখে একজন মুহাদ্দিস তাকে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন। অন্য মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত সকল হাদীস নিরীক্ষার মাধ্যমে অন্য বিধান প্রদান করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ সকল মতভেদের ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ পর্যালোচনা করেছেন এবং মতামত প্রদানকারীগণের বিভিন্ন মতামতের ভারসাম্য, বিচক্ষণতা, গভীরতা ইত্যাদির ভিত্তিতে মতবিরোধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালা নির্ণয় করেছেন।[২৪৬]

**৭. ৪. ৩. ৩. মুহাদ্দিসের নীতিগত বা পদ্ধতিগত মতভেদ**

কখনো কখনো রাবী এবং হাদীসের বিধান প্রদানে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কেউ একটু বেশি ঢিলেমি ও কেউ বেশি কড়াকড়ি করেছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এ সকল বিষয়ে পর্যাপ্ত নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে তাদের মতভেদ

নিরসন করেছেন। যেমন,

চতুর্থ শতকের মুহাদ্দিস ইবনু হিব্বান আবু হাতিম মুহাম্মাদ আল-বুসতী (৩৫৪ হি), ৬ষ্ঠ শতকের মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি) ভিত্তিহীন কঠোরতার জন্য অভিযুক্ত। পক্ষান্তরে তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী মুহাম্মাদ ইব্‌নু ঈসা (২৭৯ হি), ৪র্থ-৫ম শতকের মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫ হি), ১০ম শতকের মুহাদ্দিস জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি) প্রমুখ ঢিলেমির জন্য পরিচিতি লাভ করেছেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

**(১)** ইবনু হিব্বান ও ইবনুল জাওযীর কড়াকড়ি-জাত ভুলের উদাহরণ। দ্বিতীয় হিজরী শতকের রাবী আফলাহ ইবনু সাঈদ আনসারী (১৫৬ হি) বলেন, আমাদেরকে উম্মু সালামার গোলাম আব্দুল্লাহ ইবনু রাফি বলেছেন, আমি আবূ হুরাইরাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেছেন:

يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ

"তোমার জীবন যদি দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে খুব সম্ভব তুমি এমন কিছু মানুষ দেখতে পাবে যাদের হাতে গরুর লেজের মত (বেত বা ছড়ি) থাকবে। (নিরীহ মানুষদের সন্ত্রস্ত করবে বা আঘাত করবে।) তারা সকালেও আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে থাকবে এবং বিকালেও আল্লাহর ক্রোধের মধ্যেই থাকবে।"

এ হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান ও ইবনুল জাওযী জাল বলে গণ্য করেছেন। তাদের দাবি, এ হাদীসের বর্ণনাকারী আফলাহ ইবনু সাঈদ জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মতের আলোকে দেখেছেন যে, তাদের এ মত সম্পূর্ণ ভুল। কোনো মুহাদ্দিসই বলেন নি যে, আফলাহ জাল হাদীস বর্ণনা করেন। এমনকি কেউ বলেন নি যে, আফলাহ অনির্ভরযোগ্য। মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ (২৩০ হি), ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩ হি), আবূ হাতিম রাযী (২৭৭ হি), নাসাঈ (৩০৪ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বিস্তারিত নিরীক্ষার মাধ্যমে তাকে গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইবনু হিব্বান বা ইবনুল জাওযী কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি যে, আফলাহ অন্য রাবীদের বিপরীত উল্টোপাল্টা কোনো হাদীস বর্ণনা করেছেন। সর্বোপরি এ হাদীসটি আফলাহ ছাড়াও অন্য নির্ভরযোগ্য রাবী আবূ হুরাইরার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কাজেই হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ এবং ইবনু হিব্বান ও ইবনুল জাওযীর সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রমাণিত।[২৪৭]

**(২)** ইমাম তিরমিযীর ঢিলেমি-জাত ভুলের উদাহরণ। তিনি বলেন: "আমাদেরকে মুসলিম ইবনু আমর আবু আমর আল-হাযযা মাদানী বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু নাফি' আস-সাইগ বলেন, তিনি কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে তার পিতা থেকে তার দাদা (আমর ইবনু আউফ) থেকে বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

"নবী আকরাম ﷺ দুই ঈদে প্রথম রাক'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৭ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৫ তাকবীর বলেছেন।"[২৪৮]

হাদীসটি উল্লেখ করে ইমাম তিরমিযী বলেন :

حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

"কাসীরের দাদার হাদীসটি হাসান (গ্রহণযোগ্য)। এ বিষয়ে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে এ হাদীসটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য।[২৪৯]

এভাবে তিনি এ হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, তার মতে এ বিষয়ে এটিই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হাদীস।

মুহাদ্দিসগণ ইমাম তিরমিযীর এ মতের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। কারণ, মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের বর্ণনাকারী কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহকে অত্যন্ত দুর্বল "রাবী" বলে গণ্য করেছেন। উপরন্তু অনেকেই তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন: সে অত্যন্ত দুর্বল ও একেবারেই অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন: সে দুর্বল। ইমাম আবু দাউদ বলেন: লোকটি জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিল। ইমাম শাফিয়ী বলেন: সে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদীদের একজন। ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন: সে পরিত্যক্ত, অর্থাৎ মিথ্যা হাদীস বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবনু হিব্বান বলেন: সে তার পিতা থেকে দাদা থেকে একটি মিথ্যা হাদীসের পুস্তিকা বর্ণনা করেছে। শুধুমাত্র সমালোচনার প্রয়োজন ছাড়া কোনো গ্রন্থে সে সকল হাদীস উল্লেখ

করাও জায়েয নয়। ইবনু আব্দিল বার্‌র বলেন: এ ব্যক্তি যে দুর্বল সে বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্য হয়েছে।[২৫০] এজন্য আবুল খাত্তাব উমার ইবনু হাসান ইবনু দাহিয়া (৬৩৩ হি) বলেন:

"وَكَمْ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ فِيْ كِتَابِهِ مِنْ أَحَادِيْثَ مَوْضُوْعَةٍ وَأَسَانِيْدَ وَاهِيَةٍ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيْثُ"

"তিরমিযী তাঁর গ্রন্থে কত যে মাউযূ বা বানোয়াট ও অত্যন্ত দুর্বল সনদকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এ হাদীসটিও সেগুলোর একটি।"[২৫১]

(৩) ইমাম হাকিম-এর মুসতাদরাক থেকে উদাহরণ। হাদীসকে সহীহ বলার ক্ষেত্রে হাকিমের দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি। তিনি তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে অনেক জাল হাদীসকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। একটি উদাহরণ দেখুন:

হাকিম বলেন, আমাদেরকে আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উকবা শাইবানী কুফায় অবস্থানকালে বলেছেন, আমাদেরকে কাযী ইবরাহীম ইবনু আবিল আনবাস বলেছেন, আমাদেরকে সাঈদ ইবনু উসমান আল-খার্‌রায বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুর রাহমান ইবনু সাঈদ আল-মুয়ায্‌যিন বলেছেন, আমাদেরকে কাতার ইবনু খালীফাহ বলেছেন, আবুত তুফাইল থেকে, তিনি আলী ও আম্মার (রা) থেকে: তাঁরা উভয়ে বলেন:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ فِيْ الْمَكْتُوْبَاتِ بِـ(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) وَكَانَ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ

"নবী (ﷺ) ফরয সালাতসমূহে জোরে জোরে (সশব্দে) 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করতেন এবং তিনি সালাতুল ফজরে কুনুত পাঠ করতেন... ।"

ইমাম হাকিম হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন:

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلاَ أَعْلَمُ فِيْ رُوَاتِهِ مَنْسُوْباً إِلَى الْجَرْحِ

"এ হাদীসটির সনদ সহীহ। এর রাবীদের মধ্যে কেউ দুর্বল বলে গণ্য হয়েছেন বলে জানি না।"[২৫২]

ইমাম যাহাবী, যাইলায়ী, ইবনু হাজার প্রমুখ মুহাদ্দিস হাকিমের এ সিদ্ধান্ত ভুল বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, এ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল বরং মাউযূ বা জাল বলেই প্রতীয়মান হয়। সনদের দুজন রাবী অত্যন্ত দুর্বল: (১) সাঈদ ইবনু উসমান আল-খার্‌রায এবং (২) তার উস্তাদ আব্দুর রাহমান ইবনু সাঈদ আল-মুয়ায্‌যিন।[২৫৩]

আরো অনেক নমুনা আমরা দ্বিতীয় পর্বে দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ।

(৪) ১০ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী। ইলম হাদীসের বিভিন্ন ময়দানে তাঁর খেদমত রয়েছে। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে তাঁর গ্রন্থাবলির উপর নির্ভর করেন। তিনি তাঁর প্রণীত ও সংকলিত 'আল-জামি' আস-সগীর', 'আল-জামি' আল-কাবীর' 'আল-খাসাইসুল কুবরা' বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ সকল গ্রন্থে সহীহ ও যয়ীফ হাদীস সংকলন করবেন, তবে কোনো জাল হাদীস তিনি এ সকল গ্রন্থে উল্লেখ করবেন না। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তাঁর এ সকল গ্রন্থের মধ্যে কিছু জাল হাদীসও দেখতে পেয়েছেন। বিশেষত, ইমাম সুয়ূতী নিজেই জাল হাদীসের বিষয়ে অনেকগুলি বই লিখেছেন। বেশ কিছু হাদীস ইমাম সুয়ূতী 'জাল' বলে চিহ্নিত করে 'জাল হাদীস' বিষয়ক গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। আবার তিনি নিজেই সেগুলোকে 'আল-জামি' আস-সাগীর', আল-জামি' আল-কাবীর' বা 'আল-খাসাইসুল কুবরা' গ্রন্থাদিতে সংকলন করেছেন।

একটি উদাহরণ দেখুন। পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হামযা ইবনু ইউসূফ জুরজানী (৪২৭ হি) ও আহমাদ ইবনু আলী খতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি) একটি হাদীস সংকলন করেছেন। তাঁরা তাঁদের সনদে তৃতীয় হিজরী শতকের একজন হাদীস বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনুস সাল্‌ত থেকে হাদীসটি সংকলন করেছেন। এ ইসহাক ইবনুস সালত বলেন, আমাদেরকে ইমাম মালিক ইবনু আনাস বলেছেন, আমাদেরকে আবুয যুবাইর মাক্কী বলেছেন, আমাদেরকে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন,

رَأَيْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ لَوْ لَمْ يَأْتِ بِالْقُرْآنِ لآمَنْتُ بِهِ، أَصْحَرْنَا فِيْ بَرِيَّةٍ تَنْقَطِعُ الطُّرُقُ دُوْنَهَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَضُوْءَ وَرَأَى نَخْلَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا جَابِرُ اذْهَبْ إِلَيْهِمَا فَقُلْ لَهُمَا: اجْتَمِعَا. فَاجْتَمَعَتَا حَتَّى كَأَنَّهُمَا أَصْلٌ وَاحِدٌ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَبَادَرْتُهُ بِالْمَاءِ وَقُلْتُ لَعَلَّ اللهُ أَنْ يُطْلِعَنِيْ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ فَآكُلَهُ فَرَأَيْتُ الأَرْضَ بَيْضَاءَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَا كُنْتَ تَوَضَّأْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّا مَعْشَرَ النَّبِيِّيْنَ أُمِرَتِ الأَرْضُ أَنْ تُوَارِيَ مَا يَخْرُجُ مِنَّا مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

"আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এমন তিনটি (অলৌকিক) বিষয় দেখেছি যে, তিনি কুরআন আনয়ন না করলেও আমি তাঁর

উপর ঈমান আনয়ন করতাম। (একবার) আমরা এক দূরবর্তী মরুভূমিতে গমন করি। তখন নবী (ﷺ) ইসতিনজার পানি হাতে নিলেন। তিনি দুটি পৃথক খেজুরগাছ দেখে আমাকে বললেন, হে জাবির, তুমি গাছদুটির কাছে যেয়ে তাদেরকে বল: তোমরা একত্রিত হও। এতে গাছ দুটি এমনভাবে একত্রিত হয়ে গেল যেন তারা একই মূল থেকে উৎপন্ন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইসতিনজা সম্পন্ন করেন। আমি তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে তাকে দিলাম। আর আমি বললাম, তাঁর পেট থেকে যা বের হয়েছে তা হয়ত আল্লাহ আমাকে দেখাবেন এবং আমি তা ভক্ষণ করব। কিন্তু আমি দেখলাম যে, মাটি পরিস্কার সাদা। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ইসতিনজা করেন নি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে আমাদের নবীগণের বিষয়ে যমীনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমাদের থেকে মল-মূত্র যা নির্গত হবে তা আবৃত করে ফেলতে।......"

ইমাম মালিক ছিলেন দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। অগণিত মুহাদ্দিস তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। মূলত, সে সময়ের সকল মুহাদ্দিসই তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিখেছেন। অনেকেই বছরের পর বছর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে হাদীস শিখেছেন। এ সকল অগণিত ছাত্রের কেউই এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। অনুরূপভাবে তাবিয়ী আবুয যুবাইর বা সাহাবী জাবির (রা) থেকেও অন্য কোনো সূত্রে তা বর্ণিত হয় নি। একমাত্র ইসহাক ইবনুস সাল্‌ত নামক এই ব্যক্তি দাবি করেছেন যে, ইমাম মালিক তাকে হাদীসটি বলেছেন। এ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল ও বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী বলে চিহ্নিত হয়েছেন। আরো লক্ষণীয় হলো, এ ইসহাকের বর্ণনাও তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে কোনোরূপ প্রসিদ্ধি বা পরিচিতি লাভ করে নি। ৫ম শতকে কেউ কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। জুরজানী ও খতীব থেকে ইসহাক পর্যন্ত সনদও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এজন্য খতীব বাগদাদী, হামযা ইবনু ইউসূফ জুরজানী, যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ মুহাদ্দিসের মতামতের আলোকে ইমাম সুয়ূতী নিজেই হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন এবং জাল হাদীস বিষয়ক 'যাইলুল লাআলী' নামক গ্রন্থে তিনি তা উল্লেখ করেছেন।

আবার তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মুজিযা, অলৌকিকত্ব ও বৈশিষ্ট্যাবলি বিষয়ক 'আল-খাসাইসুল কুবরা' নামক গ্রন্থে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি দাবি করেছেন যে, এ গ্রন্থে তিনি কোনো মাউযূ বা জাল হাদীস উল্লেখ করবেন না। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তাঁর এ স্ববিরোধিতা ও হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে তাঁর ঢিলেমির কথা উল্লেখ করেছেন।[২৫৪]

## ৮. মিথ্যা হাদীস বিষয়ক কিছু বিভ্রান্তি

### ৮. ১. হাদীস গ্রন্থ বনাম জাল হাদীস

অজ্ঞতাবশত অনেকে মনে করেন যে, কোনো হাদীস কোনো হাদীস-গ্রন্থে সংকলিত থাকার অর্থ হলো হাদীসটি সহীহ, অথবা অন্তত উক্ত গ্রন্থের সংকলকের মতে হাদীসটি সহীহ। যেমন কোনো হাদীস যদি সুনানু ইবনি মাজাহ বা মুসান্নাফু আব্দুর রায্যাক গ্রন্থে সংকলিত থাকে তার অর্থ হলো হাদীসটি নিশ্চয় সহীহ, নইলে ইবনু মাজাহ বা আব্দুর রায্যাকের মত অত বড় মুহাদ্দিস তা গ্রহণ করলেন কেন? অন্তত, ইবনু মাজাহ বা আব্দুর রায্যাকের মতে হাদীসটি সহীহ, নইলে তিনি তাঁর গ্রন্থে হাদীসটির স্থান দিতেন না।

আমরা দেখেছি যে, এ ধারণাটির উভয় দিকই ভিত্তিহীন। অধিকাংশ মুহাদ্দিসই তাঁদের গ্রন্থে সহীহ, যয়ীফ, মাউযূ সকল প্রকার হাদীসই সংকলন করেছেন। তাঁরা কখনোই দাবি করেন নি বা পরিকল্পনাও করেন নি যে, তাঁদের গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করবেন। আর যারা সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেছেন তাদের দাবিও মুহাদ্দিসগণ যাচাই না করে গ্রহণ করেন নি।

অধিকাংশ হাদীসগ্রন্থের মধ্যেই সহীহ, যয়ীফ, জাল ও বাতিল হাদীস বিদ্যমান; কারণ মুহাদ্দিসগণের উদ্দেশ্য ছিল সনদ-সহ সকল কথিত বিষয় সংকলন করা। ৯ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২হি) চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম তাবারানীর (৩৬০হি) গ্রন্থগুলির মধ্যে বিদ্যমান অনেক জাল ও বাতিল হাদীসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

وهذا أمر لا يختص به الطبراني فلا معنى لإفراده باللوم، بل أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برؤا من عهدته

"এটি তাবারানীর একক বিষয় নয় এবং এ বিষয়ে তাকে পৃথকভাবে দোষ দেওয়ার কিছু নেই; দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে পরবর্তী যুগগুলির অধিকাংশ মুহাদ্দিস মনে করতেন যে, সনদ-সহ হাদীস উল্লেখ করলেই দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল এবং তাঁরা যিম্মাদারি থেকে মুক্ত হলেন।"[২৫৫]

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবীকে প্রশ্ন করা হয়: "সুনান চতুষ্ঠয়: নাসাঈ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, বাইহাকীর লিখিত গ্রন্থসমূহ, দারাকুতনীর লিখিত গ্রন্থসমূহ, হাকিম, ইবনু আবী শাইবা, ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ ও বিশাল বিশাল হাদীসের গ্রন্থসমূহের হাদীসগুলি কি সহীহ? ... না কি হাসান ...? নাকি অন্য কিছু?" উত্তরে তিনি বলেন:

ليس كل ما في هذه الكتب وأمثالها صحيحاً أو حسناً، بل هي مشتملة على الأخبار الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة.

"এ সকল গ্রন্থে এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত সকল হাদীস সহীহ বা হাসান নয়; বরং এ সকল গ্রন্থের মধ্যে সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও জাল সকল প্রকারের হাদীস বিদ্যমান।"[২৫৬]

এরপর তিনি সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বুজুর্গগণের অনেক উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এ সকল গ্রন্থের মধ্যে অনেক সহীহ ও হাসান হাদীসের পাশাপাশি অনেক যয়ীফ ও জাল হাদীস বিদ্যমান। কাজেই সনদ বিচারে জাল প্রমাণিত হলে তাকে গ্রন্থকারের মর্যাদার অযুহাতে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ বা অনুমতি কোনো মুহাদ্দিস, ফকীহ বা বুজুর্গ দেন নি।[২৫৭]

আমাদের সমাজে 'সিহাহ সিত্তাহ'[২৫৮] নামে প্রসিদ্ধ ৬ টি গ্রন্থের মধ্যে ২টি সহীহ গ্রন্থ: "সহীহ বুখারী" ও "সহীহ মুসলিম" ছাড়া বাকি ৪টির সংকলকও শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করবেন বলে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থগুলিতে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক দুর্বল বা বানোয়াট হাদীসও সংকলন করেছেন। তবে তাঁদের গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ হাদীস নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে তাঁদের গ্রন্থগুলোর উপর নির্ভর করেছেন, সাথে সাথে তাঁরা এসকল গ্রন্থে সংকলিত দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বিধান প্রদান করেছেন। আমরা দেখলাম যে, আব্দুল হাই লাখনবী সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, এ চারটি গ্রন্থে সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও বানোয়াট সকল প্রকারের হাদীস রয়েছে।

ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহর বিবরণ দেখেছি। তিনি সুনানে আবী দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযী: এ তিনটি গ্রন্থকে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত করেছেন, যে সকল গ্রন্থের হাদীসসমূহ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও সেগুলোতে কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীসও রয়েছে। কিন্তু তিনি 'সুনান ইবন মাজাহ'-কে এই পর্যায়ে উল্লেখ করেন নি। এর কারণ হলো, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী (২৭৫ হি) সংকলিত 'সুনান' গ্রন্থটিকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলির অন্তর্ভুক্ত করেন নি। হিজরী ৭ম শতক পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অতিরিক্ত এ তিনটি সুনানগ্রন্থকেই মোটামুটি নির্ভরযোগ্য এবং হাদীস শিক্ষা ও শিক্ষাদানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতেন। ৫ম-৬ষ্ঠ হিজরী শতকের মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু তাহির মাকদিসী, আবুল ফাদল ইবনুল কাইসুরানী (৫০৭ হি) এগুলোর সাথে সুনান ইবন মাজাহ যোগ করেন।

তাঁর এ মত পরবর্তী ২ শতাব্দী পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেন নি। ৭ম শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আলামা ইবনুস সালাহ আবু আমর উসমান ইবনু আব্দুর রাহমান (৬৪৩ হি), আলামা আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নাবাবী (৬৭৬ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসের মূল উৎস হিসাবে উপরের ৫টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। সুনান ইবন মাজাহ-কে তাঁরা এগুলোর মধ্যে গণ্য করেন নি। পরবর্তী যুগের অনেক মুহাক্কিক আলিম এদের অনুসরণ করেছেন। অপরদিকে ইমাম ইবনুল আসীর মুবারাক ইবনু মুহাম্মাদ (৬০৬ হি) ও অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস ৬ষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে ইমাম মালিকের মুআত্তাকে গণ্য করেছেন।

সুনান ইবন মাজাহকে উপরের ৩টি সুনানের পর্যায়ভুক্ত করতে আপত্তির কারণ হলো ইমাম ইবনু মাজাহর সংকলন পদ্ধতি এ তিন গ্রন্থের মত নয়। উপরের তিন গ্রন্থের সংকলক মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বিষয়বস্তের প্রয়োজনে কিছু যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলির দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইবনু মাজাহ তৎকালীন সাধারণ সংকলন পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। আমরা দেখেছি যে, এসকল যুগের অধিকাংশ সংকলক সনদসহ প্রচলিত সকল হাদীস সংকলন করতেন। এতে সহীহ, যয়ীফ, মাউদূ সব প্রকারের হাদীসই তাঁদের গ্রন্থে স্থান পেত। সনদ বিচার ছাড়া হাদীসের নির্ভরতা যাচাই করা সম্ভব হতো না। ইবনু মাজাহও এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি সহীহ বা হাসান হাদীস সংকলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নি। তিনি সহীহ ও হাসান হাদীসের পাশাপাশি অনেক যয়ীফ ও কিছু মাউযূ হাদীসও সংকলন করেছেন। তিনি এসকল যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীসের ক্ষেত্রে কোনো মন্তব্য করেন নি।

৮ম হিজরী শতক থেকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস সুনান ইবনি মাজাহকে ৪র্থ সুনানগ্রন্থ হিসাবে গণ্য করতে থাকেন। মুআত্তা ও সুনান ইবনি মাজাহর মধ্যে পার্থক্য হলো, মুআত্তা গ্রন্থের হাদীস সংখ্য কম এবং এ গ্রন্থের সকল সহীহ হাদীস উপরের ৫ গ্রন্থের মধ্যে সংকলিত। ফলে এ গ্রন্থটিকে পৃথকভাবে অধ্যয়ন করলে অতিরিক্ত হাদীস জানা যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে সুনান ইবন মাজাহর মধ্যে উপরের ৫ টি গ্রন্থের অতিরিক্ত সহস্রাধিক হাদীস রয়েছে। এজন্য পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ এ গ্রন্থটিকে ৪র্থ সুনান হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম ইবনু মাজাহর সুনান গ্রন্থে মোট ৪৩৪১টি হাদীস সংকলিত। তন্মধ্যে প্রায় তিন হাজার হাদীস উপরের পাঁচটি গ্রন্থে সংকলিত। বাকী প্রায় দেড় হাজার হাদীস অতিরিক্ত। ৯ম হিজরী শতকের মুহাদ্দিস আল্লামা আহমাদ ইবনু আবী বাকর আল-বূসীরী (৮৪০ হি) ইবনু মাজাহর এসকল অতিরিক্ত হাদীসের সনদ আলোচনা করেছেন। আল্লামা বূসীরী ১৪৭৬টি হাদীসের সনদ আলোচনা করেছেন, যেগুলো উপরের ৫টি গ্রন্থে সংকলিত হয় নি, শুধুমাত্র ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন। এগুলোর মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সহীহ বা হাসান হাদীস এবং প্রায় একতৃতীয়াংশ হাদীস যয়ীফ। এগুলোর মধ্যে প্রায় অর্ধশত হাদীস মাউযূ বা বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন

মুহাদ্দিসগণ ।[২৫৯]

## ৮. ২. আলিম-বুজুর্গগণের গ্রন্থ বনাম জাল হাদীস

হাদীসের গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থে হাদীস উল্লেখ করা হয়। তাফসীর, ফিকহ, ওয়ায, আখলাক, ফযীলত, তাসাউফ, দর্শন, ভাষা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তকাদিতে অনেক হাদীস উল্লেখ করা হয়। সাধারণত এ সকল গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে হাদীস উল্লেখ করা হয়। অনেকেই অজ্ঞতা বশত ধারণা করেন যে, এ সকল গ্রন্থের লেখকগণ নিশ্চয় যাচাই বাছাই করে হাদীসগুলো লিখেছেন। সহীহ না হলে কি আর তিনি হাদীসটি লিখতেন?

এ ধারণাটিও ভিত্তিহীন, ভুল এবং উপরের ধারণাটির চেয়েও বেশি বিভ্রান্তিকর। সাধারণত প্রত্যেক ইল্‌মের জন্য পৃথক ক্ষেত্র রয়েছে। এ জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক বিষয়ের আলিম অন্য বিষয়ে অত বেশি সময় দিতে পারেন না। মুফাস্‌সির, ফকীহ, ঐতিহাসিক, সূফী, ওয়ায়িয ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত আলিম ও বুযুর্গ স্বভাবতই হাদীসের নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনার গভীরতায় যেতে পারেন না। সাধারণভাবে তাঁরা হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচলিত গ্রন্থ, জনশ্রুতি ও প্রচলনের উপরে নির্ভর করেন। এজন্য তাঁদের গ্রন্থে অনেক ভিত্তিহীন, সনদহীন ও জাল কথা পাওয়া যায়।

আল্লামা নাবাবী তাঁর "তাকরীব" গ্রন্থে এবং আল্লামা সুয়ূতী তাঁর "তাদরীবুর রাবী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরার ফযীলতে অনেক মিথ্যা কথাকে কিছু বুযুর্গ দরবেশ হাদীস বলে সমাজে চালিয়েছেন। কোনো কোনো মুফাসসির, যেমন – আলামা আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আস সা'লাবী নিশাপূরী (৪২৭ হি.) তাঁর "তাফসীর" গ্রন্থে, তাঁর ছাত্র আল্লামা আলী ইবন আহমাদ আল-ওয়াহিদী নিশাপূরী (৪৬৮ হি.) তাঁর "বাসীত", "ওয়াসিত", "ওয়াজীয" ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থে, আল্লামা আবুল কাসেম মাহমূদ ইবন উমার আয-যামাখশারী (৫৩৮ হি.) তাঁর "কাশ্‌শাফ" গ্রন্থে, আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবন উমার আল-বাইযাবী (৬৮৫ হি.) তাঁর "আনওয়ারুত তানযীল" বা "তাফসীরে বাইযাবী" গ্রন্থে এসকল বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাঁরা এ কাজটি করে ভুল করেছেন। সুয়ূতী বলেন : "ইরাকী (৮০৬ হি.) বলেছেন যে, প্রথম দুজন – সা'লাবী ও ওয়াহিদী সনদ উল্লেখপূর্বক এসকল বানোয়াট বা জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁদের ওজর কিছুটা গ্রহণ করা যায়, কারণ তাঁরা সনদ বলে দিয়ে পাঠককে সনদ বিচারের দিকে ধাবিত করেছেন, যদিও মাওযূ বা মিথ্যা হাদীস সনদসহ উল্লেখ করলেও সাথে সাথে তাকে 'মাওযূ' না বলে চুপ করে যাওয়া জায়েয নয়। কিন্তু পরবর্তী দুইজন – যামাখশারী ও বাইযাবী-এর ভুল খুবই মারাত্মক। কারণ, তাঁরা সনদ উল্লেখ করেন নি, বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে সরাসরি সুস্পষ্টভাবে এ সকল বানোয়াট কথা উল্লেখ করেছেন।[২৬০]

৪র্থ হিজরী শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ সূফী ও বুজুর্গ শাইখ আবূ তালিব মাক্কী মুহাম্মাদ ইবন আলী (৩৬৮হি)। তাঁর রচিত 'কুতুল কুলুব' বা 'হৃদয়ের খোরাক' বইটি তাসাউফের জগতে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধতম আলিম ও সূফী হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ হামিদ গাযালী মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ (৫০৫ হি)। তাঁর রচিত 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থটি মুসলিম জগতের প্রসিদ্ধতম গ্রন্থগুলির অন্যতম। তাঁদের বুজুর্গি এবং তাঁদের গ্রন্থগুলির প্রতি শ্রদ্ধা-সহ উম্মাতের আলিমগণ এগুলির মধ্যে বিদ্যমান জাল হাদীসগুলি চিহ্নিত করেছেন। মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) এ সকল গ্রন্থে বিদ্যমান জাল হাদীস সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন: "কুতুল কুলুব, এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন, তাফসীরে সা'লাবী ইত্যাদি গ্রন্থে হাদীসটির উল্লেখ আছে দেখে ধোঁকা খাবেন না।[২৬১]

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী হানাফী ফিক্‌হের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলির নাম ও পর্যায় বিন্যাস উল্লেখ করে বলেন: "আমরা ফিকহী গ্রন্থাবলির নির্ভরযোগ্যতার যে পর্যায় উল্লেখ করলাম তা সবই ফিকহী মাসায়েলের ব্যাপারে। এ সকল পুস্তকের মধ্যে যে সকল হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর বিশুদ্ধতা বা নির্ভরযোগ্যতা বিচারের ক্ষেত্রে এই বিন্যাস মোটেও প্রযোজ্য নয়। এরূপ অনেক নির্ভরযোগ্য ফিকহী গ্রন্থ রয়েছে যেগুলোর উপর মহান ফকীহগণ নির্ভর করেছেন, কিন্তু সেগুলো জাল ও মিথ্যা হাদীসে ভরপুর। বিশেষত 'ফাতওয়া' বিষয়ক পুস্তকাদি। বিস্তারিত পর্যালোচনা করে আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সকল পুস্তকের লেখকগণ যদিও 'কামিল' ছিলেন, তবে হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তাঁরা অসতর্ক ছিলেন।"[২৬২]

এজন্য মুহাদ্দিসগণ ফিক্‌হ, তাফসীর, তাসাউফ, আখলাক ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসগুলি বিশেষভাবে নিরীক্ষা করে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আলামা বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবু বকর আল-মারগীনানী (৫৯৩ হি.) তাঁর লেখা ফিকাহ শাস্ত্রের প্রখ্যাত গ্রন্থ "হেদায়া"-য় অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি ফকীহ হিসাবে ফিকহী মাসায়েল নির্ধারণ ও বর্ণনার প্রতিই তাঁর মনোযোগ ও সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। হাদীস উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনি যা শুনেছেন বা পড়েছেন তা বাছবিচার না করেই লিখেছেন। তিনি কোনো হাদীসের সহীহ বা যয়ীফ বিষয়ে কোনো মন্তব্যও করতে যান নি। পরবর্তী যুগে আল্লামা জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন ইউসূফ যাইলায়ী হানাফী (৭৬২ হি.), আল্লামা আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার

আসকালানী (৮৫২ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস এসকল হাদীস নিয়ে সনদভিত্তিক গবেষণা করে এর মধ্যথেকে সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস নির্ধারণ করেছেন।

অনুরূপভাবে ইমাম গাযালী এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে ফিক্হ ও তাসাউফ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি দার্শনিক ও ফকীহ ছিলেন, মুহাদ্দিস ছিলেন না। এজন্য হাদীসের সনদের বাছবিচার না করেই যা শুনেছেন বা পড়েছেন সবই উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগে আল্লামা যাইনুদ্দীন আবুল ফাদ্ল আব্দুর রহীম ইবন হুসাইন আল-ইরাকী (৮০৬ হি.) ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস তাঁর উল্লিখিত হাদীসসমূহের সনদ-ভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করে সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীসগুলো নির্ধারণ করেছেন। এছাড়া ৮ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনু আলী সুবকী (৭৭১ হি) 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে উল্লেখিত কয়েক শত জাল ও ভিত্তিহীন হাদীস একটি পৃথক পুস্তকে সংকলিত করেছেন। পুস্তকটির নাম 'আল-আহাদীস আল্লাতী লা আস্‌লা লাহা ফী কিতাবিল এহইয়া', অর্থাৎ 'এহইয়া.. গ্রন্থে উল্লিখিত ভিত্তিহীন হাদীসসমূহ'।

### ৮. ৩. কাশফ-ইলহাম বনাম জাল হাদীস

সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও আল্লাহর প্রিয় ওলী-রূপে প্রসিদ্ধ আলিমগণের বিষয়ে। যেহেতু তাঁরা 'সাহেবে কাশফ' বা কাশ্‌ফ সম্পন্ন ওলী ছিলেন, সেহেতু আমরা ধারণা করি যে, কাশফের মাধ্যমে প্রদত্ত তথ্যের বিশুদ্ধতা যাচাই না করে তো আর তাঁরা লিখেন নি। কাজেই তাঁরা যা লিখেছেন বা বলেছেন সবই বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে।

আল্লামা সুয়ূতী (৯১১ হি), আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি) প্রমুখ আলিম এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইমাম গাযালীর (রাহ) "এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন" ও অন্যান্য গ্রন্থে, আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) লিখিত কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক মাউযূ বা বানোয়াট হাদীসের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন যে, কেউ হয়ত প্রশ্ন করবেন: এত বড় আলিম ও এত বড় সাহেবে কাশফ ওলী, তিনি কী বুঝতে পারলেন না যে, এ হাদীসটি বানোয়াট? তাঁর মত একজন ওলী কী-ভাবে নিজ গ্রন্থে মাউযূ হাদীস উল্লেখ করলেন? তাঁর উল্লেখের দ্বারা কি বুঝা যায় না যে, হাদীসটি সহীহ? এই সন্দেহের জবাবে তাঁরা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

#### ৮. ৩. ১. বুযুর্গগণ যা শুনেন তা-ই লিখেন

বস্তুত সরলপ্রাণ বুযুর্গগণ যা শুনেন তাই লিখেন। এজন্য কোনো বুযুর্গের গ্রন্থে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট মন্তব্য ছাড়া কোনো হাদীস উল্লেখ করার অর্থ এটাই নয় যে, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলে নিশ্চিত হয়েছেন। মূলত তাঁরা যা পড়েছেন বা শুনেছেন তা উল্লেখ করেছেন মাত্র। তাঁরা আশা করেছেন হয়ত এর কোনো সনদ থাকবে, হাদীসের বিশেষজ্ঞগণ তা খুঁজে দেবেন।

#### ৮. ৩. ২. হাদীস বিচারে কাশফের কোনো ভূমিকা নেই

হাদীস বিচারের ক্ষেত্রে কাশফের কোনোই অবদান নেই। কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া নিয়ামত মাত্র, আনন্দ ও শুকরিয়ার উৎস। ইচ্ছামতো প্রয়োগের কোনো বিষয় নয়। আল্লাহ তা'আলা উমার (রা)-কে কাশফের মাধ্যমে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত সারিয়ার সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখিয়েছিলেন, অথচ সে উমারকে (রা) হত্যা করতে তাঁরই পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা আবু লু'লুর কথা তিনি টের পেলেন না।

এছাড়া কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদি দ্বারা কখনোই হক বাতিলের বা ঠিক বেঠিকের ফয়সালা হয় না। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধ ও সমস্যা ঘটেছে, কখনোই একটি ঘটনাতেও তাঁরা কাশফ, ইলহাম, স্বপ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে হক বা বাতিল জানার চেষ্টা করেন নি। খুলাফায়ে রাশেদীন – আবু বাক্‌র, উমার, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর দরবারে অনেক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীর ভুলভ্রান্তির সন্দেহ হলে তাঁরা সাক্ষী চেয়েছেন অথবা বর্ণনাকারীকে কসম করিয়েছেন। কখনো কখনো তাঁরা বর্ণনাকারীর ভুলের বিষয়ে বেশি সন্দিহান হলে তার বর্ণিত হাদীসকে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু কখনোই তাঁরা কাশফে মাধ্যমে হাদীসের সত্যাসত্য বিচার করেন নি। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন, শুনেছেন ও হাদীসের সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট নির্ধারণের জন্য সনদ বর্ণনার ব্যবস্থা নিয়েছেন। বর্ণনাকারীর অবস্থা অনুসারে হাদীস গ্রহণ করেছেন বা যয়ীফ হিসেবে বর্জন করেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁরা কাশফের উপর নির্ভর করেননি।

হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য সনদের উপর নির্ভর করা সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সুন্নাতে সাহাবা। আর এ বিষয়ে কাশফ, ইলহাম বা স্বপ্নের উপর নির্ভর করা খেলাফে-সুন্নাত, বিদ'আত ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা।

#### ৮. ৩. ৩. কাশ্‌ফ- ইলহাম সঠিকত্ব জানার মাধ্যম নয়

ইসলামী আকীদায় কাশফ বা ইলহাম কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার মাপকাঠি নয়। ৬ষ্ঠ শতকের অন্যতম হানাফী আলিম উমার ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭ হি) তাঁর "আল-আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ" ও ৮ম শতকের প্রখ্যাত আলিম সা'দ উদ্দীন মাসঊদ ইবনু উমার আত-তাফতাযানী (৭৯১ হি.) তাঁর "শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ" –তে লিখেছেন :

اَلإِلْهَامُ الْمُفَسَّرُ بِإِلْقَاءِ مَعْنًى فِيْ الْقَلْبِ بِطَرِيْقِ الْفَيْضِ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ الشَّيْءِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ

"হক্কপন্থীগণের কাছে 'ইলহাম' যা 'ফয়েযরূপে প্রদত্ত ইলকা' নামে পরিচিত তা কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার কোনো মাধ্যম

নয়।"[২৬৩]

কোনো কোনো অনভিজ্ঞ বুযুর্গ স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির ভিত্তিতে 'হাদীসের' বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের দাবি করলেও অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ বুযুর্গগণ এর কঠিন বিরোধিতা করেছেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ট বুযুর্গ ও সংস্কারক মুজাদ্দিদ-ই আলফ-ই সানী (রাহ) হক্ক-বাতিল বা বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা জানার ক্ষেত্রে কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির উপর নির্ভর করার কঠিন আপত্তি ও প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন-হাদীসই কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির সঠিক বা বেঠিক হওয়ার মানদণ্ড। কাশফ কখনোই হাদীস বা বা কোনো মতের সঠিকত্ব জানার মাধ্যম নয়।[২৬৪]

**৮. ৩. ৪. সাহেবে কাশ্‌ফ ওলীগণের ভুলত্রুটি**

বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক প্রখ্যাত সাধক, যাঁদেরকে আমরা সাহেবে কাশফ বলে জানি, তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে অনেক কথা লিখেছেন যা নিঃসন্দেহে ভুল ও অন্যায়। শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১ হি.) লিখেছেন যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে। ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও ফেরকায়ে নাজিয়ার আলামত বলে গণ্য করেছেন এবং ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি না মানাকে বাতিলদের আলামত বলে গণ্য করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, কোনো মুসলমানের উচিত নয় যে সে বলবে: 'আমি নিশ্চয় মুমিন', বরং তাকে বলতে হবে যে, 'ইন্‌শা আল্লাহ আমি মুমিন'। ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও তাঁর অনুসারীগণ যেহেতু ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করেন না, আমলকে ঈমানের অংশ মনে করেন না এবং 'ইনশা আল্লাহ আমি মুমিন' বলাকে আপত্তিকর বলে মনে করেন, সে জন্য তিনি তাঁকে ও তাঁর অনুসারীগণকে বাতিল ও জাহান্নামী ফিরকা বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬৫]

ইমাম গাযালী লিখেছেন যে, গান-বাজনা, নর্তন-কুর্দন ইত্যাদি আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার পথে সহায়ক ও বিদ'আতে হাসানা। তিনি গান-বাজনার পক্ষে অনেক দুর্বল ও জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন।[২৬৬]

এরূপ অগণিত উদাহরণ তাঁদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। কাজেই, তাঁরা যদি কোনো হাদীসকে সহীহ বলেও ঘোষণা দেন তারপরও তার সনদ বিচার ব্যতিরেকে তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, সকল বানোয়াট কথাকে চিহ্নিত করা দীনের অন্যতম ফরয। কেউ সন্দেহযুক্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে বর্ণনা করলেও তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। কাজেই, এ ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতার অবকাশ নেই।[২৬৭]

এ প্রসঙ্গে আব্দুল হাই লাখনবীর অভিজ্ঞতা প্রণিধানযোগ্য। শাইখ আব্দুল কাদির জীলানীর গ্রন্থে বিদ্যমান "সালাতুল উসবূ" বা সপ্তাহের প্রত্যেক দিবস ও রাত্রির জন্য বিশেষ সালাত, আশূরার দিবস ও রাত্রির বিশেষ সালাত ইত্যাদি বিষয়ক হাদীসগুলি জাল বলে তিনি উল্লেখ করলে তাঁর এক বন্ধু তার সাথে বিতর্ক করেন। এ বিষয়ে আল্লামা লাখনবী বলেন:

عارضني بعض الأعزة قائلاً: قد ذَكَرَ صلواتِ يوم عاشوراء وليلته وغيرهما من أيام السنة ولياليها جَمْعٌ من المشايخ الصوفية في دفاترهم العلية وذكروا فيها أخباراً مروية، فكيف لا يُعْمَلُ بِهَا ويُحْكَمُ بكونها مختلقة؟ فقلت: لا عبرة بذكرهم، فإنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. فقال لي: ما تقول؟ تَفَكَّرْ فيما فيه تجول! إذا لم يُعْتَبَر بنقل هؤلاء الأكابر فمن هو يُعْتَبَر بنقله وذكره؟ فقلت: لا عجب، فإن الله تعالى جعل لكل مقام مقالاً وخلق لكل فن رجالاً.... فعاد قائلاً: إن العَجَبَ كلَّ العَجَبِ أن أحداً من المشايخ العظام كالإمام الغزالي ... ومولانا عبد القادر الجيلاني ... وأبي طالب المكي ... وغيرهم ممن تقدمهم وتأخرهم وهم من الصوفية الكبار معدودون في طبقات الأولياء حملة ألوية الأسرار يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم! مع اشتهار أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم فضلاً عن مثل هذا المسلم!! قلت؟ حاشاهم ثم حاشاهم! عن أن يضعوا حديثاً ... فقال: فإذا لم ينسب الوضع إلى هؤلاء فمن هو واضعها؟ فقلت: قوم من جهلة الزهاد أو قوم من أرباب الزندقة والإلحاد؛ فإن الرواة الذين وقعت في رواياتهم المقلوبات والموضوعات ... على ما بسطه ابن الجوزي والسيوطي ... منقسمون على أقسام .... فقال: فكيف قَبِلَ تلك الأحاديثَ الموضوعةَ جَمْعٌ من المشايخ الجامعين بين علوم الحقيقة والطريقة وأدرجوها في تصانيفهم السلوكية؟ فقلت: لحسن ظنهم بكل مسلم وتخيُّلهم أنه لا يكذب على النبي ﷺ مسلم..

"আমার এক সম্মানিত ভাই আমার কথার প্রতিবাদ করে বললেন, 'আশূরার দিনের ও রাতের সালাত ও বৎসরের অন্যান্য দিবস ও রাতের সালাতের কথা অনেক সূফী মাশাইখ তাদের মহামূল্যবান পুস্তকগুলিতে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে বর্ণিত অনেক হাদীসও উল্লেখ করেছেন। তাহলে কিভাবে আপনি বলছেন যে, এ সকল দিবস ও রাতের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলির উপর আমল করা যাবে না; বরং এগুলিকে জাল বলে গণ্য করতে হবে?' আমি বললাম: 'এ সকল মহাসম্মানিত সূফী মাশাইখদের উল্লেখের উপর নির্ভর করা যাবে না; কারণ তাঁরা মুহাদ্দিস ছিলেন না; আর তাঁরা এ সকল হাদীসের জন্য কোনো হাদীস-সংকলকের গ্রন্থের

বরাতও দেন নি।' তিনি আমাকে বললেন: 'আপনি কী বলছেন? কী বিষয়ে আপনি পদচারণা করছেন তা ভেবে দেখুন!! যদি এ সকল মহান ব্যক্তিত্বের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করা না যায় তবে কার কথার উপর নির্ভর করতে হবে?

আমি বললাম: 'অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কারণ মহান আল্লাহ প্রত্যেক স্থানের জন্য পৃথক বক্তব্য রেখেছেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক বিশেষজ্ঞ তৈরি করেছেন।' .... তিনি তাঁর বক্তব্যে এগিয়ে গেলেন: 'বড়ই অবাক কথা! খুবই বিস্ময়ের বিষয়!! ইমাম গাযালী (৫০৫হি)..., মাওলানা আব্দুল কাদির জীলানী (৫৬১ হি).., আবূ তালিব মক্কী (৩৬৮হি)... এবং তাঁদের মত অন্যান্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মহান মর্যাদাময় মাশাইখ, যারা ছিলেন বড় বড় সূফী, আল্লাহর ওলীগণের অন্তর্ভুক্ত, গোপন জ্ঞানের বাহক, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জাল হাদীস বানাবেন!!! অথচ এ কথা তো সর্বজন বিদিত যে, এ ধরনের মহান মুসলিম তো দূরের কথা একজন সাধারণ মুসলিমের জন্যও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জাল হাদীস বানানো বৈধ নয়।'

আমি বললাম: 'কখনোই নয়! কখনোই নয়!! এ সকল মহান ব্যক্তিত্ব কখনোই কোনো হাদীস জাল করেন নি।....' তখন তিনি বললেন, 'যদি এ সকল হাদীসের জালিয়াতির দায়ভার তাঁদের না হয় তাহলে এর জন্য দায়ী কারা?' আমি বললাম: 'এক শ্রেণীর জাহিল দীনদার সংসারত্যাগী, অথবা কতিপয় যিনদীক ও মুলহিদ- ধর্মদ্রোহী; কারণ যে সকল রাবীর হাদীসের মধ্যে জাল হাদীস পাওয়া যায় ইবনুল জাওযী, সুয়ূতী, .... প্রমুখ মুহাদ্দিস তাদের শ্রেণীভাগ করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন... এ সকল রাবীই এ সকল হাদীস জাল করার জন্য দায়ী।....' তিনি বললেন: 'অনেক বড় বড় সূফী মাশাইখ, যারা ইলমে হাকীকত ও ইলমে তরীকত উভয় দিকেই পারদর্শী ছিলেন তাঁরা কিভাবে এ সকল জালিয়াত রাবীর বর্ণিত জাল হাদীসগুলি গ্রহণ করলেন এবং তরীকা-তাসাউফ বিষয়ক তাঁদের গ্রন্থগুলিতে সেগুলি উল্লেখ করলেন?' আমি বললাম: 'কারণ তাঁরা সকল মুসলিমের বিষয়েই ভাল ধারণা পোষণ করতেন এবং ধারণা করতেন যে, কোনো মুসলিম কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা বলতে পারে না।'....."[২৬৮]

## ৮. ৪. বুযুর্গগণের নামে জালিয়াতি

এখানে আরেকটি বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার। তা হলো, হাদীসের নামে জালিয়াতির ন্যায় নেককার বুযুর্গ ও ওলী-আল্লাহগণের নামে জালিয়াতি হয়েছে প্রচুর। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

(১) জালিয়াতগণ 'ধর্মের' ক্ষতি করার জন্য অথবা ধর্মের 'উপকার' করার জন্য 'জালিয়াতি' করত। বিশেষ করে যারা ধর্মের অপূর্ণতা দূর করে ধর্মকে আরো বেশি 'জননন্দিত' ও 'আকর্ষণীয়' করতে ইচ্ছুক ছিলেন তাদের জালিয়াতিই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। আর উভয় দলের জন্য এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় দলের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে জালিয়াতি করার চেয়ে ওলী-আল্লাহগণের নামে জালিয়াতি করা অধিক সহজ ও অধিক সুবিধাজনক ছিল।

(২) বুযুর্গদের নামে জালিয়াতি অধিকতর সুবিধাজনক এজন্য যে, সাধারণ মানুষদের মধ্যে তাঁদের নামের প্রভাব 'হাদীসের' চেয়েও বেশি। অনেক সাধারণ মুসলমানকে 'হাদীস' বলে বুঝানো কষ্টকর। তাকে যদি বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অমুক কাজ করেছেন, করতে বলেছেন ... তবে তিনি তা গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও পারেন। কিন্তু যদি তাকে বলা যায় যে, আব্দুল কাদির জীলানী বা খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী বা ... অমুক ওলী এ কাজটি করেছেন বা করতে বলেছেন তবে অনেক বেশি সহজে তাকে 'প্রত্যায়িত' (convinced) করা যাবে এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি তা মেনে নেবেন। ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীর সোনালী দিনগুলোর পরে যুগে যুগে সাধারণ মুসলিমদের এ অবস্থা। কাজেই বুযুর্গদের নামে জালিয়াতি বেশি কার্যকর ছিল।

(৩) ওলী-আল্লাহদের নামে জালিয়াতি সহজতর ছিল এজন্য যে, হাদীসের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর নিবেদিত প্রাণ মুহাদ্দিসগণ যেভাবে সর্তক প্রহরা ও নিরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছিলেন, এক্ষেত্রে তা কিছুই ছিল না বা নেই। কোনো নিরীক্ষা নেই, পরীক্ষা নেই, সনদ নেই, মতন নেই, ঐতিহাসিক বা অর্থগত নিরীক্ষা নেই... যে যা ইচ্ছা বলছেন। কাজেই অতি সহজে জালিয়াতগণ নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারতেন।

(৪) হাদীস জালিয়াতির জন্যও এ সকল বুযুর্গের নাম ব্যবহার ছিল খুবই কার্যকর। এ সকল বুযুর্গের নামে বানোয়াট কথার মধ্যে অগণিত জাল হাদীস ঢুকিয়ে দিয়েছে তারা। এ সকল বুযুর্গের প্রতি 'ভক্তির প্রাবল্য'-র কারণে অতি সহজেই ভক্তিভরে এ সকল বিষ 'গলাধঃকরণ' করেছেন মুসলমানরা। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পেরেছে জালিয়াতগণ।

### ৮. ৪. ১. কাদিরীয়া তরীকা

আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের প্রসিদ্ধতম ব্যক্তিত্ব। (জন্ম ৪৭১-মৃত্যু ৫৬১ হি) একদিকে তিনি হাম্বালী মাযহাবের বড় ফকীহ ছিলেন। অন্যদিকে তিনি প্রসিদ্ধ সূফী ছিলেন। তাঁর নামে অনেক তরীকা, কথা ও পুস্তক মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত। এ সকল তরীকা, কথা ও পুস্তক অধিকাংশ বানোয়াট। কিছু কিছু পুস্তক তাঁর নিজের রচিত হলেও পরবর্তীকালে এগুলোর মধ্যে অনেক বানোয়াট কথা ঢুকানো হয়েছে। এখানে আমরা তাঁর নামে প্রচলিত কাদিরিয়া তরীকা ও 'সিররুল আসরার' পুস্তকটির পর্যালোচনা করব।

প্রচলিত কাদিরিয়া তরীকার আমল, ওযীফা, মুরাকাবা ইত্যাদি পদ্ধতির বিবরণ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ)-এর পুস্তকে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে, আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ)-এর ওফাতের প্রায় দুইশত বছর পরে তাঁর এক বংশধর 'গাওস জীলানী' ৮৮৭ হিজরী সালে (১৪৮২ খৃস্টাব্দে) 'কাদিরীয়া তরীকা'-র প্রচলন করেন। বিভিন্ন দেশে 'কাদিরীয়া তরীকার' নামে

বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত। আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ)-এর নিজের লেখা প্রচলিত বইগুলোতে যে সকল আমল, ওযীফা ইত্যাদি লিখিত আছে প্রচলিত 'কাদিরীয়া তরীকার' মধ্যে সেগুলো নেই।

আমাদের দেশে প্রচলিত 'কাদিরীয়া তরীকা'র সূত্র বা 'শাজারা' থেকে আমরা দেখি যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (১১৭৬ হি/১৭৬২খৃ) থেকে তা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু শাহ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর 'আল-কাওলুল জামীল' গ্রন্থে কাদিরীয়া তরীকার যে বিবরণ দিয়েছেন তাঁর সাথে সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলবীর (১২৪৬ হি/১৮৩১খৃ) 'সিরাতে মুস্তাকীমের' বিবরণের পার্থক্য দেখা যায়। আবার তাঁদের দুজনের শেখানো পদ্ধতির সাথে বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত কাদিরীয়া তরীকার ওযীফা ও আশগালের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এগুলোর কোন্টি তাঁর নিজের প্রবর্তিত ও কোন্টি তাঁর নামে পরবর্তীকালে প্রবর্তিত তা জানার কোনো উপায় নেই।

### ৮. ৪. ২. সির্‌রুল আসরার

আব্দুল কাদির জীলানীর (রাহ) নামে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ একটি পুস্তক 'সির্‌রুল আসরার'। পুস্তকটিতে কুরআন-হাদীসের আলোকে অনেক ভাল কথা রয়েছে। পাশাপাশি অনেক জাল হাদীস ও বানোয়াট কথা পুস্তকটিতে বিদ্যমান। অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায় যে, পরবর্তী যুগের কেউ এ বইটি লিখে তাঁর নামে চালিয়েছে। কয়েকটি বিষয় এই জালিয়াতি প্রমাণ করে:

**১.** এ পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে লেখক 'ফরীদ উদ্দীন আত্তার-এর বিভিন্ন বাণী ও কবিতার উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। যেমন এক স্থানে বলেছেন: "হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার (রহঃ) বলেন..."[২৬৯]। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ফরীদ উদ্দীন আত্তার ৫১২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২৬ হিজরীতে (১২২৯ খৃ) ইন্তেকাল করেন। আর আব্দুল কাদির জীলানী ৪৭১ হিজরীতে জন্মগহণ করেন এবং ৫৬১ হিজরীতে (১১৬৬ খৃ) ইন্তেকাল করেন। ফরীদ উদ্দীন আত্তার বয়সে তাঁর চেয়ে ৪০ বছরের ছোট এবং তাঁর ইন্তেকালের সময় ফরীদ উদ্দীন আত্তারের কোনো প্রসিদ্ধি ছিল না। কাজেই 'হযরত শাইখ ...' ইত্যাদি বলে তিনি আত্তারের উদ্ধৃতি প্রদান করবেন একথা কল্পনা করা যায় না।

**২.** এ পুস্তকে শামস তাবরীয-এর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। লেখক বলেন: "হযরত শামস তাবরীয (রঃ) বলেছেন..."[২৭০]। উল্লেখ্য যে, শামস তাবরীয ৬৪৪ হিজরীতে (১২৪৭ খৃ) ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে ৫৬০ হিজরীর পরে তাঁর জন্ম বলে মনে হয়। অর্থাৎ আব্দুল কাদির জীলানীর মৃত্যুর সময় শামস তাবরীযের জন্মই হয় নি! অথচ তিনি তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছেন!

**৩.** এ পুস্তকে বারংবার জালাল উদ্দীন রুমীর উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। যেমন লেখক বলছেন: "আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী তাঁর অমর কাব্য মসনবীতে বলেছেন...।"[২৭১] লক্ষ্যণীয় যে, জালাল উদ্দীন রুমী (৬০৪- ৬৭৬ হি) আব্দুল কাদির জীলানীর (রাহ) ইন্তেকালের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করেন! রুমীর জন্মের অর্ধ শত বছর আগে তাঁর মসনবীর উদ্ধৃতি প্রদান করা হচ্ছে!!

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, এ পুস্তকটি পুরোটিই জাল, অথবা এর মধ্যে অনেক জাল কথা পরবর্তীকালে ঢুকানো হয়েছে। এ পুস্তকটির মধ্যে অগণিত জাল হাদীস ও জঘন্য মিথ্য কথা লিখিত রয়েছে। আর আব্দুল কাদির জীলানীর (রাহ) নামে এগুলো অতি সহজেই বাজার পেয়েছে।

### ৮. ৪. ৩. চিশতিয়া তরীকা

আমাদের দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ বুযুর্গ খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (৬৩৩ হি), কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কা'কী (৬৫৩ হি), ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ গঞ্জে শক্কর (৬৬৩ হি) ও নিযাম উদ্দীন আউলিয়া (৭২৫ হি), রাহিমাহুমুল্লাহ। এদের নামেই চিশতিয়া তরীকা প্রচলিত। এছাড়া এদের নামে অনেক কথা, কর্ম ও বই-পুস্তকও প্রচলিত। এগুলোর মধ্যে এমন অনেক কথা রয়েছে যা সুস্পষ্টতই মিথ্যা ও বানোয়াট। এখানে চিশতিয়া তরীকা ও এঁদের নামে প্রচলিত দুএকটি বইয়ের বিষয়ে আলোচনা করব।

বিভিন্ন দরবারের চিশতীয় তরীকার আমল-ওযীফার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। উপর্যুক্ত বুযুর্গগণের নামে প্রচলিত পুস্ত কাদিতে এ সকল 'তরীকা' বা পদ্ধতির কিছুই দেখা যায় না। আবার এ সকল পুস্তকে যে সকল যিকর-ওযীফার বিবরণ রয়েছে সেগুলোও প্রচলিত চিশতিয়া তরীকার মধ্যে নেই। চিশতিয়া তরীকার ক্ষেত্রেও শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর বিবরণের সাথে সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলবীর বিবরণের পার্থক্য দেখা যায়। আবার তাঁদের দুইজনের শেখানো পদ্ধতির সাথে বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত চিশতিয়া তরীকার ওযীফা ও আশগালের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এগুলোর কোন্টি 'অরিজিনাল' ও কোনটি 'বানোয়াট' তা জানার কোনো উপায় নেই।

### ৮. ৪. ৪. আনিসুল আরওয়াহ, রাহাতিল কুলুব... ইত্যাদি

এ সকল মহান মাশাইখ রচিত বলে কিছু পুস্তক প্রচলিত। এগুলো 'উস্তাদ বা পীরের সাহচর্যের স্মৃতি ও আলোচনা হিসেবে

রচিত ।' খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী তাঁর উস্তাদ উসমান হারুনীর সাথে তাঁর দীর্ঘ সাহচর্যের বিবরণ লিখেছেন 'আনিসুল আরওয়াহ' নামক পুস্তকে । খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী তাঁর উস্তাদ মুঈন উদ্দীন চিশতীর সাথে তার সাহচর্যের স্মৃতিগুলি লিখেছেন 'দলিলুল আরেফীন' পুস্তকে । খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জে শক্কর তাঁর উস্তাদ কুতুব উদ্দীনের সাহচর্যের স্মৃতিগুলো লিখেছেন 'ফাওয়ায়েদুস সালেকীন' পুস্তকে । খাজা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া তাঁর উস্তাদ ফরীদ উদ্দীনের সাহচর্যের স্মৃতিগুলো লিখেছেন 'রাহাতিল কুলুব' পুস্তকে । প্রসিদ্ধ গায়ক আমীর খসরু তাঁর উস্তাদ নিজাম উদ্দীনের সাহচর্যের স্মৃতি ও নির্দেশাবলি লিখেছেন 'রাহাতুল মুহিব্বীন' পুস্তকে ।

এ সকল পুস্তক পাঠ করলে প্রতীয়মান হয় যে এগুলো পরবর্তী যুগের মানুষদের রচিত জাল পুস্তক । অথবা তাঁরা কিছু লিখেছিলেন সেগুলোর মধ্যে পরবর্তী যুগের জালিয়াতগণ ইচ্ছামত অনেক কিছু ঢুকিয়েছে । এই পুস্তকগুলোতে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক অনেক ভাল কথা আছে । পাশাপাশি অগণিত জাল হাদীস ও মিথ্যা কথায় সেগুলো ভরা । এ ছাড়া ঐতিহাসিক তথ্যাবলি উল্টোপাল্টা লেখা হয়েছে । এমন সব ভুল রয়েছে যা প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে ।

প্রত্যেক বুযুর্গ তার মাজালিসগুলোর তারিখ লিখেছেন । সন তারিখগুলো উল্টোপাল্টা লেখা । শাওয়াল মাসের ৪ তারিখ বৃহস্পতিবার ও ৭ তারিখ রবিবার লেখা হয়েছে । অর্থাৎ শাওয়ালের শুরু সোমবারে । কিন্তু ১৫ই জিলক্বদ সোমবার লেখা হয়েছে । অর্থাৎ যিলকাদের শুরুও সোমবারে! শাওয়াল মাস ২৮ দিনে হলেই শুধু তা সম্ভব![২৭২] আবার পরের মাজলিস হয়েছে ৫ই জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার । জিলকাদের শুরু সোম, মঙ্গল বা বুধবার যেদিনই হোক, কোনোভাবেই ৫ই জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার হয় না! আবার পরের মাজলিস ২০শে জিলহজ্ব শনিবার! ৫ তারিখ বৃহস্পতিবার হলে ২০ তারিখ শনিবার হয় কিভাবে?[২৭৩] ২০ শে রজব সোমবার এবং ২৭শে রজব রবিবার লেখা হয়েছে । ৫ই শাওয়াল শনিবার অথচ ২০ শে শাওয়াল বৃহস্পতিবার[২৭৪]. ... এরূপ অগণিত অসঙ্গতি ও জালিয়াতি প্রথম নজরেই ধরা পড়ে ।

কাকী (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, ৬১৩ হিজরীতে তিনি বাগদাদে মুঈন উদ্দীন চিশতীর নিকট মুরীদ হন । এরপর কয়েক মাজলিস তিনি বাগদাদেই থাকেন । এরপর তিনি তাঁর সহচরদের নিয়ে আজমীরে আগমন করেন । এভাবে আমরা নিশ্চিত জানতে পারছি যে, ৬১৩ হি (১২১৬ খৃ)-এর পরে মুঈন উদ্দীন চিশতী ভারতে আগমন করেন । বখতিয়ার কাকী আরো উল্লেখ করেছেন যে, আজমীরে অবস্থান কালে আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো । একপর্যায়ে তিনি বলেন, আমি পৃথ্বীরাজকে মুসলমানদের হাতে জীবিত বন্দী অবস্থায় অর্পণ করলাম । এর কয়েক দিন পরেই সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরীর সৈন্যগণ পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও বন্দী করে ।[২৭৫]

অথচ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করছেন যে, ৬১৩ হিজরীর প্রায় ২৫ বছর পূর্বে ৫৮৮ হিজরীতে (১১৯২ খৃস্টাব্দে) তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে সুলতান ঘোরী পৃথীরাজকে পরাজিত করে আজমীর দখল করেন । আর ৬১৩ হিজরীতে খাজা মুঈন উদ্দীনের আজমীর আগমনের ১০ বছর পূবে ৬০৩ হিজরীতে (১২০৬ খৃস্টাব্দে) শিহাবুদ্দীন ঘোরী মৃত্যুবরণ করেন । এ থেকে বুঝা যায় যে, এ সকল কাহিনী সবই বানোয়াট । অথবা মুঈন উদ্দীন (রাহ) অনেক আগে ভারতে আসেন । এক্ষেত্রে আনিসুল আরওয়াহ, দলিলুল আরেফীন, ফাওয়ায়েদুস সালেকীন ইত্যাদি পুস্তকে লেখা সন-তারিখ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বানোয়াট ।

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসের নামে জালিয়াতির ন্যায় বুযুর্গদের নামেও জালিয়াতি হয়েছে ব্যাপকভাবে । হাদীসের ক্ষেত্রে যেমন সুনির্দিষ্ট নিরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে, বুযুর্গদের ক্ষেত্রে তা না থাকাতে এদের নামে জালিয়াতি ধরার কোনো পথ নেই । জালিয়াতগণ বুযুর্গদের নামে 'জাল পুস্তক' লিখে সেগুলোর মধ্যে জাল হাদীস উল্লেখ করেছে, এবং তাঁদের লেখা বইয়ের মধ্যে জাল হাদীস ঢুকিয়ে দিয়েছে । এখন এ সকল জাল হাদীসের বিরুদ্ধে কিছু বললেই সাধারণ মুসলিম বলবেন, অমুক বুযুর্গের পুস্তকে এই হাদীস রয়েছে, তা জাল হয় কিভাবে?! এভাবে জালিয়াতগণ এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে!

### ৮. ৫. জাল হাদীস বনাম যয়ীফ হাদীস

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, জাল হাদীস দুর্বল হাদীসের একটি প্রকার । জাল হাদীসের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ যেরূপ কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, 'যয়ীফ' হাদীসের বিষয়ে অনেক মুহাদ্দিস তদ্রূপ কঠোরতা অবলম্বন করেন নি । দুটি ক্ষেত্রে তাঁরা 'যয়ীফ' হাদীসের ব্যবহার বা উল্লেখ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন: (১) 'আকীদা' বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং (২) শরীয়তের আহকাম বা বিধানাবলির ক্ষেত্রে । প্রথম ক্ষেত্রে একমাত্র সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে । শুধু তাই নয়, 'আকীদা' বা বিশ্বাস প্রমাণের ক্ষেত্রে মূলত 'মুতাওয়াতির' বা বহু সাহাবী ও তাবিয়ী বর্ণিত হাদীসের উপর অথবা সাহাবী-তাবিয়ীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'সহীহ' ও 'হাসান' হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে ।[২৭৬]

#### ৮. ৫. ১. যয়ীফ হাদীস বর্ণনা ও পালনের শর্ত

পক্ষান্তরে তিনটি বিষয়ে 'অল্প যয়ীফ' হাদীস বলা বা আমল করা অনেকে অনুমোদন করেছেন: (১) কুরআনের 'তাফসীর' বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, (২) ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং (৩) বিভিন্ন নেক আমলের 'ফযীলত'-এর ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে তাঁরা নিম্নরূপ শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন:

(১) যয়ীফ হাদীসটি "অল্প দুর্বল' হবে, বেশি দুর্বল হবে না।

(২) যয়ীফ হাদীসটি এমন একটি কর্মের ফযীলত বর্ণনা করবে যা মূলত সহীহ হাদীসের আলোকে জায়েয ও ভালো।

(৩) যয়ীফ হাদীসকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে বিশ্বাস করা যাবে না। এবং কোনোভাবেই তা আকীদা বা বিশ্বাসের জগতে প্রবেশ করবে না। যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে একথা মনে করা যাবে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যিই একথা বলেছেন। সাবধানতামূলকভাবে আমল করতে হবে। অর্থাৎ মনে করতে হবে, হাদীসটি নবীজী ﷺ -এর কথা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তবে যদি সত্য হয় তাহলে এ সাওয়াবটা পাওয়া যাবে, কাজেই আমল করে রাখি। আর সত্য না হলেও মূল কাজটি যেহেতু সহীহ হাদীসের আলোকে মুস্তাহাব সেহেতু কিছু সাওয়াব তো পাওয়া যাবে।

(৪) এরূপ দুর্বল হাদীস নির্ভর কোনো আমল প্রকাশ্যে করা যাবে না; বরং একান্ত ব্যক্তিগতভাবে তা পালন করতে হবে।[২৭৭]

আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী বলেন:

اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف، ما لم تكن موضوعة. وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يشهر بذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره. وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين". فكيف بمن عمل به. ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام، أو في الفضائل، إذ الكل شرع.

"এ কথা প্রসিদ্ধ যে, ফাযায়িল বিষয়ে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আলিমগণ কিছুটা ঢিলেমি দেখান। এ বিষয়ক হাদীসটি যদি জাল না হয় তবে তাতে দুর্বলতা থাকলেও আলিমগণ তা বর্ণনা করেন। এর সাথে নিম্নের বিষয় শর্ত করা প্রয়োজন। তা হলো: যদি কেউ এরূপ হাদীস পালন করতে চায় তবে তাকে বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করতে হবে যে, হাদীসটিকে যয়ীফ। এছাড়া সে এরূপ দুর্বল হাদীস নির্ভর আমল প্রকাশ্যে করতে পারবে না। কারণ একজন মানুষ দুর্বল হাদীসের উপর আমল করে শরীয়তের মধ্যে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না যা মূলত শরীয়তের অংশ নয়। অথবা তার দুর্বল হাদীস নির্ভর আমলটি দেখে একজন মুর্খ মানুষ ধারণা করতে পারে যে, একটি একটি সহীহ সুন্নাত। (সপ্তম শতকের মুজাদ্দিদ ও সুলতানুল উলামা নামে খ্যাত) উসতায (ইয্যুদ্দীন আব্দুল আযীয) ইবন আব্দুস সালাম (৬৬০ হি) এবং অন্যান্য আলিম এ অর্থে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে ঘোষিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা মুমিনের দায়িত্ব। তিনি বলেছেন: "যে হাদীসটির বিষয়ে ধারণা হয় যে তা মিথ্যা সে হাদীস যে বর্ণনা করে সেও একজন মিথ্যাবাদী।" এরূপ (সন্দেহভাজন বা দুর্বল) হাদীস বর্ণনা করার পরিণতি যদি এরূপ হয় তাহলে তার পালন বা আমল করার পরিণতি কী হতে পারে? আর কোনো হাদীস আমল বা পালন করার ক্ষেত্রে হালাল-হারাম এবং ফযীলত-সাওয়াব উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ হালাল-হারাম ও ফযীলত-সাওয়াব সবই শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত।"[২৭৮]

'যয়ীফ' হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের এ মতটি ভুল বুঝে অনেক সময় এর মাধ্যমে সমাজে 'জাল' হাদীসের প্রচলন ঘটেছে। বস্তুত, বিভিন্ন মুসলিম সমাজে প্রচলিত অধিকাংশ জাল ও ভিত্তিহীন 'হাদীস' এ 'পথ' দিয়ে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে। সমাজে অগণিত জাল হাদীসের প্রচলনের পিছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে: (১) অযোগ্য ও ইলমহীন মানুষদের ওয়ায, নসীহত ও বিভিন্ন দীনী দায়িত্ব পালন, (২) সাধারণ আলিমদের অবহেলা বা অলসতা, (৩) প্রসিদ্ধ ও যোগ্য আলিমদের ঢিলেমী, (৪) হেদায়েতের আগ্রহ এবং (৫) ইতিহাস, সীরাত ও রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর মুজিযা বর্ণনার আগ্রহ।

### ৮. ৫. ২. হিদায়াত ও ফযীলতে যয়ীফের নামে জাল হাদীস

জাল হাদীসের প্রচলনের ক্ষেত্রে শেষের কারণদ্বয় সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। হেদায়াতের আগ্রহে অনেক যোগ্য আলিম ওয়ায, ফাযায়িল, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তকে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক 'যয়ীফ' হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ সকল 'যয়ীফ' হাদীসের মধ্যে অনেক জাল হাদীস তাঁদের পুস্তকে স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা এগুলোর জালিয়াতি বা দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেন নি। ফলে সাধারণ পাঠক এগুলোকে 'সহীহ' হাদীস বলেই গণ্য করেছেন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, কুরআনের এত আয়াত, এত সহীহ হাদীস সব কিছু উল্লেখ করার পরেও বোধ হয় মানুষের মনে 'হেদায়াতের' কথাটি ঢুকানো গেল না। কিছু যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য কথা না বললে বোধহয় মানুষের মনে 'আসর' করা যাবে না।

কুরআনে ও সহীহ হাদীসে উল্লিখিত শাস্তির কথা এবং কুরআনে ও সহীহ হাদীসে উল্লিখিত পুরস্কার, সাওয়াব ও ফযীলতের কথা বোধ হয় মানুষের মনে সত্যিকার আখেরাতমুখিতা, আল্লাহ ভীতি ও আমলের আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। এজন্যই বোধহয় তাঁরা আয়াতে কুরআনী ও সহীহ হাদীসের পরে এ সকল যয়ীফ বা ভিত্তিহীন কথাগুলো উল্লেখ করেন।

**৮. ৫. ৩. ইতিহাস ও সীরাতে যয়ীফের নামে জাল হাদীস**

ইতিহাস, সীরাত ও মুজিযা বর্ণনার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দেখা যায়। সকল বিষয়ের লেখকই সে বিষয়ে সর্বাধিক তথ্য সংগ্রহ করতে চান। তথ্য সংগ্রহের এ আগ্রহের ফলে প্রথম যুগ থেকেই অনেক আলিম এ সকল ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বল হাদীস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে এ আগ্রহের ফলে সীরাতুন্নবী গ্রন্থগুলোর মধ্যে অগণিত ভিত্তিহীন জাল হাদীস অনুপ্রবেশ করেছে।

ইতোপূর্বে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবীর আলোচনা থেকে জেনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচলিত সকল হাদীসই ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর মধ্যে সংকলিত হয়ে গিয়েছিল। এর পরবর্তী যুগে অতিরিক্ত যা কিছু সংকলিত হয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগে বানানো জাল ও ভিত্তিহীন কথা। এ প্রকারের গ্রন্থগুলোকে তিনি ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

ইতিহাস, সীরাত ও মুজিযা বিষয়ক গ্রন্থগুলোর অবস্থাও আমরা এথেকে বুঝতে পারব। প্রথম ছয় শত বছরে সংকলিত এ জাতীয় গ্রন্থগুলির অন্যতম: ইবনু ইসহাকের (১৫০হি) সীরাহ, ওয়াকিদীর (২০৭ হি) মাগাযী, ইবনু হিশামের (২১৮ হি) সীরাহ, ইবনু সা'দ (২৩০হি)-এর 'তাবাকাত', খালীফা ইবনু খাইয়াতের (২৪০ হি) তারীখ, বালাযুরির (২৭৯ হি) ফুতুহুল বুলদান, ফিরইয়াবীর (৩০১ হি) দালাইলুন নুবওয়াত, তাবারীর (৩১০ হি) তারীখ, মাসউদীর (৩৪৫ হি) তারীখ, বাইহাকীর (৪৫৮ হি) দালাইলুন নুবওয়াত ইত্যাদি। এ সকল পুস্তকে প্রচুর 'অত্যন্ত যয়ীফ' হাদীস এবং কিছু জাল হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও আমরা দেখি যে, পরবর্তী যুগের লেখকগণ আরো অনেক কথা সংগ্রহ করছেন যা এ সকল গ্রন্থে মোটেও পাওয়া যাচ্ছে না।

পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর অন্যতম হলো সুয়ূতীর (৯১১ হি) আল-খাসাইসুল কুবরা, কাসতালানীর (৯২৩ হি) আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ শামীর (৯৪২ হি) সুবুলুল হুদা বা সীরাহ শামিয়াহ। এ সকল গ্রন্থের লেখকগণ দাবি করেছেন যে, তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করবেন, কিন্তু জাল হাদীস উল্লেখ করবেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা এমন অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেগুলোকে তাঁরা নিজেরাই অন্যত্র জাল ও মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন।

এর পরবর্তী পর্যায়ের গ্রন্থগুলোর অন্যতম হলো আলী ইবনু বুরহান উদ্দীন হালাবীর (১০৪৪ হি) সীরাহ হালাবিয়াহ, যারকানীর (১১২২ হি) শারহুল মাওয়াহিব ইত্যাদি গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থের লেখকগণ কোনো বাছ বিচারই রাখেন নি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল যত বেশি পারা যায় তথ্যাদি সংকলন ও বিন্যাস করা। এজন্য কোনোরূপ বিচার ও যাচাই ছাড়াই সকল প্রকার সহীহ, যয়ীফ, মাউযূ ও সনদবিহীন বিবরণ একত্রিত সংমিশ্রিত করে বিন্যাস করেছেন। ফলে অগণিত জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা এগুলোতে স্থান পেয়েছে। আর জাল হাদীসের মধ্যে নতুনত্ব ও আজগুবিত্ব বেশি। এজন্য এ সকল পুস্তকে সহীহ হাদীসের পরিবর্তে জাল হাদীসের উপরেই বেশি নির্ভর করা হয়েছে। অবস্থা দেখে মনে হয়, কুরআন কারীম ও অসংখ্য সহীহ হাদীস দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নুবুওয়াত, মুজিযা ও মর্যাদা প্রমাণ করা বোধহয় সম্ভব হচ্ছে না, অথবা এ সকল মিথ্যা ও জাল বর্ণনাগুলো ছাড়া বোধহয় তাঁর মর্যাদার বর্ণনা পূর্ণতা পাচ্ছে না!!

এ পর্যায়ের গ্রন্থগুলোর লেখকগণ অধিকাংশ বর্ণনারই সূত্র উল্লেখ করেন নি। যেখানে সূত্র উল্লেখ করেছেন সেখানেও তাদের অবহেলা অকল্পনীয়। একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। সীরাহ হালাবিয়ার লেখক বলেন:

وَرَأَيْتُ فِيْ كِتَابِ التَّشْرِيْفَاتِ فِيْ الْخَصَائِصِ وَالْمُعْجِزَاتِ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ مُؤَلِّفِهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَأَلَ جِبْرِيْلَ، فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ، كَمْ عُمِّرْتَ مِنَ السِّنِيْنَ ... رواه البخاري

"আমি 'তাশরীফাত ফিল খাসাইস ওয়াল মু'জিযাত' নামক একটি বই পড়েছি। এ বইটির লেখকের নাম আমি জানতে পারি নি। এ বইয়ে দেখেছি, আবূ হুরাইরা (রা) থেকে হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে জিব্রাঈল, আপনার বয়স কত? ... হাদীসটি বুখারী সংকলন করেছেন।"[২৭৯]

এ হাদীসটি বুখারী তো দূরের কথা কোনো হাদীস গ্রন্থেই নেই। এ অজ্ঞাত নামা লেখকের বর্ণনার উপর নির্ভর করে গ্রন্থকার হাদীসটি উদ্ধৃত করলেন। একটু কষ্ট করে সহীহ বুখারী বা ইমাম বুখারীর লেখা অন্যান্য গ্রন্থ খুঁজে দেখলেন না। এভাবে তিনি পরবর্তী যুগের মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে একটি জঘন্য মিথ্যা কথা প্রচলনের স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমাদের দেশের আলিমগণ "সীরাহ হালাবীয়া' জাতীয় পুস্তকের উপরেই নির্ভর করেন, ফলে অগণিত জাল কথা তাদের লিখনি বা বক্তব্যে স্থান পায়। প্রসিদ্ধ আলিম ও বুযুর্গ আব্দুল খালেক (রাহ) তাঁর **'সাইয়েদুল মুরসালীন'** গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মূলত এ 'সীরাহ হালাবিয়া' (সীরাত-ই হালাবী) গ্রন্থটির উপরেই নির্ভর করেছেন। স্বভাবতই তিনি গ্রন্থকারের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো তথ্যই যাচাই করেন নি। ফলে এই মূল্যবান গ্রন্থটির মধ্যে আমরা অগণিত জাল ও ভিত্তিহীন হাদীস দেখতে পাই।

আমরা দেখেছি যে, যয়ীফ হাদীসের উপর আমল জায়েয হওয়ার শর্ত হলো, বিষয়টি বিশ্বাস করা যাবে না, শুধু কর্মের ক্ষেত্রে সাবধানতামূলক কর্ম করা যাবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো, বিশ্বাস ও কর্ম বিচ্ছিন্ন করা মুশকিল। কারণ যয়ীফ হাদীসের উপর যিনি

আমল করছেন তিনি অন্তত বিশ্বাস করছেন যে, এ আমলের জন্য এ ধরনের সাওয়াব পাওয়া যেতে পারে। বিশেষত রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর জীবনী ও মুজিযা বিষয়ক বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন মুমিন কিছু শুনলে তা বিশ্বাস করেন। শুধু তাই নয়, এ সকল 'যয়ীফ' বা 'জাল' কথাগুলো তাঁর 'ঈমানের' অংশে পরিণত হয়। এভাবে তাঁর 'বিশ্বাসের' ভিত্তি হয় যয়ীফ বা জাল হাদীসের উপর।

### ৮. ৬. নিরীক্ষা বনাম ঢালাও ও অনুমান-নির্ভর কথা

জাল হাদীসের ক্ষেত্রে জঘন্যতম ও সবচেয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তি হলো, নিরীক্ষা ব্যতিরেকে ঢালাও মন্তব্য। আমরা ইতোপূর্বে বারংবার উল্লেখ করেছি এবং পূর্বের সকল আলোচনা থেকে নিশ্চিতরূপে বুঝতে পেরেছি যে, ওহী বা ধর্মীয় শিক্ষার বিশুদ্ধতা রক্ষা ও সূত্র সংরক্ষণ মুসলিম উম্মাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের ধর্মগ্রন্থ, ধর্ম-প্রচারক বা প্রবর্তকের শিক্ষা ও নির্দেশাবলীর বিশুদ্ধতা রক্ষায় এরূপ সচেষ্ট হয় নি।

সাহাবীগণের যুগ থেকে সকল যুগের মুসলিম আলিম ও মুহাদ্দিসগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচারিত প্রতিটি কথা চুলচেরা নিরীক্ষা ও যাচাই করে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অনেক 'প্রাচ্যবিদ', তাঁদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত অনেক মুসলিম ও অনেক অনভিজ্ঞ বা অজ্ঞ মুসলিম 'চিন্তাবিদ' বা 'গবেষক' হাদীসের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার বিষয়ে ঢালাও মন্তব্য ও মতামত ব্যক্ত করেন। হাদীস যেহেতু জাল হয়েছে, কাজেই কোনো হাদীসই নির্ভরযোগ্য নয়, অথবা অমুক হাদীসের অর্থ সঠিক নয় কাজেই তা জাল বলে গণ্য হবে .... ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন, মুহাদ্দিসগণ সম্ভবত শুধু সনদই বিচার করেছেন, অর্থ, শব্দ, বাক্য, ভাব ইত্যাদি বিচার ও নিরীক্ষা করেন নি। এগুলো সবই ভিত্তিহীন ধারণা ও উর্বর মস্তিকের বর্বর কল্পনা মাত্র। মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা পদ্ধতির সাথে পরিচয়হীনতা এর মূল কারণ। এর চেয়েও বড় কারণ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও ইসলাম থেকে মানুষদেরকে বিচ্যুত করার উদগ্র বাসনা।

ইহূদী-খৃস্টান প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণ, কাদিয়ানী, বাহাঈ ইত্যাদি অমুসলিম সম্প্রদায় ও শিয়া সম্প্রদায় ছাড়াও কিছু 'জ্ঞানপাপী' পণ্ডিত হাদীসের বিরুদ্ধে এরূপ ঢালাও মন্তব্য করেন অথবা মর্জিমাফিক অর্থ বিচার করে হাদীস 'জাল' বলে ঘোষণা করেন। তারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করতে চান, কিন্তু ইসলাম পালন করতে চান না। এরা সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, হালাল ভক্ষণ, পবিত্রতা অর্জন, ইত্যাদি কোনো 'কর্ম'ই করতে রাজি নন। কুরআনে উল্লিখিত এ সকল বিষয়কে 'ইচ্ছামত' ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দিতে চান। কিন্তু ভয় হলো, হাদীস নিয়ে। হাদীস থাকলে তো ইচ্ছামত ব্যাখ্যা অচল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এজন্য তারা নির্বিচারে হাদীসকে জাল বলে বাতিল করতে চান।

আশা করি, এ গ্রন্থের আলোচনা থেকে পাঠক এ সকল মানুষের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা ও বিচার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক। তাঁরা সনদ, শ্রুতি, পাণ্ডুলিপি, ভাষা, অর্থ, ও প্রাসঙ্গিক সকল প্রমাণের আলোকে যে সকল হাদীসকে সহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলোর বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণবিহীন ঢালাও সন্দেহ একমাত্র জ্ঞানহীন মুর্খ বা বিদ্বেষী জ্ঞানপাপী ছাড়া কেউই করতে পারে না। আর এ নিরীক্ষার ভিত্তিতে যে সকল হাদীসকে তাঁরা জাল ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলোকে গায়ের জোরে হাদীস বলে দাবি করাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার ভয়ঙ্কর দুঃসাহস ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে তথ্য ভিত্তিক নিরীক্ষার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত।

## ৯. জাল হাদীস চিহ্নিতকরণে বাঙালী আলিমগণ

অন্যান্য সকল মুসলিম সমাজের ন্যায় বাঙালী মুসলিম সমাজেও জাল হাদীস ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র আঙিনাকে মিথ্যার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বাঙালী আলিমগণ বিভিন্নভাবে সচেষ্ট থেকেছেন। জাল হাদীসের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি ও জাল হাদীসের ভয়াবহতা ও এ বিষয়ক মূলনীতি সংকলন করা ছাড়াও কোনো কোনো প্রসিদ্ধ বাঙালী আলিম জাল হাদীস সংকলনের মাধ্যমে জাল হাদীস প্রতিরোধে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। এখানে কয়েকজনের অবদান সংক্ষেপে পর্যালোচনা করছি।

### ৯. ১. মাওলানা রুহুল আমিন বশিরহাটী

বিশ শতকের প্রথমার্ধের অন্যতম প্রসিদ্ধ বাঙালী আলিম আল্লামা রুহুল আমিন (১৩০২/১৮৮২-১৩৬৪হি/১৯৪৫খৃ)। ফুরফরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী (১২৬৩/১৮৪৬-১৩৫৮হি/১৯৩৯খৃ)-এর নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি জাল হাদীস বিষয়ক অনেক মূল্যবান তথ্য আলোচনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

#### ৯. ১. ১. আপনি না হলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না

শাইখ রুহুল আমিন লিখেন: "বর্তমানে বেদাতি দলের যেরূপ বাড়াবাড়ি হইয়াছে, তাহাতে হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। হজরত নবি (ﷺ) শেষ যুগে একদল প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী লোকের আবির্ভাব হওয়ার কথা বলিয়াছেন, অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে। এক্ষণে 'তরিকতে রসুল রাহে হক' নামক একখানি পুস্তক দেখিয়া অবাক হইলাম, বাগমারী নিবাসী আলিমদ্দিন শাহ নামক একজন অপরিচিত লোক কোরাণ ও হাদিছ ধ্বংস করার বাসনায় উক্ত বাতীল পুস্তক রচনা করিয়াছে।... লেখকের বিদ্যার দৌড় এত যে, কতকগুলি জাল বা অমূলক হাদিস লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। ... লেখক এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় (لولاك لما خلقت الأفلاك) (তুমি না হলে নভোমণ্ডলী সৃষ্টি করতাম না)- এই কথাটি হাদিস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মোল্লা আলি কারী "মওজুয়াতে কবির" গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: সাগানী বলিয়াছেন যে, উক্ত হাদিসটি জাল। ফাতাওয়ায় আজিজি ১/১২২পৃ. "..উক্ত হাদিস: 'লাওলাকা

লামা খালাকতোল আফলাক' কোন কেতাবে দেখি নাই। ফাতাওয়ায় এমদাদিয়া, ৪/১৯ পৃ. "এই উল্লিখিত হাদিসটি কোন কেতাবে দেখি নাই, ইহা স্পষ্ট জাল বলিয়া অনুমিত হয়।"[২৮০]

অন্যত্র মাওলানা রুহুল আমিন বলেন: "মিলাদ শরিফে মওজু (জাল) হাদিছ বা রেওয়াএত উল্লেখ করা নাজায়েজ, ইহা আমি কল্য সভায় প্রকাশ করিয়াছি। 'লাওলাকা লামা খালাকতোল আফলাক' কথাটী হাদিস নয়। মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ দেহলবী ও মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেব নিজ নিজ ফতোয়ার কেতাবে লিখিয়াছেন যে, এই কথাটি কোন হাদিছের কেতাবে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 'আকাশার (উকাশার প্রতিশোধ নেওয়ার) কথা জাল' (একথা) সত্য, ইহা ওছুলে জোরজানিয়া টিকায় আছে।.. উর্দ্দু মিলাদ শরিফের কেতাবে কতকগুলি জাল কথা আছে, উহা পাঠ করা জায়েজ নহে, কিন্তু তাই বলিয়া মূল মিলাদ শরিফকে নাজায়েজ বলা যাইতে পারে না।.. ওয়াজ বর্ণনাকারি মৌলবি আলেমগণ 'দোরাতোনাছেহিন কেতাবের' রেওয়াএতগুলি উল্লেখ করিয়া ওয়াজ করিয়া থাকেন উক্ত কেতাবের অনেক রেওয়াএত জাল বা অমূলক।..."[২৮১]

### ৯. ১. ২. যে নিজেকে চিনল সে তার রব্বকে চিনল

রুহুল আমিন লিখেছেন: "তিনি (তরিকতে রসুল (ﷺ)-বইয়ের লেখক) ৫ পৃষ্ঠায় এই কথাটি হাদিস বলিয়া লিখিয়াছেন: ( من عرف نفسه فقد عرف ربه): (যে নিজেকে চিনল সে তার রব্বকে চিনল)। কিন্তু এমাম ছাখাবি মাকাছেদে হাসানার ১৯৮ পৃষ্ঠায় ও মোল্লা আলি কারী মওজুয়াতে কবির গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: ".... "এবনে তায়মিয়া বলিয়াছেন, উহা জাল হাদিস। ছাময়ানি বলিয়াছেন, উহা হজরত নবি (ﷺ)-এর কথিত হাদিস বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। নাবাবি বলেন, উহা হজরত নবি (ﷺ) হইতে প্রমাণিত হয় নাই।"[২৮২]

### ৯. ১. ৩. যার পীর নেই তার পীর শয়তান

রুহুল আমিন লিখেন: "তিনি (তরিকতে রসুল-এর লেখক) উক্ত পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত কথাটি হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন: (من لا شيخ له فشيخه الشيطان)- "যাহার পীর নাই তাহার পীর শয়তান"। কিন্তু লেখক ইহা কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিসে দেখিয়াছেন? ইহার সনদ কি? যতক্ষণ তিনি এই হাদিসের সনদ পেশ করিতে না পারেন ততক্ষণ উহা জাল হাদিস বলিয়া গণ্য হইবে।"[২৮৩]

তিনি আরো বলেন: "কোরাণ, হাদিস, এলমে তাছাওয়ফে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লেখক (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) (তাঁর দিকে অসীলা সন্ধান কর) আয়তটির অর্থে লিখিয়াছেন যে, পীর ধরা ফরজে আয়েন, যে ব্যক্তি পীরের নিকট মুরিদ না হইয়া মরিয়া যায় সে নিশ্চয় কাফের হইয়া মরে। পাঠক, পীর-শ্রেষ্ঠ মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী (রহ) কওলোল জমিলের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ( فاعلم أن البيعة سنة ...), অর্থ্যাৎ মুরিদ হওয়া সুন্নত । আরও লিখিয়াছেন (كان كالإجماع على أنها ليست بواجبة), অর্থ্যাৎ "মুরিদ হওয়া ওয়াজেব নহে, সুন্নত বলিয়া সমস্ত পীরও এমামগণের এজমা হইয়াছে।" আরও আছে যে (ولم ينكر أحد من الأئمة على تركها...), অর্থৎ দীন এসলামের এমামগণ মুরিদ না হওয়া ব্যক্তির উপর এনকার (আপত্তি) করেন নাই।... যে আয়াতে অছিলা চেষ্টা করার হুকুম করা হইয়াছে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসিরে বয়জবি ২/১৪৮ পৃষ্ঠায়, কবিরের ৩/৩৩৯ পৃষ্ঠায়, এবনে জরির ৬/১৩১/১৩২ পৃষ্ঠায়, মায়ালেম ও খাজেনের ২৩৯ পৃষ্ঠায় ও তফসিরে মাদারেকের ১/২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, 'অছিলা' শব্দের অর্থ 'এবাদত, কোরবত ও নেকির কার্য্যকলাপ'। আয়তের মর্ম্ম এই যে, তোমরা এবাদতের কার্য্যগুলি কর। ইহাতে 'পীর অনুসন্ধান' কিরূপে সাব্যস্ত হইবে? ... দ্বিতীয়, যাহার পীর নাই, তাহার পীর শয়তান হইবে, লেখক ইহাকে হাদিস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা হাদিস নহে। তবে লেখকের পীর গ্রহণ ফরজ হওয়ার দাবী ইহাতে কিরুপে সাব্যস্ত হইবে? ..."[২৮৪]

### ৯. ১. ৪. ওলীগণ মরেন না

রুহুল আমিন লিখেন: "লেখকের (তরিকতে রসুল (ﷺ)-বইয়ের লেখক) বিদ্যার পরিমাণ এত যে, তিনি আরবি ভাষা ঠিক করিয়া লিখিতে পারেন না, তিনি উক্ত পুস্তকের ২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: (الأولياء لا يموت): 'অলিগণ মরেন না'। যে ব্যক্তি আরবী নহোমির পাঠ করিয়াছে, সেও বলিতে পারে যে, উক্ত এবারতের শব্দ ভ্রমাত্নক, প্রকৃত পক্ষে এইরূপ এবারত ঠিক হইবে (الأولياء لا يموتون)। ইহা শব্দের হিসাবে বলা হইল, কিন্তু এই শব্দগুলি কোরাণও নহে এবং হাদিস নহে। কোরাণ শরিফে আছে. "নিশ্চয় তুমি (হে মোহাম্মদ) মৃত এবং নিশ্চয় তাঁহারাও (প্রাচীন নবিগণও) মৃত। (সূরা যুমার: ৩০ আয়াত)" লেখকের দাবিকৃত কথাটি এই আয়াতের খেলাফ হইল কিনা?[২৮৫]

### ৯. ১. ৫. হাদীস গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান জাল হাদীস

মাওলানা রুহুল আমিন (রাহ) জাল হাদীস বিষয়ক অনেক মূলনীতি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। জাল হাদীসের পরিচয়, হাদীস, তফসীর, ফিকহ, তাসাউফ বিভিন্ন বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান জাল হাদীস, হাদীস যাচাইয়ের মূলনীতি, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক মৌলিক বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। কোনো হাদীস যাচাই ছাড়া গ্রহণ যেমন তিনি আপত্তি করেছেন, তেমনি কোনো গ্রন্থে জাল

হাদীস বিদ্যমান থাকার কারণে গ্রন্থটির বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান বা বইটি পাঠ নিষিদ্ধ করার মত হঠকারিতার প্রতিবাদ করেছেন।

সহীহ বুখারী, তিরমিযী, ইবন মাজাহ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান জাল হাদীস প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "জাল হাদিছ কাহাকে বলে? যে হাদিছটা মিথ্যাবাদী লোক কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। উহাকে জাল হাদিছ বলা হয়। এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি ফতহোল বারির মোকদ্দমার লিখিয়াছেন যে, ছহিহ বোখারির কতকগুলি এরূপ রাবি আছে যাহাদিগকে বিদ্ধানগণ মিথ্যাবাদী স্থির করিয়াছেন। এমাম বোখারি, নাইম বেনে হাম্মাদ (نُعَيْم بن حَمَّاد) হইতে ছহিহ বোখারিতে এই হাদিছটা উল্লেখ করিয়াছেন: আমর বেনে ময়মুন বলিয়াছেন, আমি জাহেলিয়তের সময় একটি বানরকে দেখিয়াছিলাম যে, সেই বানরটা ব্যভিচার (জেনা) করিয়াছিল এবং সমস্ত বানর সমবেতভাবে উক্ত বানরকে প্রস্তরাঘাত করিয়াছিল। ইহাতে আমিও তাহাদের সহিত উহাকে প্রস্তরাঘাত করিয়াছিলাম। আহমদী প্রেসে মুদ্রিত ছহিহ বোখারি, ১-৫৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এমাম বোখারি এই হাদিছটি উল্লেখ করতঃ বন্য পশুর জেনা ও উহাদের উপর হদ জারি করার মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নইম বেনে হাম্মাদের জাল কথা। মিজানোল-এতেদাল, ৩-২৪১ পৃষ্ঠা: (এমাম) আজদি বলিয়াছেন যে, নইম বেনে হাম্মাদ হাদিছ প্রস্তুত করিত এবং (এমাম আবু হানিফা) নোমানের অপবাদের উদ্দেশ্যে মিথ্যা গল্প প্রস্তুত করিত। এই নইম বর্ণনা করিয়াছে যে, খোদাতায়ালা একটি যুবকের ন্যায় আকৃতি-ধারী, তাঁহার পদদ্বয় সবুজ রঙ্গের ফলকে আছে এবং উহাতে সুবর্ণের দুখানা পাদুকা (জুতা) আছে। ... (আলামা আব্দুল হাই লাখনবী রচিত) আজবোয়া ফাজেলা ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা: এবনো মাজার মধ্যে কতকগুলি জাল হাদিছ আছে। এইরূপ ছেহাহ-ছেত্তার অন্যান্য কেতাবগুলির অবস্থা অনুমান করুন। ছোনানে দারুকুৎনি ও ছোনানে বয়হকি ইত্যাদিতে অনেক জাল হাদিছ আছে।"

হাদীসের সনদ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের মতামত গ্রহণের মূলনীতি, সুনান তিরমিযীর মধ্যে বিদ্যমান দুর্বল ও জাল হাদীস এবং এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতামত ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেন: "বর্ত্তমানে কদমবুছির ফতোয়া নামে একখানা পুস্তক বঙ্গ-ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে, ... উক্ত ফৎওয়াতে কতকগুলি জাল হাদিছ হজরতের ছহিহ হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ... লেখক সাহেব উক্ত পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন .... 'যথা তেরমেজি শরিফের (হাদিছে) আসিয়াছে: ..... অতঃপর তাহারা (য়িহুদিরা) রছুলুল্লাহ (ﷺ) এর পদদ্বয় চুম্বন করিয়াছিল।' আমাদের উত্তর:- হাঁ, তেরমেজি শরীফের ২য় খণ্ডে (৯৮ পৃষ্ঠায়) উক্ত হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে।[২৮৬] এমাম তেরমেজি উক্ত হাদিছ সহিহ বলিলেও তদপেক্ষা যোগ্যতম মোহাদ্দেছ এমাম নাছায়ি এবং এমাম মোঞ্জারি কি বলিয়াছেন, তাহা মুফতি সাহেব দেখিয়াছেন কি? হেদায়ার টীকা, আয়নি, ৪র্থ খণ্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা: "(এমাম) নাছায়ী বলিয়াছেন, উক্ত হাদিছটী মোনকার (জইফ)। (এমাম) মোঞ্জরি বলিয়াছেন, (উক্ত হাদিসের রাবি) আবদুল্লাহ বেনে ছালেমার জন্য হাদিসটী মোনকার (জইফ) হইয়াছে, কেননা, সে ব্যক্তি দোষান্বিত। নাছবোর রাইয়াহ ১/৩২/৩৩ পৃষ্ঠা। (এমাম) তেরমেজি কছির বেনে আবদুল্লাহ হইতে ঈদের বার তকবীর সংক্রান্ত একটী হাদিস রেওয়াএত করিয়া উহা "আছ'হ' (সমধিক সহিহ) বা হাছান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এমাম আহমদ, এবনোমইন, নাছায়ী, দারকুৎনি, আবু জোরয়া শাফেয়ি উক্ত কছির বেনে আবদুল্লাহকে পরিত্যক্ত, জাল হাদিছ প্রস্তুতকারী ইত্যাদি বলিয়া হাদিসটি রদ করিয়াছেন। আরও উক্ত পৃষ্ঠা- সারমর্ম: "(এমাম) এবনো দাহইয়া বলিয়াছেন, তেরমেজির নিজ কেতাবে অনেক হাদিস হাছান (মধ্যম শ্রেণীর বা উৎকৃষ্ট) বলিয়া কথিত হইয়াছে, অথচ তৎসমস্ত জাল হাদিছ এবং তৎসমস্তের ছনদ বাতীল।"[২৮৭]

ইমাম হাকিম নিসাপূরী সংকলিত 'আল-মুসতাদরাক' গ্রন্থে বিদ্যমান জাল হাদীস বিষয়ে তিনি বলেন: "উক্ত পুস্তক (কদমবুছির ফতোয়া) ৭/৮ পৃষ্ঠা: আল্লামা শামি কদমবুছি জায়েজ হওয়া সমর্থন করিতে গিয়া নিম্নোক্ত হাদিসটি হাকেমের ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন। একদা এক ব্যক্তি নবি করিম (ﷺ)-এর নিকট আসিয়া বলিয়াছিল, হে রছুলুল্লাহ, আমাকে এমন কিছু দেখান যাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় ... (হজরত তাহাই করিলেন)। অবশেষে সে ব্যক্তি নবি করিম (ﷺ)-এর অনুমতি লইয়া তাঁহার মস্তকে এবং পায়ে চুম্বন করিল। আমাদের উত্তর: হেদায়ার টীকা আয়নি ৪/২৫৫ পৃষ্ঠা: এমাম জাহাবী বলিয়াছেন, এই হাদিসের একজন রাবি আছেম বেনে হাব্বান পরিত্যক্ত (জাল হাদিস প্রস্তুতকারী)। ইহাতে বুঝা গেল যে, হাকেমের হাদিসটি বাতীল। মুফতি সাহেবের এইরূপ বাতীল হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা ঠিক হয় নাই এবং উহা কদমবুছি জায়েজ হওয়ার প্রমাণ হইতে পারে না।"[২৮৮]

### ৯. ১. ৬. তাফসীর-গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান জাল হাদীস

তাফসীর গ্রন্থসমূহের জাল হাদীস প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "এক্ষণে আসুন তফছিরগুলির মধ্যে জাল হাদিছ আছে কি তাহার সমালোচনা করা হউক। তফছিরে এবনো জরির ও তফছিরে এবনো কছির অতি উৎকৃষ্ঠ তফছির, এই দুই তফছিরের হাদিগুলি গ্রহণের উপযুক্ত। তদ্ব্যতীতে অন্যান্য তফছিরে অনেক জাল হাদিছ আছে, (ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর রচিত) তফছিরে কবিরের ১/৩৪ পৃষ্ঠায় (أنا أفصح من نطق بالضاد)- (দোয়াদ উচ্চারণকারীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশি বাক-সৌন্দর্যের অধিকারী)-এই কথাটি হাদিছ বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু ইহার কোন ছনদ বা মূল হাদিছের কেতাবে নাই। তমইজোল কালাম মেনাল খবিছ ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তফছিরে আহমদির ২৭ পৃষ্ঠায় ছুরা জেনের তফছিরে এই মর্ম্মের একটি হাদিছ আছে: 'মছজিদে দুনইয়ার কথা বলিলে চল্লিশ বৎসরের আমল (এবাদত) নষ্ট হইয়া যায়।" ইহাকে হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু মওজুয়াতে কবিরের ৬৯ পৃষ্ঠায় উহাকে জাল হাদিস বলা হইয়াছে। এইরূপ তফছির বয়জবি ও কাশ্যাফে প্রত্যেক ছুরার শেষাংশে যে ছুরার ফজিলত লেখা আছে, তাহার অধিকাংশ জাল হাদিছ।

এক্ষেত্রে জাল হাদিছগুলি জাল বুঝিতে বা জাল বলিয়া প্রকাশ করিতে হইবে, তাই বলিয়া কি তফছির পাঠ নাজায়েজ বলিয়া প্রকাশ করিতে হইবে?"[২৮৯]

**৯. ১. ৭. ফিকহ গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান জাল হাদীস**

ফিকহী গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান হাদীসগুলি যাচাই ছাড়া গ্রহণ করা সমাজে জাল হাদীস প্রসারের অন্যতম কারণ। আল্লামা রুহুল আমিন এ প্রসঙ্গে বলেন: "এইরূপ ফেকহের কেতাবে দুই চারটি জাল হাদিছ আছে, হেদায়া কেতাবে দুই একটি জাল হাদিছ আছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকেরা হেদায়া শিক্ষা দেওয়া কালে জাল হাদিছ গুলির অবস্থা শিষ্যদিগকে জ্ঞাত করাইয়া দিবেন, ইহাই তাহাদের কর্ত্তব্য। ফেকহের কেতাবে দুই চারিটি জাল হাদিছ আছে বলিয়া কি ফেকহ শিক্ষা করা নিষেধ হইয়া যাইবে?"[২৯০]

অন্যত্র তিনি বলেন: উক্ত পুস্তক (কদমবুছির ফতোয়া) ৬ পৃষ্ঠা: "হজরত রছুলে করিম (ﷺ) আরও ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি আপন মায়ের পায়ে চুমা দিল, সে যেন বেহেস্তের চৌকাঠে চুমা দিল।" দোর্রোল মোখতার, পঞ্চম খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা। আমাদের উত্তর: মিছরি ছাপা দোর্রোল মোখতারের পঞ্চম খণ্ড নাই। অবশ্য মিছরি ছাপা শামি কেতাবের পাঁচ খণ্ড আছে। উক্ত শামি কেতাবের হাসিয়াতে দোর্রোল মোখতার মুদ্রিত হইয়াছে। এস্তাম্বুলের মুদ্রিত শামি কেতাবের হাশিয়ায় দোর্রোল মোখতারের ৫ম খন্ডে ৩৬১ পৃষ্ঠার এবং মিসরি ছাপার ৫/২৫৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসটি বিনা ছনদে উল্লিখিত হইয়াছে। দোর্রোল মোখতার ইত্যাদি ফেকহের কেতাবে কোন কথা হাদিস বলিয়া লিখিত থাকিলেও উহা যে প্রকৃতপক্ষে হজরতের হাদিস হইবে ইহা বলা যায় না। দোর্রোল মোখতারেরর ১/৩৫ পৃষ্ঠায় এই কথাটি: 'বেহেস্তবাসিদিগের ভাষা আরবি এবং দরি ফার্সি হইবে'- হাদিছ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মোহাদ্দেছ প্রবর আল্লামা মোল্লা আলিকারী মওজুয়াত কবির কেতাবের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, উহা হাদিস নহে, বরং জাল কথা। এজন্য কেবল ফেকহের কেতাবে কোন কথা হাদিস বলিয়া লেখা থাকিলে, দেখিতে হইবে যে, উহা কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিসের কেতাবে আছে কিনা? উহার সহিহ ছনদ আছে কি না? যতক্ষণ ইহা না জানা যায়, ততক্ষণ উহা হাদিস বলিয়া দাবি করা যায় না। এক্ষণে মুফতি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে, উল্লিখিত হাদিসটি কোন হাদিসের কেতাবে আছে? উহার ছনদ কি? তিনি যতক্ষণ উহা প্রকাশ করিতে না পারেন ততক্ষণ উহা হাদিস বলিয়া গণ্য হইবে না।"[২৯১]

তিনি আরো বলেন: "উক্ত পুস্তক (কদমবুছির ফতোয়া) ৮ পৃষ্ঠা: ... আল্লামা জয়লয়ি তাবইনো হাকায়েক কেতাবের ৬ষ্ঠ খন্ডের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কাফি কেতাবে আছে যে, প্রান্তরবাসীগণ নবি (ﷺ) এর হস্তপদ চুম্বন করিতেন। .... কাফি ফেকহের কেতাব, উহা কোন হাদিসের কেতাব নহে, উহাতে কোন কথা হাদিস বলিয়া লিখিত থাকিলেই যে হাদিস হইবে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। মওজুয়াতে কবিরের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, কাফি প্রণেতা বলিয়াছেন যে, হাদিসে আছে, বেহেশতবাসীদিগের ভাষা আরবি ও ফার্সি হইবে কিন্তু ইহা হাদিস নহে, বরং জাল কথা। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, কাফি কেতাবের লিখিত কথাটি কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিসের কেতাবে আছে? উহার সনদ কি? মুফতি সাহেব অগ্রে উহার ছনদ বর্ণনা করুন, পরে উহা প্রমাণস্থলে ব্যবহার করিবেন।"[২৯২]

তিনি আরো বলেন: "উক্ত কেতাব ৯ পৃষ্ঠা: ফতোয়া হাবি কেতাবে আসিয়াছে একব্যক্তি নবী করিম ﷺ এর নিকট আসিয়া বলিয়াছিল, হে রছুলুল্লাহ ﷺ, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, বেহেশতের চৌকাঠে এবং হুরগণকে চুম্বন করিব, তখন হজরত তাহাকে তাহার মায়ের পায়ে এবং বাপের কপালে চুম্বন করিতে আদেশ করিলেন। আমাদের উত্তর: ইহা ফেকহের কেতাবের হাদিস, ইহা কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিসের কেতাবে আছে এবং ইহার সনদ কি, মুফতি সাহেব যতক্ষণ প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ ইহা হাদিস বলিয়া প্রকাশ করা জায়েজ হইতে পারে না। মোল্লা আলি কারী মওজুয়াতে কবির কেতাবের ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: 'যে ব্যক্তি রমজানের শেষে জুমায় একটি ফরজ নামাজ কাজা পড়িবে তাহার জীবনের ৭০ বৎসরের প্রত্যেক নামাজের কাজা আদায় হইয়া যাইবে', এই হাদিসটি নিশ্চয় বাতীল কেননা কোন এবাদত বহু বৎসরের কাজার বিনিময় হইতে পারে না, ইহার উপর এজমা হইয়াছে। নেহায়া কিম্বা হেদায়ার অবশিষ্ট টীকাগুলিতে কাজায় ওমরির কথা উল্লিখিত থাকিলেও উহা অগ্রাহ্য, যেহেতু তাহারা মোহাদ্দেস ছিলেন না এবং তাহারা কোন মোহাদ্দেস পর্যন্ত হাদিসের সনদ উল্লেখ করেন নাই। জনাব মুফতি সাহেব, যখন নেহায়া, কেফায়া, এনায়া কেতাবের বিনা ছনদের হাদিস বাতীল হইল, তখন হাবি কেতাবের বিনা ছনদের হাদিস কেন অগ্রাহ্য হইবে না? এমাম জালালদ্দিন সিউতি লয়ালিয়ে মছনুয়া কেতাবের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: 'এবনো আদি ও বয়হকি এই হাদিসটি উল্লেখ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাতার ললাট চুম্বন করে উহা তাহার পক্ষে দোজখের অন্তরাল স্বরূপ হইবে। ইহা জইফ হাদিস।' ইহাতে বুঝা যায় যে, হাবি কেতাবের হাদিসটি বাতীল।"[২৯৩]

**৯. ১. ৮. তাসাউফ গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান জাল হাদীস**

আল্লামা রুহুল আমিন বলেন: "এইরূপ তাছাওয়াফের কেতাবে অনেক জাল হাদিছ আছে, পীরান পীর ছাহেব গুনইয়াতোত্তালেবিন কেতাবের ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠায় নইম বেনে হাম্মদের ছনদে নিম্নোক্ত জাল হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন: 'হজরত বলিয়াছেন আমার উম্মাত ৭৩

ফেরকা হইবে, তম্মধ্যে আমার উম্মতের মধ্যে প্রধান বিভ্রাটকারী উহারা হইবে- যাহারা আপন আপন রায়ে কার্য্যসমুহে কেয়াছ করিবে এবং হালালকে হারাম করিবে ও হারামকে হালাল করিবে। মিজানোল-এতেদাল ৩।২৩৮পৃষ্ঠা: ... মোহাম্মদ বেনে আলি বলেন, আমি উক্ত হাদিছ সম্বন্ধে (এমাম) এহইয়া বেনে মইনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, উক্ত হাদিছের কোন মূল নাই (অর্থাৎ উহা বাতীল হাদিছ)। এইরূপ পীরান পীরের 'ছের্রোল আছরার' কেতাবের ২/৯ পৃষ্ঠায় আছে: "আমি খেদাকে দাড়িহীন যুবকের আকৃতিতে দেখিয়াছি।" ইহাকে হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মিজানোল এতেদাল কেতাবে ইহাকে জাল কথা বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। এইরূপ তাছাওয়াফের অনেক কেতাবে দুই চারটি জাল হাদিছ দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে তাছাওয়াফের কেতাব পড়া নাজায়েজ হইবে কি?..."[২৯৪]

## ৯. ২. আলাম্মা আবূ জাফর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী

ফুরফুরার পীর আলাম্মা আবূ জাফর সিদ্দিকী (১৩১২/১৯০৬-১৪২৩/২০০২) বিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী আলিম ও পীর। তিনি তাঁর পিতা ফুরফুরার পীর আবূ বকর সিদ্দিকীর নির্দেশে "আল-মাউযূআত' নামে জাল হাদীস সংকলনে উর্দুভাষায় একটি পুস্তক রচনা করেন। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে তিনি গ্রন্থটি সংকলন সমাপ্ত করেন ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের পরে তিনি গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে মাসিক নেদায়ে ইসলামের মাধ্যমে তিনি বইটির বঙ্গানুবাদ শুরু করেন। আবু জাফর সিদ্দিকীর পূর্বে কোনো ভারতীয় আলিম কোনো ভারতীয় ভাষায় এ বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন বলে জানা যায় না। বিশেষত কোনো বাঙালী আলিম রচিত জাল হাদীস বিষয়ক সর্বপ্রথম গ্রন্থ এটি।

গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি সমাজে জাল হাদীসের প্রসার, এর ভয়াবহতা, এবং জাল হাদীস বিষয়ক কিছু মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইলমুর রিজাল ও জাল হাদীস বিষয়ক যে সকল গ্রন্থের উপর তিনি নির্ভর করেছেন সেগুলির তালিকা প্রদান করেছেন। মূল পুস্তকে তিনি আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে (Alphabeticlly) সমাজে প্রচলিত প্রায় সাড়ে চার শত জাল হাদীস সংকলন করেছেন। প্রতিটি হাদীসের মূল আরবী এবং উর্দু অনুবাদ, তথ্য সূত্র উল্লেখ করেছেন। মাঝে মাঝে অনেক মূল্যবান তথ্য উল্লেখ করেছেন। পরিশিষ্টে বাংলার মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত ভিত্তিহীন অনেক গল্প, কাহিনী, কুসংস্কার ও ভুল মাসআলা আলোচনা করেছেন। সর্বোপরি জাল হাদীস নির্ভর বা ইসলামী আকীদা বিরোধী বইপুস্তকের একটি তালিকা বইটির শেষে উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থের একেবারে শেষে গ্রন্থকার আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী "নিবেদন" নামে নিম্নের নিবেদনটি লিখেছেন: "পাঠকদের সমীপে এ গোনাহগারের নিবেদন এই যে, ভাল দুআর সাথে স্মরণ করবেন, যেন আল্লাহ এ ব্যক্তির গোনাহগুলি ক্ষমা করে দেন। আর মানবীয় দুর্বলতার কারণে যদি কোনো ভুল পাওয়া যায়, অথবা কোনো হাদীস মাউযূ (জাল) নয় বলে সন্দেহ হয়, তবে সনদ-সহ হাদীসটি অনুলিপি করে আমার নিকট পাঠিয়ে দিবেন; যেন রাবীগণের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক 'আসমাউর রিজাল' গ্রন্থাদির আলোকে সে বিষয়ে তাহকীক বা গবেষণা করা যায়। যদি প্রকৃতই সে হাদীসটি কোনো প্রকারের হাদীস বলে প্রমাণিত হয় তবে দ্বিতীয় মুদ্রণে সে হাদীসটি বাদ দেওয়া হবে। শুধু কিতাবের বরাত দেওয়া যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ এ কথা বলা যথেষ্ট নয় যে, অমুক গ্রন্থে এ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যদি কোনো গ্রন্থ ইলম হাদীসের ভাল গ্রন্থ হয়, সে গ্রন্থে জাল হাদীসের আধিক্য না থাকে এবং সে গ্রন্থের লেখকও ভাল হন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।" শেষ। ফুরফুরা শরীফ, রবীউস সানী মাস, ১৩৪৮ হি (সেপ্টেম্বর ১৯২৯খৃ)

### ৯. ২. ১. যে সকল হাদীস জাল বলে চিহ্নিত করেছেন

আল্লামা আবূ জাফর সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থে যে সকল জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. আবূ হানীফা আমার উম্মাতের প্রদীপ।
২. তোমরা আলিমদের অনুসরণ করবে; কারণ তারা দুনিয়ার প্রদীপ ও আখিরাতের বাতি।
৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো হাজত-প্রয়োজনের ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর আঙটিতে একটি সুতা বেঁধে নিতেন।
৪. নিয়্যাত বিশুদ্ধ কর এবং বিজন মরুভূমিতে বাস কর।
৫. আত্মতুষ্টি সকল রোগের মূল।
৬. তোমরা সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, কারণ তাতে দশটি বরকত রয়েছে..
৭. (আল্লাহ বলেন) আমি আমার নিজের উপর শপথ করেছি যে, আহমদ ও মুহাম্মাদ নামের কাউকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো না।
৮. আলিম বা তালিব ইলম যখন কোনো গ্রাম-মহল্লা দিয়ে গমন করেন তখন আল্লাহ সে গ্রাম বা মহল্লার গোরস্থানের আযাব ৪০ দিনের জন্য তুলে নেন।
৯. মৃতব্যক্তি ৭ দিন পর্যন্ত তার বাড়ির মানুষদেরকে দেখতে পায়।
১০. আল্লাহ আশূরার দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন।
১১. জান্নাতের বাসিন্দাগণ দাড়ি বিহীন হবেন, শুধু মূসা ইবনু ইমরান (আ) বাদে, তার দাড়ি হবে নাভী পর্যন্ত দীর্ঘ।
১২. কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর শত্রু যদিও সে দরবেশ হয়।
১৩. যাবারজাদ পাথরের আঙটি ব্যবহার কর; কারণ এতে কাঠিন্য বিহীন সহজতা রয়েছে।

১৪. যামরাদ পাথরের আঙটি ব্যবহার...কারণ তা দারিদ্র্য দূরীভূত করে ।
১৫. দেশপ্রেম ঈমানের অংশ ।
১৬. মসজিদের মধ্যে কথাবার্তা নেকী বা সাওয়াব খেয়ে ফেলে.... ।
১৭. নেককারদের নেককর্ম নৈকট্যপ্রাপ্তদের পাপ ।
১৮. বিবাহিতের দু রাকআত অবিবাহিতের ৭০ রাকআত থেকে উত্তম ।
১৯. মুমিনের লালা সুস্থতা বা রোগমুক্তি ।
২০. ছয়টি কর্ম বিস্মৃতি বা স্মৃতিহীনতা জন্ম দেয়: ইঁদুরের ঝুটা ভক্ষণ, জীবন্ত উকুন আগুনে ফেলে দেওয়া, বদ্ধ পানিতে পেশাব করা, আঠা জাতীয় দ্রব্য (গাম) চেবানো, টক আপেল খাওয়া ।
২১. বিলালের সীন আল্লাহর কাছে শীন ।
২২. মুমিনের ওযুর অবশিষ্ট পান করার মধ্যে ৭০টি রোগের প্রতিকার... ।
২৩. দিবসের সালাত বোবা (কারণ এতে কুরআন পাঠ শোনা যায় না) ।
২৪. সাপ্তাহের প্রতি দিন ও রাতের সালাত বিষয়ক হাদীস... জুমুআর রাতে ১২ রাকআত সালাত ১০ বার করে সূরা ইখলাস .... ।
২৫. আরাফার দিনের সিয়াম ষাট বছরের সিয়ামের মত ।
২৬. কৃপণের খাদ্য ব্যাধি এবং দানশীলের খাদ্য ঔষধ ।
২৭. এক মুহূর্ত ইলম সন্ধান করা সারারাত সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম...
২৮. ইলম সন্ধান করা আলাহর নিকট সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও আলাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে উত্তম ।
২৯. তোমরা লবণ ব্যবহার করবে; কারণ তা ৭০টি রোগের প্রতিকার ।
৩০. ইলমু বাতিন আমার ও আমার প্রিয়পাত্র ও অলীগণের মধ্যকার গোপন বিষয় । আমি তা তাদের অন্তরের মধ্যে প্রদান করি । কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা বা কোনো নবী-রাসূলও তা জানতে পারেন না ।
৩১. আমার উম্মাতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত ।
৩২. সকল মাসের মধ্যে রজব মাসের মর্যাদা সকল কথার উপরে কুরআনের মর্যাদার মত ।
৩৩. দারিদ্র আমার গৌরব এবং আমি তারই অহংকার করি ।
৩৪. একজন আলিমের মাজলিসে উপস্থিত হওয়া এক হাজার জানাযায় শরীক হওয়া থেকে, এক হাজার রাকআত সালাত থেকে, এক হাজার হজ্জ এবং এক হাজার জিহাদ-যুদ্ধাভিযান থেকে উত্তম ।
৩৫. "কুল" সূরাগুলি পাঠ করা দারিদ্র্য থেকে নিরাপত্তা ।
৩৬. মুমিনের অন্তর (কালব) আল্লাহর গৃহ ।
৩৭. সুলাইমান (আ)-এর আংটির নক্সা বা খোদিত কথা ছিল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ।
৩৮. দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়, যদিও সে পাপাচারী হয় । আর কৃপণ আল্লাহর শত্রু, যদিও সে দরবেশ হয় ।
৩৯. আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম... ।
৪০. আমাকে যখন মি'রাজে নেওয়া হলো তখন প্রথম আসমানে আমি সবুজ ঝুটি ও সাদা পালক ওয়ালা একটি মোরগ দেখলাম । মোরগটির পদদ্বয় দিগন্তে ও মাথা আরশের নিকট ..... ।
৪১. যে ব্যক্তি অমুক সূরা পাঠ করবে, সে অমুক সাওয়াব লাভ করবে...
৪২. তুমি না হলে আমি মহাকাশসমূহ (বিশ্ব) সৃষ্টি করতাম না ।
৪৩. আমার আকাশ ও আমার যমীন আমাকে ধারণ করার প্রশস্ততা পায় নি; কিন্তু আমার মুমিন বান্দার অন্তর আমাকে ধারণের প্রশস্ততা পেয়েছে
৪৪. জ্ঞানীদের কালি শহীদদের রক্ত থেকে অধিক মর্যাদাময় ।
৪৫. তিন বার করে কুলি করা ও নাকের মধ্যে পানি দেওয়া নাপাক ব্যক্তির জন্য (ফরয গোসলের ক্ষেত্রে) ফরয ।
৪৬. যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কথা বলবে আল্লাহ তার ৪০ বৎসরের আমল বিনষ্ট করে দিবেন ।
৪৭. যে কোনো আলিমের কাছে বসল সে যেন একজন নবীর কাছে বসল ।
৪৮. যে আলিমগণের সাথে সাক্ষাত করল সে যেন আমার সাথেই সাক্ষাত করল । যে ব্যক্তি আলিমগণের সাথে হাত মেলাল সে যেন আমার সাথেই হাত মেলাল । যে ব্যক্তি আলিমগণের কাছে বসল সে যেন আমার কাছেই বসল । আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার কাছে বসল সে কিয়ামতের দিনও আমার কাছেই বসবে ।
৪৯. যে নিজেকে চিনল সে তার প্রতিপালককে চিনল ।
৫০. যে ব্যক্তি তার ভাইকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত শিক্ষা দিল সে তার মালিক হয়ে গেল ।
৫১. যে ব্যক্তি তার ভাইকে ওযূ করতে এক পাত্র পানি এগিয়ে দিল সে যেন তাকে একটি দ্রুতগামী ঘোড়া উপহার দিল ।
৫২. যার সন্তান হলো এবং সে নামের বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সন্তানের নাম মুহাম্মাদ রাখল সে ব্যক্তি ও তার সন্তান জান্নাতী হবে ।

৫৩. যে ব্যক্তি এক রাত্রিতে সূরা সাজদা, সূরা ইয়াসীন, সূরা কামার ও সূরা মুলক পাঠ করে সূরাগুলি তার জন্য নূর ও শয়তান থেকে প্রতিরক্ষা হবে।
৫৪. যে ব্যক্তি আমাকে সফর মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করবে আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করব।
৫৫. তোমরা মৃত্যু বরণ কর তোমাদের মৃত্যুর আগেই।
৫৬. যে ব্যক্তি আযানের সময় কথা বলে তার ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
৫৭. আলিমের দোয়াতের এক ফোঁটা কালি আল্লাহর নিকট একশত শহীদের ঘামের থেকে বেশি প্রিয়।
৫৮. আলিমের নিদ্রা ইবাদত।
৫৯. আহারকারীর উপরে কোনো সালাম নেই।
৬০. জাবিরের (রা) দাওয়াতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু পুত্রকে জীবিত করেন।
৬১. রাসূলুল্লাহ ﷺ পাদুকা খুলে আরশে যাওয়া, আরশে পবিত্র কদম রাখা, আরশে দাঁড়ানো বা বসা..... ।
৬২. মিরাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জুতা পরিহিত অবস্থায় আরশে পৌছালেন, তখন আরশ শান্ত হয়, এর আগে আরশ অস্থির ছিল ..... ।
৬৩. আলী ও ফাতিমা ﷺ হাসান-হুসাইনকে এক ফকীরকে দান করেছিলেন।
৬৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে গমন, ও উকাশার প্রতিশোধ গ্রহণ... ।
৬৫. বিলাল (রা)-এর একটি কাহিনী ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তিনি মদীনা থেকে চলে যান। পুনরায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্বপ্নে দেখে মদীনায় আগমন করেন। ... আযান দেন...ইত্যাদি।
৬৬. সালাতুর রাগাইব বিষয়ক হাদীস, রজব মাসের বিভিন্ন রাতের সালাত বিষয়ক হাদীস, ২৭ রজব রাত্রির সালাত, মধ্য শাবানের রাত বা শবে বরাতের রাতে ১০০ রাক'আত সালাত, প্রত্যেক রাকআতে ১০ বার করে সূরা ইখলাস পাঠ- এগুলি সবই জাল।
৬৭. মুজিযায়ে কদম শরীফ- পাথর মোম হয়ে পায়ের চিহ্ন ধারণ করা... ।
৬৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মি'রাজ শরীফে তাশরীফ আনেন, তখন বড় পীর সাহেব কাঁধ বাড়িয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে মুহিউদ্দিন, যাও, তোমার পা সকল ওলীদের কাঁধের উপর। এটি সম্পূর্ণ অসত্য। যে এ গল্প বানিয়েছে সে মালঊন-অভিশপ্ত।
৬৯. আবূ দুজানার তদবীর... ।
৭০. বিধবা দ্বিতীয় বিবাহ করলে সে আখিরাতে লাইলি মজনুর বিবাহ দেখতে পারবে না। ... আখিরাতে লাইলি-মজনুর বিবাহ হবে... ।
৭১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র দাঁত উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়, তখন তিনি হালুয়া খেয়েছিলেন। এজন্য 'শবে বরাতে' হালুয়া পাকানো উচিত।...
৭২. রাসূলুল্লাহ ﷺ "গযল" বা সামা-সঙ্গীত শ্রবণ করেন এবং এ সময়ে "হাল" বা "ইশকের উন্মত্ততা"-র অবস্থায় তিনি তাঁর পবিত্র চাদর ছিড়ে বণ্টন করে দেন.... ইত্যাদি কাহিনী সবই জাল ও বানোয়াট।[২৯৫]

**৯. ২. ২. যে সকল মত, বিশ্বাস বা কর্মকে ভিত্তিহীন বলেছেন**

সমাজে অনেক বিশ্বাস, কর্ম বা ধারণা বিদ্যমান যার কোনো ভিত্তি কুরআন, হাদীস বা ফিকহে পাওয়া যায় না। আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর গ্রন্থের শেষে **"কিছু ভিত্তিহীন কথা"** শীর্ষক পরিচ্ছেদে এ জাতীয় অনেক কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. পাখা টানতে টানতে যদি শরীরে লাগে তবে সে জমীনে টোকা দেওয়া।
২. হাসিঠাট্টা বা মশকরাচ্ছলে যদি কেউ ছুরি বা কাটারি দিয়ে কাউকে খোঁচা দেয় তাহলে সেটিকে মাটিতে ঠেকানো বা ঠোকা জরুরী। এটিও ভিত্তিহীন কথা। এরূপ করা না-জায়েয।
৩. যদি কোন লোক কাজে আসার সময় হাঁচি দেয় তাহলে সাধারণ মানুষ একে অযাত্রা বা অশুভ বলে ধারণা করে। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা।
৪. যদি কারো কথা বলার সময়, অথবা কোনো কাজ করার সময় টিকটিকি শব্দ করে তাহলে সাধারণ মানুষেরা বলে, টিকটিকি এ কাজ বা কথাটি ঠিক বলে জানাচ্ছে। তারা বুঝাতে চান যে, এ কাজটি বা কথাটি সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক, তাই টিকটিকি এর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ বিশ্বাস পোষণকারী কঠিন গোনাহগার হবেন।
৫. মহিলারা ধারণা করে যে, সৃষ্টিগতভাবে জোড়া ফল ভক্ষণ করলে জোড়া বা যমজ সন্তান হয়। এটা বিলকুল ভ্রান্ত কথা।
৬. খাদ্য বা পানীয় শ্বাসনালীতে, তালুতে বা নাকের মধ্যে চলে গেলে সাধারণ মানুষেরা বলে যে, কেউ তাকে স্মরণ করছে। এটা একেবারে ভুল কথা।
৭. কারো নাম নেওয়ার সময় সে যদি উপস্থিত হয়ে যায় তবে সাধারণ লোক বলে তোমার হায়াত বৃদ্ধি পাবে। এটা বিলকুল মিথ্যা ও

বাতিল কথা ।

৮. প্রচলিত: রবিবার বাঁশ কাটা যাবে না । এদিন বাঁশ কাটলে ঠাকুরের অভিশাপ বা বদ-দোয়ায় আক্রান্ত হতে হবে । এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । এরূপ কথায় বা বিশ্বাসে ঈমান চলে যাওয়ার ভয় আছে ।

৯. প্রচলিত: যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় তবে চল্লিশ দিন পর কোন আলিম ডেকে তার রুহ বাহির করতে হয়, অন্যথায় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে । এটা সম্পূর্ণ না-জায়েয ও বিদআত কথা ।

১০. ক্ষেতক্ষামার ও ফসলের হেফাযতের জন্য সাধারণ লোক ক্ষেতের মাঝখানে হাড়িতে চুন ইত্যাদি দিয়ে মানুষের আকৃতি তৈরি করে । এটি ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা । এতে ছবি বানানোর জন্য গুনাহগার হবে ।

১১. প্রচলিত: রাস্তায় চলার সময় খালি কলস দেখা অথবা সাপ বা শৃগাল ডান দিক থেকে বাম দিকে যেতে দেখাকে অযাত্রা বা অশুভ বলে মনে করা । এটা ভিত্তিহীন কথা । এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী গুনাহগার হবে ।

১২. প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, যদি মুক্তাদী পাগড়ি মাথায় সালাত আদায় করে এবং ইমাম শুধু টুপি পরিধান করে সালাত আদায় করে তবে মুক্তাদীর সালাত মাকরুহ হয়ে যাবে । এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা । ....

১৩. সাধারণের মাঝে প্রচলিত আছে যে, স্বামী তার স্ত্রীর জানাযার খাঁটিয়া ধরতে পারবে না । এটি একেবারে ভিত্তিহীন কথা । খাটিয়া ধরার ক্ষেত্রে অন্য সকলের চেয়ে স্বামীর দায়িত্ব ও অধিকার সবচেয়ে বেশি ।

১৪. সাধারণের মাঝে প্রচলিত আছে যে, সতর খোলা অবস্থায় দেখলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায় । এটিও ভুল কথা ।

১৫. প্রচলিত আছে যে, মৃতদেহ যতক্ষণ বাড়িতে থাকবে ততক্ষণ আত্মীয়-স্বজন বা অন্যদের জন্য খানাপিনা নিষিদ্ধ । এটি ভিত্তিহীন কথা ।

১৬. মহিলাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, সালাত আদায়ের পর জায়নামাযের প্রান্ত অবশ্যই উল্টিয়ে দিতে হবে । অন্যথ্যায় শয়তান সেখানে সালাত আদায় করবে (!) শরীয়তে এ কথার কোনো ভিত্তি নেই ।

১৭. প্রচলিত আছে, স্বামী-স্ত্রী এক পাত্রে দুধ পান করা নিষিদ্ধ; এতে তারা পরস্পরে দুধভাই-বোন হয়ে যায় । এটি ভিত্তিহীন ভ্রান্ত কথা ।

১৮. ওযু করে শুকর দেখলে ওযু ভেঙ্গে যায় । এটি ভুল কথা ।

১৯. অন্ধকারে সালাত আদায় জায়েয নয় । এটা ভুল । তবে এতটুকু খেয়াল করা আবশ্যক যে, কিবলাহ থেকে অন্য দিকে মুখ না হয়ে যায় ।

২০. পেঁচা বা অমুক প্রাণী ডাক দিলে বালা-মুসিবত নাযিল হয় । ভ্রান্ত কথা ।

২১. প্রসিদ্ধ আছে যে, মহিলাদের জন্য নিজের পীর থেকে পর্দা করা জরুরী নয় । এটিও ভ্রান্ত কথা ।

২২. দেখা যায় যে, অনেক মানুষ সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে এসে প্রথমে বসে পড়ে, এরপর সালাত আদায় শুরু করে । এমনকি নিকটবর্তী কোনো স্থান থেকে আসলেও বা ক্লান্ত না হলেও এভাবে মসজিদে ঢুকে প্রথমে বসে পড়ে এরপর সালাতে দাঁড়ায় । শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই । (মসজিদে প্রবেশ করে কিছু সালাত আদায় না করে বসে পড়া সুন্নাতের খেলাফ । হাদীস শরীফে মসজিদে ঢুকে কোনো সালাত আদায় না করে বসে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে ।)

২৩. প্রচলিত: যদি গোশতের সাথে হাড় না থাকে তাহলে তা খাওয়া জায়েয নয় । এটা ভুল কথা ।

২৪. প্রচলিত: নুন পড়ে গেল পাঁপড়ি দিয়ে উঠাতে হয় । এটিও ভুল কথা ।

২৫. প্রচলিত: কুকুর কাঁদলে বালা-মুসিবত ছড়ায় । এটা ভুল কথা ।

২৬. নির্দিষ্ট কোনো কোনো দিন বা তারিখে সফর করাকে সাধারণ মানুষ ভাল বা মন্দ বলে ধারণা করে । এটিও বাতিল ধারণা ।

২৭. যে ব্যক্তি জবাই করে তার গোনাহ ক্ষমা হয় না । ভিত্তিহীন ভ্রান্ত কথা ।

২৮. কিছু মানুষ সালাম দেওয়ার সময় কপালে হাত রাখে অথবা সামান্য ঝুকে যায় এবং মুসাফাহা করার সময় বুকে হাত রাখে (মুসাফাহা করার পরে হাতটি বুকে রাখে) । এগুলি সব শরীয়ত বিরোধী কাজ ।

২৯. প্রচলিত আছে যে, রাতে ঝাড়ু দেওয়া, ফুঁক না দিয়ে বাতি নিভানো এবং চুল আঁচড়ানো নিষিদ্ধ । এ সব ভ্রান্ত কথা ।

৩০. বলা হয় যে, কুরআন শরীফ কিছু কিছু স্থান (মাঝে না থেমে) মিলিয়ে পড়লে কাফির হয়ে যায় এবং সুরা ফাতিহার কিছু অক্ষর (আগের শব্দে সাথে) মিলালে শয়তানের নাম হয়ে যায় । এও ভিত্তিহীন কথা । অবশ্য তাজবীদের খেলাফ হলে গুনাহগার হবে, কিন্তু কাফির হয়ে যাওয়া এবং শয়তানের নাম বানানো বাড়াবাড়ি ।[২৯৬]

**৯. ২. ৩. যে সকল বই পড়তে নিষেধ করেছেন**

আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী জাল হাদীস নির্ভর ও ইসলামি আকীদা বিরোধী গ্রন্থাদির একটি তালিকা দিয়ে সেগুলি পাঠ না করতে বা সতর্কতার সাথে পড়তে পরামর্শ দিয়েছেন । এ সকল গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

তাফরীজুল খাতির ফী মানাকিবিশ শাইখ আব্দুল কাদির, ফাতাওয়া সূফীয়্যাহ, আল-মুবতাদা ওয়া কাসাসুল আম্বিয়া, কিতাবুল

আউলিয়া, ইমাম যামাখশারী রচিত তাফসীর আল-কাশ্‌শাফ, ইমাম দাইলামী সংকলিত হাদীস গ্রন্থ আল-ফিরদাউস, ইমাম হাকিম নিসাপূরী সংকলিত হাদীস গ্রন্থ আল-মুসতাদরাক, মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ আল-কুদায়ী সংকলিত হাদীস-গ্রন্থ "আশ শিহাব" বা "মাউদূআত আল-কুদায়ী", ইবনু ওয়াদআন সংকলিত হাদীস গ্রন্থ "আল-আরবাঊন আল-ওয়াদআনিয়্যাহ, আলী (রা)-এর বাণীমালা বলে কথিত "নাহজুল বালাগা" গ্রন্থ, কালবীর তাফসীর গ্রন্থ, মুকাতিল ইবনু সুলাইমানের তাফসীর, ইবনু ইসহাকের মাগাযী গ্রন্থ, ওয়াকিদীর মাগাযী গ্রন্থ, বদরে মুনিরের কাহিনী, আন্দরসভা, শাহ ইয়ামানের গল্প, দাস্তানে আমীর-ওমরা, গুলে বকাওলী, আলিফ লাইলা, নকশে সুলাইমানী, ফালনামা, কেস্‌সায়ে মাহে রামযান, মুজিযায়ে আলে নবী, চেহেল রেসালা, ওফাত নামা, জঙ্গনামা হযরত আলী, জঙ্গনামা মুহাম্মাদ হানুফা, হাজার মাসআলা, গুলদশতায়ে মেরাজ, নাত হি নাত, দিওয়ানে লুতফ, দুআ গঞ্জল আরশ, আহাদ নামা, মৌলুদে দেলপযীর, মৌলূদে দেলপসন্দ, মৌলুদে সাদী, মৌলুদে শহীদী ইত্যাদি মীলাদ বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থ, নাফেউল খালাইক, মীর মশারফ হোসেন প্রণীত বিষাদসিন্ধু, আমীর হামযা, জীগোন, সোনাভান, সমর্থভান, জঙ্গনামা, মালিকা আকার, কালুগাযী, আব্দুল আলী, লাইলী-মজনু ইত্যাদি বাংলা ভাষায় লিখিত পুথি, কাদিয়ানী, শীয়া, আর্য সমাজ ও ফকীর সম্প্রদায়ের লিখিত গ্রন্থাদি... ।[২৯৭]

**৯. ২. ৪. যে সকল বইয়ের হাদীস জাল বলেছেন**

আমরা দেখেছি, আল্লামা রুহুল আমিন বারংবার উল্লেখ করেছেন, হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, বুজুর্গ বা গ্রন্থের বিচার না করে হাদীসের সনদ ও মুহাদ্দিসগণের যাচইয়ের উপর নির্ভর করতে হবে। কোনো বুজুর্গের উদ্ধৃতি বা মতের কারণে যেমন জাল হাদীসকে গ্রহণ করা যায় না; তেমনি কোনো গ্রন্থে কিছু জাল হাদীস বিদ্যমান থাকার কারণে গ্রন্থটির নিন্দা করা যায় না। বরং জাল হাদীসকে জাল বলার পাশাপাশি আলিম ও বুজুর্গগণের সম্মান করতে হবে এবং তাদের গ্রন্থাদি পাঠ করতে হবে। বস্তুত এটিই তাবিয়ীগণের যুগ থেকে উম্মাতের সকল ইমাম ও আলিমের মূলনীতি। আল্লামা আবূ জাফর সিদ্দিকীও এ মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। তিনি জাল হাদীস চিহ্নিতকরণে গ্রন্থকারের মর্যাদা বা বুজুর্গি বিবেচনা করেন নি। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ে প্রসিদ্ধ যে সকল গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান জাল হাদীস তিনি চিহ্নিত করেছেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে:

**৯. ২. ৪. ১. সুনান ইবন মাজাহ**

সুনান ইবন মাজাহর একটি হাদীস তিনি জাল বলে উল্লেখ করেছেন: "যার রাতের সালাত অধিক হবে দিবসে তার চেহারা সৌন্দর্যময় হবে" ।[২৯৮]

**৯. ২. ৪. ২. আল-ফিরদাউস ও মুসনাদুল ফিরদাউস**

ইমাম আবূ শুজা শীরওয়াইহি দাইলামী (৪৪৫-৫০৯হি) রচিত 'আল-ফিরদাউস' ও তাঁর পুত্র আবূ মানসূর শাহরদাদ দাইলামীর (৪৮৩-৫৫৮ হি) "মুসনাদুল ফিরদাউস" নামক গ্রন্থের অনেক হাদীস তিনি জাল বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন: 'আরাফার দিনের সিয়াম ষাট বছরের সিয়ামের মত', 'যখন মুআবিয়াকে মিম্বারের উপরে দেখবে তখন তাকে হত্যা করবে', 'গাধা ও যে সকল পশুর মাংস খাওয়া বৈধ তাদের পেশাবে কোনো অসুবিধা নেই', 'হে জিবরীল, ইলমে বাতিন হলো, আমার ও আমার প্রিয়পাত্র ও অলীগণের মধ্যকার গোপন বিষয়। আমি তা তাদের অন্তরের মধ্যে প্রদান করি। কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা বা কোনো নবী-রাসূলও তা জানতে পারেন না'... ইত্যাদি ।[২৯৯]

**৯. ২. ৪. ৩. 'আল-জামি আস-সাগীর ও কানযুল উম্মাল**

ইমাম সুয়ূতীর (৯১১ হি) 'জামি সাগীর' ও 'জামি কাবীর' হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এর উপর ভিত্তি করে প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম আল্লামা আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী (৯৭৫ হি) 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সহীহ ও যয়ীফ হাদীসের পাশাপাশি জাল হাদীস বিদ্যমান। আল্লামা আবূ জাফর সিদ্দিকী এ গ্রন্থগুলির অনেক হাদীস জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। যেমন: 'আমি এবং এ ব্যক্তি (আলী রা) কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের উপর প্রমাণ', 'সুলাইমান (আ)–এর আংটির নকশা বা খোদিত কথা ছিল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ', 'তোমরা আলিমদের অনুসরণ করবে; কারণ তারা দুনিয়ার প্রদীপ ও আখিরাতের বাতি', 'এক মুসলিমের বিরুদ্ধে আরেক মুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে; তবে এক আলিমের বিরুদ্ধে আরেক আলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না; কারণ তারা হিংসুক', 'এক মুহূর্ত ইলম সন্ধান সারারাত সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম এবং একদিন ইলম সন্ধান তিন মাস সিয়াম পালন থেকে উত্তম', 'ইলম সন্ধান করা আল্লাহর নিকট সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে উত্তম' ... ইত্যাদি ।[৩০০]

**৯. ২. ৪. ৪. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন**

ইমাম গাযালীর (৫০৫ হি) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের অনেক হাদীস আবূ জাফর সিদ্দিকী জাল বলেছেন। যেমন 'একজন আলিমের মাজলিসে উপস্থিত হওয়া এক হাজার জানাযায় শরীক হওয়া থেকে, এক হাজার রাকআত সালাত থেকে, এক হাজার হজ্জ এবং এক হাজার জিহাদ-যুদ্ধাভিযান থেকে উত্তম', 'সমূদ্রের মধ্যে পৃথিবী ভূপৃষ্ঠের মধ্যে একটি আস্তাবলের মত', 'পিতামাতার খেদমত সালাত,

সিয়াম, হজ্জ, উমরা ও আলাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা উত্তম', 'মসজিদের মধ্যে কথাবার্তা নেকী বা সাওয়াব খেয়ে ফেলে যেমন, জীবজানোয়ার ঘাস খেয়ে ফেলে', 'আলিমের নিদ্রা ইবাদত', 'আমার আকাশ ও আমার যমীন আমাকে ধারণ করার প্রশস্ততা পায় নি; কিন্তু আমার মুমিন বান্দার অন্তর আমাকে ধারণের প্রশস্ততা পেয়েছে'... ইত্যাদি।[৩০১]

**৯. ২. ৪. ৫. তাফসীর কাশ্‌ফাফ**

আল্লামা যামাখশারী (৫৩৮ হি) রচিত তাফসীরুল কাশ্‌ফাফ গ্রন্থে উদ্ধৃত কয়েকটি হাদীস আবু জাফর সিদ্দিকী জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। যেমন 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বংশধর-পরিজনের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।'[৩০২]

**৯. ২. ৪. ৬. গুনইয়াতুতালিবীন**

শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী (৫৬১ হি) রচিত 'গুনইয়াতুত তালিবীন' গ্রন্থের বিভিন্ন হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন আল্লামা আবূ জাফর সিদ্দিকী। যেমন 'সাপ্তাহের প্রতি দিন ও রাতের সালাত বিষয়ক হাদীস... জুমুআর রাতে ১২ রাকআত সালাত ১০ বার করে সূরা ইখলাস .... । এ প্রকারের হাদীস বাতিল।...', 'দশবার- অন্য বর্ণনায় ৫০ বার- করে সূরা যিলযাল দিয়ে দু রাকআত ...এ হাদীস মুনকার ও বাতিল.', 'যে ব্যক্তি রজব মাসে একদিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার জন্য এক হাজার বৎসরের সিয়াম লিপিবদ্ধ করবেন', 'আলাহ আশূরার দিন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন', 'আল্লাহ আরশ সৃষ্টি করেন আশুরার দিনে, কুরসী সৃষ্টি করেন আশুরার দিনে, কলম সৃষ্টি করেন আশুরার দিনে, জান্নাত সৃষ্টি করেন আশুরার দিনে, আদমকে জান্নাতে অবস্থান করান আশুরার দিনে... লম্বা ফিরিস্তির শেষে বলেন ... রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মলাভ করেন আশুরার দিনে, আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন আশুরার দিনে এবং কিয়ামত দিবস হবে আশুরার দিনে' .... ইত্যাদি।[৩০৩]

**৯. ২. ৪. ৬. হেদায়া**

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আলামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (৫৯৩ হি.) রচিত 'হেদায়া' গ্রন্থের কয়েকটি হাদীস আবূ জাফর সিদ্দিকী জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলির মধ্যে রয়েছে: 'ক্রীতদাসের নিরাপত্তা নিরাপত্তা', দিবসের সালাত বোবা', 'তিন বার করে কুলি করা ও নাকের মধ্যে পানি দেওয়া নাপাক ব্যক্তির জন্য (ফরয গোসলের ক্ষেত্রে) ফরয', 'একজন মুসলিমের উপর খারাজ ও উশর একত্রিত হয় না', ইত্যাদি।[৩০৪]

**৯. ২. ৪. ৭. তাফসীর কাবীর**

ইমাম ফাখরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন উমার রাযী (৬০৬ হি) রচিত 'তাফসীর কাবীর' গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান কিছু হাদীস আবূ জাফর সিদ্দিকী জাল বলেছেন, যেমন: 'আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম...', 'যে নিজেকে চিনল সে তার রব্বকে চিনল', 'আল্লাহ আমার অন্তরে যা নিক্ষেপ করেন তাই আমি আবূ বাকরের অন্তরে নিক্ষেপ করি'.. ইত্যাদি।[৩০৫]

**৯. ২. ৪. ৮. তাফসীর বাইযাবী**

আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বাইযাবী (৬৮৫ হি) রচিত তাফসীর বাইযাবী বা আনওয়ারুত তানযীল গ্রন্থের বিভিন্ন হাদীস জাল বলে উল্লেখ করেছেন আবূ জাফর সিদ্দিকী। বিশেষত কুরআনের প্রতিটি সূরার ফযীলতে বর্ণিত হাদীস। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "কুরআনের সূরাগুলির ফযীলতে বর্ণিত হাদীস এবং যে ব্যক্তি অমুক সূরা পাঠ করবে তার জন্য অমুক-তমুক সাওয়াব রয়েছে... এভাবে কুরআনের প্রথম সূরা থেকে শেষ সূরা পর্যন্ত সূরাগুলির ফযীলতে বর্ণিত হাদীস জাল। এ জাল হাদীস সা'লাবী ও ওয়াহিদী প্রত্যেক সূরার শুরুতে উল্লেখ করেছেন। আর যামাখশারী প্রত্যেক সূরার শেষে উল্লেখ করেছেন। বাইযাবী এবং আবুস সাউদ মুফতী এভাবেই যামাখশারীর অনুসরণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেছেন: আমার ধারণা যিন্দীকগণ এ হাদীসগুলিকে জাল করেছে। এ হাদীসের জালিয়াত নিজেই তার জালিয়াতির কথা স্বীকার করেছে এবং বলেছে: আমি মানুষদেরকে ... কুরআনের মধ্যে ব্যস্ত রাখার জন্য এগুলি জাল করেছি।"[৩০৬]

**৯. ২. ৪. ৯. শারহুল আকায়িদ আন-নাসাফিয়্যাহ**

আলামা মাসউদ ইবন উমার সাদুদ্দীন তাফতাযানী (৭৯৩ হি) রচিত 'শারহুল আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ' গ্রন্থের নিম্নের হাদীসটি জাল বলে চিহ্নিত করেছেন আবূ জাফর সিদ্দিকী: 'আলিম বা তালিব ইলম যখন কোনো গ্রাম-মহল্লা দিয়ে গমন করেন তখন আল্লাহ সে গ্রাম বা মহল্লার গোরস্থানের আযাব ৪০ দিনের জন্য তুলে নেন।"[৩০৭]

**৯. ২. ৪. ১০. আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যাহ**

আল্লামা নূরুদ্দীন আলী হালাবী (১০৪৪ হি) রচিত 'ইনসানুল উয়ূন ফী সীরাতিল আমীন আল-মামূন' বা সীরাহ হালাবিয়্যাহ গ্রন্থের বিভিন্ন হাদীস জাল বলে চিহ্নিত করেছেন আবু জাফর সিদ্দিকী। যেমন: 'বেলাল আযানের মধ্যে শীন অক্ষরকে সীনরূপে উচ্চারণ করতেন', 'বিলালের সীন আল্লাহর কাছে শীন', 'পাকস্থলী রোগব্যধির আবাসস্থল .....'... ইত্যাদি।[৩০৮]

**৯. ২. ৪. ১১. তাফসীর রুহুল বায়ান**

আল্লামা আবুল ফিদা ইসমাঈল হাক্কী (১১২৭ হি) রচিত 'তাফসীর রুহুল বায়ান' গ্রন্থের বহুসংখ্যক হাদীসকে আল্লামা আবূ জাফর জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুত ইসমাঈল হাক্কী ও আবূ জাফর সিদ্দিকী দুজনই প্রসিদ্ধ সূফী। তবে তাসাউফের দুপ্রান্তে তাদের অবস্থান। আল্লামা হাক্কী কাশফ বা বুজুর্গদের অজুহাতে অগণিত জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লামা আবূ জাফর সিদ্দিকী হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে কাশফ বা বুজুর্গের মতের গুরুত্ব প্রদানের কঠোর বিরোধিতা করেছেন। রুহুল বায়ান গ্রন্থের যে সকল হাদীস জাল বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে: 'আমার উম্মাতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত', 'আমি আল্লাহ থেকে এবং মুমিনগণ আমা থেকে', 'আমি ও আবূ বকর প্রতিযোগিতার দুটি ঘোড়ার মত', 'দারিদ্র আমার গৌরব এবং আমি তারই অহংকার করি', 'মুমিনের অন্তর (কালব) আল্লাহর গৃহ', 'আমাকে যখন মি'রাজে নেওয়া হলো তখন প্রথম আসমানে আমি সবুজ ঝুটি ও সাদা পালক ওয়ালা একটি মোরগ দেখলাম ...', 'যে ব্যক্তি আলিমগণের সাথে সাক্ষাত করল সে যেন আমার সাথেই সাক্ষাত করল...', 'যে ব্যক্তি আমাকে সফর মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করবে আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করব', 'তোমরা মৃত্যু বরণ কর তোমাদের মৃত্যুর আগেই', 'তুমি না হলে আমি মহাকাশসমূহ (বিশ্ব) সৃষ্টি করতাম না'... ইত্যাদি।[৩০৯]

**৯. ২. ৪. ১২. কাসিদা- ই- নু'মান**

'কাসিদা- ই- নু'মান' একটি আরবী কাব্য, যা ইমাম আবূ হানীফা (১৫০ হি) রচিত বলে প্রচারিত। যতটুক বুঝা যায় ১২০০ হিজরীর (১৭৮০/৮৫ খৃস্টব্দের) দিকে তুরস্কে এ পুস্তকাটির কথা প্রথম শোনা যায়। এরপর তুরস্কে ও ভারতে কেউ কেউ এটি মুদ্রণ করেন এবং কেউ কেউ তুর্কি, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন। এর আগে প্রায় হাজার বছর ধরে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর জীবনীকারগণ কেউ তাঁর এ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন নি। তাবিয়ী-যুগের কাব্য, শব্দব্যবহার ও ভাষাশৈলীর সাথে যাদের সামান্যতম পরিচয় আছে তারা অতি সহজেই বুঝেন যে, এ কাসীদা কখনোই ইমাম  রচিত নয়। এ কবিতার মধ্যে অনেক জাল হাদীস বিদ্যমান। যেমন 'আপনি না হলে বিশ্ব সৃষ্টি করতাম না', 'জাবিরের মৃত সন্তানদের জীবিত করা' ইত্যাদি। আবূ জাফর সিদ্দিকী এগুলোকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[৩১০]

**৯. ৩. মাওলানা আবদুল মালেক ও মুতিউর রহমান**

শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক বর্তমান বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ হাদীস বিশেষজ্ঞ। তাঁর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় মাওলানা মুতীউর রহমান-এর রচিত "প্রচলিত জাল হাদীস" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৪২৪ হিজরী (২০০৩ খৃ) সালে। দেশের কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ আলিম গ্রন্থটির সমর্থন ও প্রশংসায় বাণী প্রদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়ার তত্ত্বাবধায়ক শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী, বাইতুল মুকাররামের খতীব আল্লামা উবাইদুল হক্ক, হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা আহমদ শফী, পটিয়া মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা হারূন ইসলামাবাদী।

গ্রন্থটির ভূমিকায় জাল হাদীস বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলো আলোচনা করা হয়েছে। জাল হাদীসের পরিচয়, হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের নীতিমালা, এ বিষয়ে কাশফ, ইলহাম, স্বপ্ন, বুজুর্গগণের বক্তব্য ইত্যাদির উপর নির্ভরতার ভয়াবহ পরিণতি, মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি বর্জন করে শুধু আকল-বিবেক বা যুক্তি দিয়ে হাদীস যাচাইয়ের ধ্বংসাত্মক প্রবণতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এরপর প্রচলিত প্রায় ৭০টি জাল হাদীস আলোচনা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. আমি মীম বিহীন আহমাদ, আইন বিহীন আরব
২. ভক্তি থাকলে পাথরেও মুক্তি মেলে ...
৩. মিরাজের নব্বই হাজার কালাম লাভ...
৪. আপদ বিপদে কবরবাসীর নিকট সাহায্য চাও..
৫. দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর
৬. ইলম অন্বেষণে সত্তর নবীর সওয়াব...
৭. আলিমের চেহারার দিকে তাকানোর/ সাক্ষাত/ মুসাফাহার সাওয়াব
৮. আলিমের মজলিস হাজার রাকাআত নফল নামায থেকেও উত্তম
৯. একজন আলিমকে সম্মান করা সত্তর জন নবীকে সম্মান করা ...
১০. আলিমের পিছনে নামায যেন নবীর পিছনে নামায...

১১. আলিমের পিছনে নামায পড়ায় ৪৪৪৪ গুণ সওয়াব ...
১২. এ উম্মতের আলিম বনী ইসরাঈলের সমতুল্য
১৩. আলিম ও তালেবে ইলমের বরকতে কবরের আযাব মাফ...
১৪. শবে বরাতের গোসলের সাওয়াব ...শবে কদরের গোসল ...
১৫. আযানের সময় কথা বললে ৪০ বছরের নেকী নষ্ট হয়ে যায় ...
১৬. আংটি পরে নামায পড়ার ফযীলত...
১৭. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাঁচ প্রকার সওয়াব
১৮. পাগড়ীসহ দু'রাকাআতে ৭০ রাকাআত
১৯. বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাআতে ৭০ রাকাআত
২০. প্রতি বছর ৬ লাখ হাজীর হজ্ব পালন
২১. সপ্তাহের দিবারাত্রের নফল নামায
২২. মুমিনের ঝুটা ওষুধ... মুমিনের থুথু ওষুধ
২৩. লবণের মাঝে ৭০ রোগের ওষুধ
২৪. নখ কাটার নিয়ম
২৫. যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান
২৬. যে নিজকে চিনল সে রবকে চিনল
২৭. প্রতি ৪০ জনে একজন ওলী
২৮. মরার আগে মর
২৯. মায়্যিতের জন্য খতমে তাহলীল..
৩০. মেরাজে জিবরাঈল (আ) এর সঙ্গ ত্যাগ...
৩১. জুতা নিয়ে আরশ গমন...
৩২. আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না
৩৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া না থাকা প্রসঙ্গ
৩৪. নূরে মুহাম্মাদী সম্পর্কিত জাল হাদীসগুলি .... ।

### ৯. ৪. আলাম্মা জুনাইদ বাবুনগরী ও যাকারিয়া হাসানাবাদী

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল উলূম মাদ্রাসার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আলাম্মা মুহম্মাদ জুনাইদ বাবুনগরীর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় চট্টগ্রামের অন্য প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা জামেয়া বাবুনগরের উসতাদ মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসানাবাদীর সংকলন ও সম্পাদনায় "প্রচলিত জাল হাদীস: একটি তাত্ত্বিক আলোচনা" নামে একটি গ্রন্থ ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। দেশের কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ আলিম গ্রন্থটির সমর্থন ও প্রশংসায় বাণী প্রদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পটিয়া মাদরাসার উসতাদ আল্লামা মুহাম্মদ ইছহাক আল-গাজী, বাবুনগর মাদরাসার উসতাদ আল্লামা মুহাম্মদ ইউনুস, জামেয়া দারুল মাআরিফের পরিচালক আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদবী, বাবুনগর মাদ্রাসার মুহতামিম আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ, বাবুনগর মাদরাসার মুফতী আল্লামা মাহমুদ হাসান প্রমুখ।

গ্রন্থটির শুরুতে জাল হাদীস বিষয়ক কিছু মূলনীতি আলোচনা করার পর সংকলক প্রায় ২০০ টি জাল হাদীস আলোচনা করেছেন। যেমন:

১. চল্লিশ বৎসরের আগে কোনো নবীই নুবুওয়াত পান নি।
২. নবীগণ পথপ্রদর্শক, ফকীহগণ নেতা এবং তাঁদের মাজলিস বৃদ্ধিকর।
৩. দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের মূল।
৪. মানুষ তাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের ধর্মের উপর চলে।
৫. তোমরা মৃত্যুর আগেই মৃত্যুবরণ কর।
৬. আরবগণ অনারবগণের নেতা।
৭. নেককারগণের আলোচনা হলে রহমত নাযিল হয়।
৮. নারীগণ গৃহের প্রদীপ কিন্তু তোমরা তাদেরকে জান না।
৯. দরিদ্র মুসলিমগণ ধনীদের ৪০ বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।
১০. গরিবগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।
১১. শুক্রবারে নখ কাটলে পরের শুক্রবার পর্যন্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাবে।
১২. প্রতি শুক্রবার পিতামাতার কবর যিয়রাত করে ইয়াসীন পাঠ .... ।
১৩. পাত্র ধৌত করা এবং আঙ্গিনা পরিষ্কার করা ধন-দৌলত বৃদ্ধি করে।

১৪. আস-সালাতু ইমাদুদ্দীন: নামায দীনের খুঁটি.... ।
১৫. ইমামতিতে ধাক্কা-ধাক্কি কিয়ামতের আলামত ।
১৬. যার চেহারা সবচেয়ে সুন্দর সে ইমামতি করবে ।
১৭. যোহরের আগে চার রাকাআত নিয়মিত না পড়লে শাফাআত মিলবে না ।
১৮. জুমুআর সালাত দরিদ্রদের হজ্জ ।
১৯. স্ত্রী তার স্বামীর কাপড় ধুলে আল্লাহ তার জন্য দু হাজার নেকি লিখেন... ।
২০. খাওয়ার সময় জুতা খোলা সুন্দর সুন্নাত... ।
২১. রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর জন্মের পূর্বে আসিয়া, মরিয়ম প্রমুখের আগমন... ।

## ১০. জাল হাদীসের পক্ষে ওকালতি

আমরা দেখেছি যে, তাবিয়ীগণের যুগ থেকেই জাল হাদীসের পক্ষে জালিয়াতগণ বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করত। এ সকল যুক্তি তারা লিখিতভাবে উল্লেখ করত না, তবে মুখে বলে তাদের অনুসারীদের বুঝাতো। তাদের অবস্থা ছিল অনেকটা আমাদের সমাজের সূফী নামধারী "মারফতী" ফকীরদের মত, যারা যিকর-এর নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হন। তারা তাদের এ কর্মের পক্ষে অনেক যুক্তি পেশ করেন; তবে কেউই লিখিতভাবে তাদের অপকর্মের স্বীকৃতি দেন না এর পক্ষের যুক্তিগুলি লিখেন না। জালিয়াতদের অবস্থাও ছিল একইরূপ।

জাল হাদীস বিষয়ক অবহেলা ও অসতর্কতা এত ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিগত কয়েক শতকে কোনো কোনো আলিম জাল হাদীস প্রচারের পক্ষে ওকালিত করছেন। এরূপ একজন প্রসিদ্ধ আলিম আল্লামা আবুল ফিদা ইসমাঈল হাক্কী ইবনু মুসতাফা ইসলামবূলী (মৃত্যু ১১২৭ হি/১৭১৫ খৃ)। তিনি  দ্বাদশ হিজরী শতকের (খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতক) একজন প্রসিদ্ধ তুর্কী আলিম ও সূফী ছিলেন। তিনি তুর্কী ও আরবী ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত "রূহুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন" গ্রন্থটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আল্লামা ইসমাঈল হাক্কীর এ বিশাল তাফসীর গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। অনেক সহীহ, হাসান ও যয়ীফ হাদীসের পাশাপাশি তিনি অনেক জাল হাদীসও উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থের জাল হাদীসগুলির বিষয়ে দুটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে: (১) জাল হাদীসের আধিক্য এবং (২) জাল হাদীসের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

واعلم أن الأحاديث التي ذكرها صاحب الكشاف في أواخر السورة وتبعه القاضي البيضاوي والمولى أبو السعود رحمهم الله من أجلة المفسرين قد أكثر العلماء القول فيها فمن مثبت ومن ناف بناء على زعم وضعها كالإمام الصغاني وغيره واللائح لهذا العبد الفقير سامحه الله القدير أن تلك الأحاديث لا تخلو إما أن تكون صحيحة قوية أو سقيمة ضعيفة أو مكذوبة موضوعة فإن كانت صحيحة قوية فلا كلام فيها وإن كانت ضعيفة الأسانيد فقد اتفق المحدثون على أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب فقط... وإن كانت موضوعة فقد ذكر الحاكم وغيره أن رجلاً من الزهاد انتدب في وضع الأحاديث في فضل القرآن وسوره فقيل له فلم فعلت هذا فقال رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه فقيل له إن النبي ﷺ قال: من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"... فقال أنا ما كذبت عليه إنما كذبت له ... أراد أن الكذب عليه يؤدي إلى هدم قواعد الإسلام وإفساد الشريعة والأحكام وليس كذلك الكذب له فإنه للحث على اتباع شريعته واقتفاء أثره في طريقته.... قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب حرام فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً وواجب إن كان ذلك المقصود واجباً...وبالجملة المرء مخير في هذا الباب فإن شاء عمل بتلك الأحاديث بناء على حسن الظن بالأكابر حيث أثبتوها في كتبهم، ... وظاهر أنهم لا يضعون حرفاً إلا بعد التصفح الكثير، وإن شاء ترك العمل بها وحرم من منافع جمة ولا محاجة معه

"জেনে রাখ, কাশ্‌শাফের লেখক সূরাগুলির শেষে যে সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরদের মধ্যে কাযী বাইযাবী ও মৌলবী আবূস সাঊদ (রাহ) তাঁর অনুসরণ করেছেন এগুলির বিষয়ে আলিমদের অনেক কথা রয়েছে। কেউ এগুলি প্রমাণ করেছেন এবং কেউ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন যে, এগুলি জাল, যেমন ইমাম সাগানী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস। এ ফকীর বান্দার- আলাহ তাকে ক্ষমা করুন- নিকট এটিই প্রকাশিত যে, এ হাদীসগুলি হয় সহীহ শক্তিশালী, অথবা তা দুর্বল-রুগ্ন, অথবা তা জাল ও মিথ্যা। যদি সহীহ শক্তিশালী হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আর যদি যয়ীফ-রুগ্ন হয় তাহলে আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভয়প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা বৈধ।.... আর যদি জাল হয়, তবে হাকিম উল্লেখ করেছেন যে, একজন দরবেশ কুরআন ও তার সূরাগুলির ফযীলতে জাল হাদীস তৈরিতে লিপ্ত হয়। তাকে বলা হয়, আপনি কেন এ কাজ করলেন? তিনি বলেন, আমি দেখলাম যে, মানুষেরা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আমি তাদেরকে কুরআনের বিষয়ে আগ্রহী করার জন্য এ কাজটিকে ভাল মনে করলাম। তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমার উপর যে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে থাকতে হবে।" তিনি বলেন, আমি তো তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলি নি, বরং আমি তাঁর পক্ষে মিথ্যা বলেছি।" ... এ দরবেশের উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা বললে ইসলামের ভিত্তি ধ্বংস হয় এবং শরীয়ত ও দীনের আহকাম বিনষ্ট হয়; তাঁর পক্ষে মিথ্যা বললে তো আর তা হয় না; এরূপ মিথ্যা তো তাঁর শরীয়ত পালনের উৎসাহ দেওয়া ও তাঁর সুন্নাত অনুসরণের জন্য বলা হয়।....

শাইখ ইয্যুদ্দীন ইবনু আব্দুস সালাম বলেন: কথা উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম। যে সকল ভাল উদ্দেশ্য সত্যকথা বা মিথ্যাকথা উভয়ের মাধ্যমেই সাধন করা যায় সে উদ্দেশ্যের জন্য মিথ্যা হারাম। আর যদি সে উদ্দেশ্য মিথ্যা ছাড়া সত্য দিয়ে সাধন করা সম্ভব না হয় তাহলে মিথ্যা বৈধ, যদি উদ্দেশ্য সাধন বৈধ হয়। আর যদি উদ্দেশ্য সাধন জরুরী হয় তাহলে তার জন্য মিথ্যাও জরুরী। ... মোট কথা, এ সকল হাদীসের বিষয়ে মুসলিমের স্বাধীনতা আছে। ইচ্ছা করলে এগুলির উপর আমল করতে পারে, 'আকাবিরদের' উপর সুধারণার ভিত্তিতে; কারণ তারা তাদের গ্রন্থে এগুলি উল্লেখ করেছেন। ... বাহ্যত তারা অনেক গবেষণা ও যাচাই বাছাই করেই সেগুলি লিখেছেন। আবার ইচ্ছা করলে এগুলির উপর আমল পরিত্যাগ করতে পারে, এভাবে সে অনেক মহান কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে, এবং তার সাথে বিতর্ক নেই।[৩১১]

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কীর উপরের বক্তব্যে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(১) তিনি এ সকল হাদীসের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আলিমগণ এগুলির বিষয়ে মতভেদ করেছেন। বস্তুত এ সকল হাদীসের অধিকাংশের বিষয়ে আলিমগণের কোনো মতভেদ নেই। সকল মুহাদ্দিস একমত যে এগুলি জাল। পক্ষান্তরে যারা এগুলি সনদ-সহ বা সনদ-ছাড়া উল্লেখ করেছেন তাদের একজনও বলেন নি যে, এগুলি সহীহ বা যয়ীফ।

(২) তিনি বলেছেন, এ হাদীসগুলি সহীহ হতে পারে, যয়ীফ হতে পরে বা জালও হতে পারে। কোনো হাদীসকে সকল মুহাদ্দিস জাল বলার পর, হাদীসের সনদে জালিয়াতের বিদ্যমানতা নিশ্চিত হওয়ার পর বা হাদীসটির কোনো সনদ না থাকা নিশ্চিত হওয়ার পর কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনা কখনোই থাকে না। বস্তুত হাদীসের সহীহ, যয়ীফ বা জাল হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক নীতিমালা ও মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল। আল্লামা হাক্কীর এ কথা মূলত হাদীসের সনদ বিচারে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর কর্মধারা ও নীতিমালার বিষয়ে সন্দেহ ছড়ায়। উপরন্তু তা হাদীস গ্রহণে সতর্কতার বিষয়ে কুরআন-হাদীস ও সাহাবীগণের নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক।

(৩) আল্লামা হাক্কী জালিয়াত দরবেশের যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন অনুরূপ ঘটনা অনেক আলিম উল্লেখ করেছেন। পার্থক্য হলো, সকলেই এ সকল ঘটনা উল্লেখ করার পর এদের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লামা হাক্কী জালিয়াতের 'যুক্তি'র যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম নাবাবী (৬৭৬ হি) জালিয়াতদের এ 'যুক্তি' উল্লেখ করে বলেন:

وزعم بعضهم أن هذا كذب له ﷺ لا كذب عليه وهذا الذى انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع وقد جمعوا فيه جملا من الاغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة فخالفوا قول الله عز وجل ... وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والاحاديث الصريحة المشهورة فى إعظام شهادة الزور وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد وغير ذلك من الدلائل القطعيات فى تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحى ... ومن أعجب الاشياء قولهم هذا كذب له وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع فإن كل ذلك عندهم كذب عليه

"কেউ কেউ ধারণা করেছে যে, এরূপ মিথ্যা তাঁর পক্ষে মিথ্যা, তার বিরুদ্ধে নয়। তাদের এ মত ও দলীল চূড়ান্ত মূর্খতা ও সীমাহীন অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। আর এটিই হলো সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, তারা শরীয়তের মূলনীতির কোনো কিছুই জানে না। তাদের এ কথায় তারা এমন সব মূর্খতা ও বিভ্রান্তি জমায়েত করেছে যা একমাত্র তাদের মত মূঢ়তা ও নীচতায় ভরা বুদ্ধি ও বিনষ্ট মন-মগজধারীদের পক্ষেই সম্ভব। তারা আল্লাহ নির্দেশের বিরোধিতা করেছে....। আর তারা এ সকল সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন মুতাওয়াতির হাদীসেরও বিরোধিতা করেছে। উপরন্তু তারা অন্যান্য মাশহূর হাদীসের বিরোধিতা করেছে, যে সকল হাদীসে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া তারা মুসলিম উম্মাহর সকল আলিমের ইজমার বিরোধিতা করেছে। এভাবে তারা দীনের সকল কাতয়ী বা সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত দলীলের বিরোধিতা করেছে, যে সকল দলীলে সাধারণ মানুষদের নামে বা তাদের সম্পর্কে মিথ্যা বলা হারাম করা হয়েছে, তাহলে যার কথাই শরীয়ত এবং যাঁর কথাই ওহী তাঁর নামে মিথ্যা বলার বিধান কী হতে পারে? ... তাদের কথার সবচেয়ে উদ্ভট বিষয় হলো মিথ্যাকে পক্ষে ও বিপক্ষে বলে দাবি করা। এ হলো আরবী ভাষা ও শরীয়তের সম্ভাষণ সম্পর্কে তাদের প্রগাঢ় মূর্খতা। আরবীতে যে কোনো মিথ্যাকেই (الكذب عليه): "তার নামে মিথ্যা বা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা" বলে আখ্যায়িত করা হয়।[৩১২]

এভাবে উম্মাতের সকল আলিমই জালিয়াতদের বক্তব্য উল্লেখ করে তাদের বিভ্রান্তি ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে শাইখ ইসমাইল হাক্কী জালিয়াতদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে যে কোনো মিথ্যা কথাই ওহীর বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করে, মানুষের বানানো কথাকে দীনের ভিত্তি বানিয়ে দেয় এবং ইসলামী শরীয়ত ধ্বংস করে। সর্বোপরি দীন পালন বা সুন্নাতের পথে আহ্বান করতে সহীহ হাদীস ও সত্য কথা যথেষ্ট নয় বরং মিথ্যার প্রয়োজন আছে এ কথা কি কল্পনা করা যায়?

(৪) শাইখ হাক্কী জালিয়াতির স্বপক্ষে শাইখ ইয্যুদ্দীন ইবনু আব্দুস সালামের বক্তব্যের যে দলীল (!!) পেশ করেছেন তা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। ইয্যুদ্দীন সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে কথাটি বলেছেন। এ হলো জীবন বাঁচানো বা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে অসত্য বলা বা ঘুরিয়ে কথা বলার বৈধতার ব্যাখ্যা। কিন্তু শাইখ হাক্কী এ কথাটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা থেকে বুঝা যায় যে,

ইসলামের প্রয়োজনে (!!) হাদীস জালিয়াতি করা বা হাদীসের নামে মিথ্যা বলা বৈধ বা জরুরী হতে পারে!!!

সত্য দ্বারা বা সহীহ হাদীস দ্বারা ইসলামের সকল উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব নয় এরূপ চিন্তা কি কোনো মুসলিম করতে পারেন? আল্লাহর দীন পালন ও প্রচারের জন্য মিথ্যার প্রয়োজন আছে এরূপ চিন্তা কি সম্ভব? আল্লাহ তাঁর দীনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন নি, কাজেই আমাকে মিথ্যা বলে তা সংরক্ষণ করতে হবে- এরূপ চিন্তা কি কোনো মুমিন করতে পারেন? এ মিথ্যাটি যে ইসলামের জন্য প্রয়োজন, এটি ছাড়া ইসলামের মাকসূদ পূরণ হতে পারে না- এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমাকে কে দিয়েছে? আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের পক্ষে মিথ্যা বলার প্রয়োজন আছে এরূপ চিন্তার চেয়ে ভয়ানক বিভ্রান্তি আর কী হতে পারে?

মিথ্যা বলে দীনের গৌরব বাড়ানোর মূল চেতনা প্রচলিত খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পলের। আমরা দেখেছি তিনি প্রচলিত ইঞ্জিলের মধ্যে লিখেছেন যে, মিথ্যা বলে যদি আল্লাহর মর্যাদা বাড়ানো যায় তাহলে আর পাপ হবে কেন? সাধু পলের এ যুক্তি আর উপর্যুক্ত জালিয়াতের যুক্তির মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নেই। একবার এ যুক্তি দিয়ে জালিয়াতির দরজা খোলার পর শয়তান নানান রকম মিথ্যাকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের পক্ষে বলে যুক্তি দিয়ে ধর্মের নামে প্রচার করায় এবং এভাবেই ঈসা (আ)-এর দীনকে নষ্ট করা হয়েছে। আর এজন্যই ইসলামে এ দরজা চিরতরে বন্ধ করা হয়েছে।

(৫) আল্লামা হাক্কী লিখেছেন, আকাবিরদের উপর নেক ধারণার ভিত্তিতে এ সকল হাদীস গ্রহণ করা যায়। আমরা দেখেছি যে, মুসলিম উম্মাহর কোনো প্রাজ্ঞ বুজুর্গ, ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ বা সূফী এরূপ "নেক ধারণা"-কে প্রশ্রয় দেন নি। আমরা আগেই বলেছি, যে সকল মুফাস্‌সির এ সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন তাঁরা কখনোই বলেন নি যে, এগুলি সহীহ বা যয়ীফ। এমনকি তারা কখনোই বলেন নি যে, তাঁরা তাদের গ্রন্থে যাচাই না করে হাদীস লিখবেন না। উপরন্তু তাদের গ্রন্থের মধ্যে এরূপ অনেক "হাদীস" তারা উল্লেখ করেছেন যার কোনোরূপ অস্তিত্ব বা সনদ নেই। এগুলি প্রমাণ করে যে, তারা এবিষয়ে কোনো যাচাই বাছাই করেন নি। যে হাদীসের বিষয়ে সকল মুহাদ্দিস একমত যে তা জাল সে হাদীসের বিষয়ে শুধু "অমুক আলিম তা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত তিনি যাচাই না করে তা করেন নি, কজেই তা গ্রহণ করা যেতে পারে' এরূপ চিন্তা কোনো মুসলিম করতে পারেন না। তাহলে যাচাই করে হাদীস গ্রহণের বিষয়ে, মিথ্যার সন্দেহ হলে সে হাদীস গ্রহণ না করার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা কোথায় থাকবে?

বস্তুত বিগত দু-তিন শতাব্দী যাবত মুসলিম উম্মাহর আলিম, তালিব ইলম ও সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে যে অসতর্কতা ও অবহেলা প্রসার লাভ করেছে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আল্লামা হাক্কীর এ বক্তব্য। আল্লাহ আমাদেরকে ও তাঁকে ক্ষমা করুন, রহমত করুন এবং তাঁর নেক আমলের বরকতে তাঁর ভুলক্রটি দূরীভূত করে দিন।

## ১১. জাল হাদীস বিষয়ক কিছু প্রশ্ন

আমরা প্রথম পর্বের আলোচনা শেষ করেছি। দ্বিতীয় পর্বে আমরা আমাদের সমাজে প্রচলিত অনেক জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা উল্লেখ করব। এ সকল জাল ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা পাঠের সময় পাঠকের মনে বারংবার কয়েকটি প্রশ্ন জাগতে পারে। প্রশ্নগুলোর উত্তর পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি। তবুও এখানে প্রশ্নগুলো আলোচনা করতে চাই।

আমরা দেখতে পাব যে, মিথ্যা বা বানোয়াট হাদীসের মধ্যে অনেক কথা আছে যা অত্যন্ত সুন্দর, অর্থবহ, মূল্যবান ও হৃদয়স্পর্শী। তখন আমাদের কাছে মনে হবে যে, কথাটি তো খুব সুন্দর, একে বানোয়াট বলার দরকার কি? অথবা এত সুন্দর ও মর্মস্পর্শী কথা হাদীস না হয়ে পারে না। অথবা এ কথার মধ্যে তো কোন দোষ নেই, এর বিরুদ্ধে লাগার প্রয়োজন কি? ইত্যাদি।

এর উত্তরে আমাদের বুঝতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষা ও বাণীকে অবিকল নির্ভেজালভাবে হেফাযত করা উম্মতের প্রথম দায়িত্ব। তিনি বলেন নি, এমন কোন কথা তাঁর নামে বলাই জাহান্নামের নিশ্চিত পথ বলে তিনি বারবার বলেছেন। কাজেই কোন বাণীর ভাব ও মর্ম কখনোই আমাদের কাছে প্রথমে বিবেচ্য নয়। প্রথম বিবেচ্য হলো, তিনি এ বাক্যটি বলেছেন কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা। কোন কথার অর্থ যত সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী হোক সে কথাটিকে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বা হাদীস বলতে পারি না, যতক্ষণ না বিশুদ্ধ সনদে তাঁর থেকে বর্ণিত না হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কথা বলেছেন বলে আমরা নিশ্চিতরূপে জানি না সে কথা তাঁর নামে বলার মত কঠিনতম অপরাধ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, আমরা প্রায়ই দেখব যে, আমরা যে সকল হাদীসকে বানোয়াট বলে উল্লেখ করছি, এ সকল হাদীসকে অনেক বুযুর্গ তার কথায় বা গ্রন্থে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে কেউ হয়ত বলতে পারেন: অমুক আলিম বা বুযুর্গ এ হাদীস বলেছেন, তিনি কি তাহলে জাহান্নামী?

আমরা দেখেছি যে, বুযুর্গদের নামে জালিয়াতি হয়েছে অনেক। এ সকল জাল হাদীস বুযুর্গগণ সত্যই বলেছেন, না জালিয়াতরা তাঁদের নামে চালিয়েছে তা আমরা জানি না। যদি তাঁরা বলেও থাকেন, তবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, একজন বুযুর্গের অসংখ্য কর্মের মধ্যে কিছু ভুল থাকতে পারে। তাঁদের অসংখ্য ভাল কাজের মধ্যে এ সকল ভুলভ্রান্তি কিছুই নয়। মূলত: তাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা যথাসাধ্য সঠিক কথাটি লেখার বা বলার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। আর এক্ষেত্রে ভুল করলেও তাঁরা সাওয়াব পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "কেউ যদি কোনো হুকুম-বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে বা যথাসাধ্য সঠিক হুকুম-বিধান প্রদানের জন্য চেষ্টা করে এবং সফল হয় তবে তার জন্য দুটি পুরস্কার। আর যদি সে এভাবে ইজতিহাদ করে বিধান প্রদান করে ভুল করে তবে তার জন্য একটি পুরস্কার।"[৩১৩]

কোনো আলিম বা বুজুর্গ যদি যথাসাধ্য সতর্কতা ও চেষ্টা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে ভুল বশত কোনো জাল হাদীস বলেন বা লিখেন তবে তিনি একটি পুরস্কার লাভ করবেন। এছাড়া মহান আল্লাহ বলেছেন: "পুণ্যকাজ অবশ্যই পাপকে দূর করে দেয়।" (সূরা হূদ: ১১৪ আয়াত)। এজন্য কোনো বুজুর্গ যদি এক্ষেত্রে অপরাধীও হন তবে তাঁর অন্যান্য অগণিত নেকআমলের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়। কিন্তু তাঁর ভুলকে পুঁজি করে আমরা পাপ করতে পারি না।

কোনো বুযুর্গ বা সত্যিকারের আল্লাহ-ওয়ালা মানুষ কখনোই জেনেশুনে কোনো জাল বা মিথ্যা কথা রাসূলুলাহ (ﷺ) এর নামে বলতে পারেন না। না-জেনে হয়ত কেউ বলে ফেলেছেন। কিন্তু তাই বলে আমরা জেনে শুনে কোনো জাল হাদীস বলতে পারি না। আমাদের দায়িত্ব হলো, কোনো হাদীসের বিষয়ে যদি আমরা শুনি বা জানি যে, হাদীসটি 'জাল' তবে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তা বলা ও পালন করা বর্জন করব। যদি এ বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ হয় তবে আমরা মুহাদ্দিসগণের তথ্যাদির আলোকে 'তাহকীক' বা গবেষণা করে প্রকৃত বিষয় জানতে চেষ্টা করব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন, অন্য কারো কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। কাজেই আমাদেরকে রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বা সন্দেহজনক কিছু বলা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

তৃতীয় প্রশ্ন যা আমাদের মনে আসবে তা হলো, এতসব বুযুর্গ কিছু বুঝলেন না, এখন আমরা কি তাঁদের চেয়েও বেশী বুঝলাম? এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো, এ গ্রন্থে আলোচিত জাল হাদীসগুলোকে জাল বলার ক্ষেত্রে আমার মত অধমের কোন ভূমিকা নেই। এখানে আমি মূলত পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মতামতই বর্ণনা করছি। পাঠক তা বিস্তারিত দেখবেন, ইনশা আল্লাহ।

# দ্বিতীয় পর্ব
# প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা

## প্রথম পরিচ্ছেদ:
## অশুদ্ধ হাদীসের বিষয়ভিত্তিক মূলনীতি

জাল ও অনির্ভরযেগ্যে হাদীস সংকলনের একটি বিশেষ পদ্ধতি: যে সকল বিষয়ে সকল হাদীস বা অধিকাংশ হাদীস বানোয়াট বা অনির্ভরযোগ্য সে সকল বিষয়কে একত্রিত করে সংকলিত করা। বানোয়াট হাদীস চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে আগ্রহী মুসলিম বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা ছাড়াই অতি সহজে বুঝতে পারেন যে, এ হাদীসটি বানোয়াট; কারণ হাদীসটি যে বিষয়ে বর্ণিত সে বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। এ পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ ৭ম হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ উমার ইবনু বাদর আল-মাউসিলী (৫৫৭-৬২২ হি) রচিত 'আল-মুগনী' গ্রন্থ। এছাড়া হিজরী একাদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), ত্রয়োদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সূফী সাধক মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ দরবেশ হূত (১২৭৬ হি) এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস এ বিষয়ক কিছু মূলনীতি উল্লেখ করেছেন।

### (ক) উমার ইবনু বাদর মাউসিলী হানাফী

আলামা উমার ইবনু বাদর ইবনু সাঈদ আল-মাউসিলী হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম "আল-মুগনী আনিল হিফযি ওয়াল কিতাব বি-কাউলিহিম লাম ইয়াসিহ্ শাইউন ফী হাযাল বাব" নামক গ্রন্থটি। এ দীর্ঘ নামের প্রতিপাদ্য হলো: 'মুহাদ্দিসগণ সে সকল বিষয়ে বলেছেন যে, এ বিষয়ে কোনো হাদীসই সহীহ নয় সে বিষয়গুলোর বিবরণ। এগুলোর জন্য অন্য কোনো গ্রন্থ পাঠ ও মুখস্থ করার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।' এ গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি ১০১ টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যে সকল বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীসই অশুদ্ধ বলে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন। কোনো বিষয়ে কিছু হাদীস বিশুদ্ধ হলে তা উল্লেখ করে বাকি সকল হাদীস অশুদ্ধ বলে জানিয়েছেন। তাঁর গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে বর্ণিত সকল হাদীসই জাল অথবা অতি দুর্বল:

#### ১. ঈমানেরহ্রাস-বৃদ্ধি

কুরআনে একাধিক স্থানে আল্লাহ বলেছেন যে, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় (সূরা আনফাল ২ ও সূরা ফাতহ ৪ আয়াত)। তবে ঈমান বাড়ে এবং কমে অথবা বাড়ে না ও কমে না এবং কথা ও কর্ম ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বা অন্তর্ভুক্ত নয়- এ অর্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল। কুরআন ও হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনার আলোকে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ মতভেদ করেছেন।

#### ২. মুরজিয়া, জাহমিয়া, কাদারিয়া ও আশআরিয়া

এ সকল সম্প্রদায় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী মূলক কোনো সহীহ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয় নি। এদের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি বানোয়াট অথবা অত্যন্ত দুর্বল। সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ ও ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহের নির্দেশনার আলোকে এ সকল সম্প্রদায়ের বিষয়ে কথা বলেছেন।

#### ৩. আল্লাহর বাণী সৃষ্ট নয়

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, বিভিন্ন হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা ও সাহাবীগণের মতামতের আলোকে তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী ইমামগণ একমত যে, কুরআন আল্লাহর বাণী, তা তাঁর মহান গুণাবলির অংশ এবং সৃষ্ট নয়। বিভ্রান্ত মু'তাযিলা সম্প্রদায় কুরআনকে সৃষ্টবস্তু বলে বিশ্বাস করতো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকে এ বিষয়টি মুসলিম সমাজের অন্যতম বিতর্ক-বিষয় ছিল। এজন্য অনেক জালিয়াত এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে হাদীস বানিয়ে প্রসিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেছে। মুহাদ্দিসগণ একমত পোষণ করেছেন যে, কুরআন সৃষ্ট নয়। তবে এ মত প্রমাণের জন্য হাদীস জালিয়াতির সকল প্রচেষ্টা তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

**৪. নূরের সমুদ্রে ফিরিশতাগণের সৃষ্টি**

জিবরাঈল (আ) প্রতিদিন সকালে নূরের সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠে শরীর ঝাড়া দেন এবং প্রতি ফোটা নূর থেকে ৭০ হাজার ফিরিশতা সৃষ্টি করা হয়। এ অর্থে ও এ জাতীয় সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

**৫. মুহাম্মাদ বা আহমাদ নাম রাখার ফযীলত**

মুহাম্মাদ বা আহমাদ নাম রাখার ফযীলতে প্রচারিত সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে অনেক বানোয়াট হাদীস প্রচারিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ও আহমাদ নামধারীদের আল্লাহ শাস্তি দিবেন না, যাদের পরিবারে কয়েক ব্যক্তির নাম মুহাম্মাদ হবে তাদের ক্ষমা করা হবে, বা বরকত দেয়া হবে ইত্যাদি বিভিন্ন কথা বানিয়ে হাদীসের নামে চালানো হয়েছে। এ নাম দুটি নিঃসন্দেহে উত্তম নাম। রাসূলুলাহ ﷺ-এর মহব্বতে সন্তানদের এ নাম রাখা ভাল। তবে এ বিষয়ের বিশেষ ফযীলত জ্ঞাপক হাদীগুলো বানোয়াট।

**৬. আকল অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়**

বুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রশংসা বা ফযীলতে বর্ণিত সকল হাদীস ভিত্তিহীন। কুরআন ও হাদীসে জ্ঞান শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং জ্ঞানীগণের প্রশংসা করা হয়েছে। তবে ইন্দ্রিয়ের প্রশংসায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস সহীহরূপে বর্ণিত হয় নি। জালিয়াতগণ বুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রশংসায় অনেক হাদীস বানিয়েছে। যেগুলোতে বুদ্ধির প্রশংসা করা হয়েছে, মানুষ কর্ম নয় বরং বুদ্ধি অনুসারে পুরস্কার লাভ করবে; বুদ্ধিহীন বা নির্বোধের সালাতের চেয়ে বুদ্ধিমানের সালাতের সাওয়াব বেশি.... ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে। এগুলো সবই বানোয়াট। কোনো জন্মগত বা বংশগত বিষয়ই আখিরাতের মুক্তি বা মর্যাদার বিষয় নয়। মানুষের ইচ্ছাকৃত কর্মই মূলত তার মুক্তির মাধ্যম। যার বুদ্ধি বেশি ও বুদ্ধি সৎকর্মে ব্যবহার করেন তিনি তার কর্মের জন্য প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হবেন। কিন্তু জন্মগত বা প্রকৃতিগত বুদ্ধি কোনো মুক্তি বা সাওয়াবের বিষয় নয়।

**৭. খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) এর দীর্ঘ জীবন**

সূরা কাহাফে আল্লাহ মূসার (আ) সাথে আল্লাহর একজন বান্দার কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে এ বান্দার নাম উল্লেখ করা হয় নি। তবে সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ বান্দার নাম 'খাযির' (প্রচলিত বাংলায়: খিযির)। এ একটি ঘটনা ছাড়া অন্য কোনো ঘটনায় খিযির (আ)-এর বিষয়ে কোনো সহীহ বর্ণনা জানা যায় না। তাঁর জন্ম, বাল্যকাল, কর্ম, নবুয়ত, কর্মক্ষেত্র, এ ঘটনার পরবর্তী কালে তার জীবন ও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কোনো প্রকারের কোনো বর্ণনা কোনো সহীহ হাদীসে জানতে পারা যায় না। তিনি আবে হায়াতের পানি পান করেছিলেন ইত্যাদি কথা সবই ইহূদী-খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত কথা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে।

আল্লামা মাউসিলী বলেন, খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) দীর্ঘ জীবন পেয়েছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন বা কথা বলেছেন, তাঁর পরে বেঁচে আছেন, ইত্যাদি অর্থে বর্ণিত সকল হাদীসই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) এর দীর্ঘ জীবন ও জীবিত থাকার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন... শয়তানই এ বিষয়টি মানুষদের মধ্যে প্রচারিত করেছে। ইমাম বুখারীকে প্রশ্ন করা হয়, খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) কি এখনো জীবিত আছেন? ইমাম বুখারী বলেন, তা অসম্ভব; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'তোমরা আজকের রাত্রিটির কথা মনে রাখবে। আজ রাত্রিতে পৃথিবীর বুকে যারা আছে আজ থেকে একশত বৎসরের মাথায় তাদের কেউই পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে না।'[৩১৪] ইবনুল জাওযী খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) এর দীর্ঘজীবনের বিষয়ে বলেন, এই কথাটি কুরআনের আয়াতের পরিপন্থী। আল্লাহ বলেছেন[৩১৫]: 'আপনার পূর্বে কোনো মানুষকেই আমি অনন্ত জীবন দান করি নি; সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে?'।

উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো আলিম খিযিরের জীবিত থাকার সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন বুযুর্গের কথার উপর নির্ভর করেছেন। তবে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয় নি।

**৮. কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফযীলত**

আল্লামা মাউসিলী বলেন, কুরআনের ফযীলতের বিষয়ে কিছু হাদীস সহীহ, তবে এ বিষয়ে অনেক বানোয়াট হাদীস সমাজে প্রচার করা হয়েছে। নিম্নলিখিত সূরা বা আয়াতের বিষয়ে বিশেষ মর্যাদা বা ফযীলত জ্ঞাপক সহীহ বা হাসান হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারাহ, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-ইমরান, সূরা কাহাফ, সূরা কাহাফের প্রথম বা শেষ দশ আয়াত,

সূরা মুলক, সূরা যিলযাল, সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। এছাড়া অন্যান্য সূরার ফযীলতে বর্ণিত হাদীসগুলি বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল। এছাড়া উপরের সূরাগুলোর ফযীলতেও অনেক বানোয়াট কথা হাদীস নামে প্রচার করা হয়েছে।

**৯. রোদে গরম করা পানি**

রোদে গরম করা পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বা অমঙ্গল হতে পারে অর্থে রাসূলুলাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত সকল হাদীস মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

**১০. আবু হানীফা (রাহ) ও শাফিয়ীর (রাহ) প্রশংসা বা নিন্দা**

**১১. যার দায়িত্বে সালাত (কাযা) রয়েছে তার সালাত হবে না**

**১২. মসজিদের মধ্যে জানাযার সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা**

**১৩. ওযুর পরে রুমাল ব্যবহার বা আদ্র অঙ্গগুলো মোছা**

ইমাম মাউসিলী বলেন, এ সকল অর্থে বর্ণিত সকল হাদীস ভিত্তিহীন।

**১৪. সালাতের মধ্যে সশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠ**

আল্লামা মাউসিলী বলেন, ইমাম দারাকুতনী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের মধ্যে সশব্দে ‘বিসমিল্লাহ...’ পাঠ করেছেন অর্থে বর্ণিত কোনো হাদীসই সহীহ নয়।

**১৫. জানাযার তাকবীরগুলোতে হাত উঠানো**

রাসূলুলাহ (ﷺ) জানাযার প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য কোনো তাকবীরের সময় হাত উঠিয়েছেন বলে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি।

**১৬ সালাতুর রাগাইব**

সালাতুর রাগাইব বা রজব মাসের প্রথম জুম‘আর দিনে বিশেষ নফল সালাতের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

**১৭ শবে মি’রাজ-এর নামায**

মি’রাজের রাত্রিতে বিশেষ নফল সালাত আদায়ের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

**১৮ শবে বরাতের নামায**

শবে বারাতের রাত্রিতে বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ কিছু রাক‘আত নফল সালাতের বিশেষ ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

**১৯ সপ্তাহের দিন ও রাতের নফল সালাত**

আল্লামা মাউসিলী বলেন, এ বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। তিনি আরো বলেন: নফল সালাতের বিষয়ে শুধুমাত্র নিম্নের সালাতগুলির বিষয়ে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে: ফরয সালাতের আগে পরে সুন্নাত সালাত, তারাবীহ, দোহা বা চাশত, রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, তাহিয়্যাতুল ওযু, ইসতিখারার সালাত, কুসূফের (চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের) সালাত, ইসতিসকার সালাত।[৩১৬]

**২০ ঈদের তাকবীরের সংখ্যা**

আল্লামা মাউসিলী বলেন, ইমাম আহমাদ বলেছেন, ঈদের তাকবীরের সংখ্যার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত সকল হাদীসই যয়ীফ।[৩১৭]

**২১ সুন্দর চেহারার প্রশংসার বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট।**

**২২ আশুরার ফযীলত**

আশুরার দিনে সিয়াম পালনের ফযীলত সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। এছাড়া এ দিনে দান করা, খেযাব মাখা, তেল ব্যাবহার, সুরমা মাখা, বিশেষ পানাহার ইত্যাদি বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

**২৩ রজব মাসে সিয়ামের ফযীলত**

রজব মাসে বা এ মাসের কোনো তারিখে নফল সিয়াম পালনের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

**২৪ ঋণ থেকে উপকার নেওয়াই সুদ**

আল্লামা মাউসিলী বলেন, একটি কথা প্রচলিত আছে:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعاً فَهُوَ رِباً

“যে কোনো কর্জ থেকে উপকার নেয়াই সুদ।” এ অর্থে বর্ণিত হাদীসের সনদ সহীহ নয়। হাদীসে সুদের সুনির্ধারিত সংজ্ঞা ও পরিচিতি রয়েছে।

**২৫ অবিবাহিতদের প্রশংসায় কথিত সকল কথা ভিত্তিহীন।**

**২৬ ছুরি দিয়ে মাংস কেটে খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা**

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, খাওয়ার সময় ছুরি ব্যবহার বা ছুরি দিয়ে মাংস কেটে খাওয়া আ'জামীদের আচরণ, মুসলমানদের তা পরিহার করতে হবে। এ হাদীসটি বানোয়াট পর্যায়ের। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছুরি দিয়ে ছাগলের গোশত কেটে খেয়েছেন।

**২৭ আখরোট, বেগুন, বেদানা, কিশমিশ, মাংস, তরমুয, গোলাপ, ইত্যাদির উপকার বা ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।**

**২৮ মোরগ বা সাদা মোরগের প্রশংসা বিষয়ক সকল কথা বানোয়াট।**

**২৯ আকীক পাথর ব্যবহার, বা অন্য কোনো পাথরের গুণাগুণ বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।**

**৩০ স্বপ্নের কথা মহিলাদেরকে বলা যাবে না অর্থে বর্ণিত সকল কথা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।**

**৩১ রাসূলুল্লাহ ﷺ ফার্সী ভাষায় কথা বলেছেন বা ফার্সী ভাষার নিন্দা করেছেন এ অর্থে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট বা ভিত্তিহীন।**

**৩২ জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না অর্থে বর্ণিত সকল কথা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।**

**৩৩ ফাসেক ব্যক্তির গীবত করার বৈধতা**

প্রচলিত বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে: "ফাসিকের গীবত নেই" অর্থাৎ ফাসিক ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার মধ্যে বিরাজমান সত্য ও বাস্তব দোষের কথা উল্লেখ করলে তাতে গীবত হবে না বা গোনাহ হবে না। এ অর্থে বর্ণিত সকল কথা বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও বাতিল। এ প্রকার বানোয়াট কথা অগণিত মুমিনকে 'গীবতের' মত ভয়ঙ্কর পাপের মধ্যে নিপতিত করে।

**৩৪ অমুক মাসে, অমুক সালে অমুক কিছু ঘটবে এইরূপ সন, তারিখ ও স্থানভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বানোয়াট।**

**২৫ দাবা খেলার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক**

হাদীস শরীফে শরীরচর্চা মূলক খেলাধুলার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। 'নারদ' অর্থাৎ সাতগুটি, লুডু, তাস ইত্যাদি ভাগ্যনির্ভর খেলাধুলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুদ্ধি নির্ভর কিন্তু শরীরচর্চা বিহীন দাবা খেলার বৈধতার বিষয়ে সাহাবীগণের যুগ থেকেই আলিমগণ মতভেদ করেছেন। অনেক সাহাবী এ খেলা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লামা মাউসিলী বলেন, এ অর্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো দুর্বল বা বানোয়াট পর্যায়ের।

### (খ) মোল্লা আলী কারী ও দরবেশ হূত

১০ম-১১শ হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও হানাফী ফকীহ মোল্লা আলী ইবনু সুলতান মুহাম্মাদ নূরুদ্দীন হারাবী কারী (১০১৪ হি) রচিত বিভিন্ন মূল্যবান পুস্তকের মধ্যে দুটি পুস্তক জাল হাদীস বিষয়ক। একটির নাম: 'আল-আসরারুল মারফূয়া' বা 'আল-মাউদূ'আত আল-কুবরা' ও অন্যটির নাম 'আল-মাসনূ ফিল হাদীসিল মাউদূ' বা 'আল-মাউদূ'আত আস-সুগরা'। উভয় গ্রন্থের শেষে জাল হাদীস বিষয়ক কিছু মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ হিজরী শতকের সুপ্রসিদ্ধ সিরীয় আলিম ও সূফী মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ দরবেশ হূত (১২০৯-১২৭৬ হি) । তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থগুলোর একটি 'আসনাল মাতালিব'। এই গ্রন্থে তিনি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সহীহ, যয়ীফ ও মাউযূ হাদীসের আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের শেষে তিনি জাল হাদীস বিষয়ক কিছু মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। এ দুই আলিমের উল্লিখিত মূলনীতিগুলোর আলোকে আমি এখানে সংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করছি[৩১৮]:

**১. ভবিষ্যতের যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ক বর্ণনাসমূহ প্রায় সবই অনির্ভরযোগ্য**

ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিষ্যত ঘটনাবলির বিষয়ে অতি অল্প সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া ভবিষ্যতের যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফিতনা-ফাসাদ ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত ও প্রচলিত অধিকাংশ হাদীসই অনির্ভরযোগ্য বা ভিত্তিহীন।

**২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুদ্ধবিগ্রহের বা জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বিস্তারিত ইতিহাস বিষয়ক অধিকাংশ হাদীসের কোনো গ্রহণযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে অল্প কিছু সহীহ হাদীস রয়েছে। বাকি সবই গল্পকারদের বৃদ্ধি। ইতিহাসের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তিনিও ইহূদী-খৃস্টানদের থেকে তথ্য নিতেন।**

**৩. তাফসীরের ক্ষেত্রে সহীহ সনদের তাফসীর ও শানে নুযূল খুবই কম। এ বিষয়ক অধিকাংশ 'হাদীস'-ই নির্ভরযোগ্য সনদ বা সূত্র বিহীন। বিশেষত, মুহাম্মাদ ইবনু সাইব 'কালবী' (১৪৬হি) বর্ণিত সকল তাফসীরই ভিত্তিহীন। এছাড়া মুকাতিল ইবনু সুলাইমান (১৫০হি)-এর বর্ণিত তাফসীরও অনুরূপ। এরা জনশ্রুতি, ইহূদী-খৃস্টানদের ইসরাঈলীয় বর্ণনা ইত্যাদির সাথে অগণিত মিথ্যা মিশ্রিত করেছেন।**

**৪. নবীগণের কবর সম্পর্কে প্রচলিত সব কথাই ভিত্তিহীন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছাড়া অন্য কোনো নবীর কবর সম্পর্কে কিছু জানা**

যায় না।

৫. মক্কা শরীফে অনেক সাহাবীর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কবরের স্থান সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। 'মু'য়াল্লা' গোরস্থানে খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর 'কবর' বলে পরিচিত স্থানটিও কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয় নি। এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে বলেন যে, এ স্থানটি খাদীজা (রা)-এর কবর। ক্রমান্বয়ে তা প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

৬. মক্কায় ঠিক কোন্ স্থানটিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে।

৭. কুদায়ীর 'আশ-শিহাব' গ্রন্থের অতিরিক্ত হাদীসসমূহ

৪র্থ হিজরী শতকের পরে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীস সংকলন গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসকল হাদীস গ্রন্থের মধ্যে কিছু গ্রন্থে সংকলিত প্রায় সকল হাদীসই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এগুলোর অন্যতম হলো ৫ম হিজরী শতকের মিশরীয় আলিম কাযি আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ আল-কুদায়ী (৪৫৪ হি) প্রণীত 'আশ-শিহাব' নামক গ্রন্থটি। এ গ্রন্থটিতে তিনি প্রায় ১৫০০ হাদীস সংকলন করেছেন। এর মধ্যে কিছু হাদীস পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোতে সংকলিত 'সিহাহ সিত্তা' বা অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সংকলিত। অবশিষ্ট হাদীসগুলো তিনি নিজের সনদে সংকলন করেছেন। এ ধরনের হাদীসগুলো প্রায় সবই বানোয়াট, ভিত্তিহীন বা অত্যন্ত দুর্বল সনদে সংকলিত।

৮. ইবনু ওয়াদ'আনের 'চল্লিশ হাদীস' গ্রন্থের সকল হাদীস

৫ম হিজরী শতকের অন্য একজন আলিম ইরাকের মাওসিলের কাযি আবূ নাস্র মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াদ'আন (৪৯৪ হি)। তিনি 'আল-আরবাঈন' বা 'চল্লিশ হাদীস' নামে হাদীসের একটি সংকলন রচনা করেন। এ সংকলনের সকল হাদীসই জাল বা বানোয়াট কথা। ইমাম সুয়ূতী বলেন, এ 'চল্লিশ হাদীস' নামক গ্রন্থের হাদীস নামক জাল কথাগুলোর বক্তব্য খুবই সুন্দর। এগুলোর মধ্যে হৃদয় গলানো ওয়ায রয়েছে। কিন্তু কথা সুন্দর হলেই তো তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর কথা বলে গণ্য হবে না। বিশুদ্ধ সনদে তাঁর থেকে বর্ণিত হতে হবে। এ গ্রন্থের সকল হাদীসই জাল। তবে জালিয়াতগণ কোনো কোনো জাল হাদীসের মধ্যে সহীহ হাদীসের কিছু বাক্য ঢুকিয়ে দিয়েছে।

৯. শারাফ বালখী রচিত 'ফাযলুল উলামা' বইয়ের সকল হাদীস।

১০. 'কিতাবুল আরূস' নামক একটি প্রচলিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে নব দম্পতি ও বিবাহিতদের বিষয়ে অনেক জাল কথা সংকলিত। জালিয়াত বইটি ইমাম জাফর সাদিকের নামে প্রচার করেছে।

১১. তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম 'হাকিম তিরমিযী' মুহাম্মাদ ইবনু আলী (মৃত্যু আনু. ৩২০ হি)। তিনি নাওয়াদিরুল উসূল' ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থগুলোতে অনেক জাল হাদীস রয়েছে। এমনকি মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, তিনি তাঁর গ্রন্থগুলোকে জাল হাদীস দিয়ে ভরে ফেলেছেন। ফলে তাঁর গ্রন্থের কোনো হাদীস নিরীক্ষা ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না।

১২. ইমাম গাযালী (৫০৫ হি) রচিত 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে বিদ্যমান কোনো হাদীস নিরীক্ষা ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম গাযালীর মহান মর্যাদা অনস্বীকার্য। তবে তিনি হাদীস উল্লেখের ব্যাপারে কোনো যাচাই বাছাই করেন নি। প্রচলিত কিছু গ্রন্থ ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে অনেক জাল ও ভিত্তিহীন হাদীস তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১৩. আল্লামা ইমাম আবুল লাইস সামারকান্দী নাস্র ইবনু মুহাম্মাদ (৩৭৩ হি) রচিত 'তানবীহুল গাফিলীন' গ্রন্থের অবস্থাও অনুরূপ। এ গ্রন্থে অনেক জাল ও বানোয়াট হাদীস রয়েছে।

১৪. ৬ষ্ঠ শতকের প্রসিদ্ধ আলিম শু'আইব ইবনু আব্দুল আযীয খুরাইফীশ (৫৯৭ হি)। তিনি ওয়ায উপদেশ ও ফযীলত বিষয়ে 'আর-রাওদুল ফাইক' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ গ্রন্থটিতেও অনেক জাল হাদীস স্থান পেয়েছে।

১৫. তাসাউফের গ্রন্থগুলোতে সূফী বুযুর্গগণের সরলতার কারণে অনেক জাল হাদীস স্থান পেয়েছে।

১৬. ইমাম হাকিম (৪০৫হি) তাঁর 'আল-মুসতাদরাক' গ্রন্থে অনেক যয়ীফ, মাউযূ ও বাতিল হাদীসকে 'সহীহ' বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে তিনি খুবই দুর্বলতা দেখিয়েছেন। এজন্য তাঁর মতামতের উপর নির্ভর করা যায় না।

১৭. কুদা'য়ীর 'আস-শিহাব' গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেন ৬ষ্ঠ শতকের একজন মুহাদ্দিস 'মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুলাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাবীব আল-আমিরী (৫৩০ হি)। তিনিও হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের বিষয়ে বিশেষ দুর্বলতা ও ঢিলেমি প্রদর্শন করেছেন। এ গ্রন্থের অনেক দুর্বল, জাল ও ভিত্তিহীন হাদীসকে সহীহ বা হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। আব্দুর রাঊফ মুনাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর এ সকল ভুল উল্লেখ করেছেন। এজন্য নিরীক্ষা ছাড়া তাঁর মতামত অগ্রহণযোগ্য।

১৮. 'আলীর প্রতি রাসূলুলাহ ﷺ-এর ওসীয়ত' নামে প্রচলিত ওসীয়ত

আলী (রা) এর নামে একাধিক জাল ওসীয়ত প্রচলিত। প্রসিদ্ধ একটি জাল ওসীয়তের শুরুতে বলা হয়েছে: হে আলী মূসা (আ)-এর কাছে হারূন (আ)-এর মর্যাদা যেরূপ, আমার কাছেও তোমার মর্যাদা সেরূপ। তবে আমার পরে কোনো নবী নেই।' জালিয়াত এ বাক্যটি সহীহ হাদীস থেকে নিয়েছে। এরপর বিভিন্ন ভিত্তিহীন কথা উল্লেখ করেছে। যেমন, হে আলী, মুমিনের আলামত তিনটি...

মুনাফিকের আলামত... হিংসুকের আলামত.... পুরো ওসীয়তটিই বাতিল, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা কথায় ভরা। মাঝে মধ্যে দুই একটি সহীহ হাদীসের বাক্য ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।[৩১৯] এ ছাড়াও আলী (রা) এর নামে আরো একাধিক ওসীয়ত জালিয়াতগণ তৈরি করেছে। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, 'আলীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওসীয়ত' নামে প্রচলিত সবই জাল। তবে এগুলোর মধ্যে জালিয়াতগণ দুই একটি সহীহ হাদীসের বাক্য ঢুকিয়ে দিয়েছে।

**১৯. আবূ হুরাইরার প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওসীয়ত**

আবূ হুরাইরার (রা) উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওসীয়ত নামে আরেকটি জাল হাদীস প্রচলিত আছে। এ ওসীয়তটিও আগাগোড়া জাল ও মিথ্যা। তবে জালিয়াতগণ তাদের অভ্যাস মত এর মধ্যে অন্য সনদে বর্ণিত দু-চারটি সহীহ হাদীসের বাক্য জোড়াতালি দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে।[৩২০]

**২০. বিলালের মদীনা ত্যাগ ও স্বপ্ন দেখে মদীনায় আগমনের কাহিনী**

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পরে বিলাল (রা) জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা ছেড়ে সিরিয়া এলাকায় গমন করেন এবং সিরিয়াতেই বসবাস করতেন। কথিত আছে যে, একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে যিয়ারতের উৎসাহ দিচ্ছেন। তখন তিনি মদীনায় আগমন করেন.... ইত্যাদি। আল্লামা কারী বলেন, সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন যে, এ কাহিনীটি বানোয়াট। সম্ভবত, ইবনু হাজার মাক্কী ইমাম সুয়ূতীর এ আলোচনা দেখতে পান নি; এজন্য তিনি এ জাল কাহিনীটিকে তার যিয়ারত বিষয়ক পুস্তকটিতে উল্লেখ করেছেন।

**২১. সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের বা রাতের জন্য বিশেষ নামাযের বিষয়ে বর্ণিত সব কিছু বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। অনুরূপভাবে আশুরার দিনের বা রাতের নামায, রজব মাসের প্রথম রাতের নামায, রজব মাসের অন্যান্য দিন বা রাতের নামায, রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতের নামায ইত্যাদি সকল কথাই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।**

আল্লামা আলী কারী বলেন, কূতুল কুলূব, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, তাফসীরে সা'আলিবী ইত্যাদি গ্রন্থে এ সকল হাদীস রয়েছে দেখে পাঠক ধোঁকা খাবেন না। এগুলো সবই বানোয়াট।

**২২. হাসান বসরী আলী (রা) থেকে খিরকা বা সূফী তরীকা গ্রহণ করেছিলেন বলে যা কিছু প্রচলিত আছে সবই ভিত্তিহীন কথা।**

**২৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উমার (রা) ও আলী (রা)-কে তার জামা বা খিরকা দিয়েছিলেন উয়াইস কারনীকে পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং তাঁরা তাঁকে তা পৌঁছে দিয়েছিলেন মর্মে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল।**

**২৪. কুতুব-আকতাব, গওস, নকীব-নুকাবা, নাজীব-নুজাবা, আওতাদ ইত্যাদি বিষয়ক সকল হাদীস বাতিল ও ভিত্তিহীন।**

**২৫. মেহেদি বা মেন্দির বিশেষ ফযীলত বা প্রশংসায় বর্ণিত সকল হাদীস ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। শুধুমাত্র মেহেদি দিয়ে খেযাব দেয়ার উৎসাহ জ্ঞাপক হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্য।**

**২৬. আজগুবি সাওয়াব বা শাস্তি**

মুহাদ্দিসগণ সনদ বিচার ছাড়াও যে সমস্ত অর্থ ও তথ্যগত বিষয়কে জাল হাদীসের চিহ্ন হিসাবে উল্লেখ করেছেন তার অন্যতম বিষয় অস্বাভাবিক সাওয়াব বা শাস্তির বিবরণ। বিভিন্ন প্রকারের সামান্য নফল ইবাদত বা অত্যন্ত সাধারণ ইবাদত, যিকির, দোয়া, কথা, কর্ম বা চিন্তার জন্য অগণিত আজগুবি সাওয়াবের বর্ণনা। এক্ষেত্রে জালিয়াতগণ কখনো সহীহ হাদীসে প্রমাণিত যিকির, সালাত, দোয়া বা ইবাদতের এরূপ আজগুবি সাওয়াব বলেছে। কখনো বা বানোয়াট যিকির, সালাত, সিয়াম ইবাদত তৈরি করে তার বানোয়াট আজগুবি সাওয়াব বর্ণনা করেছে। এসকল জাল হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ:

যে ব্যক্তি একবার অমুক যিকির বলবে, অমুক বা অমুক কাজটি করবে তার জন্য এক লক্ষ নেকী, একলক্ষ পাপ মোচন...। অথবা তার জন্য জান্নাতে একলক্ষ বৃক্ষ রোপন, প্রত্যেক গাছের... গোড়া স্বর্ণের... ডালপালা... পাতা... ইত্যাদি কাল্পনিক বর্ণনা...। অথবা তার জন্য একলক্ষ শহীদের সাওয়াব, সিদ্দীকের সাওয়াব...। অথবা তার জন্য একটি ফিরিশতা/পাখি বানানো হবে, তার এত হাজার বা এত লক্ষ মুখ থাকবে... ইত্যাদি। অথবা অমুক দোয়া পাঠ করলে লোহা গলে যাবে, প্রবাহিত পানি থেমে যাবে.. প্রত্যেক অক্ষরের জন্য এত লক্ষ ফিরিশতা.... ইত্যাদি।

**২৭. স্বাভাবিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিপরীত কথা**

এ জাতীয় বানোয়াট কথাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. 'বেগুন সকল রোগের ঔষধ' বা 'বেগুন যে নিয়্যাতে খাওয়া হবে সে নিয়্যাত পূরণ হবে'।

২. 'যদি কেউ কোনো কথা বলে এবং সে সময়ে কেউ হাঁচি দেয় তাহলে তা সে কথার সত্যতা প্রমাণ করে।'

৩. তোমরা ডাল খাবে; কারণ ডাল বরকতময়। ডাল কলব নরম করে এবং চোখের পানি বাড়ায়। ৭০ জন নবী ডালের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।

৫. স্বর্ণকার, কর্মকার ও তাঁতীগণ সবচেয়ে বেশি মিথ্যাবাদী।

**২৮. অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর বা ফালতু বিষয়ের আলোচনা**

যে সকল কথা সাধারণ জ্ঞানী মানুষেরা আলোচনা করতে ইচ্ছুক নয়, সকল জ্ঞানীর সরদার সাইয়িদুল বাশার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে বিষয়ে কথা বলতে পারেন না। এ জাতীয় কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে:

১. চাউল যদি মানুষ হতো তাহলে ধৈর্যশীল হতো, কোনো ক্ষুধার্ত তা খেলেই পেট ভরে যেত।
২. আখরোট ঔষধ ও পনির রোগ। দুটি একত্রে পেটে গেলে রোগমুক্তি।
৩. তোমরা লবণ খাবে। লবণ ৭০ প্রকার রোগের ঔষধ।
৪. তারকাপুঞ্জ আরশের নিচে একটি সাপের ঘাম... ।
৫. আল্লাহ ক্রোধান্বিত হলে ফার্সী ভাষায় ওহী নাযিল করেন।
৬. সুন্দর চেহারার দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। সুন্দর চেহারাকে আল্লাহ জাহান্নামে শাস্তি দিবেন না।
৭. চোখের নীল রং শুভ।
৮. আল্লাহ মাথার টাকের মাধ্যমে কিছু মানুষকে পবিত্র করেছেন, যাদের মধ্যে প্রথম আলী (রা)।
৯. নাকের মধ্যে পশম গজানো কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাপত্তা দেয়।
১০. কান ঝিঁঝিঁ করা বা কান ডাকা বিষয়ক হাদীসগুলো বানোয়াট।

এ প্রকারের বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গাছ, সবজি, ঔষধি ইত্যাদির উপকার বর্ণনায় প্রচারিত হাদীস। অনুরূপভাবে মোরগ, সাদা মোরগ ইত্যাদির ফযীলতে বানোয়াট হাদীসও এ পর্যায়ভুক্ত।

**২৯. চিকিৎসা, টোটকা বা খাদ্য বিষয়ক অধিকাংশ কথাই বানোয়াট।**

এ জাতীয় ফালতু কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে:

১. অমুক অমুক কাজে স্মৃতিশক্তি কমে বা লোপ পায়। অমুক কাজে অমুক রোগ হয়। অমুক কাজ করলে অমুক রোগ দূর হয়... ইত্যাদি।

২. অমুক খাদ্যে কোমর মজবুত হয়। অমুক খাদ্যে সন্তান বেশি হয়। মুমিন মিষ্ট এবং সে মিষ্টি পছন্দ করে। ঝুটা মুখে খেজুর খেলে ক্রিমি মরে।

**৩০. উজ পালোয়ান, কোহে কাফ ইত্যাদি বিষয়ক কথাবার্তা**

এ জাতীয় ভিত্তিহীন বাতিল কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে:

১. ঊজ ইবনু উনুক বা ওজ পালোয়ানের কাল্পনিক দৈর্ঘ...'উজ পালোয়ান' বিষয়ক সকল কথাই মিথ্যা ও বানোয়াট।
২. কোহে কাফ বা কাফ পাহাড়ের বর্ণনায় প্রচারিত ও বর্ণিত হাদীস সমূহ। এ বিষয়ক সকল কথাই ভিত্তিহীন, জাল ও মিথ্যা।
৩. পৃথিবী পাথরের উপর পাথর একটি ষাঁড়ের শিঙ-এর উপর। ..../ একটি মাছের উপরে .../ ষাঁড়টি নড়লে শিং নড়ে আর ভুমিকম্প হয়...। এ জাতীয় সকল কথাই মিথ্যা ও বানোয়াট, যা অসৎসাহসী ও নির্লজ্জ জালিয়াতগণ হাদীসের নামে প্রচার করেছে।

**৩১. বিশুদ্ধ হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধী কথাবার্তা**

কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা হলো, আখিরাতের মুক্তি নির্ভর করে কর্মের উপর, নাম বা বংশের উপর নয়। অনুরূপভাবে কর্মের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হলো ফরয, যা করা অত্যাবশক ও হারাম যা বর্জন করা অত্যাবশক। এরপর ওয়াজিব, সুন্নাত, মুসতাহাব ইত্যাদি কর্ম রয়েছে। সমাজে অনেক কথা প্রচলিত রয়েছে যা এ ইসলামী শিক্ষার স্পষ্ট বিরোধী। সনদ বিচারে সেগুলো দুর্বল বা জাল বলে প্রমাণিত। তবে সনদ বিচার ছাড়া শুধু অর্থ বিচার করলেও এর জালিয়াতি ধরা পড়ে।

যেমন, অনেক হাদীসে সামান্য মুস্তাহাব কর্মের পুরস্কার বা সাওয়াব হিসাবে বলা হয়েছে, এ কর্ম করলে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না বা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে... ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ বা আহমাদ নাম হওয়ার কারণে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। এ প্রকারের সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
## স্রষ্টা, সৃষ্টি ও পূর্ববর্তী নবীগণ

### (ক) মহান স্রষ্টা বিষয়ক জাল হাদীস

**১. আল্লাহকে কোনো আকৃতিতে দেখা**

চক্ষু আল্লাহকে দেখতে পারে না বলে কুরআনে বলা হয়েছে:

لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ

"তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত।"[৩২১]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন: "কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে বা পর্দার আড়াল থেকে ছাড়া তার সাথে কথা বলবেন।"[৩২২]

মূসা (আ) মহান আল্লাহকে দেখতে চেয়েও দেখতে অক্ষম হন। আল্লাহ বলেন: "মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব। তিনি বলেন: তুমি কখনই আমাকে দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা স্বস্থানে স্থির থাকলে তুমি আমাকে দেখবে। যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চুর্ণ-বিচুর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল...।[৩২৩]

এ সকল সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে মুসলিম উম্মাহ একমত যে, পৃথিবীতে কেউ আল্লাহকে দেখতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি সহীহ হাদীসও বর্ণিত হয় নি, যাতে তিনি বলেছেন: "আমি জাগ্রত অবস্থায় পৃথিবীতে বা মি'রাজে চর্ম চক্ষে বা অন্তরের চক্ষে আল্লাহকে দেখেছি।" স্বপ্নের ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত অবস্থায় অন্তরের দৃষ্টিতে আল্লাহকে দেখেছেন কিনা সে বিষয়ে সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন: "যে ব্যক্তি বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যা কথা বলে।"[৩২৪] ইবনু মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবীও এ মত পোষণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহকে দেখেছিলেন। আল্লাহ যেমন মূসাকে (আ) 'কথা বলার' মু'জিযা প্রদান করেন, তেমনি তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে অন্তরের দৃষ্টিতে দর্শনের মু'জিযা দান করেন।[৩২৫]

যারা 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দর্শন দাবি করেছেন, তাঁরা একমত যে, এ দর্শন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য একটি বিশেষ মুজিযা, যা আর কারো জন্য নয় এবং এ দর্শন হৃদয়ের অনুভব, যেখানে কোনো আকৃতির উল্লেখ নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহকে কোনো 'আকৃতি'তে দেখেছেন, অথবা তিনি ছাড়া কোনো সাহাবী আল্লাহকে দেখেছেন বলে যা কিছু বর্ণিত সবই জাল ও মিথ্যা।

মি'রাজের রত্রিতে বা আরাফার দিনে, বা মিনার দিনে বা অন্য কোনো সময়ে বা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহকে বিশেষ কোনো আকৃতিতে দেখেছেন অর্থে সকল হাদীস জাল। যেমন, তাকে যুবক দেখেছেন, তাজ পরিহিত দেখেছেন, উট বা খচ্চরের পিঠে দেখেছেন... ইত্যাদি সবই জাল ও মিথ্যা।[৩২৬]

এজাতীয় ভিত্তিহীন একটি বাক্য:

رَأَيْتُ رَبِّيْ فِيْ صُوْرَةِ شَابٍ أَمْرَدَ

"আমি আমার প্রভুকে একজন দাড়ি-গোঁফ ওঠে নি এমন যুবক রূপে দেখেছি।" মুহাদ্দিসগণ বাক্যটিকে জাল বলে ঘোষণা করেছেন।[৩২৭]

অনুরূপভাবে উমরের (রা) নামে জালিয়াতগণ বানিয়েছে: "আমার প্রভুর নূর দ্বারা আমার অন্তর আমার প্রভুকে দেখেছে।" আলীর (রা) নামে জালিয়াতগণ বানিয়েছে: "যে প্রভুকে আমি দেখি না সে প্রভুর ইবাদত করি না।"[৩২৮]

**২. ৭, ৭০ বা ৭০ হাজার পর্দা**

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর নূরের পর্দা রয়েছে।[৩২৯] তবে পর্দার সংখ্যা, প্রকৃতি ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। কিছু হাদীসে আল্লাহর পর্দার সংখ্যার কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ওয়াযে "৭০ হাজার নূরের পর্দা" "৭০ টি পর্দা", "৭টি পর্দা" ইত্যাদির কথা বলা হয়। মুহাদ্দিসগণ বিস্তারিত নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন যে, এ অর্থের হাদীসগুলো কিছু সন্দেহাতীতভাবে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা আর কিছু যয়ীফ, দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য কথা।[৩৩০]

**৩. আরশের নিচের বিশাল মোরগ বিষয়ে**

আমাদের সমাজে ওয়াযে আলোচনায় অনেক সময় আরশের নিচের বিশাল মোরগ, এর আকৃতি, এর ডাক ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়। এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো ভিত্তিহীন বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল।[৩৩১]

**৪. যে নিজেকে চিনল সে আল্লাহকে চিনল**

আমাদের সমাজে ধার্মিক মানুষদের মাঝে অতি প্রচলিত একটি বাক্য:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

"যে নিজেকে জানল সে তার প্রভুকে (আল্লাহকে) জানল।" অথবা "যে নিজেকে চিনল সে তার প্রভুকে চিনল"। অনেক আলিম তাদের বইয়ে এ বাক্যটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বা হাদীস বলে সনদবিহীন ভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ একবাক্যে বলছেন যে, এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা নয়, কোনো সনদেই তাঁর থেকে বর্ণিত হয়নি। কোনো কোনো মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, বাক্যটি ৩য় হিজরী শতকের একজন সূফী ওয়ায়েয ইয়াহইয়া ইবন মুয়ায আল-রাযী (২৫৮ হি:)-র নিজের বাক্য। তিনি ওয়াজ নসিহতের সময় কথাটি বলতেন, তার নিজের কথা হিসাবে, হাদীস হিসাবে নয়। পরবর্তীতে অসতর্কতা বশত কোনো কোনো আলিম বাক্যটিকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৩২]

**৫. মুমিনের কালব আল্লাহর আরশ**

সমাজের বহুল প্রচলিত একটি বাক্য: "মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ": 'বাড়ির পাশে আরশি নগর'!! এ বিষয়ে বিভিন্ন বাক্য প্রচলিত, যেমন:

**اَلْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ :** হৃদয় প্রভুর বাড়ি।

**قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ :** মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ।

مَا وَسِعَنِيْ أَرْضِيْ وَلاَ سَمَائِيْ وَلَكِنْ وَسِعَنِيْ قَلْبُ عَبْدِيْ الْمُؤْمِن

আমার যমিন এবং আমার আসমান আমাকে ধারণ করতে পারে নি, কিন্তু আমার মুমিন বান্দার কলব বা হৃদয় আমাকে ধারণ করেছে।

এগুলো সবই বানোয়াট হাদীস। কোনো কোনো আলিম বাক্যগুলি তাঁদের গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিসগণ অনেক গবেষণা করেও এগুলোর কোন সনদ পান নি, বা কোন হাদীসের গ্রন্থে এগুলোর উল্লেখ পান নি। এগুলি সনদবিহীন জাল কথা।[৩৩৩]

**৬. আমি গুপ্তভাণ্ডার ছিলাম**

প্রচলিত একটি বানোয়াট কথা যা হাদীস নামে পরিচিত:

كُنْتُ كَنْزًا لاَ يُعْرَفُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لأُعْرَفَ

"আমি অজ্ঞাত গুপ্তভাণ্ডার ছিলাম। আমি পরিচিত হতে পছন্দ করলাম। তখন আমি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলাম; যেন আমি পরিচিত হই।"

ইতোপূর্বে বলেছি যে, প্রচলিত জাল হাদীসগুলো দু প্রকারের। এক প্রকারের জাল হাদীসের সনদ আছে এবং কোনো গ্রন্থে সনদসহ তা সংকলিত। সনদ নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসিগণ সেগুলোর জালিয়াতি ধরতে পেরেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জাল হাদীস যেগুলো কোনো গ্রন্থেই সনদসহ সংকলিত হয় নি। অথচ লোকমুখে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে এবং লোকমুখের প্রচলনের ভিত্তিতে কোনো কোনো আলিম তার গ্রন্থে সনদ ছাড়া তা উল্লেখ করেছেন। এ প্রকারের সম্পূর্ণ অস্তিত্ববিহীন ও সনদবিহীন বানোয়াট একটি কথা এ বাক্যটি।[৩৩৪]

**৭. কিয়ামতে আল্লাহ মানুষদেরকে মায়ের নামে ডাকবেন**

আরেকটি বানোয়াট ও মিথ্যা কথা হলো: কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষদেরকে মায়ের নামে ডাকবেন। এ বাক্যটি একদিকে বানোয়াট বাতিল কথা, অপরদিকে সহীহ হাদীসের বিপরীত। ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলিত বিভিন্ন সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন মানুষদের পরিচয় পিতার নামের সাথে প্রদান করা হবে। বলা হবে, অমুক, পিতা অমুক বা অমুক ব্যক্তির পুত্র অমুক।[৩৩৫]

**৮. জান্নাতের অধিবাসীদের দাড়ি থাকবে না**

জান্নাতের অধিবাসীগণের কোন দাড়ি থাকবে না। সবাই দাড়িহীন যুবক হবেন। শুধুমাত্র আদমের (আ) দাড়ি থাকবে। কেউ বলেছে: শুধুমাত্র মূসার (আ), বা হারুনের (আ) দাড়ি থাকবে বা ইবরাহীম (আ) ও আবু বাকরের (রা) দাড়ি থাকবে। এ গুলো সবই বানোয়াট ও বাতিল কথা।[৩৩৬]

**৯. আলাহ্ ও জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা**

اَلتَّفَكُّرُ فِيْ عَظَمَةِ اللهِ وَجَنَّتِهِ وَنَارِهِ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ

"আল্লাহর মহত্ত্ব, জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা বা ফিকির করা সারা রাত তাহাজ্জুদ আদায়ের চেয়ে উত্তম।" এটি জাল হাদীস।[৩৩৭]

## (খ) পূর্ববর্তী সৃষ্টি, নবীগণ ও তাফসীর বিষয়ক জাল হাদীস

পূর্ববর্তী সৃষ্টি ও পূর্ববর্তী নবীগণ বিষয়ে কুরআন সংক্ষেপ আলোচনা করেছে। শুধু যে বিষয়গুলোতে মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক শিক্ষা রয়েছে সেগুলোই আলোচনা করা হয়েছে। সৃষ্টি ও নবীগণের ঘটনা ইহূদীদের মধ্যে অনেক বিস্তারিতভাবে প্রচলিত। কুরআনে যেহেতু এ সকল বিষয়ে বিশদ বর্ণনা নেই, সে জন্য সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগ থেকেই অনেক মুফাস্সির এ সকল বিষয়ে ইহূদীদের বর্ণনা কৌতুহলের সাথে শুনতেন। পাশাপাশি তাবিয়ী পর্যায়ে অনেক ইহূদী আলিম ইসলাম গ্রহণ করার পরে এ সকল বিষয়ে তাদের সমাজে প্রচলিত অনেক গল্প কাহিনী মুসলিমদের মধ্যে বলেছেন।

এ সকল গল্প-কাহিনী গল্প হিসেবে শুনতে বা বলতে মূলত ইসলামে নিষেধ করা হয় নি। তবে এগুলোকে সত্য মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোনো কোনো মুফাস্সির ও ঐতিহাসিক পূর্ববর্তী নবীগণ বিষয়ক বিভিন্ন আয়াতের তাফসীরে ও তাদের জীবন কেন্দ্রিক ইতিহাস বর্ণনায় ইহূদী-খৃস্টানগণের বিকৃত বাইবেল ও অন্যান্য সত্য-মিথ্যা গল্পকাহিনীর উপর নির্ভর করেছেন। প্রথম যুগগুলোতে মুসলিমগণ গল্প হিসেবেই এগুলো শুনতেন। তবে পরবর্তী যুগে এ সকল কাহিনীকে মানুষেরা সত্য মনে করেছেন। কেউ কেউ এগুলোকে হাদীস বলে প্রচার করেছেন।

কুরআন বলেছে, ইহূদী ও খৃস্টানগণ তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলকে বিকৃত করেছে। অনেক কথা তারা নিজেরা রচনা করে আল্লাহর কালাম বলে চালিয়েছে। এজন্য হাদীস শরীফে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের কথা বর্ণনা করা যাবে, তবে শর্ত হলো, কুরআনের সত্যায়ন ছাড়া কোনো কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করা যাবে না। সাহাবীগণ ইহূদী-খৃস্টানদের তথ্যের উপর নির্ভর করার নিন্দা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন:

كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْدَثُ تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكِتَابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا أَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟

"কিভাবে তোমরা ইহূদী খৃস্টানদেরকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? "অথচ তোমাদের পুস্তক (অর্থাৎ কুরআন) যা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর উপরে অবতীর্ণ হয়েছে তা নবীনতর, তোমরা তা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাঠ করছ, যার মধ্যে কোনোরূপ বিকৃতি প্রবেশ করতে পারে নি। এ কুরআন তোমাদেরকে বলে দিয়েছে যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অনুসারীগণ (ইহূদী, খৃস্টান ও অন্যান্য জাতি) আল্লাহর পুস্তককে (তাওরাত-ইঞ্জিল ইত্যাদি) পরিবর্তন করেছে এবং বিকৃত করেছে। তারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে বলেছে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। পার্থিব সামান্য স্বার্থ লাভের জন্য তারা এরূপ করেছে। তোমাদের কাছে যে জ্ঞান আগমন করেছে (কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান) তা কি তোমাদেরকে তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করা থেকে নিবৃত করতে পারে না?"[৩৩৮]

এতকিছু সত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমাজে অগণিত 'ইসরাঈলীয় রেওয়ায়াত' প্রবেশ করতে থাকে। পরবর্তী যুগে মুসলিমগণ এগুলোকে কুরআনের বা হাদীসের কথা বলেই বিশ্বাস করতে থাকেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই বইয়ের পরিসরে সম্ভব নয়। এজন্য সংক্ষেপে কিছু বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছি। আল্লাহর দয়া ও তাওফীক হলে এ বইয়ের পরবর্তী খণ্ডগুলোতে এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব।

**১. বিশ্ব সৃষ্টির তারিখ বা বিশ্বের বয়স বিষয়ক**

বিশ্ব সৃষ্টির তারিখ, সময়, বিশ্বের বয়স, আদম (আ) থেকে ঈসা (আ) পর্যন্ত বা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) পর্যন্ত সময়ের হিসাব, আর কতদিন বিশ্ব থাকবে তার হিসাব ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা। জালিয়াতগণ এ বিষয়ে অনেক কথা বানিয়েছে।

ইহূদী ও খৃস্টানগণের 'বাইবেলে' বিশ্বের বয়স প্রদান করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সময় বলা হয়েছে। বাইবেলের হিসাব অনুসারে বর্তমানে বিশ্বের বয়স ৭০০০ (সাত হাজার) বছর মাত্র। এ সকল কথা ঐতিহাসিভাবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত। এ সকল মিথ্যা ও ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে মুসলিম ঐতিহাসিকগণও অনেক কথা লিখেছেন। আর জালিয়াতগণ এ মর্মে অনেক জাল হাদীসও বানিয়েছে।

**২. মানুষের পূর্বে অন্যান্য সৃষ্টির বিবরণ**

মানব জাতির পূর্বে অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী এ বিশ্বে ছিল কিনা সে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয় নি।

তবে মানুষের পূর্বে মহান আল্লাহ জিন জাতিকে মানুষের মতই বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি ও ইবাদতের দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন বলে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। জিন জাতির সৃষ্টির বিস্তারিত বিবরণ কুরআন কারীমে নেই। কোনো সহীহ হাদীসেও এ বিষয়ক বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় না।

জিন জাতির সৃষ্টি রহস্য, জিন জাতির আদি পিতা, জিন জাতির কর্মকাণ্ড, জিন জাতির নবী-পয়গম্বর, তাদের আযাব-গযব, তাদের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ, নবী-রাসূলের নাম ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই ইহূদী খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার, লোককথা ও অনির্ভরযোগ্য গল্প-কাহিনী।

কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবলিস জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। আদমকে সাজদা করার নির্দেশ অমান্য করে সে অভিশপ্ত হয়। এ ঘটনার পূর্বে তার জীবনের কোনো ইতিহাস সম্পর্কে কোনো সহীহ বর্ণনা নেই। ইবলিসের জন্ম-বৃত্তান্ত, বংশ ও কর্ম তালিকা, জ্ঞান-গরিমা, ইবাদত-বন্দেগি ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বিভিন্ন মানুষরে কথা, ইসরাঈলীয় রেওয়ায়াত বা অনির্ভরযোগ্য বিবরণ। 'কাসাসুল আম্বিয়া' জাতীয় পুস্তকগুলো এ সকল মিথ্যা কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

**৩. ১৮ হাজার মাখলুখাত**

একটি বহুল প্রচলিত কথা হলো: "আঠারো হাজর মাখলুকাত", অর্থাৎ এ মহাবিশ্বে সৃষ্ট প্রাণীর জাতি-প্রজাতির সংখ্যা হলো ১৮ হাজার। এ কথাটি একান্তই লোকশ্রুতি ও কোনো কোনো আলিমের মতামত। আল্লাহর অগণিত সৃষ্টির সংখ্যা কত লক্ষ বা কত কোটি সে বিষয়ে কোনো তথ্য কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

**৪. নবী-রাসূলগণের সংখ্যা: ১ বা ২ লক্ষ ২৪ হাজার**

কুরআন কারীম থেকে জানা যায় যে, মহান আল্লাহ সকল যুগে সকল জাতি ও সমাজেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। এরশাদ করা হয়েছে:

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ

"প্রত্যেক জাতিতেই সতর্ককারী প্রেরণ করা হয়েছে।"[৩৩৯]

এ সকল নবী-রাসূলের মোট সংখ্যা কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। বরং কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে যে, এ সব নবী-রাসূলগণের কারো কথা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (ﷺ) জানিয়েছেন এবং কারো কথা তিনি তাঁকে জানান নি। এরশাদ করা হয়েছে:

وَرُسُلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইতোপূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আপনাকে বলি নি।"[৩৪০]

আমাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ কথা যে নবী-রাসূলগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার বা ২ লক্ষ ২৪ হাজার। এখানে লক্ষণীয় যে, নবী-রাসূলগণের সংখ্যার বিষয়ে কোনো একটিও সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। একাধিক যয়ীফ বা মাউযূ হাদীসে এ বিষয়ে কিছু কথা বর্ণিত হয়েছে। ২ লক্ষ ২৪ হাজারের সুস্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত কোনো সনদ-সহ হাদীস আমি কোথাও দেখতে পাই নি। তবে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ও অন্য কিছু সংখ্যা এ ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

**ক. ১ লক্ষ ২৪ হাজার**

একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার। কিন্তু সবগুলো সনদই অত্যন্ত দুর্বল। কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ অর্থের হাদীসকে জাল বলে গণ্য করেছেন।

ইবনু হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিস তাদের সনদে ইবরাহীম ইবনু হিশাম ইবনু ইয়াহইয়া আল-গাস্‌সানী (২৩৮ হি) নামক তৃতীয় হিজরী শতকের একজন রাবীর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ইবরাহীম বলেন, আমাকে আমার পিতা, আমার দাদা থেকে, তিনি আবূ ইদরীস খাওলানী থেকে, তিনি আবূ যার গিফারী থেকে বলেছেন:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَمِ الأَنْبِيَاءُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ أَلْفاً قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَمِ الرُّسُلُ مِنْهُمْ قَالَ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ جَمٌّ غَفِيْرٌ

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি বলেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এদের মধ্যে রাসূল কত জন? তিনি বলেন, তিন শত তের জন, অনেক বড় সংখ্যা।"[৩৪১]

হাদীসটির বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনু হিশামের বিষয়ে মুহাদ্দিসদের কিছুটা মতভেদ রয়েছে। তাবারানী ও ইবনু হিব্বান তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী রাবী বলে চিহ্নিত করেছেন। আবূ যুরআ বলেন: লোকটি কায্যাব বা মহা-মিথ্যাবাদী। আবূ হাতিম রাযী তার কাছে হাদীস গ্রহণ করতে গমন করেন। তিনি তার কাছ থেকে তার পাণ্ডুলিপি নিয়ে তার মৌখিক বর্ণনার সাথে মিলিয়ে অগণিত বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্য দেখতে পান। ফলে তিনি বলেন: বুঝা যাচ্ছে যে, লোকটি কখনো

হাদীস শিক্ষার পিছনে সময় ব্যয় করে নি। লোকটি মিথ্যাবাদী বলে মনে হয়। যাহাবী তাকে মাতরূক বা পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৪২]

যেহেতু হাদীসটি ইবরাহীম ইবনু হিশাম ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেন নি, সেহেতু ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন।[৩৪৩]

ইমাম আহমাদ এ অর্থে অন্য একটি হাদীস সংকলন করেছেন। এ হাদীসে মু'আন ইবনু রিফা'আহ নামক একজন রাবী বলেন, আমাকে আলী ইবনু ইয়াযিদ বলেছেন, কাসিম আবূ আব্দুর রাহমান থেকে, তিনি আবূ উমামা (রা) থেকে... নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি বলেন ১ লক্ষ ২৪ হাজার... ।"[৩৪৪]

এ হাদীসের রাবী মু'আন ইবনু রিফা'আহ আস-সুলামী কিছুটা দুর্বল রাবী ছিলেন।[৩৪৫] তার উস্তাদ আলী ইবনু ইয়াযিদ আরো বেশি দুর্বল ছিলেন। ইমাম বুখারী তাকে 'মুনকার' বা 'আপত্তিকর' বলেছেন। ইমাম নাসাঈ, দারাকুতনী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে 'পরিত্যক্ত' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৪৬] তার উস্তাদ কাসিম আবূ আব্দুর রাহমানও (১১২ হি) দুর্বল ছিলেন। এমনকি ইমাম আহমাদ, ইবনু হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেছেন যে, কাসিম সাহাবীগণের নামে এমন অনেক কথা বর্ণনা করেন যে,মনে হয় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই এ ভুলগুলো বলছেন। তিনি দাবী করতেন যে, তিনি ৪০ জন বদরী সাহাবীকে দেখেছেন, অথচ তাঁর জন্মই হয়েছে প্রথম শতকের মাঝামাঝি।[৩৪৭]

এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এ হাদীসটিও অত্যন্ত দুর্বল। আরো দু একটি অত্যন্ত দুর্বল সনদে এ সংখ্যাটি বর্ণিত হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে এ সংখ্যাটি 'মাউযূ' না হলেও দুর্বল বলে গণ্য। আল্লাহই ভাল জানেন।[৩৪৮]

**খ. ৮ হাজার পয়গম্বর**

আবূ ইয়ালা মাউসিলী মূসা ইবনু আবীদাহ আর-রাবাযী থেকে, তিনি ইয়াযিদ ইবনু আবান আর-রাকাশী থেকে বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

بَعَثَ اللهُ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ نَبِيٍّ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ إِلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَأَرْبَعَةَ آلاَفٍ إِلَى سَائِرِ النَّاسِ

মহান আল্লাহ ৮ হাজার নবী প্রেরণ করেছেন। ৪ হাজার নবী বনী ইসরাঈলের মধ্যে এবং বাকী চার হাজার অবশিষ্ট মানব জাতির মধ্যে।"[৩৪৯]

এ হাদীসটিও দুর্বল। ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, এ সনদটিও দুর্বল। আর-রাবাযী দুর্বল। তার উস্তাদ রাকাশী তার চেয়েও দুর্বল।" ইবনু কাসীর আলোচনা করেছেন যে, আরো একটি সনদে এ সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। সনদটি বাহ্যত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[৩৫০]

**গ. এক হাজার বা তারও বেশি পয়গম্বর**

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنِّيْ خَاتِمُ أَلْفِ نَبِيٍّ أَوْ أَكْثَرَ

"আমি এক হাজার বা তারো বেশি নবীর শেষ নবী।"[৩৫১]

ইবনু কাসীর, হাইসামী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, সংখ্যার বর্ণনায় অন্যান্য হাদীসের চেয়ে এ হাদীসটি কিছুটা গ্রহণযোগ্য, যদিও এর সনদেও দুর্বলতা রয়েছে।[৩৫২]

**৫. নবী-রাসূলগণের নাম**

কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে: আদম[৩৫৩], ইদরীস[৩৫৪], নূহ[৩৫৫], হুদ[৩৫৬], সালিহ[৩৫৭], ইবরাহীম[৩৫৮], লূত[৩৫৯],

ইসমাঈল[৩৬০], ইসহাক[৩৬১], ইয়াকূব[৩৬২], ইউসূফ[৩৬৩], আইয়ূব[৩৬৪], শুয়াইব[৩৬৫], মূসা[৩৬৬], হারূন[৩৬৭], ইউনূস[৩৬৮], দাউদ[৩৬৯], সুলাইমান[৩৭০], ইল্‌ইয়াস[৩৭১], ইল্‌ইয়াসা'[৩৭২], যুলকিফল[৩৭৩], যাকারিয়া[৩৭৪], ইয়াহইয়া[৩৭৫], ঈসা[৩৭৬], মুহাম্মাদ[৩৭৭] (صلى الله عليهم وسلم)।[৩৭৮]

কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উযাইরকে ইহূদীগণ আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করত।[৩৭৯] কিন্তু তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَا أَدْرِيْ أَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ

"আমি জানি না যে, উযাইর নবী ছিলেন কি না।"[৩৮০]

মূসার খাদেম হিসাবে ইউশা ইবনু নূন-এর নাম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত কোনো সহীহ হাদীসে অন্য কোনো নবীর নাম উল্লেখ করা হয় নি। কোনো কোনো অত্যন্ত যয়ীফ বা জাল হাদীসে আদম (আ) এর পুত্র "শীস"-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কালুত, হাযকীল, হাযালা, শামূয়েল, জারজীস, শামঊন, ইরমিয়, দানিয়েল প্রমুখ নবীগণের নাম, জীবণবৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই মূলত ইসরাঈলীয় বর্ণনা ও সেগুলোর ভিত্তিতে মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণের মতামত।

**৬. আসমানী সহীফার সংখ্যা**

মহান আল্লাহ কুবআন কারীমে বারংবার বলেছেন যে, তিনি নবী ও রাসূলগণকে গ্রন্থাদি প্রদান করেছেন। কিন্তু এ সকল কিতাব ও সহীফার কোনো সংখ্যা কুরআন কারীমে বা কোনো সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি। '১০৪' কিতাব ও সহীফার কথাটি আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসে কথাটি পাওয়া যায় না। উপরে ১ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গম্বর' বিষয়ক যে হাদীসটি আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীসের মধ্যে এ ১০৪ সহীফা ও কিতাবের কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, এ হাদীসটি জাল অথবা অত্যন্ত দুর্বল।

**৭. নবী-রাসূলগণের বয়স বিষয়ক বর্ণনা**

কুরআন কারীমে নূহ (আ)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি ৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন। এছাড়া অন্য কোনো নবীর আয়ুষ্কাল কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয় নি। আদম (আ) এর আয়ুষ্কাল ১ হাজার বৎসর বলে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ক আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। নবীগণের আয়ুষ্কাল বিষয়ক যা কিছু আমাদের দেশে প্রচলিত বই পুস্তকে লিখিত রয়েছে সবই ইহূদী খৃস্টানগণের বিকৃত গ্রন্থাবলি থেকে গৃহীত তথ্য।

**৮. নবী-রাসূলগণের জীবন-বৃত্তান্ত**

নবী-রাসূলগণের জীবনবৃত্তান্ত কুরআন বা হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নি। ইলইয়াস, ইলইয়াসা' ও যুলকিফল (আ) সম্পর্কে শুধু নাম উল্লেখ ছাড়া কিছুই বলা হয় নি। ইদরীস (আ)-এর বিষয়টিও প্রায় অনুরূপ। অন্যান্য নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে তাঁদের জীবনের শিক্ষণীয় কিছু দিক শুধু আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের দেশের প্রচলিত 'কাসাসুল আম্বিয়া' ও বিভিন্ন নবীর জীবনী বিষয়ক পুস্তকাদিতে যা কিছু লিখা হয়েছে তার অধিকাংশই জাল, ভিত্তিহীন ও ইসরাঈলীয় রেওয়ায়াতের সমষ্টি। এ গ্রন্থের পরিসরে এ সকল দিক বিস্তারিত আলোচনা

সম্ভব নয়। এখানে সংক্ষেপে কিছু বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছি।

**৯. আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর গন্দম ফল ভক্ষণ**

আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত কথা যে, আদম (আ) গন্দম (গম) গাছের ফল খেয়েছিলেন। কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন এবং কুরআন বা হাদীসে কোথাও তা নেই। আদম ও হাওয়া (আ)-কে আল্লাহ একটি বিশেষ বৃক্ষের কাছে গমন করতে নিষেধ করেন। পরবর্তীতে তাঁরা শয়তানের প্ররোচনায় এ বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করেন। কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বৃক্ষ বা ফলের নাম কোথাও বলা হয় নি। পরবর্তী যুগে ইহূদীদের গল্পকাহিনীর ভিত্তিতে মুফাস্সিরগণ গম, আঙুর, খেজুর... ইত্যাদি বিভিন্ন গাছের নাম বলেছেন। এগুলো সবই অনুমানভিত্তিক কথা। হাদীসে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয় নি। মুমিনের দায়িত্ব হলো, এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, গাছের বা ফলের নাম জানা নয়। সর্বাবস্থায় এ সকল মানবীয় মতামতকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) কথা বলে মনে করা যাবে না।[৩৮১]

এ গন্দম ফল নিয়ে আরো অনেক বানোয়াট কথা আমাদের দেশের প্রচলিত কাসাসুল আম্বিয়া ও এ জাতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। আদমের মনে কূটতর্ক জন্মে, জিবরাঈল তা বের করে পুতে রাখেন, সেখান থেকে গন্দম গাছ হয় .... ইত্যাদি...। সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা।

বাইবেলে বলা হয়েছে যে, হাওয়া (আ) আগে ফল খান, এরপর আদম (আ)-কে প্ররোচিত করেন। এজন্য নারীকে জন্মগতভাবে অপরাধী বলে গণ্য করা হয়েছে (তীমথিয় ২/১২-১৪) কুরআন বা হাদীসে এভাবে কোথাও বলা হয় নি। কুরআনে সর্বদা ফলভক্ষণের জন্য আদমকে দায়ী করা হয়েছে।

**১০. আদম ও হাওয়ার (আ) বিবাহ ও মোহরানা**

কুরআনের বর্ণনা থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, আদম (আ)-এর জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয় এবং উভয়কে একত্রে জান্নাতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন, আদম জান্নাতে অবস্থানের কিছুদিন পরে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়।

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম থেকে হওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে এ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ কুরআন বা হাদীসে দেয়া হয় নি। মুফাসসিরগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। প্রচলিত আছে যে, আদম ও হাওয়ার মধ্যে বিবাহের মোহরান ছিল দরুদ শরীফ পাঠ... ইত্যাদি। এ সকল কথার কোনো ভিত্তি বা সনদ আছে বলে জানা যায় না।

**১১. ইবলিস কর্তৃক ময়ূর ও সাপের সাহায্য গ্রহণ**

ইবলিস সাপ ও ময়ূরের সাহায্যে আদম ও হাওয়া (আ)-কে প্ররোচনা প্রদানের চেষ্টা করে বলে অনেক কথা প্রচলিত রয়েছে। এগুলো ইহূদী-খৃস্টানদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন।[৩৮২]

**১২. আদম-হাওয়া (আ)-এর পৃথিবীতে অবতরণের পরে**

পৃথিবীতে অবতরণের পরে আদম ও হাওয়া (আ) সম্পর্কে কুরআনে কোনো কিছু বলা হয় নি। সহীহ হাদীসেও এ বিষয়ক বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তাঁরা কোথায় অবতরণ করেছিলেন, কোথায় বসবাস করেছিলেন, কি কর্ম করতেন, কোন্ ভাষায় কথা বলতেন, কিভাবে ইবাদত বন্দেগি করতেন, সংসার ও সমাজ জীবন কিভাবে যাপন করতেন ইত্যাদি বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ সকল বিষয়ে যা কিছু প্রচলিত প্রায় সবই মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণের মতামত বা বিভিন্ন গল্পকারদের গল্প। দু-একটি দুর্বল সনদের হাদীসও এ সকল বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

**১৩. আদম কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণ**

আদম (আ) পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন বলে প্রচলিত আছে। মূলত বিভিন্ন ঐতিহাসিক, মুফাস্সির বা আলিমের কথা এগুলো। এ বিষয়ক হাদীসগুলো দুর্বল সনদে বর্ণিত। কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ বিষয়ক সকল বর্ণনাই অত্যন্ত যয়ীফ ও বাতিল বলে গণ্য করেছেন। আল্লামা ইবনু কাসীর বাইতুল্লাহ বিষয়ক আয়াতগুলো উল্লেখ করে বলেন, এ সকল আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্ট জানিয়েছেন যে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য বিশ্বের সকল মানুষের জন্য নির্মিত সর্বপ্রথম বরকতময় ঘর 'বাইতুল্লাহ'কে ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেন। এ স্থানটি সৃষ্টির শুরু থেকেই মহা সম্মানিত ছিল। আল্লাহ সে স্থান ওহীর মাধ্যমে তাঁর খলীলকে দেখিয়ে দেন। তিনি আরো বলেন:

لَمْ يَجِئْ فِيْ خَبَرٍ صَحِيْحٍ عَنِ الْمَعْصُوْمِ أَنَّ الْبَيْتَ كَانَ مَبْنِيًّا قَبْلَ الْخَلِيْلِ... كُلُّ هَذِهِ الأَخْبَارُ عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَقَدْ قَرَّرْنَا أَنَّهَا لاَ تُصَدَّقُ وَلاَ تُكَذَّبُ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে একটিও সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি যে, ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে কাবা ঘর নির্মিত হয়েছিল... এ বিষয়ক সকল বর্ণনা ইসরাঈলীয় রেওয়ায়াত। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এগুলোকে সত্যও মনে করা যাবে না, মিথ্যাও বলা যাবে না।"[৩৮৩]

**১৪. নূহ (আ) এর নৌকায় মলত্যাগ করা ও পরিষ্কার করা**

এ বিষয়ে অনেক মুখরোচক গল্প প্রচলিত রয়েছে। এগুলোর কোনো ভিত্তি কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে আছে বলে জানতে পারি নি। বাহ্যত এগুলো বানোয়াট গল্প যা গল্পকাররা বানিয়েছে। নূহ (আ) এর নৌকার বিবরণ, কোন্ কাঠে তৈরি, তাতে কোন্ প্রাণী কোথায় ছিল, শয়তান কিভাবে প্রবেশ করল ইত্যাদি বিষয়েও অগণিত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কাহিনী প্রচলিত। এ সকল বিষয়ে সহীহ হাদীসে কোনো তথ্য দেয়া হয় নি।[৩৮৪]

**১৫. ইদরীস (আ)-এর সশরীরে আসমানে গমন**

কুরআন কারীমে দু স্থানে 'ইদরীস' (আ)-এর উল্লেখ রয়েছে। একস্থানে এরশাদ করা হয়েছে: "এবং ইসমাঈল, এবং ইদরীস এবং যুল কিফ্ল সকলেই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।"[৩৮৫] অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

"এবং স্মরণ কর এ কিতাবের মধ্যে ইদরিসের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ স্থানে (মর্যাদায়)।"[৩৮৬]

হাদীস শরীফেও ইদরীস (আ) সম্পর্কে তেমন কোনো কিছু উল্লেখ করা হয় নি। তাঁর জন্ম, বংশ, পরিচয়, কর্মস্থল, ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই ইসরাঈলীয় বর্ণনা বা গল্পকারদের বানোয়াট কাহিনী। বিশেষ করে আমাদের সমাজে প্রসিদ্ধ আছে যে, চার জন নবী চিরজীবী: খিযির ও ইলিয়াস (আ) পৃথিবীতে এবং ইদরীস ও ঈসা (আ) আসমানে। প্রচলিত আছে যে, ইদরীস (আ)-কে জীবিত অবস্থায় সশরীরের ৪র্থ বা ৬ষ্ঠ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সেখানে জীবিত আছেন অথবা সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় এবং এরপর আবার জীবিত হন....। এ সবই ইসরাঈলীয় রেওয়ায়াত। ঈসা (আ) ছাড়া অন্য কোনো নবীর জীবিত থাকা, জীবিত অবস্থায় আসমানে গমন ইত্যাদি কোনো কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয় নি।

আল্লাহ তাঁকে উচ্চ স্থানে উন্নীত করেছেন অর্থ তাঁকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। যে মর্যাদার একটি বিশেষ দিক হলো আল্লাহ ইন্তেকালের পরে তাঁকে অন্য কয়েকজন মহান নবী-রাসূলের সাথে রূহানীভাবে আসমানে স্থান দান করেছেন। সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আসমানে ৮ জন নবীর সাথে সাক্ষাত করেন। ১ম আসমানে আদম, ২য় আসমানে ইয়াহইয়া ও ঈসা, ৩য় আসমানে ইউসূফ, ৪র্থ আসমানে ইদরীস, পঞ্চম আসমানে হারূন, ৬ষ্ঠ আসমানে মূসা ও ৭ম আসমানে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়।[৩৮৭] শুধু ঈসা (আ) ব্যতীত অন্য সকল নবীকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে।[৩৮৮]

**১৬. হূদ (আ) ও শাদ্দাদের বেহেশত**

শাদ্দাদের জন্ম কাহিনী, শাদ্দাদ ও শাদীদের জীবন কাহিনী, শাদ্দাদের বেহেশতের লাগামহীন বিবরণ, বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে তার মৃত্যু ইত্যাদি যা কিছু কাহিনী বলা হয় সবই বানোয়াট, ভিত্তিহীন কথা। কিছু ইহূদীদের বর্ণনা ও কিছু জালিয়াগণের কাল্পনিক গল্প কাহিনী। এ বিষয়ক কোনো কিছুই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয় নি। অনেকে আবার এ মিথ্যাকে আল্লাহর নামেও চালিয়েছেন। এক লেখক লিখেছেন: "সে বেহেশতের কথা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও কোরআন পাকে উল্লেখ করেছেন যে, হে মুহাম্মাদ!, শাদ্দাদ পৃথিবীতে এমন বেহেশত নির্মাণ করেছিল, দুনিয়ার কোনো মানুষ কোনোদিনই ঐরূপ প্রাসাদ বানাতে পারে নাই...।"[৩৮৯]

আল্লাহর কালামের কি জঘন্য বিকৃতি!! এখানে কুরআনের সূরা ফাজ্র-এর ৬-৭ আয়াতের অর্থকে বিকৃত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মূলত অনেক মুফাস্সির এ আয়াতের তাফসীরে সনদ বিহীনভাবে এ সকল বানোয়াট কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। আবার 'কাসাসুল আম্বিয়া' জাতীয় গ্রন্থে সনদ বিহীনভাবে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। সবই মিথ্যা কথা।

এ বিষয়ে ইবনু কাসীর বলেন: "অনেক মুফাস্সির এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইরাম শহর সম্পর্কে এ সকল কথা বলেছেন। এদের কথায় পাঠক ধোঁকাগ্রস্ত হবেন না। ... এ সকল কথা সবই ইহূদীদের কুসংস্কার ও তাদের কোনো কোনো যিনদীকের বানোয়াট কল্প কাহিনী। এগুলো দিয়ে তারা মুর্খ সাধারণ জনগণের বুদ্ধি যাচাই করে, যারা যা শোনে তাই বিশ্বাস করে।..."[৩৯০]

**১৭. ইবরাহীম (আ)-এর পিতা**

আল্লাহ কুরআনকে তাওরাত, যাবূর ও ইনজীলের বিশুদ্ধতা বিচারের মানদণ্ড বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরকারক বা আলিম বাইবেলের বর্ণনাকে বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করে তার ভিত্তিতে কুরআনের বর্ণনাকে ব্যাখ্যা করেন। এর একটি উদাহরণ হলো ইবরাহীম (আ) এর পিতার নাম। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ

"এবং যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা আযরকে বললেন"[৩৯১]

এখানে সুস্পষ্টভাবে ইবরাহীমের পিতার নাম 'আযর' বলা হয়েছে। কিন্তু বাইবেলে বলা হয়েছে যে ইবরাহীমের পিতার নাম ছিল 'তেরহ'[৩৯২]। কুরআন কারীমে সাধারণত নবুয়ত, দাওয়াত ও মু'জিযা বিষয়ক তথ্য ছাড়া নবীগণের পিতা, মাতা, জন্মস্থান, জীবনকাল ইত্যাদি বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য আলোচনা করা হয় না। কখনো কখনো ইহূদীদের মিথ্যাচারের প্রতিবাদের জন্য কিছু তথ্য প্রদান করা হয়। যেমন ইহূদীরা তাদের বাইবেল বিকৃত করে লিখেছে যে, আল্লাহ ৬ দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং ৭ম দিনে বিশ্রাম করেন। এ কুসংস্কার ও মিথ্যা অপসারণ করতে আল্লাহ বলেন: ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করতে কোনোরূপ ক্লান্তি বা কষ্ট তাঁকে স্পর্শ করে নি (সূরা কাফ: ৩৩ আয়াত)। এখানে ইবরাহীমের পিতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত ইবরাহীমের পিতার নামের ক্ষেত্রে ইহূদীদের ভুলটি তুলে ধরা।

সর্বাবস্থায় মুমিনের জন্য কুরআন-হাদীসের বর্ণনার পরে আর কোনো বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। এ জন্য অধিকাংশ প্রাজ্ঞ মুফাস্সির বলেছেন যে, ইবরাহীম (আ) -এর পিতার নাম 'আযর' ছিল। কুরআনের এ তথ্যই চূড়ান্ত। ইহূদী-খৃস্টানদের তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেয়ার কোনো প্রয়োজন মুসলিম উম্মাহর নেই। বাইবেলের বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে কোনো কোনো মুফাস্সির সমন্বয় করতে চেয়েছেন। কেউ বলেছেন, আযর ও তেরহ দু'টিই ইবরাহীম (আ) -এর পিতার নাম ছিল। যেমন ইয়াকূব (আ)-এর আরেকটি নাম ইসরাঈল। কেউ বলেছেন, একটি ছিল তার উপাধি ও একটি ছিল তার নাম। অনুরূপ আরো কিছু মতামত আছে। এ সকল ব্যাখ্যায় কুরআনের বর্ণনাকে বিকৃত করা হয় নি। সকলেই একমত যে, এখানে 'তাহার পিতা' বলতে ইবরাহীমের জন্মদাতা পিতাকে বুঝানো হয়েছে এবং 'আযর' তারই নাম অথবা উপাধি...।[৩৯৩]

তবে সবচেয়ে জঘন্য ও মিথ্যা একটি মত প্রচলিত যে, বাইবেলের বর্ণনাই ঠিক, ইবরাহীমের পিতার নাম ছিল তেরহ। তার নাম আযর ছিল না। তারা কুরআনের বর্ণনাকে সরাসরি মিথ্যা না বলে এর একটি উদ্ভট ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, ইবরাহীমের এক চাচার নাম ছিল আযর। কুরআনে চাচাকেই 'পিতা' বলা হয়েছে। এভাবে তারা বাইবেলের বর্ণনাকে বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে কুরআনের আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থকে বিকৃত করেছেন।

'পিতা' অর্থ 'চাচা' বলা মূলত কুরআনের অর্থের বিকৃতি। 'পিতৃগণ' বা 'বাপদাদাগণ' বলতে পিতা, দাদা, চাচাকে বুঝানো সকল সমাজেই স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু ইবরাহীম (আ) আযরকে বারবার 'হে পিতা' বলে ডেকেছেন (সূরা মরিয়ম ৪২-৪৫)। আর জন্মদাতা পিতা ছাড়া কাউকে পিতা বলে ডাকার প্রচলন আরবী ভাষায় ছিল না এবং এখনো নেই। জন্মদাতা পিতা ছাড়া কাউকে নিজের পিতা বলা বা নিজেকে তার সন্তান বলে দাবি করা হাদীসে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সর্বোপরি কুরআনের স্পষ্ট অর্থ অন্যান্য আয়াত বা হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া রূপক ভাবে ব্যাখ্যা করা বিকৃতির নামান্তর। সহীহ বুখারীতে সংকলিত হাদীস থেকেও আমরা জানতে পারি যে, আযরই ইবরাহীমের জন্মদাতা পিতা এবং এ আযরকেই ইবরাহীম কিয়ামতের দিন ভর্ৎসনা করবেন এবং একটি জন্তুর আকৃতিতে তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে।[৩৯৪]

এ অপব্যাখ্যা সমর্থন করার জন্য কেউ কেউ দাবি করেন যে, ইবরাহীমের জন্মদাতা পিতা কাফির ছিলেন না; কারণ আদম (আ) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কাফির-মুশরিক ছিলেন না। এ কথাটি ভিত্তিহীন এবং কুরআন, সহীহ হাদীস ও ঐতিহাসিক তথ্যাদির সুস্পষ্ট বিপরীত। কুরআন এবং অনেক সহীহ হাদীসে বারংবার ইবরাহীমের পিতাকে কাফির বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব কুফরী ধর্মের উপর ছিলেন বলে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালিবকে মৃত্যুর সময়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করে বলেন আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরেই থাকব।[৩৯৫] স্বভাবতই আমর ইবনু লুহাই-এর যুগ থেকে আব্দুল মুত্তালিবের যুগ পর্যন্ত পূর্বপুরুষগণও শিরকের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন, যদিও তাঁরা সততা, নৈতিকতা, জনসেবা ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৩৯৬] রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর পূর্বপুরুষগণ সকলেই অনৈতিকতা, ব্যভিচার ও অশ্লীলতা মুক্ত ছিলেন।[৩৯৭]

**১৮. ইবরাহীম (আ) এর তাওয়াক্কুল**

ইবরাহীম (আ)-এর নামে প্রচলিত একটি বানোয়াট গল্প নিম্নরূপ: তাঁকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন জিবরাঈল (আ.) এসে তাঁকে বলেন: আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন। তিনি বলেন: আপনার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। জিবরাঈল (আ.) বলেন: তাহলে আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করুন। তখন তিনি বলেন:

حَسْبِيْ مِنْ سُؤَالِيْ عِلْمُهُ بِحَالِيْ

"তিনি আমার অবস্থা জানেন, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট, অতএব আমার আর কোনো প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।"

এ কাহিনীটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী, সনদহীনভাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। মুহাদ্দিসগণ একে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। কুরআন কারীমে ইবরাহীম (আ)-এর অনেক দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কখনো কোনো প্রয়োজনে দোয়া করেন নি এরূপ কোনো ঘটনা কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত হয় নি।[৩৯৮]

'তাওয়াক্কুলের' নামে দোয়া পরিত্যাগ করা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার বিপরীত। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকল বিষয় আল্লাহর কাছে চাইতে হাদীস শরীফে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানার জন্য পাঠককে **'রাহে বেলায়াত'** বইটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

**১৯. ইসমাঈলের (আ) গলায় ছুরি চালানো**

কুরআন কারীমে সূরা 'সাফ্‌ফাত'-এ মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আ) কর্তৃক পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়ার বিষয় উলেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন: "(ইবরাহীম বলল) হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এক সৎকর্ম-পরায়ণ সন্তান দান কর। অতঃপর আমি তাকে এক স্থির-বুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করবার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল, বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলল, হে আমার পিতা, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করে থাকি।"[৩৯৯]

এখানে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক মিথ্যা ও কুরআন-হাদীসের বর্ণনার বিপরীত কথা হাদীস ও তাফসীর হিসাবে প্রচলিত। কয়েকটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**(ক)** কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবরাহীম তার পুত্রকে জবাই করতে স্বপ্নে দেখেছিলেন। আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যে, ইবরাহীম স্বপ্নে দেখেন যে, 'তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কুরবানী কর।' এ কথাটি ভিত্তিহীন; কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে এরূপ কথা বর্ণিত হয় নি।

**(খ)** কুরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবরাহীম তাঁর পুত্রকে জানান যে, তিনি তাঁকে জবাই করার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু প্রচলিত আছে যে, ইবরাহীম তাঁর স্ত্রীকে ও পুত্রকে দাওয়াত খাওয়া... ইত্যাদি মিথ্যা কথা বলে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যান। ... সর্বশেষ তিনি পুত্রকে সত্য কথাটি জানান। এ সকল কথা কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয় নি। এ ছাড়া এই কথাগুলো নবীগণের মর্যাদার খেলাফ। আল্লাহর খলীল তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে কেন মিথ্যা কথা বলবেন?

**(গ)** প্রচলিত আছে যে, ইবরাহীম পুত্র ইসমাঈলকে দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধেন। এরপর শুইয়ে তাঁর গলায় বারংবার ছুরি চালান....। এগুলো সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা। কুরআনে তো সুস্পষ্টই বলা হচ্ছে যে, জবাই করার প্রস্তুতি নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান এসে যায়। কোনো ছুরি চালানোর ঘটনা ঘটে নি। হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে যে, জবাইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার সময়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিকল্প জানোয়ার প্রদান করা হয়।[৪০০]

এ বিষয়ে ত্রয়োদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ সিরিয় মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ দরবেশ হূত (১২৭৬ হি) বলেন, ইবরাহীম (আ)-এর বিষয়ে যে গল্প প্রচলিত আছে যে, তিনি তাঁর পুত্রের গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন, কিন্তু কাটে নি... এ গল্পটি জাল, মিথ্যা এবং যিন্দীকদের বানানো...।[৪০১]

**২০. আইউব (আ)-এর বালা-মুসিবৎ**

কুরআনে বলা হয়েছে যে, আইউব (আ) বিপদগ্রস্থ হয়ে সবর করেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাকে বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন। তাঁকে তাঁর সম্পদ ও সন্তান ফিরিয়ে দেন।[৪০২]

আইউব (আ)-এর বালা-মুসিবত বা বিপদাপদের প্রকৃতি, ধরন, বিবরণ, সময়কাল, তাঁর স্ত্রীর নাম, আত্মীয় স্বজনের নাম ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো বর্ণনা কুরআন কারীম বা সহীহ হাদীসে নেই। এ বিষয়ক যা কিছু বলা হয় সবই মূলত ইসরাঈলীয় রেওয়ায়াত। অধিকাংশ বিবরণের মধ্যে লাগামহীন কাল্পনিক বর্ণনা রয়েছে। বিভিন্ন মুফাস্সির এ বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলেছেন। বিশেষত, ওয়াহ্‌ব ইবনু মুনাব্বিহ, কা'ব আল-আহবার প্রমুখ তাবিয়ী আলিম, যারা ইহূদী ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইহূদীদের ধর্মগ্রন্থ ও তাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন তাঁরাই এ সকল গল্প 'গল্প' হিসেবে বলেছেন।[৪০৩]

এগুলোকে গল্প হিসাবে বলা যেতে পারে, কিন্তু কখনোই সত্য মনে করা যাবে না। বিশেষত এ সকল গল্পে আইয়ূব (আ)-এর

রোগব্যাধির এমন কাল্পনিক বিবরণ রয়েছে যা একজন নবীর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হলে আমরা তা গ্রহণ করতাম ও ব্যাখ্যা করতাম। কিন্তু যেহেতু কোনো সহীহ হাদীসে এ বিষয়ে কিছুই বর্ণিত হয় নি এবং এগুলো ইসরাঈলীয় বর্ণনা ও গল্পকারদের গল্প, সেহেতু এগুলো পরিত্যাজ্য। এ বিষয়ে দরবেশ হূত (১২৭৬ হি) বলেন, "আইয়ূব (আ)-এর গল্পে বলা হয় যে, আল্লাহ তাঁর উপরে ইবলিসকে ক্ষমতাবান করে দেন। তখন ইবলিস তাঁর দেহের মধ্যে ফুঁক দেয়। এতে তাঁর দেহ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। এমনকি তার শরীরের মাংস পচে যায় ও পোকা পড়তে থাকে ... ইত্যাদি। এগুলো গল্পকাররা বলেন এবং কোনো কোনো মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন। ... এ সকল কথা সবই নির্ভেজাল জাল, মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। যে-ই একথা বলুন বা উদ্ধৃত করুন না কেন, তাঁর মর্যাদা যত বেশিই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। এ সকল কথা আল্লাহর কিতাবে বলা হয় নি এবং তাঁর রাসূলের (ﷺ) কোনো হাদীসেও তা বর্ণিত হয় নি। এমনকি কোনো যয়ীফ বা বাতিল সনদের হাদীসেও তা বর্ণিত হয় নি। এ সবই সনদ বিহীন বর্ননা..।"[৪০৪]

**২১. দায়ূদ (আ) এর প্রেম**

নবী দায়ূদ (আ) এর সম্পর্কে একটি অত্যন্ত নোংরা গল্প বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ ও পরবর্তী যুগের দুই একটি হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়। গল্পটি মূলত ইহূদীদের বাইবেল থেকে ও তাবিয়ীগণের যুগে বিদ্যমান ইহূদী আলিমদের মুখ থেকে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে কোনো কোনো গ্রন্থে এ ঘটনাটিকে রাসূলুল্লাহর ﷺ নামেও প্রচার করা হয়েছে।

ইহূদী-খৃস্টানগণ তাওরাত-যাবুর-ইঞ্জিলের মধ্যে অনেক জাল অশ্লীল গল্প-কাহিনী সংযোজন করেছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি দায়ূদ (আ)-এর নামে প্রেম, ব্যভিচার ও হত্যার কাহিনী। এ গল্পটি মুসলিম সমাজে কিছুটা সংশোধিতরূপে প্রচারিত। গল্পটির সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ: একদিন দায়ূদ (আ) হঠাৎ করে একজন গোসলরত মহিলাকে এক নজর দেখে ফেলেন। এতে তিনি মহিলাটির উপর অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন। মহিলাটির স্বামীর নাম ছিল উরিয়া। তিনি একজন যোদ্ধা ছিলেন। দায়ূদ প্রধান সেনাপতির সাথে ষড়যন্ত্র করেন উরিয়াকে যুদ্ধের মাঠে হত্যা করার জন্য। এক পর্যায়ে উরিয়া যুদ্ধে নিহত হলে দায়ূদ ঐ মহিলাকে বিবাহ করেন।[৪০৫] বাইবেলে এ ঘটনাটি আরো অনেক নোংরাভাবে লেখা হয়েছে।[৪০৬]

এ ঘটনাটি শুধু মিথ্যা এবং নবীদের প্রকৃতির বিরোধীই নয়; উপরন্তু তা মানবীয় বুদ্ধিরও বিপরীত। একজন বিবেকবান বয়স্ক মানুষ, যার কয়েক ডজন স্ত্রী বিদ্যমান এবং যিনি একজন জনপ্রিয় শাসক- তিনি একটিবার মাত্র দৃষ্টি পড়ার ফলে এমন ভাবে প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়বেন এবং এরূপ হত্যা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেবেন তা কল্পনা করা যায় না।[৪০৭]

**২২. হারুত মারুত**

ইহূদীগণের মধ্যে যাদুর প্রচলন ছিল। তারা আরো দাবি করত যে, সুলাইমান (আ) যাদু ব্যবহার করেই ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তারা আরো দাবি করত যে, স্বয়ং সুলাইমান (আ) এবং হারূত ও মারূত নামক দুই ফিরিশতা তাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছেন। এদের এ মিথ্যাচারের প্রতিবাদে কুরআন কারীমে সূরা বাকারার ১০২ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ

"এবং সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত তারা (ইহূদীরা) তা অনুসরণ করত। সুলামইমান কুফুরী করেন নি কিন্তু শয়তানরাই কুফুরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। এবং যা বাবিলে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা কাউকে শিক্ষা দিত না, এ কথা না বলা পর্যন্ত যে, 'আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, সুতরাং তোমরা কুফুরী করিও না।..."

এ আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যায় সাহাবী ও তাবিয়ীগণের যুগ থেকেই মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) ও অন্য কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, হারূত ও মারূতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আরবী (ما) অর্থ (না)। অর্থাৎ হারূত মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপরেও যাদু অবতীর্ণ করা হয় নি। সুলাইমানের (আ) সম্পর্কে ইহূদীদের দাবি যেমন মিথ্যা, হারূত ও মারূত সম্পর্কেও তাদের দাবি মিথ্যা।

তবে অধিকাংশ মুফাস্সির বলেছেন যে, ইহূদীগণ যখন কারামত-মুজিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য না করে সবকিছুকেই যাদু বলে দাবি করতে থাকে তখন আল্লাহ দু'জন ফিরিশতাকে দায়িত্ব প্রদান করেন যাদুর প্রকৃতি এবং যাদু ও মুজিযার মধ্যে পার্থক্য শিক্ষা দানের জন্য। তারা মানুষদেরকে এ পার্থক্য শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, তোমরা এই জ্ঞানকে যাদুর জন্য ব্যবহার করে কুফুরী করবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকেই যাদু ব্যবহারের কুফুরীতে নিমগ্ন হতো। কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন, তাঁরা দুইজন মানুষ ছিলেন; বিশেষ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য বা সৎকর্মশীলতার কারণে তাদেরকে মানুষ ফিরিশতা বলে অভিহিত করতো। তাঁরা এভাবে মানুষদেরকে যাদুর অপকারিতা শিক্ষা দিতেন।

হারূত ও মারূত সম্পর্কে কুরআনে আর কোনো কিছুই বলা হয় নি। সহীহ হাদীসেও এ বিষয়ে কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু এ বিষয়ক অনেক গল্প-কাহিনী হাদীস নামে বা তাফসীর নামে তাফসীরের গ্রন্থগুলোতে বা সমাজে প্রচলিত। কাহিনীটির সার-সংক্ষেপ হলো, মানব জাতির পাপের কারণে ফিরিশতাগণ আল্লাহকে বলেন, মানুষের এত অপরাধ আপনি ক্ষমা করেন কেন বা শাস্তি প্রদান করেন না কেন? আল্লাহ তাদেরকে বলেন, তোমরাও মানুষের মত প্রকৃতি পেলে এরূপ পাপ করতে। তারা বলেন, কক্ষনো না। তখন তারা পরীক্ষার জন্য হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফিরিশতাকে নির্বাচন করেন। তাদেরকে মানবীয় প্রকৃতি প্রদান করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তারা যোহরা নামক এক পরমা সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে মদপান, ব্যভিচার ও নরহত্যার পাপে জড়িত হন। পক্ষান্তরে যোহরা তাদের কাছ থেকে মন্ত্র শিখে আকাশে উড়ে যায়। তখন তাকে একটি তারকায় রূপান্তরিত করা হয়। ...

এ গল্পগুলো মূলত ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী। তবে কোনো কোনো তাফসীর গ্রন্থে এগুলি হাদীস হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ক সকল হাদীসই অত্যন্ত দুর্বল বা জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদের কারণে কয়েকটি বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। অনেক মুহাদ্দিস সবগুলোই জাল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

আলামা কুরতুবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল গল্প ফিরিশতাগণ সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীত। ইহূদী, খৃস্টান ও অন্যান্য অনেক ধর্মে ফিরিশতাগণকে মানবীয় প্রকৃতির বলে কল্পনা করা হয়। তাদের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত শক্তি আছে বলেও বিশ্বাস করা হয়। ইসলামী বিশ্বাসে ফিরিশতাগণ মানবীয় প্রবৃত্তি, নিজস্ব চিন্তা বা আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদের প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র। তাঁরা মহান আল্লাহকে কিছু জানার জন্য প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা আল্লাহর কোনো কর্ম বা কথাকে চ্যালেঞ্জ করবেন এরূপ কোনো প্রকারের প্রকৃতি তাদের মধ্যে নেই। কাজেই এ সকল কাহিনী ইসলামী আকীদার বিরোধী।

এ বিষয়ে আল্লামা ইবনু কাসীর ও অন্যান্য কতিপয় মুহাদ্দিস সকল বর্ণনা একত্রিত করে তুলনামূলক নিরীক্ষার ভিত্তিতে বলেছেন যে, এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো প্রকার হাদীস সহীহ বা নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। তাঁর নামে বর্ণিত এ বিষয়ক হাদীসগুলো জাল। তবে সাহাবীগণ থেকে তাঁদের নিজস্ব কথা হিসাবে এ বিষয়ে কিছু কিছু বর্ণনার সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। একথা খুবই প্রসিদ্ধ যে এ সকল বিষয়ে কোনো কোনো সাহাবী (রা) ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনী শুনতেন ও বলতেন। সম্ভবত এ সকল বর্ণনার ভিত্তিতেই তারা এগুলি বলেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।[৪০৮]

# তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ
# রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিষয়ক জাল হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সীমাহীন ও অতুলনীয় মর্যাদা, ফযীলত, মহত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে কুরআন কারীমের অগণিত আয়াতে এবং অগণিত সহীহ হাদীসে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের ভাব-গম্ভীর ভাষা, বুদ্ধিবৃত্তিক আবেদন ও আত্মিক অনুপ্রেরণা অনেক মুমিনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এজন্য অধিকাংশ সময়ে আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল আয়াত ও সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে সাধারণত একেবারে ভিত্তিহীন বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীসগুলো আমরা সর্বদা আলোচনা করি, লিখি ও ওয়ায নসীহতে উল্লেখ করি।

আমরা দেখেছি যে, মুসলিম সমাজে প্রচলিত জাল হাদীসের অন্যতম তিনটি ক্ষেত্রঃ (১) ফাযায়িল বা বিভিন্ন নেক আমলের সাওয়াব বিষয়ক গ্রন্থাদি, (২) পূববর্তী নবীগণ বা কাসাসুল আম্বিয়া জাতীয় গ্রন্থাদি এবং (৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম, জীবনী, মুজিযা বা সীরাতুন্নবী বিষয়ক গ্রন্থাদি। যুগের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে এ সকল বিষয়ে জাল ও ভিত্তিহীন কথার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ হিজরী শতকে সংকলিত সীরাত, দালাইল বা মুজিযা বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে অগণিত ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনা স্থান পেয়েছে, যেগুলো পূর্ববর্তী কোনো হাদীসের গ্রন্থ তো দূরের কথা, কোনো সীরাত বা মুজিযা বিষয়ক গ্রন্থেও পাওয়া যায় না।

আল্লামা আবুল কালাম আযাদ তার 'রাসূলে রহমত' গ্রন্থে তুলনামূলক আলোচনা ও নিরীক্ষা করে এ জাতীয় কিছু বানোয়াট ও ভিত্তিহীন গল্পের উল্লেখ করেছেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্মের পূর্বে আসিয়া (আ) ও মরিয়ম (আ)-এর শুভাগমন, মাতা আমিনাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্মের সুসংবাদ প্রদান, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গর্ভধারণের শুরু থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়ে হযরত আমিনার কোনোরূপ কষ্টক্লেশ না হওয়া... ইত্যাদি।[৪০৯]

কেউ কেউ মনে করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা দ্বারা আমরা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করছি। কত জঘন্য চিন্তা! মনে হয় তাঁর সত্য মর্যাদায় ঘাটতি পড়েছে যে, মিথ্যা দিয়ে তা বাড়াতে হবে!! নাঊযু বিল্লাহ! মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) সবচেয়ে অসন্তুষ্ট হন মিথ্যায় এবং সবচেয়ে জঘন্য মিথ্য হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা।

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ পূর্ববর্তী নবীগণকে (আ) মূর্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনেক মুজিযা প্রদান করেছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ-কেও তিনি অনেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুজিযা দিয়েছেন। তবে তাঁর মৌলিক মুজিযা বিমূর্ত বা জ্ঞানবৃত্তিক। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মানুষকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুজিযা অনুধাবনে সক্ষম করে। অনেক সময় সাধারণ মুর্খ মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ, অবাক করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে গল্পকার, ওয়ায়িয বা জালিয়াতগণ অনেক মিথ্যা গল্প কাহিনী বানিয়ে হাদীস নামে চালিয়েছেন।

অনেক সময় এ বিষয়ক মিথ্যা হাদীসগুলো চিহ্নিত করাকে অনেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা ও শানের সাথে বেয়াদবী বলে ভাবতে পারেন। বস্তুত তাঁর নামে মিথ্যা বলাই তাঁর সাথে সবচেয়ে বেশি বেয়াদবী ও দুশমনী। যে মিথ্যাকে শয়তানের প্ররোচনায় মিথ্যাবাদী তাঁর মর্যাদার পক্ষে ভাবছে সে মিথ্যা মূলত তাঁর মর্যাদা-হানিকর। মিথ্যার প্রতিরোধ করা, মিথ্যা নির্ণয় করা এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ। এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেন্দ্রিক কিছু বানোয়াট কথা উল্লেখ করছি।

## প্রথম প্রসঙ্গঃ জন্ম, মর্যাদা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

### ১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অলৌকিক জন্মগ্রহণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ অলৌকিকভাবে মাতৃগর্ভে স্থান নেন এবং মাতৃগর্ভ থেকে অলৌকিকভাবে বের হয়ে আসেন মর্মে নানা রকমের গল্প প্রচলিত। এগুলি সবই সনদবিহীন, দলীলবিহীন ও মনগড়া মিথ্যা। বিশ্বের কোনো গ্রন্থে এ মর্মে সনদ-সহ কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস পাওয়া যায় না।

এখানে একটি কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের মধ্যে অনেকেই আবেগতাড়িত হয়ে বা অজ্ঞতাবশত মনে করেন, অলৌকিকত্ব সম্ভবত মর্যাদার মাপকাঠি। এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। এ ভুল ধারণাকে পুঁজি করে খৃস্টান মিশনারিগণ আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে অপপ্রচার চালান। তাদের একটি লিফলেটে বলা হয়েছেঃ কে বেশি বড়ঃ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ না ঈসা মসীহ? ঈসা মসীহ বিনা পিতায় জন্মলাভ করেছেন আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর পিতা ছিল। ঈসা মসীহ মৃতকে জীবিত করতেন কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ করতেন না। ঈসা মসীহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেন নি কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন।... এভাবে মুসলিম আকীদার কিছু বিষয়কে বিকৃত করে এবং প্রচলিত ভুল ধারণাকে পুঁজি করে তারা মুসলিম জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

অলৌকিকত্ব কখনোই মর্যাদার মাপকাঠি নয়। নবীদেরকে আল্লাহ অলৌকিকত্ব বা মুজিযা প্রদান করেন হেদায়েতের প্রয়োজন অনুসারে, মর্যাদা অনুসারে নয়। মর্যাদার মানদণ্ড আল্লাহর ঘোষণা। এছাড়া দুনিয়ার ফলাফল আমরা পর্যালোচনা করতে পারি। মিশনারি প্রতারণার একটি দিক দেখুনঃ

ঈসা (আ)-এর জন্ম অলৌকিক। এছাড়া মৃতকে জীবিত করা, অন্ধকে বা কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করা ইত্যাদি মুজিযা তাকে প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মর্যাদা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি নয়। কারণ প্রথমত আল্লাহর ঘোষণা। দ্বিতীয়ত জাগতিক ফলাফলও তা প্রমাণ

করে। প্রচলিত বাইবেল থেকে বিচার করলে বলতে হবে যে, হেদায়েতের ক্ষেত্রে ঈসা (আ)-এর দাওয়াতের ফল সবচেয়ে কম। আল্লাহর হুকুমে তিনি রুগীকে সুস্থ করেছেন ও মৃতকে জীবিত করেছেন। বরং বাইবেল পড়লে মনে হয় জিনভুত ছাড়ানো ছাড়া আর কোনো বিশেষ কাজই তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি অনেক অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করতে বা অনেক মৃত হৃদয়কে জীবিত করেতে পারেন নি। আল্লাহর হুকুমে তিনি অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, কিন্তু বিশ্বাসে অন্ধকে চক্ষু দান করতে পারেন নি। মাত্র ১২ জন বিশেষ শিষ্যের বিশ্বাসও এত দুর্বল ছিল যে, একজন তাঁকে কয়েকটি টাকার বিনিময়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করল এবং তাঁর প্রধান শিষ্য তাঁর গ্রেফতারের পর পুলিশের ভয়ে তাঁকে অস্বীকার করেন ও গালি দেন![৪১০] **কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম** বইটি পড়ে বিস্তারিত জানুন।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুলাহ (ﷺ)-কে অনেক অলৌকিকত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অলৌকিকত্ব হলো লক্ষাধিক মানুষকে বিভ্রান্তির অন্ধত্ব থেকে বিশ্বাসের আলোক প্রদান করা ও লক্ষাধিক মৃত হৃদয়কে জীবন দান করা। কাজেই অলৌকিকত্ব সম্পর্কে মিথ্যা, দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য কথাবার্তাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা, সেগুলোকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদার মাপকাঠি বা নবুয়তের প্রমাণ মনে করা ইসলামের মূল চেতনার বিপরীত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা, নুবুওয়াত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে কুরআনই যথেষ্ট। এর পাশাপাশি সহীহ হাদীসগুলির উপর আমরা নির্ভর করব। আমাদের মানবীয় বুদ্ধি, আবেগ বা যুক্তি দিয়ে কিছু বাড়ানো বা কমানোর কোনো প্রয়োজন আল্লাহর দীনের নেই।

**২. রাসূলুলাহ (ﷺ) জন্ম থেকেই কুরআন জানতেন**

আব্দুল হাই লাখনবী বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে একটি জাল কথা:

كَانَ ﷺ عَالِماً بِالْقُرْآنِ بِتَمَامِهِ وَتَالِيًا لَهُ مِنْ حِيْنِ وِلاَدَتِهِ

"তিনি জন্মলগ্ন থেকেই পুরো কুরআন জানতেন এবং পাঠ করতেন।"[৪১১]

এ কথা শুধু মিথ্যাই নয়, কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ বলেন: "আপনি তো জানতেন না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি..."[৪১২] অন্যত্র বলেন: "আপনি আশা করেন নি যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এ তো কেবল আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ।"[৪১৩]

**৩. রাসুলুল্লাহ জন্ম থেকেই লেখা পড়া জানতেন!**

আব্দুল হাই লাখনবী বলেন: ওয়ায়িজদের মিথ্যাচারের একটি নমুনা:

لَمْ يَكُنْ ﷺ أُمِّيًّا بَلْ كَانَ قَادِراً عَلَى الْكِتَابَةِ وَالتِّلاَوَةِ مِنِ ابْتِدَاءِ الْفِطْرَةِ

"রাসূলুলাহ (ﷺ) উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন না। তিনি প্রকৃতিগতভাবে শুরু থেকেই লিখতে ও পড়তে সক্ষম ছিলেন।"

এ কথাটিও ভিত্তিহীন মিথ্যা এবং তা কুরআনের সুস্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ বলেন: "আপনি তো এর পূর্বে কোনো পুস্তক পাঠ করেন নি এবং নিজ হাতে কোনো পুস্তক লিখেন নি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।"[৪১৪]

**৪. আপনি না হলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না**

এ ধরনের বানোয়াট কথগুলোর একটি:

لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاَكَ

"আপনি না হলে আমি আসমান যমিন বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না।"

আল্লামা সাগানী, মোল্লা আলী কারী, আব্দুল হাই লাখনবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস একবাক্যে কথাটিকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এ শব্দে এ বাক্য কোনো হাদীসের গ্রন্থে কোনো প্রকার সনদে বর্ণিত হয় নি।[৪১৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, এ শব্দে নয়, তবে এ অর্থে দুর্বল বা মাওযূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

**৫. আরশের গায়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নাম**

উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন,

لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِيْ. فَقَالَ اللهُ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّداً وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، لأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْباً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلاَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ. فَقَالَ اللهُ: صَدَقْتَ يَا

آدَمُ، إِنَّهُ لأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، ادْعُنِيْ بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.

"আদম (আ) যখন (নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে) ভুল করে ফেলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন: হে প্রভু, আমি মুহাম্মাদের হক্ক (অধিকার) দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ বলেন, হে আদম, তুমি কিভাবে মুহাম্মাদকে (ﷺ) চিনলে, আমি তো এখনো তাঁকে সৃষ্টিই করি নি? তিনি বলেন, হে প্রভু, আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ ফুঁ দিয়ে প্রবেশ করান, তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম আরশের খুঁটি সমূহের উপর লিখা রয়েছে: 'লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এতে আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি বলেই আপনি আপনার নামের সাথে তাঁর নামকে সংযুক্ত করেছেন। তখন আল্লাহ বলেন, হে আদম, তুমি ঠিকই বলেছ। তিনিই আমার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। তুমি আমার কাছে তার হক্ক (অধিকার) দিয়ে চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুহাম্মাদ ﷺ না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।"[৪১৬]

ইমাম হাকিম নাইসাপূরী হাদীসটি সংকলিত করে একে সহীহ বলেছেন। কিন্তু সকল মুহাদ্দিস একমত যে হাদীসটি যয়ীফ। তবে মাউযূ কিনা তাতে তাঁরা মতভেদ করেছেন। ইমাম হাকিম নিজেই অন্যত্র এ হাদীসের বর্ণনাকারীকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা দেখেছি যে, হাকিম অনেক যয়ীফ ও মাউযূ হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং ইবনুল জাওযী অনেক সহীহ বা হাসান হাদীসকে মাউযূ বলেছেন। এজন্য তাদের একক মতামত মুহাদ্দিসগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং তাঁদের মতামত তাঁরা পুনর্বিচার ও নিরীক্ষা করেছেন।

এ হাদীসটির সনদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সনদটি খুবই দুর্বল, যে কারণে অনেক মুহাদ্দিস একে মাউযূ হাদীস বলে গণ্য করেছেন। হাদীসটির একটিই সনদ: আবুল হারিস আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-ফিহরী নামক এক ব্যক্তি দাবী করেন, ইসমাঈল ইবনু মাসলামা নামক একব্যক্তি তাকে বলেছেন, আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম তার পিতা, তার দাদা থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী আবুল হারিস একজন অত্যন্ত দুর্বল রাবী। এছাড়া আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম (১৮২ হি) খুবই দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেন নি। কারণ তিনি কোনো হাদীস ঠিকমত বলতে পারতেন না, সব উল্টোপাল্টা বর্ণনা করতেন। ইমাম হাকিম নিজেই তার 'মাদখাল ইলাস সহীহ' গ্রন্থে বলেছেন:

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه

"আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম তার পিতার সূত্রে কিছু মাউযূ বা জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস শাস্ত্রে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তারা একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন যে, এ সকল হাদীসের জালিয়াতির অভিযোগ আব্দুর রাহমানের উপরেই বর্তায়।"[৪১৭]

এ হাদীসটি উমার (রা) থেকে অন্য কোন তাবিয়ী বলেন নি, আসলাম থেকেও তাঁর কোন ছাত্র তা বর্ণনা করেন নি। যাইদ ইবনু আসলাম প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তাঁর অনেক ছাত্র ছিল। তাঁর কোন ছাত্র এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। শুধুমাত্র আব্দুর রহমান দাবী করেছেন যে তিনি এ হাদীসটি তাঁর পিতার কাছে শুনেছেন। তাঁর বর্ণিত সকল হাদীসের তুলনামূলক নিরীক্ষা করে ইমামগণ দেখেছেন তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীসই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা পর্যায়ের। এজন্য ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে মাউযূ বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম বাইহাকী হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এ কথাটি মূলত ইহূদী-খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত শেষ নবী বিষয়ক কথা; যা কোনো কোনো সাহাবী বলেছেন। অন্য একটি দুর্বল সনদে এ কথাটি উমার (রা) এর নিজের কথা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আব্দুর রহমান অন্যান্য অনেক হাদীসের মত এ হাদীসেও সাহাবীর কথাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[৪১৮]

এ মর্মে আরেকটি যয়ীফ হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের কথা হিসাবে হাকিম সংকলন করেছেন। তিনি জানদাল ইবনু ওয়ালিক এর সূত্রে বলেন, তাকে আমর ইবনু আউস আনসারী নামক দ্বিতীয় শতকের এক ব্যক্তি বলেছেন, তাকে তাবি-তাবিয়ী সাঈদ ইবনু আবূ আরূবাহ (১৫৭ হি) বলেছেন, তাকে তাবিয়ী কাতাদা ইবনু দিআমাহ আস-সাদূসী (১১৫ হি) বলেছেন, তাকে তাবিয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (৯১হি) বলেছেন, তাকে ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন:

أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيْسَى يَا عِيْسَى آمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوْا بِهِ فَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلاَ النَّارَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ

اللهِ فَسَكَنَ.

"মহান আলাহ ঈসা (আ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে বলেন, তুমি মুহাম্মাদের উপরে ঈমান আনয়ন কর এবং তোমার উম্মাতের যারা তাঁকে পাবে তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ প্রদান কর। মুহাম্মাদ (ﷺ) না হলে আদমকে সৃষ্টি করতাম না। মুহাম্মাদ (ﷺ) না হলে জান্নাত ও জাহান্নামও সৃষ্টি করতাম না। আমি পানির উপরে আরশ সৃষ্টি করেছিলাম। তখন আরশ কাঁপতে শুরু করে। তখন আমি তার উপরে লিখলাম: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'; ফলে তা শান্ত হয়ে যায়।"[৪১৯]

ইমাম হাকিম হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী প্রতিবাদ করে বলেন, "বরং হাদীসটি মাউযূ বলেই প্রতীয়মান হয়।" কারণ এর একমাত্র বর্ণনাকারী এ 'আমর্ ইবনু আউস আল-আনসারী' নামক ব্যক্তি। সে প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুহাদ্দিসের নামে হাদীসটি বর্ণনা করেছে। অথচ তাঁদের অন্য কোনো ছাত্র এ হাদীসটি তাঁদের থেকে বর্ণনা করে নি। এ লোকটি মূলত একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এ জানদাল ইবনু ওয়ালিক ছাড়া অন্য কোনো রাবী তার নাম বলেন নি বা তার কোনো পরিচয়ও জানা যায় না। এজন্য যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এটি ইবনু আব্বাসের নামে বানানো জাল হাদীস।[৪২০]

এ অর্থে আরো জাল হাদীস মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন।[৪২১]

### ৬. খলীলুল্লাহ ও হাবীবুল্লাহ

প্রচলিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

اِتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وَمُوْسَى نَجِيًّا وَاتَّخَذَنِيْ حَبِيْباً ثُمَّ قَالَ وَعِزَّتِيْ وَجَلاَلِيْ لأُوْثِرَنَّ حَبِيْبِيْ عَلَى خَلِيْلِيْ وَنَجِيِّيْ

"আল্লাহ ইবরাহীমকে (আ) খালীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করেছেন, মূসাকে (আ) নাজীই (একান্ত আলাপের বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং আমাকে হাবীব (প্রেমাস্পদ) হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, আমার মর্যাদা ও মহিমার শপথ, আমি আমার হাবীবকে আমার খালীল ও নাজীই-এর উপরে অগ্রাধিকার প্রদান করব।"

হাদীসটি ইমাম বাইহাকী 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তিনি তাঁর সনদে বলেন, দ্বিতীয় হিজরী শতকের রাবী মাসলামা ইবনু আলী আল-খুশানী (১৯০হি) বলেন, আমাকে যাইদ ইবনু ওয়াকি, কাসিম ইবনু মুখাইমিরা থেকে, আবূ হুরাইরা থেকে বলেন... ।" হাদীসটি উদ্ধৃত করে বাইহাকী বলেন, "এ 'মাসলামা ইবনু আলী' মুহাদ্দিসগণের কাছে দুর্বল।"[৪২২]

মাসলামা ইবনু আলী নামক এ রাবীকে মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ যুর'আ, বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে 'মুনকার' বা আপত্তিকর বলেছেন। নাসাঈ, দারাকুতনী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে 'মাতরূক' বা পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা মিথ্যায় অভিযুক্ত রাবীকেই মাতরূক বলেন। হাকিম তাকে জাল হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৪২৩] এজন্য অনেক মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন; কারণ একমাত্র এ পরিত্যক্ত রাবী ছাড়া কেউ এ হাদীসটি বলেন নি। অপরপক্ষে কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে 'দুর্বল' বলে গণ্য করেছেন।[৪২৪]

এর বিপরীতে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলিত সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- কেও "খালীল" হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

إِنَّ اللهَ تَعَالى قَدْ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إبراهيم خليلا

"মহান আল্লাহ আমাকে খালীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেরূপ তিনি ইবরাহীমকে খালীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"[৪২৫]

### ৭. আমি শেষ নবী, আমার পরে নবী নেই, তবে...

জালিয়াতদের তৈরী একটি জঘন্য মিথ্যা কথা:

أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ، لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ...

"আমি শেষ নবী, আমার পরে নবী নেই, তবে আল্লাহ যদি চান।"

কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে শেষ নবী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ সকল হাদীস-গ্রন্থে

বিশুদ্ধতম সনদে সংকলিত অসংখ্য সাহাবী থেকে বর্ণিত অগণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তাঁর পরে কোনো নবী হবে না। তিনিই নবীদের অট্টালিকার সর্বশেষ ইট। তিনিই নবীদের সর্বশেষ। তাঁর মাধ্যমে নবুওতের পরিসমাপ্তি।

কিন্তু এত কিছুর পরেও পথভ্রষ্টদের ষড়যন্ত্র থেমে থাকে নি। মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ নামক দ্বিতীয় হিজরী শতকের এক যিনদীক বলে, তাকে হুমাইদ বলেছেন, তাকে আনাস ইবনু মালিক বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আমি শেষ নবী, আমার পরে নবী নেই, তবে আল্লাহ যদি চান।"[৪২৬]

এ যিনদীক ছাড়া কেউই এ অতিরিক্ত বাক্যটি "তবে আল্লাহ যদি চান" বলেন নি। কোনো হাদীসের গ্রন্থেও এ বাক্যটি পাওয়া যায় না। শুধু এ যিনদীকের জীবনীতে ও মিথ্যা হাদীসের গ্রন্থে মিথ্যাচারের উদাহরণ হিসাবে এ মিথ্যা কথাটি উল্লেখ করা হয়। তা সত্ত্বেও কাদীয়ানী বা অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এ মিথ্যা কথাটি তাদের বিভ্রান্তির প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে চায়।

সুপথপ্রাপ্ত মুসলিমের চিহ্ন যে, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ও অভিরুচি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর কাছে সমর্পিত। এরই নাম ইসলাম। মুসলিম যখন হাদীসের কথা শুনেন তখন তাঁর একটি মাত্র বিবেচ্য: হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে কিনা। হাদীসের অর্থ তাঁর মতের বিপরীত বা পক্ষে তা নিয়ে তিনি চিন্তা করেন না বরং নিজের মতকে হাদীসের অনুগত করে নেন। আর পথভ্রষ্টদের পরিচয় যে, তারা নিজেদের অভিরুচি অনুসারে কোনো কথাকে গ্রহণ করে। এর বিপরীতে সকল কথা ব্যাখ্যা করে। এরা কোনো কথা শুনলে তার অর্থ নিজের পক্ষে কিনা তা দেখে। এরপর বিভিন্ন বাতুল যুক্তিতর্ক দিয়ে তা সমর্থন করে। কোনো কথা তার মতের বিপক্ষে হলে তা যত সহীহ বা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশই হোক তারা তা বিভিন্ন ব্যাখ্য করে বিকৃত করে।

**দ্বিতীয় প্রসঙ্গ: নূর মুহাম্মাদী**

আরবী ভাষায় 'নূর' (نور) শব্দের অর্থ আলো, আলোকচ্ছটা, উজ্জ্বলতা (light, ray of light, brightness) ইত্যাদি। আরবী, বাংলা ও সকল ভাষাতেই নূর, আলো বা লাইট যেমন জড় 'আলো' অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক আলো বা পথ প্রদর্শকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কুরতুবী বলেন, "আরবী ভাষায় নূর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দৃষ্টিগ্রাহ্য আলো বা জ্যোতিকে বলা হয়। অনুরূপভাবে রূপকার্থে সকল সঠিক ও আলোকজ্জ্বল অর্থকে 'নূর' বলা হয়। বলা হয়, অমুকের কথার মধ্যে নূর রয়েছে। অমুক ব্যক্তি দেশের নূর, যুগের সূর্য বা যুগের চাঁদ... ।"[৪২৭]

নূর মুহাম্মাদী বিষয়টি বর্তমান মুসলিম সমাজে, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে বিতর্ক ও হানাহানির অন্যতম বিষয়। রাসূলুলাহ ﷺ-কে নূরের তৈরি বলে বিশ্বাস করা অনেক দীনদার আলিম ও মুমিনের দৃষ্টিতে ঈমানের অন্যতম শর্ত। যারা তা বিশ্বাস করেন না তাঁদেরকে তাঁরা কাফির বা কাফিরের ন্যায় বিভ্রান্ত ও রাসূলুলাহ ﷺ-এর দুশমন বলে গণ্য করেন। এর বিপরীতে অন্য অনেক আলিম ও দীনদার মুমিন রাসূলুলাহ ﷺ-কে নূরের তৈরি বলে মনে করাকে ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেন। বিশেষত, তাঁকে মহান আল্লাহর 'যাত' অর্থাৎ সত্ত্বার নূর অথবা সিফাত অর্থাৎ বিশেষণের নূর-এর অংশ বলে বিশ্বাস করাকে তারা শিরক বলে গণ্য করেন। এ বিষয়ক হাদীসগুলি আলোচনার পূর্বে নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(১) 'রাসূলুলাহ ﷺ নূর দ্বারা সৃষ্ট'- এরূপ কোনো কথা কুরআন কারীমে নেই। কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে ব্যবহৃত 'নূর' শব্দের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেছেন যে, নূর বলতে মুহাম্মাদ ﷺ- কে বুঝানো হয়েছে। বিষয়টি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

(২) 'রাসূলুলাহ ﷺ নূর দ্বারা সৃষ্ট'- এ অর্থে প্রচলিত কিছু হাদীস আমরা আলোচনা করব। তবে লক্ষণীয় যে, মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থগুলিতে এ বিষয়ে একটি হাদীসও পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ সিহাহ-সিত্তা, মুসনাদ আবী হানীফা, মুআত্তা মালিক, মুসনাদ শাফিয়ী, মুসনাদ আহমাদ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থগুলির মধ্যে এ বিষয়ে কোনো হাদীসই পাওয়া যায় না।

(৩) রাসূলুলাহ ﷺ সম্পর্কিত যে কোনো একটি হাদীস অনেক হাদীস গ্রন্থে সংকলিত। বিশেষত ঈমান-আকীদা ও দীনের প্রয়োজনীয় হাদীসগুলো মূলত সকল গ্রন্থেই সংকলিত। এমনকি রাসূলুলাহ ﷺ-এর প্রাকৃতিক কর্ম, পারিবারিক সম্পর্ক বা তাঁর জীবনের অতি সামান্য বিষয়ের একটি হাদীস আমরা সিহাহ-সিত্তা সহ প্রায় সকল গ্রন্থে দেখতে পাই। অথচ নূর মুহাম্মাদী বিষয়ক কোনো হাদীস এ সকল গ্রন্থের একটি গ্রন্থেও পাওয়া যায় না।

(৪) হাদীস সংকলকগণ হাদীস গ্রন্থগুলিতে ঈমান, আকীদা, শারীয়াহ, আহকাম, পরিবার, প্রকৃতি ইত্যাদি সকল বিষয়ের শিরোনাম দিয়ে অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন। 'নূর মুহাম্মাদ' বিষয়ক একটি অধ্যায়, পরিচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদ কোনো হাদীসের গ্রন্থে নেই।

(৫) উম্মাতের ইমাম ও বুজুর্গগণ আকীদা ও ফিকহের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তাদের গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী, চার ইমাম-সহ ইসলামের প্রথম অর্ধ-সহস্র বৎসরের মধ্যে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমাম ও বুজুর্গগণ রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে 'নূর মুহাম্মাদী' বিষয়ক কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। শুধু ৪র্থ/৫ম হিজরী শতক থেকে শীয়াগণের গ্রন্থে 'নূর মুহাম্মাদী' বিষয়ক বক্তব্য পাওয়া যায়।

**(৬)** শীয়াগণের মধ্যে প্রকাশিত নূর মুহাম্মাদী বিষয়ক বক্তব্যগুলি ৬ষ্ঠ-৭ম হিজরী শতক থেকে সাধারণ মুসলিম আলিমগণের মধ্যেও প্রচারিত হতে থাকে। পরবর্তী ৫০০ বৎসর এ বিষয়ক হাদীসগুলি 'ফযীলত' বিষয়ক আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে। শীয়াগণ ছাড়া অন্য কেউ একে আকীদার অন্তর্ভূক্ত করেন নি।

**(৭)** ইমাম আযম আবূ হানীফা-সহ প্রসিদ্ধ চার ইমাম থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় হাজার বৎসর যাবৎ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ আকীদা বিষয়ে অগণিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। আকীদার খুটিনাটি অতি সামান্য বিষয়ও তারা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু 'মুহাম্মাদ ﷺ নূরের তৈরি' বলে বিশ্বাস করাকে আকীদার বিষয় বলে কেউ উল্লেখ করেন নি।

**(৮)** কুরআন-হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে যে, মানুষ মাটির তৈরি। সৃষ্টির উপাদান বলতে মূলত প্রথম সৃষ্টিকেই বুঝানো হয়। এরপর তার বংশধররেরা বংশ-পরম্পরায় সে উপাদান ধারণ করে। কুরআনে আদম (আ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ জাগতিক প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করে। কাউকেই নতুন করে 'মাটি' দিয়ে তৈরি করা হয় না। তবে সকল মানুষকেই মাটির তৈরি বলা হয়। আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

"যখন তোমার রব্ব ফিরিশতাগণকে বললেন, আমি 'বাশার' (মানুষ) সৃষ্টি করছি গন্ধযুক্ত কাদার শুস্ক ঠন্‌ঠনে মাটি হতে।"[৪২৮]

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

"ফিরিশতাগণকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, জিনকে সৃষ্টি করা নির্ধুম আগুনের শিখা থেকে, আর আদমকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তো তোমাদের বলা হয়েছে।"[৪২৯]

অর্থাৎ শুধু ফিরিশতাগণই নুর থেকে সৃষ্ট; কোনো মানুষ বা জিন নয়।

**(৯)** কুরআন-হাদীসে বারংবার রাসুলুলাহ ﷺ-কে 'বাশার' বা মানুষ বলা হয়েছে। কুরআন-হাদীসে 'বাশার' শব্দ অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কুরআন ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং অন্যান্য নবী-রাসূলের মানুষ হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বারংবার বলা হয়েছে। কাফিরগণ নবীগণের নুবুওয়াত অস্বীকার করত এ কথা বলে যে, 'তোমরা আমাদের মতই মানুষ'। এর প্রতিবাদে আল্লাহ বারংবার বলেছেন, হ্যাঁ, নবীগণ তোমাদের মতই মানুষ, তবে তাঁরা আল্লাহর ওহীপ্রাপ্ত মানুষ।[৪৩০]

রাসূলুলাহ ﷺ-এর বাশারিয়্যাত বা মানুষ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

"বলুন, আমি তোমাদের মত মানুষ মাত্র; আমার কাছে ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, তোমাদের মাবুদ এক মাবুদ।"[৪৩১]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

"বলুন: সুবহানাল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ রাসূল বৈ কিছুই নই।"[৪৩২]

বিভিন্ন হাদীসেও রাসূলুলাহ ﷺ বারংবার বলেছেন, আমি মানুষ মাত্র, আমি তোমাদের মতই মানুষ...। কুরআন ও হাদীসের এ সকল বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান যে, মানুষ হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির উপাদান থেকেই সৃষ্ট। এখন প্রশ্ন হলো, এ সকল বক্তব্যের বিপরীতে কুরআন-হাদীসে অন্য কোনো বক্তব্য দ্বারা কি ব্যতিক্রম কিছু প্রমাণিত হয়? আমরা এখানে বিষয়টি আলোচনা করব।

**(ক) আল-কুরআন ও নূর মুহাম্মাদী**

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে নিজেকে 'নূর' বলেছেন:

اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ...

"আলাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর (জ্যোতি)..... "[৪৩৩]

ইমাম তাবারী বলেন: 'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর' একথা বলতে আল্লাহ বুঝাচ্ছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যকার সকলের হাদী বা পথ প্রদর্শক। তাঁরই নূরেই তাঁরা সত্যের দিকে সুপথপ্রাপ্ত হয়।... ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: 'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর' অর্থ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসীদের হাদী বা পথ-প্রদর্শক।... আনাস থেকে বর্ণিত,

আল্লাহ বলছেন, আমার হেদায়াতই আমার নূর... ।"[৪৩৪]

আলাহ্‌ বারবার দ্ব্যার্থহীনভাবে কুরআনকে নূর বলেছেন। তিনি বলেন:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ ... فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক এ উম্মী নবীর...যারা তাঁর উপর ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তাঁর সাথে যে নূর (কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম ।"[৪৩৫]

অন্যত্র কুরআনকে 'রূহ' ও 'নূর' বলা হয়েছে:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

"এভাবে আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ (আত্মা), আমার নির্দেশ থেকে, আপনি তো জানতেন না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি! কিন্তু আমি একে (এ রূহ বা আল-কুরআনকে) নূর বানিয়ে দিয়েছি, যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পর্থ-নির্দেশ করি... ।"[৪৩৬]

অন্যত্র মূসা (আ) এর উপর অবর্তীণ তাওরাতকেও নূর বলা হয়েছে:

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ

"বলুন, তবে কে নাযিল করেছিল মূসার আনীত কিতাব, যা মানুষের জন্য নূর (আলো) ও হেদায়াত (পথ-প্রদর্শন) ছিল ।"[৪৩৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে যে, তাওরাত ও ইনজীলের মধ্যে নূর ছিল:

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ...وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ

"আমি অবতীর্ণ করেছি তাওরাত, যার মধ্যে হেদায়াত ও নূর ... আমি তাকে (ঈসাকে) প্রদান করেছি ইনজীল যার মধ্যে হেদায়াত ও নূর... ।[৪৩৮]

কুরআনে আরো কয়েকটি স্থানে 'নূর' বা 'আল্লাহর নূর' শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহৃত। যেমন এক স্থানে বলেছেন:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"তারা 'আলাহর নূর' ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ 'তাঁর নূর' পূর্ণ করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে ।"[৪৩৯]

এখানে 'আল্লাহর নূর' বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন: এখানে 'আল্লাহর নূরের' ব্যাখ্যায় ৫টি মত রয়েছে: (১) আল্লাহর নূর অর্থ আল-কুরআন, কাফিররা কথার দ্বারা তা বাতিল করতে ও মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়। ইবনু আব্বাস ও ইবনু যাইদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। (২) আল্লাহর নূর অর্থ ইসলাম, কাফিররা কথাবার্তার মাধ্যমে তাকে প্রতিরোধ করতে চায়। সুদ্দী এ কথা বলেছেন। (৩) আল্লাহর নূর অর্থ মুহাম্মাদ (ﷺ), কাফিররা অপপ্রচার ও নিন্দাচারের মাধ্যমে তাঁর ধ্বংস চায়। দাহ্‌হাক এ কথা বলেছেন। (৪) আল্লাহর নূর অর্থ আল্লাহর দলীল-প্রমাণাদি, কাফিররা সেগুলো অস্বীকার করে মিটিয়ে দিতে চায়। ইবনু বাহর এ কথা বলেছেন। (৫) আল্লাহর নূর অর্থ সূর্য। অর্থাৎ ফুৎকারে সূর্যকে নেভানোর চেষ্টা করার মত বাতুল ও অসম্ভব কাজে তারা লিপ্ত। ইবনু ঈসা এ কথা বলেছেন।[৪৪০]

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

"এ কিতাব। আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন... ।"[৪৪১]

এখানে স্বভাবতই অন্ধকার ও আলো বলতে 'জড়' কিছু বুঝানো হয় নি। এখানে অন্ধকার বলতে অবিশ্বাসের অন্ধকার এবং আলো বলতে আল-কুরআন অথবা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য আয়াতেও 'নূর' বা 'আলাহর নূর' বলতে 'কুরআন',

'ইসলাম' বা 'মুহাম্মাদ ﷺ' অর্থ গ্রহণ করেছেন মুফাস্সিরগণ[৪৪২]। এ ধরনের একটি আয়াত:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

"হে কিতাবীগণ, আমার রাসূল তোমাদের কাছে এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক কিছু তোমাদের কাছে প্রকাশ করেন এবং অনেক কিছু উপেক্ষা করেন। তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে এক নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। হেদায়াত করেন আল্লাহ তদ্বারা যে তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে তাকে শান্তির পথে এবং বের করেন তাদেরকে অন্ধকার থেকে নূরের দিকে তাঁর অনুমতিতে এবং হেদায়াত করেন তাদের সঠিক পথে।"[৪৪৩]

এ আয়াতে 'নূর' বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাস্সিরগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, নূর অর্থ কুরআন, কেউ বলেছেন, ইসলাম, কেউ বলেছেন, মুহাম্মাদ ﷺ। এ তিন ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। সবাই সঠিক পথের আলোক বর্তিকা বা হেদায়াতের নূর বুঝিয়েছেন।[৪৪৪]

যারা এখানে নূর অর্থ কুরআন বুঝিয়েছেন, তাঁদের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ: (১) এ আয়াতের প্রথমে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলা হয়েছে, সেহেতু শেষে 'নূর' ও 'সুস্পষ্ট কিতাব' বলতে 'কুরআনকে' বুঝানো হয়েছে। (২) কুরআনে বিভিন্ন স্থানে কুরআনকে ব্যাখ্যাতীতভাবে 'নূর' এবং 'সুস্পষ্ট কিতাব' বলা হয়েছে। কাজেই এখানেও দুটি বিশেষণ দ্বারা কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। (৩) দুটি শব্দ দ্বারা একই বিষয় বুঝানো কুরআনের একটি রীতি। যেমন আল্লাহ বলেন: 'আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান প্রদান করি'[৪৪৫]। এখানে কিতাব ও ফুরকান বলতে একই কিতাব 'তাওরাত' বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে উপরের আয়াতেও 'নূর' ও 'সুস্পষ্ট কিতাব' বলতে একই কিতাব 'কুরআন'-কে বুঝানো হয়েছে। (৪) পরের আয়াতে এ দুটি বিষয়ের জন্য এক বচনের সর্বনাম ব্যবহার করে আল্লাহ বলেছেন: 'হেদায়াত করেন আল্লাহ যদ্বারা'। এ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে 'নূর' ও 'সুস্পষ্ট কিতাব' বলতে একই জিনিস বুঝানো হয়েছে যদ্বারা আল্লাহ যাকে চান হেদায়াত করেন। 'নূর' ও 'সুস্পষ্ট কিতাব' উভয়কে বুঝাতে "একবচনের" সর্বনাম ব্যবহার নিশ্চিত প্রমাণ যে, এখানে উভয় বিশেষণ দ্বারা একটি বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে। (৫) এখানে আল্লাহ বলেছেন: 'হেদায়াত করেন আল্লাহ যাহা দ্বারা': কুরআনের পরিভাষায় এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং কুরআনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কুরআনে আল্লাহ বলেন নি যে, তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে দিয়ে কাউকে হেদায়াত করেন; বরং বলেছেন যে, তিনি কুরআন দিয়ে যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন।[৪৪৬]

যারা 'নূর' অর্থ ইসলাম বলেছেন, তাঁদের বক্তব্য: এ আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা এবং শেষে কিতাব বা কুরআনের কথা বলা হয়েছে। কাজেই মাঝে নূর বলতে ইসলামকে বুঝানো স্বাভাবিক। এ ছাড়া কুরআনে অনেক স্থানে 'নূর' বলতে ইসলাম বুঝানো হয়েছে। আরবীতে 'আলো' বুঝাতে দুটি শব্দ রয়েছে: 'দিয়া (ضياء) ও নূর (نور)। প্রথম আলোর মধ্যে উত্তাপ রয়েছে, আর দ্বিতীয় আলো স্নিগ্ধতাপূর্ণ আলো। পূর্ববর্তী শরীয়াতগুলোর বিধানের মধ্যে কাঠিন্য ছিল। পক্ষান্তরে ইসলামী শরীয়তের সকল বিধিবিধান সহজ ও জীবনমুখী। এজন্য ইসলামী শরীয়তকে নূর বলা হয়েছে।[৪৪৭]

যারা এখানে 'নূর' অর্থ 'মুহাম্মাদ (ﷺ) বুঝিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, 'সুস্পষ্ট কিতাব' বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই 'নূর' বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বুঝানো সম্ভব। এ বিষয়ে ইমাম তাবারী বলেন:

يَعْنِيْ بِالنُّوْرِ مُحَمَّداً ﷺ الَّذِيْ أَنَارَ اللهُ بِهِ الْحَقَّ وَأَظْهَرَ بِهِ الإِسْلاَمَ وَمَحَقَ بِهِ الشِّرْكَ فَهُوَ نُوْرٌ لِمَنِ اسْتَنَارَ بِهِ يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَمِنْ إِنَارَتِهِ الْحَقَّ تَبْيِيْنُهُ لِلْيَهُوْدِ كَثِيْراً مِمَّا كَانُوا يُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ.

"নূর (আলো) বলতে এখানে 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে, যাঁর দ্বারা আল্লাহ হক্ক বা সত্যকে আলোকিত করেছেন, ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং শির্ককে মিটিয়ে দিয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি তাঁর দ্বারা আলোকিত হতে চায় তার জন্য তিনি আলো। তিনি হক্ক বা সত্য প্রকাশ করেন। তাঁর হক্ককে আলোকিত করার একটি দিক হলো যে, ইহূদীরা আল্লাহর কিতাবের যে সকল বিষয় গোপন করত তার অনেক কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন।"[৪৪৮]

এছাড়া কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'নূর-প্রদানকারী প্রদীপ' বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

"হে নবী, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং আলোকোজ্জ্বল (নূর-প্রদানকারী) প্রদীপরূপে।"[৪৪৯]

এভাবে আমরা দেখলাম যে, কুরআনে সঠিক পথের নির্দেশক হিসেবে কুরআনকে 'নূর' বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোনো কোনো আয়াতে 'নূর' শব্দের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্সির রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কুরআনের এ সকল বর্ণনা থেকে বুঝা যায় না যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ, কুরআন বা ইসলাম নূরের তৈরী বা নূর থেকে সৃষ্ট। আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে কোনো সৃষ্ট, জড় বা মূর্ত নূর বা আলো বুঝানো হয় নি। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ, ইসলাম ও কুরআন কোনো জাগতিক, 'জড়', ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মূর্ত 'আলো' নয়। এ হলো বিমূর্ত, আত্মিক, আদর্শিক ও সত্যের আলোকবর্তিকা, যা মানুষের হৃদয়কে বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বিশ্বাস, সত্য ও সুপথের আলোয় জ্যোতির্ময় করে।

**(খ) হাদীস শরীফে নূর মুহাম্মাদী**

রাসূলুলাহ (ﷺ)-কে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থে কিছু হাদীস প্রচলিত রয়েছে। একথা ঠিক যে, সৃষ্টির মর্যাদা আলাহর ঘোষণায় ও তার নিজের কর্মের মধ্যে নিহিত, তার সৃষ্টির উপাদান, বংশ ইত্যাদিতে নয়। এজন্য আগুনের তৈরী জিন ও নূরের তৈরী ফিরিশতার চেয়ে মাটির তৈরী মানুষ অনেক ক্ষেত্রে বেশি মর্যাদাবান। এরপরও যখন আমরা জানতে পারি যে, সৃষ্টির উপাদানেও আমাদের প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বৈশিষ্ট্য রয়েছে তখন আমাদের তা ভাল লাগে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, যে কোনো কথা তা যতই ভাল লাগুক, তা গ্রহণের আগে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করা। কোনো কথাকে তার অর্থের ভিত্তিতে নয়, বরং সাক্ষ্য প্রমাণের বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে প্রথমে বিচার করা হয়। এরপর তার অর্থ বিচার করা হয়। লক্ষণীয় যে, এ অর্থের অধিকাংশ হাদীস একেবারেই 'সনদবিহীন' জাল কথা এবং কিছু হাদীস 'সনদওয়ালা' জাল কথা।

**৮. রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর পবিত্র দাঁতের নূর**

فِيْ لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِيْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِ عَائِشَةَ إِبْرَتُهَا فَفُقِدَتْ فَالْتَمَسَتْهَا وَلَمْ تَجِدْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَخَرَجَتْ لُمْعَةُ أَسْنَانِهِ فَأَضَاءَتِ الْحُجْرَةَ وَرَأَتْ عَائِشَةُ بِذَلِكَ الضَّوْءِ إِبْرَتَهَا

"এক রাতে আয়েশা (রা)-এর হাত থেকে তাঁর সূচটি পড়ে যায়। তিনি তা হারিয়ে ফেলেন এবং খোঁজ করেও পান নি। তখন নবীজী (ﷺ) হেসে উঠেন এবং তাঁর দাঁতের আলোকরশ্মি বেরিয়ে পড়ে। এতে ঘর আলোকিত হয়ে যায় এবং সে আলোয় আয়েশা (রা) তাঁর সূচটি দেখতে পান।"

এটি একটি সনদবিহীন ভিত্তিহীন মিথ্যা কাহিনী। আমরা দেখেছি যে, অনেক আলিম সহীহ কথার সাথে অনেক বাতিল কথাও সংকলন করেন। এতে অনেক সময় সাধারণ মুসলিম বিভ্রান্ত হন। যেমন দশম হিজরী শতকের একজন আলিম মোল্লা মিসকীন মুহাম্মাদ আল-ফিরাহী (৯৫৪ হি) কর্তৃক ফার্সী ভাষায় লিখিত **'মা'আরিজুন নুবুওয়াত'** নামক সীরাতুন্নবী বিষয়ক একটি গ্রন্থ এক সময় ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল। এ গ্রন্থে উপরের মিথ্যা হাদীসটি সংকলিত রয়েছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লামা লাখনবী বলেন: "এ কথা ঠিক যে, এ জাল কথাটি 'মা'আরিজুন নুবুওয়াত' ও আরো অন্যান্য সীরাতুন্নবী গ্রন্থে সংকলিত। এ সকল গ্রন্থের লেখকগণ শুকনো-ভিজে সবকিছুই জমা করতেন। কাজেই এ সকল বইয়ের সব কথার উপরে শুধু ঘুমন্ত বা ক্লান্ত (অজ্ঞ বা অসচেতন) মানুষেরাই নির্ভর করতে পারে। ..."[৪৫০]

**৯. রাসূলুলাহ (ﷺ) ও আলী (রা) নূর থেকে সৃষ্ট**

خُلِقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ نُوْرٍ، وَكُنَّا عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ آدمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، ثُمَّ خَلَقَ اللهُ آدَمَ فَانْقَلَبْنَا فِيْ أَصْلاَبِ الرِّجَالِ.

"আমাকে ও আলীকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়। আদমের সৃষ্টির ২ হাজার বৎসর পূর্বে আমরা আরশের ডান পার্শ্বে ছিলাম। অতঃপর যখন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন আমরা মানুষদের ঔরসে ঘুরতে লাগলাম।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কথাটি একটি মিথ্যা ও জাল হাদীস। জা'ফর ইবনু আহমাদ ইবনু আলী আল-গাফিকী নামক একজন মিথ্যাবাদী জালিয়াত এ হাদীসটি বানিয়েছে এবং এর জন্য একটি সনদও সে বানিয়েছে।[৪৫১]

**১০. রাসূলুল্লাহকে ﷺ আল্লাহর নূর, আবূ বকরকে তাঁর নূর... থেকে সৃষ্টি**

خَلَقَنِي اللهُ مِنْ نُوْرِهِ، وخَلَقَ أَبا بَكْرٍ مِنْ نُورِي، وخَلَقَ عُمَرَ مِنْ نُور أَبي بكر، وخَلَقَ أُمَّتِيْ مِنْ نُوْرِ عُمَرَ...

"আল্লাহ আমাকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবূ বাকরকে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, উমারকে আবূ বাকরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার উম্মাতকে উমারের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন... ।"

এটি একটি সনদ-সহ জাল হাদীস। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কথাটি মিথ্যা ও বানোয়াট। আহমাদ ইবনু ইউসূফ আল-মানবিযী

নামক এক ব্যক্তি এ মিথ্যা কথাটির প্রচারক। সে এ কথাটির একটি সুন্দর সনদও বানিয়েছে।[৪৫২]

এ অর্থে আরেকটি বানোয়াট কথা:

إِنَّ اللهَ خَلَقَنِيْ مِنْ نُوره وخَلَقَ أبا بَكْرٍ مِنْ نُوْرِيْ وَخَلَقَ عُمَرَ مِنْ نُوْرِ أَبِيْ بَكْرٍ وَخَلَقَ الْمُؤْمِنِيْن كُلَّهُمْ مِنْ نُوْرِ عُمَرَ غَيْرَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ

"আল্লাহ আমাকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবূ বাক্‌রকে আমার নূর থেকে, উমারকে আবূ বাকরের নূর থেকে এবং নবী-রাসূল ব্যতীত মুমিনগণের সকলকেই উমারের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[৪৫৩]

এ অর্থে আরেকটি ভিত্তিহীন কথা:

إِنَّ اللهَ خَلَقَنِيْ مِنْ نُوْرٍ وَخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ مِنْ نُوْرِيْ وَخَلَقَ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مِنْ نُوْرِ أَبِيْ بَكْرٍ وَخَلَقَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أُمَّتِيْ مِنْ نُوْرِ عُمَرَ وَخَلَقَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أُمَّتِيْ مِنْ نُوْرِ عَائِشَةَ

"আল্লাহ আমাকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবূ বাক্‌রকে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, উমার ও আয়েশাকে আবূ বাকরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন আর আমার উম্মাতের মুমিন পুরুষগণকে উমারের নূর থেকে এবং মুমিন নারীগণকে আয়েশার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[৪৫৪]

**১১. আল্লাহর মুখমণ্ডলের নূরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সৃষ্টি**

নূর মুহাম্মাদী বিষয়ক সম্পূর্ণ সনদবিহীন একটি জাল কথা:

خَلَقْتُ مُحَمَّداً مِنْ نُوْرِ وَجْهِيْ

"আমি মুহাম্মাদকে আমার মুখমণ্ডলের নূর থেকে সৃষ্টি করেছি।"[৪৫৫]

**১২. রাসূলুল্লাহর নূরে ধান-চাউল সৃষ্টি!**

জালিয়াতদের বানানো আরেকটি মিথ্যা কথা:

الأَرُزُّ مِنِّي وأنا مِنَ الأَرُزِّ خُلِقَتِ الأَرُزُّ مِنْ بَقِيَّةِ نُوْرِيْ

"চাউল আমা হতে এবং আমি চাউল থেকে। আমার অবশিষ্ট নূর থেকে চাউলকে সৃষ্টি করা হয়।"[৪৫৬]

**১৩. ঈমানদার মুসলমান আল্লাহর নূর দ্বারা সৃষ্ট**

দাইলামী (৫০৯) তার 'আল-ফিরদাউস' নামক পুস্তকে ইবনু আব্বাস (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন:

اَلْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ الَّذِيْ خُلِقَ مِنْه

"মুমিন আল্লাহর নূরের দ্বারা দৃষ্টিপাত করেন, যে নূর থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৪৫৭]

এটি একটি সনদ-বিশিষ্ট জাল হাদীস। এর একমাত্র রাবী মাইসারাহ ইবনু আব্দু রাব্বিহ দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ জালিয়াত। ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, আবূ হাতিম, ইবনু হিব্বান–সহ সকল মুহাদ্দিস এ বিষয়ে একমত। তাঁরা তার 'রচিত' অনেক জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন।[৪৫৮]

**১৪. নূর মুহাম্মাদীর ময়ূর রূপে থাকা**

এ বিষয়ক প্রচলিত অন্যান্য কাহিনীর মধ্যে রয়েছে নূর মুহাম্মাদীকে ময়ূর আকৃতিতে রাখা। এ বিষয়ক সকল কথাই ভিত্তিহীন। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ হাদীসের গ্রন্থে এর কোনো প্রকার সনদ, ভিত্তি বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ভাবে গল্পগুলো লেখা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা শাজারাতুল ইয়াকীন নামক একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নূর মোবরককে একটি ময়ূর আকৃতি দান করত স্বচ্ছ ও শুভ্র মতির পর্দার ভিতরে রেখে তাকে সে বৃক্ষে স্থাপন করলেন... ক্রমান্বয়ে সে নূর থেকে সব কিছু সৃষ্টি করলেন... রূহগণকে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতে নির্দেশ দিলেন.. ইত্যাদি...। জাল হাদীসের জাল বই ছাড়া কোথাও এর সনদ পাওয়া যায় না।

**১৫. রাসূলুলাহ (ﷺ) তারকা-রূপে ছিলেন**

আমাদের দেশে প্রচলিত ধারণা, রাসূলুল্লাহ ﷺ আদম সৃষ্টির পূর্বে তারকারূপে বিদ্যমান ছিলেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষ্য প্রচলিত। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমাকে (রা) বলেন, জিবরাঈল তোমার ছোট চাচা ...। এ বিষয়ে প্রচলিত সকল কথাই ভিত্তিহীন

ও মিথ্যা। আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ একটি ইসলামী কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত একটি খুতবার বইয়ে লেখা হয়েছে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ سَأَلَ جِبْرَائِيْلَ فَقَالَ: يَا جِبْرَائِيْلُ، كَمْ عُمِّرْتَ مِنَ السِّنِيْنَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَسْتُ أَعْلَمُ غَيْرَ أَنَّ فِيْ الْحِجَابِ الرَّابِعِ نَجْماً يَطَّلِعُ فِيْ كُلِّ سَبْعِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ مَرَّةً، رَأَيْتُهُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ أَلْفَ مَرَّةً. فَقَالَ: يَا جِبْرَائِيْلُ، وَعِزَّةِ رَبِّيْ جَلَّ جَلاَلُهُ، أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

উপরের কথাগুলোর অনুবাদে উক্ত পুস্তকে বলা হয়েছে: "হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলে কারীম (ﷺ) হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে জিব্রাঈল, আপনার বয়স কত? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, চতুর্থ পর্দায় (আসমানে) একটি সিতারা আছে যা প্রতি ৭০ হাজার বছর পর সেখানে উদিত হয়। আমি উহা এ যাবত ৭০ হাজার বার[৪৫৯] উদিত হতে দেখেছি। এতদশ্রবণে হুজুর (ﷺ) বল্লেন, হে জিব্রাঈল, শপথ মহান আল্লাহর ইজ্জতের, আমি সেই সিতারা। (বুখারী শরীফ)।"[৪৬০]

এ সকল কথা সবই ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা যা হাদীস নামে প্রচলিত।[৪৬১] তবে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, এ ভিত্তিহীন কথাটিকে বুখারী শরীফের বরাত দিয়ে চালানো হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, সীরাহ হালাবিয়া গ্রন্থের লেখক একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের উপর নির্ভর করে এ জাল হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আমরা কি একটু যাচাই করব না? এ সকল ইসলামী কেন্দ্রে এমন অনেক আলিম রয়েছেন যারা যুগ যুগ ধরে 'বুখারী' পড়াচ্ছেন। বুখারী শরীফের অনেক কপি সেখানে বিদ্যমান। কিন্তু কেউই একটু কষ্ট করে পুস্তকটি খুলে দেখার চেষ্টা করলেন না। শুধু সহীহ বুখারীই নয়, 'তারীখ বুখারী', বুখারীর লেখা বা অন্য কারো লেখা কোনো গ্রন্থেই এ কথাটি সনদ-সহ বর্ণিত হয় নি। অথচ সে জাল কথাটিকে বুখারীর নামে চালানো হলো।

কেউ কেউ এ ভিত্তিহীন কথাটিকে শুধু বুখারীর নামে চালানোর চেয়ে 'বুখারী ও মুসলিম' উভয়ের নামে চালানোকে উত্তম (!) বলে মনে করেছেন। উক্ত প্রসিদ্ধ দীনী কেন্দ্রের একজন সম্মানিত মুহাদ্দিস, যিনি বহু বছর যাবৎ ছাত্রদেরকে 'সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম' পড়িয়েছেন তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করে লিখেছেন: "মুসলিম শরীফ ও বুখারী শরীফ।"[৪৬২]

আমরা মনে করি যে, এ সকল বুযুর্গ ও আলিম জেনেশুনে এরূপ মিথ্যা কথা বলেন নি। তাঁরা অন্য আলিমদের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু আলিমদের জন্য এটি কখনোই গ্রহণযোগ্য ওযর নয়। এখন আমরা যতই বলি না কেন যে, এ হাদীসটি বুখারী বা মুসলিমে কোথাও নেই, আপনারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে অনুসন্ধান করুন...সাধারণ মুসলিম ও ভক্তগণ সে সকল কথায় কর্ণপাত করবেন না। তাঁরা কোনোরূপ অনুসন্ধান ছাড়াই বলতে থাকবেন, এতবড় আলিম কি আর না জেনে লিখেছেন!!

**১৬. নূর মুহাম্মাদীই (ﷺ) প্রথম সৃষ্টি**

'নূর মুহাম্মাদী প্রথম সৃষ্টি' অর্থে নিম্নের হাদীসটি সমাজে বহুল প্রচলিত:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِيْ

"আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন"।

সুদীর্ঘ হাদীসটির সার সংক্ষেপ হলো, জাবির (রা) রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম কী সৃষ্টি করেন? উত্তরে তিনি বলেন:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ....

"সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূরকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেন।" এরপর এ লম্বা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ নূরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তা থেকে আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম, ফিরিশতা, জিন, ইনসান এবং সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়।....

এ হাদীসটির অর্থ ইতোপূর্বে উদ্ধৃত সহীহ মুসলিমের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, তাতে বলা হয়েছে: ফিরিশতাগণ নূর থেকে, জিনগণ আগুন থেকে এবং মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট। আর এ হাদীসে বলা হচ্ছে যে, ফিরিশতা, জিন, ইনসান ও মহাবিশ্বের সব কিছুই নূর থেকে সৃষ্ট। তারপরও এ হাদীসটির বক্তব্য আমাদের কাছে আকর্ষণীয়। যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলার বা যা শুনব তাই বলার অনুমতি থাকতো তবে আমরা তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতাম ও বলতাম। কিন্তু যেহেতু তা নিষিদ্ধ তাই কুরআন ও সুন্নাহ-এর নির্দেশ অনুসারে আমরা সনদ অনুসন্ধান করতে বাধ্য হই এবং নিম্নের বিষয়গুলি জানতে পারি:

**(ক)** বিশ্বে বিদ্যমান কোনো হাদীস গ্রন্থে হাদীসটি সনদ-সহ পাওয়া যায় না। আমরা বলেছি, একটি হাদীস সাধারণত অনেকগুলি হাদীসের গ্রন্থে সনদ-সহ সংকলিত থাকে। কিন্তু এ হাদীসটি কোনো হাদীস গ্রন্থেই সংকলিত হয় নি।

**(খ)** আমরা দেখেছি যে, ইতিহাস, সীরাত, আকীদা, তাসাউফ, ওয়ায ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থগুলিতেও বহুসংখ্যক সহীহ, যয়ীফ ও

জাল হাদীস সনদবিহীন বা সনদ-সহ সংকলিত। ইসলামের প্রথম ৫০০ বৎসরের মধ্যে এ সকল বিষয়ক কোনো একটি গ্রন্থেও এ হাদীসটির কোনো উল্লেখ নেই।

**(গ)** যতটুকু জানা যায়, ৭ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু আলী তাঈ হাতিমী (৫৬০-৬৩৮হি /১১৬৫-১২৪০খৃ) সর্বপ্রথম এ কথাগুলোকে 'হাদীস' হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইবনু আরাবী তাঁর পুস্তকাদিতে অগণিত জাল হাদীস ও বাহ্যত ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক অনেক কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগে বুযুর্গগণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বশত এ সকল কথার বিভিন্ন ওযর ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। আবার অনেকে কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন।

বিশেষত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শাইখ আহমাদ ইবনু আব্দুল আহাদ সারহিন্দী (১০৩৪ হি) ইবনু আরাবীর এ সকল ভিত্তিহীন বর্ণনার প্রতিবাদ করেছেন বারংবার। কখনো কখনো নরম ভাষায়, কখনো কঠিন ভাষায়।[৪৬৩] এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : "আমাদের নস্‌স বা কুরআন ও হাদীসের পরিষ্কার অকাট্য বাণীর সহিত কারবার, ইবন আরাবীর কাশফ ভিত্তিক ফস্‌স বা ফুসূসুল হিকামের সহিত নহে। ফুতূহাতে মাদানীয়া বা মাদানী নবী ﷺ -এর হাদীস আমাদেরকে ইবন আরাবীর ফতূহাতে মাক্কীয়া জাতীয় গ্রন্থাদি থেকে বেপরওয়া করিয়া দিয়াছেন।"[৪৬৪] অন্যত্র প্রকৃত সূফীদের প্রশংসা করে লিখেছেন : "তাহারা নসস, কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বাণী, পরিত্যাগ করত শেখ মহিউদ্দীন ইবন আরাবীর ফসস বা ফুসূসুল হিকাম পুস্তকে লিপ্ত হন না এবং ফুতূহাতে মাদানীয়া, অর্থাৎ হাদীস শরীফ বর্জন করত ইবন আরাবীর ফুতূহাতে মাক্কীয়ার প্রতি লক্ষ্য করেন না।"[৪৬৫] "... নস্‌স বা আল্লাহর বাণী পরিত্যাগ করত ফসস বা মহিউদ্দীন আরবীর পুস্তক আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং ফতূহাতে মাদানীয়া বা পবিত্র হাদীস বর্জন করত ফুতূহাতে মাক্কিয়া পুস্তকের দিকে লক্ষ্য করেন না।"[৪৬৬]

সর্বাবস্থায়, ইবনু আরাবী এ বাক্যটির কোনো সূত্র উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিনি এর উপরে তাঁর প্রসিদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের লগোস তত্ত্বের (Theory of Logos) আদলে তিনি 'নূর মুহাম্মাদী তত্ত্ব' প্রচার করেন। খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, আল্লাহ্ সর্বপ্রথম তার নিজের 'জাত' বা সত্ত্বা থেকে 'কালেমা' বা পুত্রকে জন্মদান করেন, পুত্র 'নূর থেকে জাত নূর' (light of light) এবং পুত্র থেকেই আল্লাহ্ সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন। ইবনু আরাবী বলেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম নূর মুহাম্মাদী সৃষ্টি করেন এবং তার থেকে সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন। ক্রমান্বয়ে কথাটি ছড়াতে থাকে। বিশেষত ৯/১০ম হিজরী শতক থেকে লেখকগণের মধ্যে যাচাই ছাড়াই অন্যের কথার উদ্ধৃতির প্রবণতা বাড়তে থাকে। শ্রদ্ধাবশত, ব্যস্ততা হেতু অথবা অন্যান্য বিভিন্ন কারণে নির্বিচারে একজন লেখক আরেকজন লেখকের কাছ থেকে গ্রহণ করতে থাকেন। যে যা শুনেন বা পড়েন তাই লিখতে থাকেন, বিচার করার প্রবণতা কমতে থাকে। এভাবে বিগত কয়েক শতক যাবৎ সীরাত, মীলাদ, তাসাউফ, ওয়ায ইত্যাদি বিষয়ক অগণিত গ্রন্থে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করা হয়।

**(ঘ)** যতদূর জানা যায় সর্বপ্রথম দশম হিজরী শতকের কোনো কোনো আলিম হাদীসটি মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক-এ বিদ্যমান বলে মন্তব্য করেন। অর্থাৎ ইবনু আরাবীর পূর্বে ইসলামের প্রথম ৬০০ বৎসর এ হাদীসটি কেউ উল্লেখই করেন নি। হাদীসটির অর্থ অত্যন্ত আকর্ষণীয় হওয়াতে পরবর্তী ৩০০ বৎসরে হাদীসটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। কিন্তু এর কোনো সনদ বলা তো দূরের কথা হাদীসটি কোন্ গ্রন্থে সংকলিত তাও কেউ বলতে পারেন নি। এরপর থেকে কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, হাদীসটি বাইহাকী বা আব্দুর রায্যাক সান'আনী সংকলন করেছেন। এ দাবিটি ভিত্তিহীন। আব্দুর রায্যাক সান'আনী বা বাইহাকী রচিত কোনো গ্রন্থে এ হাদীসটি নেই। দশম শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আলামা আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-কাসতালানী (৯২৩ হি) তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ সীরাত-গ্রন্থ 'আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে এ হাদীসটি 'মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকে' সংকলিত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৬৭] তার বক্তব্যের উপর নির্ভর করে এরপর অনেকেই লিখেছেন যে, হাদীসটি 'মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকে' সংকলিত। কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক গ্রন্থের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং ছাপানো গ্রন্থে কোথাও এ হাদীসটি নেই। লক্ষণীয় যে, যারা হাদীসটি মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকে সংকলিত বলে উল্লেখ করেছেন তাঁরা কেউই হাদীসটির কোনো সনদ উল্লেখ করেন নি, সনদ বিচার তো দূরের কথা।

**(ঙ)** দশম শতক থেকেই অনেক আলিম নিশ্চিত করেছেন যে, এ হাদীসটি ভিত্তিহীন, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক বা অন্য কোনো গ্রন্থে তা নেই। ইমাম সুয়ূতী, শাইখ আব্দুল্লাহ গুমারী, শাইখ আহমাদ গুমারী, শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী, শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ও অন্যান্য প্রাচীন, সমকালীন, সালাফী ও সূফী সকল মতের মুহাদ্দিস একমত যে, এ কথাটি হাদীস নয়; কোনো হাদীসের গ্রন্থে এর অস্তিত্ব নেই। ইমাম কাসতালানীর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি)। তিনি এ হাদীসটির কোনো সনদ খুঁজে না পেয়ে লিখেন:

ليس له إسناد يعتمد عليه

"এ হাদীসটির কোনো সনদ নেই যার উপর নির্ভর করা যায়।"[৪৬৮]

(চ) বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী ও মুহাদ্দিস আল্লামা শাইখ আবুল ফাইয আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুস সিদ্দীক গুমারী (১৩৮০/১৯৬০) এবং আল্লামা শাইখ আবুল ফাদল আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুস সিদ্দীক গুমারী (১৪১৩/১৯৯৩)। তাঁদের দাদা সাইয়িদ মুহাম্মাদ সিদ্দীক ইবন আহমাদ হাসানী মরোক্কোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী, পীর ও ওলী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের পিতা মুহাম্মাদ ইবনুস সিদ্দীক পিতার স্থলাভিষিক্ত প্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিস এবং 'যাবিয়া সিদ্দীকিয়া' বা 'সিদ্দীকিয়া খানকা'-র পরিচালক ছিলেন। তাঁরা উভয়েই মুহাদ্দিস, ফকীহ ও তাসাউফের ইমাম বলে সুপরিচিত। তাঁরা সকলেই তাসাউফ, আকীদা, হাদীস ও ফিকহে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সালাফীগণ ও শাইখ আলবানীর বিরুদ্ধে তাঁরা অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে এ হাদীসের জালিয়াতির বিষয়ে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

শাইখ আহমাদ গুমারী ইমাম সুয়ূতীর 'জামি-সাগীর' গ্রন্থে বিদ্যমান জাল হাদীস বিষয়ে 'আল-মুগীর আলাল আহাদীসিল মাউদূআতি ফিল জামিয়িস সাগীর' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি এ হাদীসটি প্রসঙ্গে বলেন:

وهو حديث موضوع، لو ذكره بتمامه لما شك الواقف عليه في وضعه، وبقيته تقع في نحو ورقتين من القطع الكبير مشتملة على ألفاظ ركيكة ومعان منكرة

"'হাদীসটি জাল। যদি পুরো হাদীসটি উল্লেখ করা হয় তবে পাঠক হাদীসটির জালিয়াতি সম্পর্কে কোনো সন্দেহ করবেন না। হাদীসের অবশিষ্ট বক্তব্য বৃহদাকৃতির প্রায় দু পৃষ্ঠা, যার মধ্যে অনেক অসংলগ্ন ফালতু কথা এবং আপত্তিকর অর্থ বিদ্যমান।"[৪৬৯]

শাইখ আব্দুল্লাহ গুমারী মীলাদ মাহফিলের পক্ষে অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন। পাশাপাশি মীলাদ মাহফিলে জাল হাদীস আলোচনার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। মীলাদ মাহফিলের জাল হাদীস প্রসঙ্গে রচিত 'ইরশাদুত তালিবিন নাজীব ইলা মা ফিল মাওলিদিন নাবাবী মিনাল আকাযীব' বইয়ে তিনি বলেন:

منها وهو أشهرها حديث: أول ما خلق الله نور نبيك من نوره يا جابر، عزاه السيوطي في الخصائص الكبرى لمصنف عبد الرزاق، وقال في الحاوي ... ليس له إسناد يُعتمد عليه. وهذا تساهل كبير من السيوطي، كنتُ أنزهه عنه. أما أولاً: فالحديث غير موجود في مصنف عبد الرزاق ولا في شيء من كتب الحديث. أما ثانياً: فإن الحديث لا إسناد له أصلا. وأما ثالثاً: فإنه ترك بقية الحديث، وهي مذكورة في تاريخ الخميس للديار بكري، ومن قرأها يجزم بأن الحديث مكذوب على رسول الله ﷺ. وجاء شخص فيلالي من ذرية الشيخ محمد بن ناصر الدرعي، فألف كتاباً ... أتى فيه بطامة كبرى! حيث قال في أوله: .. حديث الإمام عبد الرزاق في مصنفه الشهير، عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم أحد أعلام المدينة، عن محمد بن المنكدر شيخ الزهري، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ... وقد تعجبت من وقاحة هذا الشخص وجرأته، حيث صنع هذا الإسناد الصحيح لحديث لا يوجد في مصنف عبد الرزاق ولا غيره من كتب الحديث المسندة!

"মীলাদ মাহফিলের জাল হাদীসগুলির অন্যতম: 'হে জাবির আল্লাহ সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূর তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেন। সুয়ূতী খাসাইসুল কুবরা গ্রন্থে বলেন: হাদীসটি মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকে সংকলিত এবং 'হাবী গ্রন্থে সুয়ূতী বলেন: হাদীসটির নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ নেই। এ বক্তব্যটি সুয়ূতীর পক্ষ থেকে বড় রকমের অবহেলা ও ঢিলেমি। সুয়ূতী এতবড় অবহেলা করবেন আমি তা মনে করতাম না। কারণ, প্রথমত: মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক বা হাদীসের অন্য কোনো গ্রন্থে এ হাদীসটি নেই। দ্বিতীয়ত: হাদীসটির একেবারেই কোনো সনদ নেই। তৃতীয়ত: সুয়ূতী হাদীসটির অবশিষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেন নি। (হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ) দিয়ারবাকরী (৯৬৬ হি) রচিত 'তারীখ খামীস' নামক গ্রন্থে হাদীসটির অবশিষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান। যদি কেউ হাদীসে অবশিষ্ট অংশ পাঠ করেন তবে নিশ্চিত হবেন যে, হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জাল করা। শাইখ মুহাম্মাদ নাসির দারয়ীর বংশধর এক ব্যক্তি একটি গ্রন্থ রচনা করে... এতে সে এক ভয়ঙ্কর মহাপাপ করে..। সে বলে হাদীসটি ইমাম আব্দুর রায্যাক সুফইয়ান ইবন উআইনা থেকে, তিনি যাইদ ইবন আসলাম থেকে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ... আমি এ ব্যক্তির অসভ্যতা ও দুঃসাহস দেখে অবাক হই! মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক বা অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে যে হাদীসের অস্তিত্ব নেই সে হাদীসের জন্য সে কিভাবে একটি সহীহ সনদ জাল করল!"[৪৭০]

এ হাদীসটির জালিয়াতি সম্পর্কে রচিত পুস্তক 'মুরশিদুল হায়ির লিবায়ানি ওয়াদয়ি হাদীসি জাবির' নামক পুস্তকে তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য আমাদের গ্রন্থের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। আমি তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

وبعد: فهذا جزء... أردت به تنزيه النبيّ ﷺ عمّا نُسب إليه مما لم يصح عنه ويعدُّ من قبيل الغلو المذموم، ومع ذلك صار عند العامة وكثير من الخاصة معدودًا من الفضائل النبويّة التي يكون إنكارها طعنًا في الجناب النبويّ عندهم، ولا يدركون ما في رأيهم وقولهم من الإثم العظيم الثابت في قول النبيّ ﷺ: "من كذب عليَّ فليتبوأ مقعده من النار" ... ولا يكون مدحه ﷺ شافعًا له في الكذب عليه. وإن كانت الفضائل يتسامح فيها فإن فضائل النبي ﷺ إنما تكون بالثابت المعروف حذرًا من الكذب المتوعَّد عليه بالنار... ... روى عبد الرزاق –فيما قيل– عن

جابر رضي الله عنه ... الحديث، ... وقد ذكره بتمامه ابن العربي الحاتمي في كتاب "تلقيح الأذهان ومفتاح معرفة الإنسان"، والديار بكري في كتاب "الخميس في تاريخ أنفس نفيس". وعزوه إلى رواية عبد الرزاق خطأ لأنه لا يوجد في مصنفه ولا جامعه ولا تفسيره. ... وهو حديث موضوع جزمًا، وفيه اصطلاحات المتصوفة، وبعض الشناقطة المعاصرين ركّب له إسنادًا فذكر أن عبد الرزاق رواه من طريق ابن المنكدر عن جابر وهذا كذب يأثم عليه. وبالجملة فالحديث منكر موضوع لا أصل له في شيء من كتب السُّنّة. ... وكونه ﷺ نورًا أمر معنوي، مثل تسمية القرءان نورًا ونحو ذلك، لأنه نوّر العقول والقلوب. ومن الكذب المكشوف قولهم: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، وروي في بعض كتب المولد النبوي عن أبي هريرة قال: سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل كم عمّرتَ من السنين؟ ... أنا ذلك الكوكب. وهذا كذب قبيح، قبّح الله من وضعه وافتراه. وذكر بعض غلاة المتصوّفة أن جبريل عليه السلام كان يتلقّى الوحي من وراء حجاب وكُشف له الحجاب مرة فوجد النبيّ ﷺ يوحي إليه فقال جبريل: منك وإليك. قلت: لعن الله من افترى هذا الهراء ... ما يوجد في كتب المولد النبويّ من أحاديث لا خطام لها ولا زمام هي من الغلو الذي نهى الله ورسوله عنه، فتحرم قراءة تلك الكتب، ولا يقبل الاعتذار عنها بأنّها في الفضائل لأن الفضائل يتساهل فيها برواية الضعيف، أمّا الحديث المكذوب فلا يقبل في الفضائل إجماعًا، بل تحرم روايته (إلا مع بيان أنه موضوع).... وفضل النبي ﷺ ثابت في القرءان الكريم، والأحاديث الصحيحة، وهو في غنى عما يقال فيه من الكذب والغلو، وقال ﷺ :"لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله".

"এ পুস্তিকাটি আমি রচনা করেছি... উদ্দেশ্য হলো অশুদ্ধ হাদীসগুলি থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পবিত্র করা। এ সকল হাদীস নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষদের মধ্যে এবং অনেক আলিম-বুজুর্গের মধ্যে কথাগুলি নবীজী ﷺ-এর ফযীলত বলে গণ্য। এগুলি খণ্ডন করা বা প্রতিবাদ করাকে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বেয়াদবী ও নিন্দা বলে গণ্য করেন। তাঁরা বুঝেন না যে, তাঁদের কথা ও মতের মধ্যে কী ভয়ঙ্কর পাপ বিদ্যমান। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমার নামে যে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে।" ... তাঁর প্রশংসা বা মর্যাদা বাড়ানো তাঁর নামে মিথ্যার কোনো অযুহাত হতে পারে না। যদিও ফযীলত বা সাওয়াব বা মর্যাদা বিষয়ক হাদীসের বিষয়ে কিছু ঢিল দেওয়া হয়, তবে তা অবশ্যই পরিচিত ও প্রমাণিত হাদীস দ্বারা হতে হবে। তাঁর নামে মিথ্যা বলে জাহান্নামী হওয়ার ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। ... বলা হয় যে, আব্দুর রায্যাক জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন....। ইবনু আরাবী হাতিমী 'তালকীহুল আযহান ওয়া মিফতাহু মা'রিফাতিল ইনসান' গ্রন্থে এবং দিয়ারবাকরী 'খামীস ফি তারীখ আনফাস নাফীস' গ্রন্থে এ হাদীসটির পুরো বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। আব্দুর রায্যাক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে যারা উল্লেখ করেছেন তাদের কথা সঠিক নয়। কারণ তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে, জামি গ্রন্থে বা তাফসীর গ্রন্থে এ হাদীসটির কোনো অস্তিত্ব নেই। ... হাদীসটি যে জাল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ হাদীসের মধ্যে (কয়েক শতক পরে উদ্ভাবিত) সূফীগণের পরিভাষা বিদ্যমান। বর্তমান যুগের একজন শানকীতী আলিম এ হাদীসের জন্য একটি জাল সনদ তৈরি করেছেন। তিনি লিখেছেন হাদীসটি আব্দুর রায্যাক ইবনুল মুনকাদিরের সূত্রে জাবির থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ মিথ্যাচারের জন্য তিনি পাপী হবেন। মোট কথা হাদীসটি আপত্তিকর জাল হাদীস। হাদীসের গ্রন্থগুলিতে এর কোনোরূপ অস্তিত্ব বা উৎস পাওয়া যায় না।..... আর রাসূলুলাহ ﷺ-এর নূর হওয়ার অর্থ তিনি বিমূর্ত ও রূপক অর্থে নূর। যে অর্থে কুরআন এবং অন্যান্য বিষয়কে নূর বলা হয়। কারণ তিনি জ্ঞান, বিবেক ও হৃদয়ের নূর।

এ জাতীয় আরেকটি প্রকাশ্য মিথ্যা কথা: "আপনি না হলে আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না।' মীলাদের গ্রন্থে কোনো কোনো লেখক লিখেছেন, আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ জিবরাঈল (আ)-কে বলেন, হে জীবরাঈল, আপনার বয়স কত? ..... আমিই সেই তারকা'। এটি একটি জঘন্য মিথ্যা, যে এটি বানিয়েছে আল্লাহ তাঁকে লাঞ্ছিত করুন! বাড়াবাড়িতে নিমজ্জিত কোনো কোনো সূফী উল্লেখ করেছেন, জিবরাঈল (আ)-কে পর্দার অন্তরাল থেকে ওহী দেওয়া হতো। একবার পর্দা উঠানো হলে তিনি দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ওহী দিচ্ছেন। তখন জিবরাঈল (আ) বলেন: আপনিই ওহী দিচ্ছেন আর আপনার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি!.. যে ব্যক্তি এ নোংরা প্রলাপ বানিয়েছে তাকে আল্লাহ লানত করুন! ... মীলাদুন্নবী গ্রন্থগুলিতে একেবারে ভিত্তিহীন অস্তিত্বহীন হাদীস বিদ্যমান, যেগুলি অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত। আলাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এরূপ অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ি নিষেধ করেছেন। এজন্য এ সকল বই পাঠ করা হারাম। ফাযাইল বিষয়ক হাদীস এ অজুহাতে এগুলি বলা জায়েয নয়। কারণ ফাযাইল বিষয়ে যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে উম্মাতের ইজমা রয়েছে যে, ফাযাইলের ক্ষেত্রেও জাল হাদীস গ্রহণ করা যায় না; বরং জাল হাদীস উল্লেখ করাই হারাম; (শুধু জাল হিসেবে চিহ্নিত করে তা উল্লেখ করা যায়)। ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ি করে তাঁর নামে যা বলা হয় তার কোনো প্রয়োজনই তাঁর নেই। তিনি বলেছেন[৪৭১]: খৃস্টানগণ যেভাবে ঈসার (আ) বিষয়ে অতিভক্তি-অতিপ্রশংসা করেছে তোমরা আমার বিষয়ে সেরূপ অতিভক্তি-অতিপ্রশংসা করবে না; আমি তো বান্দা বা দাস বৈ কিছুই নই; কাজেই আমার বিষয়ে বলবে: আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল।"[৪৭২]

আলামা আব্দুলাহ গুমারী 'ইসলাহু আবইয়াতিল বুরদাহ' পুস্তকে বলেন:

قال السيوطي في الحاوي: إنه غير ثابت. وهو تساهل قبيح، بل ظاهر الحديث الوضع، واضح النكارة، وفيه نَفَس صوفي، حيثُ يذكر مقام الهيبة ومقام الخشية، إلى آخر مصطلحات الصوفية..... فجابرٌ رضي الله عنه بريء من رواية هذا الحديث، وعبد الرزاق لم يسمع به، وأول من شهَّر هذا الحديث ابنُ العربي الحاتمي، فلا أدري عمّن تلقّاه! وهو ثقة، فلا بدَّ أن أحد المتصوفة المتزهدين وَضَعه.

"সুয়ূতী হাবী পুস্তকে বলেছেন: হাদীসটি প্রমাণিত নয়। এটি সুয়ূতীর একটি নিন্দনীয় ঢিলেমি; বরং হাদীসটি সুস্পষ্টত জাল এবং আপত্তিকর। সূফীদের পরিভাষা এর মধ্যে সুস্পষ্ট; যেমন এতে 'হাইবাতের মাকাম, খাশিয়াতের মাকাম ইত্যাদি সূফী পরিভাষা ব্যবহৃত (এগুলি প্রমাণ করে যে এ হাদীসটি জাল; কারণ এ সকল পরিভাষা কয়েকশত বৎসর পরে প্রচলিত হয়েছে) .... । জাবির (রা) এ হাদীস বর্ণনার দায়ভার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং আব্দুর রায্যাক কখনো এ হাদীসটি শুনেন নি। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি হাদীসটি প্রচার করেন তিনি ইবন আরাবী হাতিমী। আমি জানি না তিনি কার থেকে হাদীসটি পেয়েছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তাহলে অবশ্যই কোনো দরবেশ সূফী এ হাদীসটি জাল করে বানিয়েছেন।"[৪৭৩]

আরো অনেক সূফী ও তরীকাপন্থী মুহাদ্দিস এ হাদীসটির জালিয়াতি প্রসঙ্গে বই-পুস্তক রচনা করেছেন। সূফী-সালাফী মতভেদের কারণে, সূফী মত প্রমাণের জন্য বা বুজুর্গগণের দোহাই দিয়ে তাঁরা জাল হাদীস প্রশ্রয় দেন নি।

### তৃতীয় প্রসঙ্গ: জাল হাদীস প্রমাণে জাল পুস্তক

#### (ক) একটি হারানো পুস্তকের আবির্ভাব

২০০৫ খৃস্টাব্দে (الجزء المفقود من الجزء الأول من المصنف): 'মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকের প্রথম খণ্ডের হারানো অংশ" নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। 'ঈসা ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মানি হিমইয়ারী' নামক সংযুক্ত আরব আমিরাতের একজন আলিম গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ড. মাহমূদ সায়ীদ মামদূহ পুস্তকটির প্রশংসাপত্র লিখেন।

ভূমিকায় শাইখ হিমইয়ারীর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, নূর মুহাম্মাদীই যে প্রথম সৃষ্টি তা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এ বিষয়ক হাদীসটির মুসান্নফ আব্দুর রায্যাক গ্রন্থে বিদ্যমান না থাকায় এটি প্রমাণের জন্য তিনি অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ছিলেন। তিনি তুরস্ক, ইয়ামান ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগারগুলিতে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগুলো অনুসন্ধান করে কোথাও কোনো পাণ্ডুলিপিতে এ হাদীসটি পান নি। হঠাৎ করেই ড. সাইয়িদ মুহাম্মাদ আমীন কাদিরী বারাকাতী নামক একজন ভারতীয় রেজবী সূফী শাইখ তাকে মুসান্নাফ গ্রন্থে প্রথম দুটি খণ্ডের একটি পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন যার মধ্যে এ হাদীসটি বিদ্যমান। বিশ্বের কোথাও এ পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় কোনো কপি পাওয়া যায় না। এতে লেখা আছে ৯৩৮ হিজরীতে বাগদাদ নগরীতে ইসহাক ইবনু আব্দুর রাহমান সুলাইমানী এ পাণ্ডুলিপিটি লিখেন। তিনি কোন্ পাণ্ডুলিপি দেখে এটি লিখেছেন, এর সনদ কী ইত্যাদি বিষয় তাতে লেখা নেই। হিমইয়ারী দাবি করেন যে, এ পাণ্ডুলিপিটি দশম হিজরী শতকেই লেখা এবং এর বয়স প্রায় ৫০০ বৎসর।

এ পাণ্ডুলিপিটিতে মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকের শুরুতে দশটি পরিচ্ছেদ বিদ্যমান যে অধ্যায়গুলি বিশ্বের অন্য কোনো পাণ্ডুলিপিতে নেই। প্রথম পরিচ্ছেদটির নাম (باب في تخليق نور محمدﷺ) 'নূর মুহাম্মাদী সৃষ্টির অধ্যায়'। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলো ওযূ অধ্যায়ের। মুদ্রিত গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ের নাম 'কিতাবুল ঈমান': ঈমান অধ্যায়। এ অধ্যায়ে উপরের একটিই মাত্র পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ পরিচ্ছেদে উপরের হাদীসটির সনদ নিম্নরূপ:

عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر قال:

আব্দুর রায্যাক মা'মার থেকে, তিনি ইবনুল মুনকাদির থেকে, তিনি জাবির থেকে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম.... ।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ পাণ্ডুলিপি এবং এতে বিদ্যমান হাদীসগুলোর সনদ ও মতন বিচার করে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, পাণ্ডুলিপিটি পুরোটাই জাল। আমাদের এ গ্রন্থের পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলোর দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(১) তুর্কি সুলতানগণ বিগত কয়েকশত বৎসর যাবৎ বিশ্বের সকল দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছেন, যেগুলি তুরস্কের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বিদ্যমান। খোদাবখশ লাইব্রেরী-সহ ভারতেও অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে মুসলিম বিশ্বের প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিগুলি সংরক্ষিত। উপনিবেশ সময়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের পণ্ডিতগণ মুসলিম দেশগুলো থেকে সকল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে নিজেদের দেশের যাদুঘর ও পাঠাগারে সংরক্ষণ করেছেন। বিশ্বের কোনো যাদুঘরে বা লাইব্রেরিতে নেই এমন একটি পাণ্ডুলিপি আল্লামা রেজা খান ব্রেলবীর ভক্ত কোনো পীর সাহেবের বাড়িতে পাওয়া যাবে! বিশেষত আল্লামা আহমাদ রেযা খান ব্রেলবী (১২৭২-১৩৪০ হি/ ১৮৫৬-১৯২১খৃ) গবেষণা অধ্যয়নকে ওহাবীদের পরিচয় বলে গণ্য করতেন। তিনি বলেন:

أهل سنة بحر قوالي وعرس : ديوبندي بحر تصنيفات ودرس

خرج سني بر قبور وخانقاه : خرج نجدي بر علوم ودرس كاه

"আহল সুন্নাত কাওয়ালী ও উরশের সাগর; দেওবন্দী (ওহাবী) গ্রন্থরচনা ও পাঠদানের সমুদ্র । সুন্নীর খরচ কবর ও খানকার

জন্য। নজদীর (ওহাবীর) খরচ ইলম ও মাদরাসার জন্য।"[৪৭৪]

এমন একজন পীর সাহেব ৫০০ বৎসর যাবৎ একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করলেন, বিশ্বের বিশেষজ্ঞ আলিমদেরকে দিয়ে এর বিশুদ্ধতা প্রমাণ না করে তিনি 'নূর মুহাম্মাদী' প্রমাণের জন্য 'পাগলপারা' শাইখ হিমইয়ারীকেই তা প্রদান করলেন! তিনিও তা কাউকে দেখতে দিচ্ছেন না!

(২) পাণ্ডুলিপিটি ৯৩৩ হিজরী সালে লেখা বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু লিপিকার কার কাছ থেকে শুনে বা কোন্ পাণ্ডুলিপি দেখে লিখেছেন তা বলেন নি। আবার ৯৩৩ সাল থেকে ১৪২৫ সাল পর্যন্ত ৫০০ বৎসর পাণ্ডুলিপিটি কোথায় ছিল তারও কোনো বিবরণ এতে নেই। ইসলামী পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে অভিজ্ঞ সকলেই জানেন যে, এটি পাণ্ডুলিপির জালিয়াতি প্রমাণ করে।

(৩) পাণ্ডুলিপির যে পৃষ্ঠাগুলি বইটিতে ছাপা হয়েছে সেগুলি প্রমাণ করে যে, এটি আধুনিকযুগের ভারতীয় লিখন পদ্ধতিতে লেখা।

(৪) এ বইটিতে দাবি করা হয়েছে যে, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'কিতাবুল ঈমান' বা 'ঈমান অধ্যায়'। অথচ প্রাচীনকাল থেকে মুহাদ্দিসগণ মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকের অধ্যায়গুলির বর্ণনায় 'কিতাবুল ঈমান'-এর কথা উল্লেখ করেন নি; বরং কিতাবুত তাহারাহ বা পবিত্রতার অধ্যায় দিয়ে এ পুস্তকের শুরু বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৭৫]

(৫) বিশ্বে কোনো মুসান্নাফ গ্রন্থ কিতাবুল ঈমান দিয়ে শুরু করা হয় নি। ইমাম আব্দুর রায্যাক (২১১ হি)-এর পরে আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন উসমান আবু বাকর ইবন আবী শাইবা (২৩৫ হি) তাঁর প্রসিদ্ধ 'মুসান্নাফ' গ্রন্থ রচনা করেন। এটিও 'কিতাবুত তাহারাত' দিয়ে শুরু। উল্লেখ্য যে, অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও হাদীসের বিন্যাসে উভয় মুসান্নাফ প্রায় একইরূপ।

(৬) এ জাল পুস্তকটির দাবি অনুসারে ইমাম আব্দুর রায্যাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'কিতাবুল ঈমানে' একটিই মাত্র পরিচ্ছেদ সংকলন করেন! হাদীসের গ্রন্থগুলো সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান থাকলেও কি একথা কল্পনা করা যায়? বিশ্বের শতশত হাদীসগ্রন্থের মধ্যে একটি গ্রন্থও কি পাওয়া যায় যার 'কিতাবুল ঈমান'-এর মধ্যে একটিই মাত্র পরিচ্ছেদ বিদ্যমান?!

(৭) পাণ্ডুলিপিটি যিনি রচনা করেছেন তিনি হাদীস সম্পর্কে অভিজ্ঞ, তবে ভাল অভিজ্ঞ নন। বইটির দ্বিতীয় হাদীসের সনদ নিম্নরূপ:

عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني البراء قال:

"আব্দুর রায্যাক: ইবন জুরাইজ থেকে, ইবনু জুরাইজ বলেন: আমাকে বারা (রা) বলেন..."।[৪৭৬] জুরাইজ (১৫০ হি) একজন তাবি-তাবিয়ী। বারা ইবন আযিব (৭১ হি) বা কোনো সাহাবীকে তিনি দেখেনও নি। কোনো তাবি-তাবিয়ী যদি বলেন: "অমুক সাহাবী থেকে" তবে তা 'মুনকাতি' বলে গণ্য। আর যদি কোনো তাবি তাবিয়ী বলেন যে, অমুক সাহাবী তাকে বলেছেন, তবে তিনি মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হন। ইবন জুরাইজ কখনোই মিথ্যাবাদী ছিলেন না; তবে এ পাণ্ডুলিপিটির লেখক জ্ঞানের স্বল্পতা বা জালিয়াতির ব্যবস্তায় এরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যা লিখেছেন। এরূপ আরেকটি মহামিথ্যা বইটির ২৪ নং হাদীসের সনদ:

عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري أنه سمع عقبة بن عامر...

"আব্দুর রায্যাক, ইবন জুরাইজ থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি উকবা ইবন আমির (রা) কে বলতে শুনেছেন...।"[৪৭৭]

উকবা ইবন আমির (রা) ৪৪ হিজরীতে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং ৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম যুহরী ৫০ বা ৫৮ হিজরী সালে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। যুহরী কখনো উকবা থেকে হাদীস শুনেন নি। পাণ্ডুলিপিটির লেখক অজ্ঞতা বশত এরূপ লিখেছেন।

**(খ) শাইখ কামাদানী ও ড. মাহমূদ সায়ীদ-এর বক্তব্য**

আলোচ্য 'হারানো' পুস্তকটির ৩-৪ পৃষ্ঠায় মিসরের নাগরিক ও আরব আমিরাতে অবস্থানকারী প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ড. মাহমূদ সায়ীদ মামদূহ-এর একটি প্রশংসাপত্র বিদ্যমান। বস্তুত পুস্তকটির সম্পাদক শাইখ হিমইয়ারী তাঁর পাণ্ডুলিপি মাত্র দুজন আলিমকে দেখতে দেন: শাইখ আদীব কামাদানী ও ড. মাহমূদ সায়ীদ। শাইখ কামাদানী সিরিয়ার একজন মুহাদ্দিস ও পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই প্রদেশের ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ে গবেষক হিসেবে তিনি কর্মরত ছিলেন। এ সময়ে শাইখ হিমইয়ারীও একই মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন ও উভয়ে বন্ধু ছিলেন। তিনি বলেন, শাইখ হিমইয়ারী মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকের কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে নূর মুহাম্মাদী বিষয়টি প্রমাণ করতে অত্যন্ত অস্থির ছিলেন এবং সবাইকে বিষয়টি বলতেন। তাঁর এ অস্থিরতা দেখে ভারতের একজন ব্রেলবী পীর এ পাণ্ডুলিপিটি তাকে এনে দেন। পাণ্ডুলিটি পেয়ে হিমইয়ারী আনন্দ প্রকাশ করতে বিশাল মেজবানির আয়োজন করেন।

হিমইয়ারী কামাদানী ও মাহমূদ সায়ীদকে পাণ্ডুলিপিটি দেখতে দেন। কামাদানী পাণ্ডুলিপির কাগজ, কালি ও লিখনপদ্ধতি দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই এটিকে জাল বলেন। তিনি বলেন: পাণ্ডুলিপিটির বয়স দুবছরের বেশি কখনোই হতে পারে না। কিন্তু হিমইয়ারী এটিকে জাল বলে মানতে কিছুতেই রাজি হন না। কামাদানী তাকে বলেন: আপনি দুবাইয়ের পাণ্ডুলিপি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জুমুআতুল

মাজিদ কেন্দ্রে প্রেরণ করে এর বয়স, কাগজ, কালি ও লিখনির বিষয় যাচাই করুন এবং পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক কোথা থেকে তা অনুলিপি করেছে তা জানুন। হিমইয়ারী বলেন: পাণ্ডুলিপিটির সংগ্রাহক বলেছেন সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি লাইব্রেরি থেকে তারা পাণ্ডুলিপিটির অনুলিপি করে এনেছেন, তবে মূল পাণ্ডুলিপিটি যুদ্ধে নষ্ট হয়ে গিয়েছে! মুসান্নাফ-এর অবশিষ্ট অংশের পাণ্ডুলিপি দেখাতে বললে তারা অপারগতা প্রকাশ করেন![৪৭৮]

দ্বিতীয় ব্যক্তি ড. মাহমূদ সায়ীদ মুহাম্মাদ মামদূহ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাদীস গবেষক। তিনি পাণ্ডুলিপিটির সম্পাদক শাইখ হিমইয়ারীর মত সূফী আকীদার অনুসারী এবং সালাফীগণের বিরোধী। শাইখ আলবানী ও সালাফীগণের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান সুপরিচিত। আমরা দেখেছি তিনি এ 'হারানো' পুস্তকের প্রশংসাপত্র লিখেন। কিন্তু দু বছর পরে ২০০৭ সালে তিনি তাঁর প্রশংসাপত্র প্রত্যাহার করে এবং বইটির অনির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির নাম (بيان من الشيخ محمود سعيد حول ما طبع باسم الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق) 'মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকের হারানো অংশ নামে যা ছাপা হয়েছে তার বিষয়ে শাইখ মাহমূদ সায়ীদের বক্তব্য'।

এ প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আকীদা ও আমলে তিনি শাইখ হিমইয়ারীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন ও ভালবাসেন। হিমইয়ারী তাঁকে যখন এ পাণ্ডুলিপিটি দেখান তখন তিনি দুটি কারণে এর বিশুদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন: (১) পাণ্ডুলিপিটির কাগজ এবং কালি নতুন এবং (২) পাণ্ডুলিপির উপর এর সনদ, শ্রবণ, মালিকানা ইত্যাদির তথ্য লেখা নেই। দুবাইয়ের জুমুআতুল মাজিদ কেন্দ্রে পাণ্ডুলিপিটি পাঠালে তারা বলে যে, পাণ্ডুলিপিটির বয়স সর্বোচ্চ ৫০ বা ৬০ বৎসর। হিমইয়ারী এ পুস্তকটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁকে একটি প্রশংসাপত্র লিখে দিতে অনুরোধ করেন। তিনি পাণ্ডুলিপিটি পুরো না পড়ে, শুধু তার ভূমিকার উপর নির্ভর করে একটি প্রশংসাপত্র লিখেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে, পাণ্ডুলিপিটি অনির্ভরযোগ্য। মুমিনের জন্য ভুলের পক্ষে হুজ্জতি না করে ভুল স্বীকার করে সত্যগ্রহণ উত্তম। এজন্য তিনি 'মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক-এর প্রথম খণ্ডের হারানো অংশ' নামের পুস্তকটিতে তাঁর লেখা প্রশংসাপত্র প্রত্যাহার করলেন। এর সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।

তিনি আরো বলেন যে, আলোচিত পুস্তকের বাতিলকৃত প্রশংসাপত্রে তিনি 'নূর মুহাম্মাদী' বিষয়ক হাদীসটির প্রসঙ্গ মোটেও উল্লেখ করেন নি। কারণ তাঁর উস্তাদ আহমাদ গুমারী, আব্দুল্লাহ গুমারী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এ হাদীসটি জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। একটি বইয়ের প্রশংসাপত্র লেখার জন্য বইটির মধ্যে বিদ্যমান সকল হাদীস বা জাল হাদীসের বিষয় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করেন নি। এজন্যই তিনি উক্ত প্রশংসাপত্রে হাদীসটির জালিয়াতির প্রসঙ্গ আলোচনা করেন নি।

বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি লিখেন: "মোট কথা 'মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাকের প্রথম খণ্ডের হারানো অংশ' নামে প্রকাশিত বইটি একেবারেই অনির্ভরযোগ্য। এ বইটির রেফারেন্স দেওয়া বা অনুবাদ করা যাবে না।"[৪৭৯]

**(গ) বুখারী ও মুসলিম-সহ সকলেই কি নবী-বিরোধী ছিলেন?**

সম্মানিত পাঠক, যদি 'মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক-এর প্রথম খণ্ডের হারানো অংশ' নামক পুস্তকটি সঠিক প্রমাণ হয় তবে ইমাম আহমাদ ও সিহাহ-সিত্তার সংকলকগণ-সহ ও তৃতীয় শতক থেকে উম্মাতের সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বুজুর্গ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদার বিরোধী ও দীনের দুশমন বলে প্রমাণ হবে। কারণ তাঁরা ইমাম আব্দুর রায্যাকের মুসান্নাফের মধ্যে বিদ্যমান এতগুলি সহীহ হাদীসকে জেনে শুনে গোপন করেছেন। হাদীস সংকলন বিষয়ে যাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তারা বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, দ্বিতীয় হিজরীর প্রথমার্ধ থেকে মুসলিম বিশ্বের আলিমগণ হাদীসের সন্ধানে প্রতিটি গ্রাম ও শহর পরিভ্রমণ করতে থাকেন। এ সময় থেকে কোনো হাদীসই আর শুধু একটি সনদে বর্ণিত হয় নি। দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুহাদ্দিসগণ একটি হাদীস অনেক সনদে বর্ণনা করতেন এবং তাঁদের গ্রন্থগুলোতে সংকলন করতেন। এখন নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

(১) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) ৭৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে অনেক তাবিয়ী তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষার সুযোগ পান। তাঁর ছাত্রের সংখ্যা ১৬৫ জনেরও বেশি। অবাক বিষয় যে, এতবড় গুরুত্বপূর্ণ হাদীস তাঁর একজন মাত্র ছাত্র বর্ণনা করবেন, অন্য কেউই করবেন না।

(২) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (মৃত্যু ১৩০ হি) দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধের সুপ্রসিদ্ধ তাবিয়ী। সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যেই তাঁর দেড় শতাধিক ছাত্রের বর্ণনা বিদ্যমান। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম জাফর সাদিক, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী, শুবা ইবনুল হাজ্জাজ, ইবনুল মাজিশূন, ইবন জুরাইজ, আমর ইবন দীনার ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ও মুহাদ্দিস। হাদীসের গ্রন্থগুলিতে একটি সহীহ হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না যা ইবনুল মুনকাদির থেকে শুধু একজন ছাত্র বর্ণনা করেছেন, অন্য কোনো ছাত্রই বর্ণনা করেন নি। তাহলে এ হাদীসটি মা'মার ইবনু রাশিদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করলেন না কেন? ইবনুল মুনকাদির গোপন করে রেখেছিলেন? না ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, সুফইয়ান সাওরী ও অন্যান্য ছাত্র হাদীসটি তাঁর মুখ থেকে শোনার পরেও গোপন করেছিলেন?

(৩) মা'মার ইবনু রাশিদ (৯৬-১৫৪ হি) প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী। প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোতেই তাঁর প্রায় ৭৫ জন ছাত্রের বর্ণিত হাদীস পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি সহীহ হাদীসও খুঁজে পাওয়া যায় না যা মামার ইবনু রাশিদ থেকে শুধু একজন ছাত্র বর্ণনা

করেছেন। তাঁর প্রতিটি হাদীসই একাধিক ছাত্র বর্ণনা করেছেন। তাহলে এ হাদীসটি আব্দুর রায্যাক ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করলেন না কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা গোপন করতে?

(৪) ইমাম আব্দুর রায্যাক ইবন হাম্মাম সানআনী (১২৬-২১১ হি) দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোতে তাঁর শতাধিক ছাত্রের বর্ণনা বিদ্যমান। একটিও সহীহ মারফূ (নববী) হাদীস পাওয়া যায় না যা আব্দুর রায্যাক থেকে তার একজন মাত্র ছাত্র বর্ণনা করেছেন। তাহলে এ হাদীসটি অন্য কোনো ছাত্র বর্ণনা করলেন না কেন? রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা গোপন করার উদ্দেশ্যে?

(৫) মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক-এর মধ্যে বিদ্যমান সকল মারফূ (নববী) হাদীস তাঁর সনদে ও অন্যান্য সনদে সিহাহ সিত্তা ও তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম হিজরী শতকে সংকলিত হাদীস গ্রন্থগুলিতে সংকলিত। পাঠক, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি সহীহ বা যয়ীফ হাদীসও দেখাতে পারবেন না যা মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে সংকলিত কিন্তু বিশ্বের অন্য কোনো হাদীসগ্রন্থে এক বা একাধিক সনদে সংকলিত নয়। এখন প্রশ্ন হলো: ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, সিহাহ সিত্তার প্রণেতাগণ ও পরবর্তী যুগগুলোর মুহাদ্দিসগণ ইমাম আব্দুর রায্যাক-এর মুসান্নাফ গ্রন্থের সকল মারফূ বা নববী হাদীস গ্রহণ ও সংকলন করলেন, কিন্তু এ গ্রন্থে বিদ্যমান নূর মুহাম্মাদী বিষয়ক 'সহীহ সনদে' (!) সংকলিত এতগুলো হাদীসের একটিও তাঁরা সংকলন করলেন না কেন? হাজার বছর ধরে একটি হাদীস-গ্রন্থেও এসকল হাদীসের একটিও নেই কেন? তাঁরা সকলেই কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা গোপন করতে চেয়েছেন?

(৬) সহীহুল বুখারীর একটি অধ্যায়ের নাম 'কিতাব বাদয়িল খালক' 'সৃষ্টির শুরুর অধ্যায়'। এ অধ্যায়ে সাপ, বিচ্ছু, মাছি, জিন, ফিরিশতা ইত্যাদি বিষয়ক কত হাদীস ইমাম বুখারী সংকলন করেছেন। কিন্তু তাঁর উস্তাদগণের উস্তাদ আব্দুর রায্যাকের মুসান্নাফে সংকলিত নূর মুহাম্মাদী বিষয় কয়েক ডজন সহীহ (!) হাদীসের একটিও তিনি উল্লেখ করলেন না! আব্দুর রায্যাক বর্ণিত প্রায় ১৫০টি হাদীস তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থে সংকলন করলেন অথচ নূর মুহাম্মাদ বিষয়ক এতগুলো সহীহ (!) হাদীস তিনি গ্রহণ করলেন না!

(৭) উবাদা ইবনুস সামিত (রা), আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত:

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقَلَمُ../ أَوَّلَ شَيْءٍ خلقه الله القلم

'আল্লাহ সর্বপ্রথম 'কলম' সৃষ্টি করেন'। এ সকল হাদীস ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদে সংকলন করেছেন। ইমাম ইবন আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে (كتاب الأوائل: أول ما فُعِل...) "সর্বপ্রথম বিষয়ক অধ্যায়: প্রথম কী হলো..." নামে একটি অধ্যায় সংকলন করেছেন। এ অধ্যায়েও তিনি 'সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির' এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি বা অন্য কোনো মুহাদ্দিস সর্বপ্রথম সৃষ্টি, সৃষ্টির শুরু বা অন্য কোনো অধ্যায়ে নূর মুহাম্মাদী বিষয়ক হাদীসগুলো উল্লেখ করেন নি। কেন? রাসূলুলাহ ﷺ-এর মর্যাদা কমিয়ে কলম-এর মর্যাদা বাড়ানোর জন্য?

(৮) সম্মানিত পাঠক, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকের মধ্যে বিদ্যমান অধ্যায় ও পরিচ্ছেদগুলো মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা ও অন্যান্য সকল হাদীস গ্রন্থে বিদ্যমান। কিন্তু 'তাখলীক নূর মুহাম্মাদ ﷺ' (নূর মুহাম্মাদীর সৃষ্টি) নামে একটি অধ্যায় মুসলিম বিশ্বের কোনো একটি হাদীসের গ্রন্থেও নেই। ৫০০ বৎসর পর্যন্ত সংকলিত ফিকহ ও আকীদার কোনো গ্রন্থেও 'নূর মুহাম্মাদ' বিষয়ক অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ বা সামান্যতম কোনো আলোচনা নেই। তাঁরা মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক থেকে অগণিত হাদীস গ্রহণ করলেন, সংকলন করলেন এবং এগুলিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করলেন অথচ নূর মুহাম্মাদ বিষয়ক এতগুলো হাদীস এভাবে এড়িয়ে গেলেন কেন?

(৯) এ 'হারানো' বইটি যদি সত্যই আব্দুর রায্যাক রচিত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, ইমাম আহমাদ-সহ ইমাম আব্দুর রায্যাকের ছাত্রগণ, পরবর্তী সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ, আকীদাবিদ ও বুজুর্গগণ রাসূলুলাহ ﷺ-এর মর্যাদা গোপন করতেই এরূপ করেছেন (নাউযূ বিল্লাহ)! আর তাঁদেরকে যদি আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অতন্দ্র প্রহরী বলে গণ্য করি তবে এ পুস্ত কটিকে জাল বলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তৃতীয় কোনো ব্যাখ্যা কি পাঠক দেখাতে পারবেন?

সম্মানিত পাঠক, কোন্‌টি আপনার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য? একটি জাল হাদীসকে প্রমাণ করতে এভাবে হাজার বছরের সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ, আকীদাবিদ ও বুজুর্গকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা গোপনকারী বলা? অথবা চার ইমাম-সহ উম্মাতের প্রথম শতকগুলোর ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, আকীদাবিদ ও বুজুর্গগণ যে সকল হাদীস কোনোভাবে উল্লেখ করেন নি এবং যে বিষয়ে মোটেও কথা বলেন নি সে হাদীস ও সে বিষয় বর্জন করা?

**চতুর্থ প্রসঙ্গ: রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নূরত্ব বনাম মানবত্ব**

নূরে মুহাম্মাদী বিষয়ে আরো অনেক জাল ও সনদবিহীন কথা ইবনু আরাবীর পুস্তকাদি, সীরাহ হালাবিয়া, শারহুল মাওয়াহিব ও মীলাদুন্নবী বিষয়ক পুস্তকাদিতে বিদ্যমান। এসকল পুস্তকের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশে 'সাইয়েদুল মুরসালীন' ও অন্যান্য সীরাতুন্নবী বিষয়ক পুস্তকে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, 'রাসূলুলাহ (ﷺ) নূর দ্বারা সৃষ্ট' এ অর্থে বর্ণিত ও প্রচলিত সকল হাদীসই বানোয়াট। এর বড় প্রমাণ যে, ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ৫০০ বৎসরে সংকলিত কোনো হাদীস, তাফসীর, সীরাত বা ফিকহের গ্রন্থে এ বিষয়ক একটি সহীহ বা যায়ীফ হাদীসও সনদ-সহ পাওয়া যায় না।

তাফসীর গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীস আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ইমাম তাবারী সূরা মায়িদার ১৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় নূর বলতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বুঝিয়েছেন। কিন্তু তিনি বা অন্য কোনো প্রাচীন মুফাস্‌সির রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নূর থেকে সৃষ্ট বিষয়ক কোনো হাদীস এখানে উল্লেখ করেন নি। ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক বইগুলোতে অগণিত যয়ীফ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে অনেক অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের প্রথম ৫০০ বছরে লেখা কোনো একটি ইতিহাস বা সীরাত গ্রন্থে 'নূর মুহাম্মাদী' বিষয়টি কোনোভাবে আলোচনা করা হয় নি।

এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে: (১) 'রাসূলুল্লাহ নূর প্রদানকারী প্রদীপ হিসেবে প্রেরিত'-এটি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত (২) 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নূর'- এ কথা কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেছেন। (৩) 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-নূর দ্বারা সৃষ্ট'- এ কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

**(ক)** কুরআন-হাদীসের নির্দেশনাকে নিজের পছন্দ অপছন্দের উর্ধ্বে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার নামই ইসলাম। সুপথপ্রাপ্ত মুসলিমের দায়িত্ব হলো, ওহীর মাধ্যমে যা জানা যাবে তা সর্বান্তকরণে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং নিজের পছন্দ ও মতামতকে ওহীর অনুগত করা। পক্ষান্তরে বিভ্রান্তদের চিহ্ন হলো, নিজের পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে ওহীকে গ্রহণ করা বা বাদ দেয়া।

**(খ)** কুরআন ও হাদীসে বারংবার স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মানুষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআনে আরো বলা হয়েছে যে, তাঁকে আল্লাহ 'নূর প্রদানকারী প্রদীপ' রূপে প্রেরণ করেছেন। কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বিশ্বাস করা মুমিনের দায়িত্ব। এজন্য আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি মানুষ এবং তিনি নূর প্রদানকারী প্রদীপ হিসেবে প্রেরিত।

**(গ)** কুরআন বা হাদীসে এক স্থানেও বলা হয় নি যে, আপনি বলুন 'আমি নূর' বা 'মুহাম্মাদ নূর'। কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেছেন যে, সেখানে 'নূর' বলতে রাসূলুলাহ (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যাও রাসূলুলাহ (ﷺ) বা কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়, বরং পরবর্তী কোনো কোনো মুফাস্‌সির একথা বলেছেন।

**(ঘ)** আমরা কুরআন-হাদীসের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশকে দ্ব্যর্থহীনভাবেই গ্রহণ করব। আর মুফাস্‌সিরদের কথাকে তার স্থানেই রাখব। আমরা বলতে পারি: কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুলাহ ﷺ মানুষ। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় নূর বলতে আমরা 'কুরআন'-কে বুঝাবো। কারণ কুরআনে সুস্পষ্টত 'কুরআন'কে নূর বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুস্পষ্টত নূর বলা হয় নি; কাজেই তাঁর বিষয়ে একথা বলা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। অথবা আমরা বলতে পারি: কুরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুলাহ ﷺ মানুষ। তবে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মানব জাতির হেদায়াতের আলোক-বর্তিকা হিসেবে তাঁকে নূর বলা যেতে পারে।

**(ঙ)** কিন্তু যদি কেউ বলেন যে, তিনি 'হাকীকতে' বা প্রকৃত অর্থে নূর ছিলেন, মানুষ ছিলেন না, শুধু মাজাযী বা রূপক অর্থেই তাঁকে মানুষ বলা যেতে পারে, তবে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি নিজের মন-মর্জি অনুসারে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা বাতিল করে এমন একটি মত গ্রহণ করলেন, যার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের একটিও দ্ব্যর্থহীন বাণী নেই।

**(চ)** নূর মুহাম্মাদী বিষয়ক এ সকল হাদীসে বারংবারই বলা হয়েছে ইহূদী, খৃস্টান, কাফির, মুশরিক, মুমিন, মুসলিম ভাল-মন্দ সকল শ্রেণীর মানুষ, জিন, ফিরিশতা ও মহাবিশ্ব মুহাম্মাদ ﷺ-এর নূর দ্বারা সৃষ্ট, অর্থাৎ সকলেই আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্ট! এভাবে আমরা তাঁর মর্যাদা কতটুকু বাড়াচ্ছি?

**পঞ্চম প্রসঙ্গ: সমস্যা কী?**

সম্মানিত পাঠক, একজন নেককার মানুষ আমাকে প্রশ্ন করেন: রাসূলুলাহ ﷺ নূরের তৈরি হলে আপনাদের সমস্যা কী? কেনই বা আপনারা এ বিষয়ক হাদীসগুলোকে জাল প্রমাণ করতে এত সচেষ্ট?

পাঠক, আমার মনেও একই প্রশ্ন: 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নূরের তৈরি'- একথা বললে আল্লাহর কী সমস্যা হতো? কুরআন ও হাদীসে ফিরিশতা, জিন ও মানুষের নূর, আগুন ও মাটি দিয়ে তৈরির কথা কতবার বলা হলো! কিন্তু একটিবারও মুহাম্মাদ ﷺ-এর নূর দ্বারা সৃষ্টির কথা বলা হলো না কেন? কেনই বা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বারংবার তাঁকে মানুষ বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন?

সম্মানিত পাঠক, প্রকৃত বিষয় তো আল্লাহই জানেন। তবে বাহ্যত এর দুটি কারণ: (১) সুন্নাতে নববীর প্রতিষ্ঠা এবং (২) শিরকের পথ রুদ্ধ করা।

**(ক)** ধর্মীয় 'মহাপুরুষ' বা ধর্মপ্রবর্তকের বিষয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে মুসলিমদের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। হিন্দুগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার ও মুক্তির দূত বলে বিশ্বাস করেন; কিন্তু কখনোই কর্মে-আচরণে তাঁর অনুকরণ-অনুসরণের কথা ভাবেন না। খৃস্টানগণ ঈসা (আ)-কে তাঁদের শাফাআতকারী-ত্রাণকর্তা (savior) ও মধ্যস্থ-ওসীলা (mediator) হিসেবে বিশ্বাস করেন; কিন্তু কখনোই তাঁর অনুকরণ-অনুসরণের কথা চিন্তা করেন না। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এ সকল 'মহাপুরুষ' অলৌকিক সত্ত্বা ছিলেন; অন্যদের মত মানুষ ছিলেন না। কাজেই তাঁরা অনেক কিছুই করতে পারেন যা সাধারণ মানুষের জন্য সম্ভব বা সঠিক নয়। এজন্য আল্লাহর করুণা ও জান্নাত লাভের জন্য তাঁদের ভক্তি করতে হবে এবং নির্দেশ পালন করতে হবে; তাঁদের পরিপূর্ণ অনুকরণ সম্ভব নয় বা প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও প্রেম

লাভের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভক্তি ও ভালবাসার পাশাপাশি তাঁর পরিপূর্ণ 'ইত্তিবা' বা অনুকরণ-অনুসরণ করতে হবে।

বস্তুত কোনো 'উসওয়া হাসানা' বা 'অনুকরণীয় মডেল' ছাড়া মানুষ বাস্তব জীবনে কোনো আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পারে না। ইসলামী বিশ্বাসে মুহাম্মাদ ﷺ-ই এরূপ অনুপম আদর্শ। মুহাম্মাদ ﷺ পাথর বা অস্ত্রের আঘাতে জর্জরিত হয়েও শত্রুকে ক্ষমা করেছেন, রাতের গভীরে সালাত আদায় করতে করতে পবিত্র পদযুগল ফুলে গিয়েছে, তাঁর পবিত্র চোখের পানিতে সাজদার স্থান আদ্র হয়েছে, প্রচণ্ড ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধেছেন; কিন্তু অন্যায়, দুর্নীতি বা পরমুখাপেক্ষিতার প্রশ্রয় দেন নি; সকল অত্যাচার সহ্য করেও তাওহীদের ক্ষেত্রে আপোষহীন থেকেছেন, কোনোদিন কোনো খাদিম, স্ত্রী বা অন্য কাউকে গালি দেন নি বা ঝগড়া করেন নি। মুমিন যখন চিন্তা করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের মত মাটির মানুষ হয়ে যদি এরূপ করতে পারেন তবে আমি কেন পারব না? তখন তাঁর জন্য এ মহান আদর্শ পালন সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু যখন মুমিন বিশ্বাস করবেন যে, তিনি আমাদের মত মাটির মানুষ নন; বরং আল্লাহর সত্তা থেকে সৃষ্ট অলৌকিক সত্তা, তিনি তো অনেক কিছুই করতে পারেন! তখন তিনি শুধু ভক্তিই করতে পারেন; কিন্তু অনুকরণের প্রেরণা লাভ করতে পারেন না। তখন তাঁকে অনুকরণের জন্য মডেল হিসেবে অন্য কোনো 'গুরু', 'পুরোহিত' বা 'মডেল' খুঁজতে হয়।

**(খ)** ধর্মের মধ্যে শিরকের প্রবেশের কারণ 'নবী-ওলীগণের' বিষয়ে অতিভক্তি, তাঁদেরকে আল্লাহর সত্তার অংশ বা অবতার (God incarnate) আল্লাহর যাত বা সিফাতের (সত্তা বা বিশেষণের) মুজাস্সাম বা দেহরূপ (in flesh) বলে বিশ্বাস করা। তাওহীদী দীনকে এভাবে শিরকে রূপান্তরিত করার অন্যতম উদাহরণ খৃস্টধর্ম। প্রচলিত বাইবেলেও ঈসা (আ) বারংবার বলছেন যে, আমি মানুষ, আমাকে ভাল বলবে না, আমি গাইব জানি না, আল্লাহই ভাল, তিনিই সব জানেন, একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর...। তবে তিনি আল্লাহকে পিতা বলেছেন। হিব্রু ভাষায় সকল মানুষকে, বিশেষত নেককার মানুষকে 'ইবনুল্লাহ' বা 'আল্লাহর পুত্র' বলা হয়। তিনি বলেছেন: 'যে আমাকে দেখল সে আল্লাহকে দেখল', যে আমাকে মানল সে আল্লাহকে মানল'। এরূপ কথা সকল নবীই বলেন। কিন্তু সাধু পল অতিভক্তিকে পুঁজি করে খৃস্টধর্মকে বিকৃত করেন। ক্রমান্বয়ে খৃস্টানগণ দাবি করেন ঈসা (আ) আল্লাহর 'যাতের অংশ' (same substance) এবং তাঁর 'কালিমা' বিশেষণের মুজাস্সাম বা দেহধারী রূপ (the Word was made flesh)। তিনি নূর থেকে আগত নূর। এর বিপরীত কিছু বলাকে তাঁরা ঈসা মাসীহের সাথে বেয়াদবি ও দুশমনি বলে গণ্য করলেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লেখা **'কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম"** পুস্তিকাটি পাঠ করুন। এখানে খৃস্টধর্মের বিশ্বাসের সাক্ষ্য বা নাইসীন ক্রীড (Nicene creed) থেকে কিছু উদ্ধৃতি প্রদান করছি:

**We believe in one God, .. and in one Lord Jesus Christ, the Son of God ... of the substance of the Father... light of light ... was incarnate, .. But the holy catholic and apostolic Church of God anathematizes those .. who say, that the Son of God was of any other substance or essence...**

"আমরা বিশ্বাস করি এক ঈশ্বরে... এবং একজন প্রভু যীশু খৃস্টে, ঈশ্বরের পুত্র, ... পিতারই যাত (সত্তা) থেকে.. নূর থেকে নূর ..মুজাস্সাম হন (দেহ ধারণ করেন)... কিন্তু পবিত্র মহাসম্মেলন... অভিশাপ দিচ্ছে তাদেরকে ...যারা বলে যে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বরের যাত (সত্তা) ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বা সারবস্তুর...।" পাঠক, প্রয়োজনে (the creed) লিখে ইন্টারনেটে সার্চ করুন।

শেষ দীন ও বিশ্বধর্ম হিসেবে ইসলামের সংরক্ষণের জন্য মহান আল্লাহ এ অতিভক্তির পথ রুদ্ধ করেছেন। আর এজন্যই মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাশারিয়্যাত বা মানুষ হওয়ার বিষয়টি এত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। উপরন্তু ঈমানের সাক্ষ্যে 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ' বলে তাঁর বান্দা ও মানুষ হওয়ার বিষয়টি রিসালাতের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানানো হয়েছে।

### ষষ্ঠ প্রসঙ্গ: সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদার প্রাচীনত্ব

উপর্যুক্ত বাতিল ও ভিত্তিহীন কথার পরিবর্তে আমাদের সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের উপর নির্ভর করা উচিত। সহীহ হাদীসে ইরবাদ ইবনু সারিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي: دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ

"যখন আদম তাঁর কাদার মধ্যে লুটিয়ে রয়েছেন সে অবস্থাতেই আমি আল্লাহর কাছে খাতামুন নাবিয়্যীন বা শেষ নবী রূপে লিখিত। আমি তোমাদেরকে এর শুরু সম্পর্কে জানাব। তা হলো আমার পিতা ইবরাহীমের (আ) দোয়া, ঈসার (আ) সুসংবাদ এবং আমার আম্মার দর্শন। তিনি যখন আমাকে জন্মদান করেন তখন দেখেন যে, তাঁর মধ্য থেকে একটি নূর নির্গত হলো যার আলোয় তাঁর জন্য সিরিয়ার প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে গেল।"[৪৮০]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

"তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, কখন আপনার জন্য নবুয়ত স্থিরকৃত হয়? তিনি বলেন: যখন আদম দেহ ও রূহের মধ্যে ছিলেন।"

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, সহীহ, গরীব বলেছেন।[৪৮১] অন্য হাদীসে মাইসারা আল-ফাজর (রা) বলেন,

قُلْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ مَتَى كُنْتَ (كُتِبْتَ/ جُعِلْتَ) نَبِيًّا؟ قَالَ: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

"আমি রাসূলুলাহ ﷺ-কে বললাম, আপনি কখন নবী ছিলেন (অন্য বর্ণনায়: কখন আপনি নবী হিসেবে লিখিত হয়েছিলেন?, অন্য বর্ণনায়: কখন আপনাকে নবী বানানো হয়?) তিনি বলেন, যখন আদম দেহ ও রূহের মধ্যে ছিলেন।" হাদীসটি হাকিম সংকলন করেছেন ও সহীহ বলেছেন। যাহাবীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৪৮২]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ بَيْنَ خَلْقِ آَدَمَ وَنَفْخِ الرُّوحِ فِيْهِ

"নবী (ﷺ)-কে বলা হলো, কখন আপনার জন্য নবুয়ত স্থিরকৃত হয়? তিনি বলেন, আদমের সৃষ্টি ও তার মধ্যে রূহ ফুঁক দেয়ার মাঝে।"[৪৮৩]

এ অর্থে একটি যায়ীফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ নু'আইম ইসপাহানী (৪৩০হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাঁরা তাঁদের সনদে দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন রাবী সাঈদ ইবনু বাশীর (১৬৯হি) থেকে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। এ সাঈদ ইবনু বাশীর বলেন, আমাকে কাতাদা বলেছেন, তিনি হাসান থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّيْنَ فِيْ الْخَلْقِ وَآَخِرَهم في البَعْثِ

"আমি ছিলাম সৃষ্টিতে নবীগণের প্রথম এবং প্রেরণে নবীগণের শেষ।"[৪৮৪]

এ সনদে দুটি দুর্বলতা রয়েছে। প্রথম, হাসান বসরী মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। তিনি এখানে (**عن**: আন) বা 'থেকে' শব্দ ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়, এ হাদীসের বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনু বাশীর হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে চলনসই হিসাবে গণ্য করেছেন। অনেকে তাকে অত্যন্ত দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোর নিরীক্ষা করে এবং সকল মুহাদ্দিসের মতামত পর্যালোচনা করে তাকে 'যয়ীফ' বা দুর্বল বলে গণ্য করেছেন।[৪৮৫]

এ হাদীসকে কেউ কেউ তাবিয়ী কাতাদার নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবন কাসীর বলেন, "সাঈদ ইবনু বাশীরের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। সাঈদ ইবনু আবূ আরূবাও হাদীসটি কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কাতাদার পরে হাসান বসরী ও আবূ হুরাইরার নাম বলেন নি, তিনি কাতাদা থেকে বিচ্ছিন্ন সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ হাদীসটিকে কাতাদার নিজের বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।"[৪৮৬]

এ সর্বশেষ হাদীসটি ছাড়া উপরের ৪টি হাদীসই সহীহ বা হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীস সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, আদম (আ)-এর সৃষ্টি প্রক্রিয়া পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর শ্রেষ্ঠতম সন্তান, আলাহর প্রিয়তম হাবীব, খালীল ও রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নুবুওয়াত, খতমে নবুয়ত ও মর্যাদা সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ভিত্তিহীন, সনদবিহীন কথাগুলোকে আন্দাযে, গায়ের জোরে বা বিভিন্ন খোঁড়া যুক্তি দিয়ে রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নামে বলার প্রবণতা ত্যাগ করে এ সকল সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করা আমাদের উচিত।

**১৭. আদম যখন পানি ও মাটির মধ্যে**

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরের সহীহ বা হাসান হাদীসগুলোর কাছাকাছি শব্দে জাল হাদীস প্রচারিত হয়েছে। একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

كُنْتُ نَبِيًّا وآدمُ بَيْنَ الْمَاءِ والطِّيْنِ

"আদম যখন পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন তখন আমি নবী ছিলাম।"

**১৮. যখন পানিও নেই মাটিও নেই**

কোনো কোনো জালিয়াত এর সাথে একটু বাড়িয়ে বলেছেন:

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدمُ بَيْنَ الْمَاءِ والطِّيْنِ، وكنت نبيا وَلاَ مَاءَ ولاَ طِيْنٌ

"আদম যখন পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন তখন আমি নবী ছিলাম। এবং যখন পানি ছিল না এবং মাটিও ছিল না তখন আমি নবী ছিলাম।"

সাখাবী, সুয়ূতী, ইবনু আর্‌রাক, মোল্লা আলী কারী, আজলূনী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস একবাক্যে বলেছেন যে এ কথাগুলো ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।[৪৮৭]

**সপ্তম প্রসঙ্গঃ তুরবায়ে মুহাম্মাদী বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সৃষ্টির মাটি**

**১৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাকর ও উমার (রা) একই মাটির**

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নূর নিয়ে যেমন অনেক বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা কথা প্রচলিত হয়েছে, তেমনি তাঁর সৃষ্টির মাটি বিষয়েও কিছু কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

إن الله خَلَقَنِي وخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْ تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِيْهَا نُدْفَنُ

"মহান আল্লাহ আমাকে, আবূ বাকরকে ও উমারকে একই মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সে মাটিতেই আমাদের দাফন হবে।"

হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত। প্রত্যেকটি সনদই দুর্বল। ইবনুল জাওযী একটি সনদকে 'জাল' ও অন্যটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে সুয়ূতী, ইবনু আর্‌রাক, তাহির পাটনী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, এ দুটি সনদ ছাড়াও 'হাদীসটি' আরো কয়েকটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল সনদে দুর্বল রাবী থাকলেও মিথ্যায় অভিযুক্ত নেই। কাজেই সামগ্রিকভাবে হাদীসটি 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য।[৪৮৮]

**২০. রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আলী (রা), হারূন (আ)... একই মাটির**

৫ম শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আহমাদ ইবনু আলী খতীব বাগদাদী বলেন.. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনুল হুসাইন ইবনু দাঊদ আল-কাত্তান ৩১১ হিজরীতে তার ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনু ইসামঈলকে বলেছেন। আবূ ইসহাক বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু খালাফ আল-মারওয়াযী বলেছেন, আমাদেরকে মূসা ইবনু ইবরাহীম আল-মারওয়াযী বলেছেন, আমাদেরকে ইমাম মূসা কাযিম বলেছেন, তিনি তাঁর পিতা ইমাম জা'ফর সাদিক থেকে, তিনি তাঁর পিতামহদের সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

خُلِقْتُ أَنَا وَهَارُوْنُ بْنُ عِمْرَانَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَعَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ مِنْ طِيْنَةٍ وَاحِدَةٍ

"আমি, হারূন ইবনু ইমরান (আ), ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া (আ) ও আলী ইবনু আবূ তালিব একই কাদা থেকে সৃষ্ট।"[৪৮৯]

লক্ষ্য করুন, এ সনদে রাসূল-বংশের বড় বড় ইমামদের নাম রয়েছে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি জাল কথা। এ সনদের দুজন রাবীঃ মুহাম্মাদ ইবনু খালাফ ও তার উস্তাদ মূসা ইবনু ইবরাহীম উভয়ই জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। এ দুজনের একজন হাদীসটি বানিয়েছে। তবে জালিয়াতির ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি বেশি ছিল উস্তাদ মূসার।[৪৯০]

**২১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ), ফাতেমা, হাসান, হুসাইন (রা) একই মাটির**

আবূ নুআইম ইসপাহানীর 'ফাযাইলুস সাহাবাহ' গ্রন্থে সংকলিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমা (রা) ও হাসান-হুসাইন (রা) সম্পর্কে বলেছেনঃ

خُلِقْتُ وَخُلِقْتُمْ مِنْ طِيْنَةٍ وَاحِدَةٍ

"আমি এবং তোমরা একই মাটি থেকে সৃষ্ট হয়েছি।"

সুয়ূতী, ইবন আর্‌রাক প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলেছেন।[৪৯১]

**অষ্টম প্রসঙ্গঃ হিজরত, মি'রাজ, ওফাত ইত্যাদি বিষয়ক জাল হাদীস**

**২২. সাওর গুহায় আবূ বাকর (রা)-কে সাপে কামড়ানো**

১৩শ শতকের মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ দরবেশ হূত বলেন,

مَا يُذْكَرُ فِيْ السِّيَرِ مِنْ نَبَاتِ شَجَرَةٍ عِنْدَ فَمِ الْغَارِ وَقْتَ هِجْرَتِهِ ﷺ وَأَنَّهُ فُتِحَ بَابٌ فِيْ ظَهْرِ الْغَارِ وَظَهَرَ عِنْدَهُ نَهْرٌ وَأَنَّ الْحَيَّةَ لَدَغَتْ أَبَا بَكْرٍ فِيْ الْغَارِ- بَاطِلٌ لاَ أَصْلَ لَهُ

"সীরাতুন্নবী লেখকগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হিজরতের সময়ে গুহার মুখে গাছ জন্মেছিল, গুহার পিছনে দরজা প্রকাশিত

হয়েছিল এবং সেখানে একটি নদী দেখা গিয়েছিল, এবং গুহার মধ্যে আবূ বাকরকে (রা) সাপে কামড় দিয়েছিল- এগুলো সবই বাতিল কথা, যার কোনো ভিত্তি নেই।"[৪৯২]

বস্তুত গুহার পিছনে দরজা প্রকাশ হওয়া, নদী দেখতে পাওয়া ইত্যাদি বিষয় একেবারেই ভিত্তিহীন ও সনদবিহীন গল্প বলে প্রতীয়মান। আর গুহার মুখে গাছ জন্মানো, মাকড়াসার জাল বোনা, কবুতরের বাসা বানানো এবং আবূ বাকর (রা)-কে সাপে কামড়ানো বিষয়ে কিছু হাদীস সনদ-সহ বর্ণিত।

**(ক)** আবূ বাকরকে সাপে কামড়ানোর কাহিনীটি ইমাম বাইহাকী দালাইলুন নুবুওয়াত গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এ হাদীসের সারমর্ম যে, আবূ বাকর (রা) সাওর গুহায় প্রবেশের পর আবূ বাকর (রা) দেখেন যে সেখানে ফাটল বা গর্ত রয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিরাপত্তার জন্য ফাটলটির মুখে নিজের পা রাখেন। তখন ফাটলের মধ্যে অবস্থানরত সাপ তাঁকে দংশন করে এবং বেদনায় তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু পড়তে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন: তুমি ব্যথিত হয়ো না; আল্লাহ তো আমাদের সাথে। এ কথার পর আল্লাহ আবূ বাকর (রা)-এর উপর প্রশান্তি নাযিল করেন।

বাইহাকী বর্ণিত হাদীসে এতটুকুই বলা হয়েছে, যদিও আমাদের সমাজে এ গল্পের সাথে অনেক কিছু সংযুক্ত হয়েছে। ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবন হাজার আসকালানী হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন। হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী আব্দুর রাহমান ইবনু ইবরাহীম রাসিবী জালিয়াত বলে গণ্য। তাঁর উস্তাদ ফুরাত ইবনুস সায়িবও অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী।[৪৯৩]

**(খ)** গুহার মুখের গাছ, মাকড়াসার জাল ও কবুতরের বাসা বিষয়ে মুসনাদ আহমাদ, তাবাকাত ইবন সা'দ, বাইহাকীর দালাইলুন নুবুওয়াত ও অন্যান্য গ্রন্থে অত্যন্ত দুর্বল সনদে কয়েকটি হাদীস সংকলিত। অনেক মুহাদ্দিস পুরো বিষয়টিকেই ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন। মাকড়াসার জাল বিষয়ক একটি হাদীসকে ইবন কাসীর ও ইবন হাজার হাসান বলে গণ্য করেছেন।[৪৯৪]

**২৩. মি'রাজের রাত্রিতে পাদুকা পায়ে আরশে আরোহণ**

সমাজে অতি প্রসিদ্ধ কথা যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুতা পায়ে আরশে আরোহণ করেছিলেন। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট একটি কথা। মি'রাজের ঘটনা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ ৬টি হাদীস গ্রন্থ সহ সকল হাদীস গ্রন্থে প্রায় অর্ধ শত সাহাবী থেকে বিভিন্নভাবে মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সিহাহ সিত্তার এ বিষয়ক হাদীসগুলো আমি ভালভাবে পড়ার চেষ্টা করেছি। এছাড়া মুসনাদ আহমাদসহ প্রচলিত আরো ১৫/১৬টি হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ক হাদীসগুলো পাঠ করার চেষ্টা করেছি। কুরআনে এবং এ সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমনের কথা বারংবার বলা হয়েছে। তিনি সিদরাতুল মুনতাহার ঊর্ধ্বে বা আরশে গমন করেছেন বলে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে মি'রাজে গমন করেন এবং সিদরাতুল মুনতাহার সর্বোচ্চ মাকামে আল্লাহর সান্নিধ্য বা 'দীদার' লাভ করেন বলে এ সকল হাদীস প্রমাণ করে।

রাফরাফে চড়া, আরশে গমন করা ইত্যাদি কথা সিহাহ সিত্তা, মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস-গ্রন্থে সংকলিত কোনো হাদীসে নেই। ৫/৬ শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থগুলোতেও এ বিয়য়ে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। দশম হিজরী শতাব্দী ও পরবর্তী যুগে সংকলিত সীরাতুন্নবী বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে মি'রাজের বিষয়ে রাফরাফ-এ আরোহণ, আরশে গমন ইত্যাদি ঘটনা বলা হয়েছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবীর আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি, যে সকল হাদীস কোনো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায় না, বরং ৫ম হিজরী শতকে বা তার পরে কোনো কোনো মুহাদ্দিস বা বিষয়ভিত্তিক লেখক তা সংকলন করেছেন, সেগুলো সাধারণত বাতিল বা অত্যন্ত দুর্বল সনদের হাদীস। বিশেষত **১১শ-১২শ** শতাব্দীর গ্রন্থাদিতে সহীহ, যয়ীফ ও মাউযূ সবকিছু একত্রে মিশ্রিত করে সংকলন করা হয়েছে।

আলামা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী যারকানী (১১২২ হি) 'আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া' গ্রন্থের ব্যাখ্যা 'শারহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে আল্লামা রাযী কাযবীনীর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন:

لَمْ يَرِدْ فِيْ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ وَلاَ حَسَنٍ وَلاَ ضَعِيْفٍ أَنَّهُ جَاوَزَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، بَلْ ذُكِرَ فِيْهَا أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مُسْتَوَى سَمِعَ فِيْهِ صَرِيْفَ الأَقْلاَمِ فَقَطْ. وَمَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَأَنَّى لَهُ بِهِ! وَلَمْ يَرِدْ فِيْ خَبَرٍ ثَابِتٍ وَلاَ ضَعِيْفٍ أَنَّهُ رَقِيَ الْعَرْشَ. وَافْتِرَاءُ بَعْضِهِمْ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ.

"কোনো একটি সহীহ, হাসান অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছিলেন। বরং বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তথায় এমন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যে, কলমের খসখস শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। যিনি দাবি করবেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছিলেন তাকে তার দাবীর পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। আর কিভাবে তিনি তা করবেন! একটি সহীহ অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, তিনি আরশে আরোহণ করেছিলেন। কারো কারো

মিথ্যাচারের প্রতি দৃকপাত নিষ্প্রয়োজন।"[৪৯৫]

সর্বাবস্থায় আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত একটি জাল হাদীস:

لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ إِلَى السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَوَصَلَ إِلَى الْعَرْشِ الْمُعَلَّى أَرَادَ خَلْعَ نَعْلَيْهِ أَخْذاً مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لِسَيِّدِنَا مُوْسَى حِيْنَ كَلَّمَهُ: فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. فَنُوْدِيَ مِنَ الْعَلِيِّ الأَعْلَى: يَا مُحَمَّدُ! لاَ تَخْلَعْ نَعْلَيْكَ فَإِنَّ الْعَرْشَ يَتَشَرَّفُ بِقُدُوْمِكَ مُتْنَعِلاً وَيَفْتَخِرُ عَلَى غَيْرِهِ مُتَبَرِّكاً، فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْعَرْشِ وَفِيْ قَدَمَيْهِ النَّعْلاَنِ...

"মি'রাজের রাত্রিতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উচ্চতম আকাশমণ্ডলিতে নিয়ে যাওয়া হলো এবং আরশে মু'আল্লায় পৌঁছালেন, তখন তিনি তাঁর পাদুকাদ্বয় খুলার ইচ্ছা করেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আ) বলেছিলেন: "তুমি তোমার পাদুকা খোল; তুমি পবিত্র 'তুয়া' প্রান্তরে রয়েছ।"[৪৯৬] তখন আলাহর পক্ষ থেকে আহ্বান করে বলা হয়, হে মুহাম্মাদ, আপনি আপনার পাদুকাদ্বয় খুলবেন না। কারণ আপনার পাদুকাসহ আগমনে আরশ সৌভাগ্যমণ্ডিত হবে এবং অন্যদের উপরে বরকতের অহংকার করবে। তখন রাসূলুলাহ (ﷺ) পাদুকাদ্বয় পায়ে রেখেই আরশে আরোহণ করেন।"

এ কাহিনীর আগাগোড়া সবটুকুই বানোয়াট। এ কাহিনীর উৎপত্তি ও প্রচারের পর থেকে মুহাদ্দিসগণ বলছেন যে, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিসও এ সকল মিথ্যা কথা নির্বিচারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলেন। এ সকল কথা তাঁরা কোন্ হাদীস গ্রন্থে পেয়েছেন তাও বলেন না, খুঁজেও দেখেন না, আবার যারা খুঁজে দেখে এগুলোর জালিয়াতির কথা বলেছেন তাঁদের কথাও পড়েন না বা শুনতে চান না। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।[৪৯৭]

আলামা রাযিউদ্দীন কাযবীনী, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মাক্কারী, যারকানী, আব্দুল হাই লাখনবী, দরবেশ হূত প্রমুখ মুহাদ্দিস এ কাহিনীর জালিয়াতি ও মিথ্যাচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী এ প্রসঙ্গে বলেন: "এ ঘটনা যে জালিয়াত বানিয়েছে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মি'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশি। এত হাদীসের একটি হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, রাসূলুলাহ (ﷺ) মি'রাজের সময় পাদুকা পরে ছিলেন। এমনকি একথাও প্রমাণিত হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরশে আরোহণ করেছিলেন।"[৪৯৮]

**২৪. মি'রাজের রাত্রিতে 'আত-তাহিয়্যাতু' লাভ**

আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি কথা হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মি'রাজের রাত্রিতে 'আত-তাহিয়্যাতু' লাভ করেন। এ বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটির সার-সংক্ষেপ হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মি'রাজের রাত্রিতে যখন সর্বোচ্চ নৈকট্যে পৌছান তখন মহান আল্লাহকে সম্ভাষণ করে বলেন: (আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি...)। তখন মহান আল্লাহ বলেন, (আস-সালামু আলাইকা...)। তখন রাসূলুলাহ (ﷺ) চান যে তাঁর উম্মতের জন্যও সালামের অংশ থাক। এজন্য তিনি বলেন (আস-সালামু আলাইনা ওয়া...)। তখন জিবারাঈল ও সকল আকাশবাসী বলেন: (আশহাদু...)। কোনো কোনো গল্পকার বলেন: (আস-সালামু আলাইনা...) বাক্যটি ফিরিশতাগণ বলেন...।

এ গল্পটির কোনো ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না। কোথাও কোনো গ্রন্থে সনদসহ এ কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায় নি। মি'রাজের ঘটনা বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে ও সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও কোনো সনদ-সহ বর্ণনায় মি'রাজের ঘটনায় এ কাহিনীটি বলা হয়েছে বলে আমি দেখতে পাই নি। সনদ বিহীনভাবে কেউ কেউ তা উল্লেখ করেছেন।[৪৯৯]

বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে, সাহাবীগণ সালাতের শেষে বৈঠকে সালাম পাঠ করতেন। আল্লাহকে সালাম, নবীকে সালাম, জিবরাঈলকে সালাম...। তখন তিনি তাঁদেরকে বলেন, এভাবে না বলে তোমরা 'আত-তাহিয়্যাতু..." বলবে।[৫০০] সকল হাদীসেই এইরূপ বলা হয়েছে। কোনো হাদীসেই বলা হয় নি যে, 'আত-তাহিয়্যাতু' মি'রাজ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে

**২৫. মুহূর্তের মধ্যে মি'রাজের সকল ঘটনা সংঘটিত হওয়া**

প্রচলিত একটি কথা, রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর মি'রাজের সকল ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যায়। তিনি সকল ঘটনার পর ফিরে এসে দেখেন পানি গড়ছে, শিকল নড়ছে, বিছানা তখনো গরম রয়েছে... মি'রাজে ২৭ বৎসর অতিবাহিত হয় ... ইত্যাদি। এ সকল কথা ভিত্তিহীন বলে প্রতীয়মান।

আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সিহাহ সিত্তাহ-সহ প্রায় ২০ খানা হাদীস গ্রন্থের মি'রাজ বিষয়ক হাদীসগুলো আমি অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছি। অধিকাংশ হাদীসে মি'রাজে ভ্রমণ, দর্শন ইত্যাদি সবকিছু সমাপ্ত হতে কত সময় লেগেছিল সে বিষয়ে সুস্পষ্ট

কিছু উল্লেখ করা হয় নি। তাবারানী সংকলিত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِيْ قَبْلَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ فَأَتَانِيْ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ كُنْتَ اللَّيْلَةَ فَقَدِ الْتَمَسْتُكَ فِيْ مَكَانِكَ فَلَمْ أَجِدْكَ

"অতঃপর প্রভাতের পূর্বে আমি মক্কায় আমার সাহাবীদের কাছে ফিরে আসলাম। তখন আবূ বাক্‌র আমার কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি গত রাতে কোথায় ছিলেন? আমি আপনার স্থানে আপনাকে খুঁজেছিলাম, কিন্তু আপনাকে পাই নি।... তখন তিনি মি'রাজের ঘটনা বলেন।"[৫০১]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথম রাতে মি'রাজে গমন করনে এবং শেষ রাতে ফিরে আসেন। সারা রাত তিনি মক্কায় অনুপস্থিত ছিলেন। এরূপ আরো দু একটি হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মি'রাজের ঘটনায় রাসুলুল্লাহ (ﷺ) রাতের কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন।[৫০২]

মি'রাজের ঘটনায় কত সময় লেগেছিল তা কোনো গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় নয়। এ মহান অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ সময় ছাড়া বা অল্প সময়ে যে কোনো ভাবে তাঁর মহান নবীর (ﷺ) জন্য সম্পাদন করতে পারেন। কিন্তু আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো, হাদীসে যা বর্ণিত হয় নি তা রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নামে না বলা। তিনি ফিরে এসে দেখেন পানি গড়াচ্ছে, শিকল নড়ছে, বিছানা তখনো গরম রয়েছে ইত্যাদি কথা কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায় না। মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ দরবেশ হূত (১২৭৬ হি) বলেন:

ذَهَابُهُ وَرُجُوْعُهُ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ وَلَمْ يَبْرُدْ فِرَاشُهُ، لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ.

"রাসূলুলাহ (ﷺ) মিরাজের রাত্রিতে গমন করেন এবং ফিরে আসেন কিন্তু তখনো তার বিছান ঠাণ্ডা হয় নি, এ কথাটি প্রমাণিত নয়।"[৫০৩]

**২৬. মি'রাজ অস্বীকারকারীর মহিলায় রূপান্তরিত হওয়া**

আমাদের দেশে প্রচলিত একটি বানোয়াট কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে মুহূর্তের মধ্যে এত ঘটনা ঘটেছিল বলে মানতে পারে নি এক ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তি একটি মাছ ক্রয় করে তার স্ত্রীকে প্রদান করে নদীতে গোসল করতে যায়। পানিতে ডুব দেয়ার পরে সে মহিলায় রূপান্তরিত হয়। একজন সওদাগর তাকে নৌকায় তুলে নিয়ে বিবাহ করেন.... অনেক বছর পরে আবার ঐ মহিলা পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে দেখেন যে, তার স্ত্রী তখন মাছটি কাটছেন...। এগুলো সবই মিথ্যা কাহিনী।

**২৭. হরিণীর কথা বলা বা সালাম দেওয়া**

প্রচলিত গল্পে বলা হয়: একটি হরিণী রাসূলুলাহ ﷺ-কে সালাম দেয়, তাঁর সাথে কথা বলে, অথবা শিকারীর কাছ থেকে তার নাম বলে ছুটি নেয় .... ইত্যাদি। এসকল কথার কোনো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি পাওয়া যায় না।[৫০৪]

**২৮. হাসান-হুসাইনের ক্ষুধা ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রহৃত হওয়া**

হাসান-হুসাইনের অভুক্ত থেকে ক্রন্দন, ফাতেমা (রা) ও আলীর কষ্ট, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক ইহূদীর বাড়িতে কাজ করা, ইহূদী কতৃক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আঘাত করা ....ইত্যাদি আমাদের দেশের অতি প্রচলিত ওয়ায ও গল্প। এ সকল কাহিনী সবই বানোয়াট। এগুলোর কোনো ভিত্তি আছে বলে আমার জানা নেই। মদীনার রাষ্ট্রপতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কারো বাড়িতে শ্রম বিক্রয় করতে গিয়েছেন বলে বর্ণিত হয় নি। এছাড়া হাসান ও হুসাইন (রা) ৩ ও ৪ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ৪ হি. সালে বনূ নযীর ও ৫ হি. সালে বনূ কুরাইযার ইহূদীদেরকে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কারণে মদীনা থেকে বিতাড়িত করেন। কাজেই ইমামদ্বয়ের কথা বলার বয়স হওয়ার অনেক আগেই মদীনা ইহূদী মুক্ত হয়েছিল।

**২৯. জাবিরের (রা) সন্তানদের জীবিত করা**

প্রচলিত একটি গল্পে বলা হয়, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দাওয়াত দেন। ইত্যবসরে জাবিরের এক পুত্র আরেক পুত্রকে জবাই করে। এরপর সে ভয়ে পালাতে যেয়ে চুলার মধ্যে পড়ে পুড়ে মারা যায়। জাবির (রা)-এর স্ত্রী এ সকল বিষয় গোপন রেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর মেহমানদারী করেন। ... এরপর মৃত পুত্রদ্বয়কে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করেন। ... রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দোয়ায় তারা জীবিত হয়ে ওঠে।... পুরো কাহিনীটি আগাগোড়াই বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।[৫০৫]

**৩০. বিলালের জারি**

প্রচলিত বিলালের জারির সকল কথাই বানোয়াট।

**৩১. উসমান ও কুলসুমের (রা) দাওয়াত সংক্রান্ত জারি**

এ বিষয়ক প্রচলিত জারিতে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট কথা।

**৩২. রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর ছায়া না থাকা প্রসঙ্গ**

সমকালীন মুসলিম সমাজের দীনদার মুসলিমদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বাস যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো ছায়া ছিল না। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ৫০০ বৎসরে লিখিত হাদীস, তাফসীর, সীরাতুন্নবী, দালাইলুন নুবুওয়াত ইত্যাদি কোনো গ্রন্থে এ বিষয়টির কোনোরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ হিজরী শতক থেকে কোনো কোনো আলিম বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মরক্কো ও স্পেনের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস আলামা কাযী ইয়ায ইবন মূসা ইয়াহসূবী সাবতী (৫৪৪ হি) 'আশ শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুসতাফা ﷺ' নামক গ্রন্থে রাসূলুলাহ ﷺ-এর মু'জিযা, বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিকত্ব বিষয়ক আলোচনায় বলেন:

وما ذكر من أنه كان لا ظل شخصه في شمس ولا قمر لأنه كان نورا

"কথিত আছে যে, সূর্যের আলোয় বা চাঁদের আলোয় তাঁর দেহের কোনো ছায়া ছিল না; কারণ তিনি নূর ছিলেন।"[৫০৬]

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লামা কাযী ইয়ায এ কথিত বক্তব্যটির কোনো সনদ বা অন্তত গ্রন্থসূত্র প্রদান করেন নি। এ গ্রন্থটির বিষয়ে মরোক্কোর অধিবাসী বিগত শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক ও সূফী আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর কাত্তানী হাসানী (১৩৪৫ হি) বলেন:

وكتاب (الشفا ... لأبي الفضل عياض... وفيه أحاديث ضعيفة, وأخرى قيل فيها: إنها موضوعة، تبع فيها ((شفاء الصدور)) (للخطيب أبي الربيع سليمان بن سبع السبتي)

"কাযী ইয়াযের 'আশ-শিফা' গ্রন্থটি.. এতে যয়ীফ হাদীসাদি বিদ্যমান। এছাড়া আরো হাদীস বিদ্যমান যেগুলোকে জাল বলা হয়েছে। এগুলোতে (যয়ীফ-জাল হাদীস নির্ভরতায়) তাঁর অনুসরণ করেছেন খতীব আবুর রাবী সুলাইমান ইবন সাবু' সাবতী তাঁর রচিত "শিফাউস সুদূর" নামক গ্রন্থে।"[৫০৭]

সুলাইমান ইবন সাবু' কাযী ইয়াযের ছাত্র প্রজন্মের আলিম ছিলেন। তাঁর দৌহিত্র মুহাম্মাদ ইবন হাসান ইবন আতিয়্যাহ ৫৯১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৫০৮] এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ষষ্ঠ হিজরী শতকের মাঝামাঝি মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছায়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

إن ظله ﷺ كان لا يقع على الأرض وإنه كان نورا وكان إذا مشى في الشمس أو القمر لا يظهر له ظل.

"তাঁর ছায়া মাটিতে পড়ত না, তিনি নূর ছিলেন, সূর্যের বা চাঁদের আলোয় তিনি যখন হাঁটতেন তখন তাঁর কোনো ছায়া প্রকাশিত হতো না।"[৫০৯]

আমরা দেখছি যে, তিনিও এ বক্তব্যের কোনো সনদ বা তথ্যসূত্র উল্লেখ করেন নি। তাঁর এ গ্রন্থের বিষয়ে ইমাম সাখাবী (৯০২ হি) বলেন:

في مجلدات واختصره بعض الأئمة, وفيه مناكير كثيرة

"গ্রন্থটি অনেকগুলি খণ্ডে রচিত। পরবর্তী কোনো কোনো ইমাম তা সংক্ষেপ করেছেন। এতে অনেক আপত্তিকর-ভিত্তিহীন হাদীস বিদ্যমান।"[৫১০]

ষষ্ঠ হিজরী শতকের অন্য প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হি)। তিনি 'আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুসতাফা ﷺ' নামক গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন:

عن ابن عباس ﷺ قال: لم يكن لرسول الله ﷺ ظل، ولم يقم مع شمس قط إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس، ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوؤه السراج

"ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো ছায়া ছিল না। তিনি যখনই সূর্যের আলোয় দাঁড়াতেন তাঁর আলো সূর্যের আলোর উপর প্রাধান্য লাভ করত। আর যখনই তিনি প্রদীপের আলোয় দাঁড়াতেন তাঁর আলো প্রদীপের আলোর উপর প্রাধান্য লাভ করত।"[৫১১]

পরবর্তী যুগগুলিতে আলিমগণ এগুলোর সনদ ও সূত্র সন্ধান করেছেন। বিশেষত ইমাম সুয়ূতী (৯১১ হি) ও তাঁর ছাত্রগণ এ বিষয়ে প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। ইমাম সুয়ূতী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ সকল অলৌকিকত্ব সংকলনের জন্য দীর্ঘ ২০ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে (খাসাইস কুবরা) গ্রন্থটি সংকলন করেন। এছাড়া তিনি "শিফা" গ্রন্থের হাদীসগুলির সূত্র বর্ণনায় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলেন:

أخرج الحكيم الترمذي من طريق عبد الرحمن بن قيس الزعفراني عن عبد الملك بن عبد الله بن الوليد عن ذكوان أن رسول الله ﷺ لم يكن يرى له ظل في شمس ولا قمر...

"(চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুল হাসান) হাকীম তিরমিযী (মৃত্যু ৩২০ হিজরীর দিকে) উদ্ধৃত করেছেন (দ্বিতীয় হিজরী শতকের রাবী) আব্দুর রাহমান ইবন কাইস যা'আফরানী থেকে, তিনি আব্দুল মালিক ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ থেকে, তিনি তাবিয়ী যাকওয়ান (মৃত্যু ১০১ হি) থেকে, তিনি বলেন: সূর্যের আলোতে বা চাঁদের আলোতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো ছায়া দেখা যেত না... ।"[৫১২]

ইমাম সুয়ূতীর ছাত্র আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ শামী (৯৪২ হি)। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ সীরাতগ্রন্থ 'সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ'। তিনি লিখেছেন যে, তিনি তিনশতাধিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন এবং এটি তাঁর সারা জীবনের সাধনার ফসল। এ গ্রন্থে তিনি বলেন:

قال ذكوان (رح) لم ير لرسول الله ﷺ ظل في شمس ولا قمر. رواه الحكيم الترمذي. وقال: معناه لئلا يطأ عليه كافر فيكون مذلة له.

"যাকওয়ান (রাহ) বলেন: সূর্যের বা চাঁদের আলোয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছায়া দেখা যেত না। হাকীম তিরমিযী কথাটি সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন: এর অর্থ হলো; যেন কোনো কাফির তাঁর ছায়া পদদলিত করতে না পারে; কারণ এতে তাঁর অবমাননা হয়।"[৫১৩]

দশম-একাদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী (১০১৪হি) কাযী ইয়াযের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেন:

ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عند عبد الرحمن بن قيس، وهو مطعون، عن عبد الملك بن عبد الله بن الوليد، وهو مجهول، عن ذكوان

"ছায়া না থাকার হাদীসটি হাকীম তিরমিযী 'নাওয়াদিরুল উসূল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি আব্দুর রাহমান ইবন কাইস থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আব্দুর রাহমান ইবন কাইস অভিযুক্ত রাবী। তিনি আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ থেকে, তিনি অজ্ঞাত পরিচয়। তিনি যাকওয়ান থেকে।"[৫১৪]

মোল্লা আলী কারী অন্যত্র বলেন:

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ظِلٌّ، وَلَمْ يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ قَطُّ ...وَلَمْ يَقُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ إِلاَّ غَلَبَ ضَوْءُهُ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ...

"ইবন আব্বাসের হাদীস: 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো ছায়া ছিল না। তিনি যখনই সূর্যের আলোয় ... প্রদীপের আলোয় দাঁড়াতেন তাঁর আলো ... প্রাধান্য লাভ করত।' হাদীসটি ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন।"[৫১৫]

উল্লেখ্য যে, আল্লামা আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ কাসতালানী (৯২৩ হি), মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল বাকী যারকানী (১১২২ হি) ও অন্যান্য আলিমও ইবনুল জাওযী ও হাকীম তিরমিযীর সূত্র প্রদান করেছেন।[৫১৬] ইবনুল জাওযী উদ্ধৃত হাদীসটির সনদ তিনি নিজে বা অন্য কেউ উল্লেখ করেন নি। নবম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইমাম তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবন আলী মাকরীযী (৮৪৫হি) এ হাদীসটির শুরুতে একটি সনদ উল্লেখ করে বলেন:

قال أحمد بن عبد الله الغدافي أخبرنا عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس ﷺ: لم يكن....

'আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ গাদ্দাফী বলেন, আমাদেরকে (তাবিয়ী) আমর ইবন আবী আমর বলেন (১৫০ হি), তিনি (তাবি-তাবিয়ী) মুহাম্মাদ ইবনুস সায়িব (১৪৬ হি) থেকে, তিনি (তাবিয়ী) আবূ সালিহ বাযাম থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো ছায়া ছিল না... ।"[৫১৭]

আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ গাদ্দাফী নামের কোনো রাবীর পরিচয় জানতে পারি নি। আর ইমাম মাকরীযী এ সনদ কোথায় পেলেন তাও জানান নি।

এভাবে সুয়ূতী, হালাবী, শামী, আলী কারী প্রমুখের আজীবনের গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে আমরা নিম্নের তথ্যগুলি আমরা জানতে পারি:

**(ক)** চতুর্থ শতকে হাকীম তিরমিযীর পূর্বে কোনো মুহাদ্দিস কোনো হাদীসের গ্রন্থে এ হাদীস বা এ অর্থে অন্য কোনো হাদীস সংকলন করেন নি।

**(খ)** ইমাম সুয়ূতী তাঁর জামি কাবীরের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, যে সকল হাকীম তিরমিযী সংকলন করেছেন কিন্তু অন্য কোনো মুহাদ্দিসের গ্রন্থে পাওয়া যায় না সেগুলি সন্দেহাতীতভাবে অনির্ভরযোগ্য।[৫১৮] আমরা দেখেছি যে, মোল্লা আলী কারী, আবূ জাফর সিদ্দিকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাকীম তিরমিযীর গ্রন্থগুলি জাল হাদীসে পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে সেগুলি পড়তে নিষেধ করেছেন।

**(গ)** আব্দুর রাহমান যা'আফরানী থেকে শতাধিক বৎসর সময়ে হাদীসটি কে বা কারা বর্ণনা করে হাকীম তিরমিযীকে শুনালেন তা তিনি বলেন নি।

**(ঘ)** হাদীসটি মুরসাল। আমরা দেখেছি ইবনুল জাওযী এ বিষয়ক হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে ইবনু আব্বাস (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সুয়ূতী ও তাঁর ছাত্রগণের অনুসন্ধানে এ একটিমাত্র মুরসাল সনদ ছাড়া অন্য কোনো সনদ পাওয়া যায় নি। তাবিয়ী যাকওয়ান কার মাধ্যমে এ তথ্যটি জেনেছেন তা বলেন নি। তাঁর ছাত্র আব্দুল মালিক ইবন আব্দুল্লাহও অজ্ঞাত।

(ঙ) সর্বোপরি এ হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী আব্দুর রাহমান ইবন কাইস যা'আফরানী সুপরিচিত জালিয়াত। ইমাম আব্দুর রাহমান ইবন মাহদী, ইমাম আবূ যুরআত, ইমাম আহমাদ, ইমাম সালিহ যাজরাহ, ইমাম বুখারী ও অন্যান্য সকল মুহদ্দিস তাকে জালিয়াত ও পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[৫১৯]

আমরা ইতোপূর্বে 'মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক-এর প্রথম খণ্ডের হারানো অংশ' নামক পুস্তকটির বিষয় আলোচনা করেছি। এ পুস্তকে এ হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, পুস্তকটি সন্দেহাতীতভাবেই জাল। এটিকে 'আব্দুর রায্যাক সানআনী' রচিত বলে মনে করলে মুসলিম উম্মাহর সকল ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বুজুর্গকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা গোপনকারী বলে গণ্য করতেই হবে। আব্দুর রায্যাক হাদীসটি বর্ণনা ও সংকলন করবেন, অথচ ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাজার বছর ধরে তাদের গ্রন্থগুলিতে হাদীসটি বয়কট করবেন বলে কল্পনাও করা যায় না। বিশেষত সুয়ূতী, শামী ও আলী কারী তাঁদের গ্রন্থে মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক থেকে হাজার হাজার উদ্ধৃতি প্রদান করবেন, অথচ এ হাদীসটি প্রমাণ করতে মুসান্নাফ গ্রন্থের 'সহীহ হাদীস' বাদ দিয়ে শতবৎসর পরে রচিত অনির্ভরযোগ্য বলে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিবেন তা কল্পনা করা যায় না।

রাসূলুলাহ ﷺ-এর ছায়া ছিল বলে কোনে কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসনাদ আহমাদ ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুলাহ ﷺ একবার তাঁর স্ত্রী যাইনাব বিনত জাহশ (রা)–এর আচরণে কষ্ট পেয়ে কয়েক মাস তাঁর গৃহে গমন থেকে বিরত থাকেন। কয়েকমাস পর একদিন দুপুরে তিনি তাঁর গৃহে গমন করেন। এ প্রসঙ্গে যাইনাব (রা) বলেন:

قالت: فبينما أنا يوماً بنصف النهار؛ إذا أنا بظل رسول الله ﷺ مُقْبِل (فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت إن هذا لظل رجل وما يدخل على النبي ﷺ فمن هذا فدخل النبي ﷺ)

"এমতাবস্থায় একদিন দুপুরে আমি হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছায়া দেখতে পেলাম.. । দ্বিতীয় বর্ণনায়: (প্রায় তিন মাস পরে) রবিউল আউআল মাসে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গৃহে গমন করেন। যাইনাব (রা) তাঁর ছায়া দেখতে পান। তিনি বলেন: এ তো পুরুষ মানুষের ছায়া! রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আমার নিকট আসেন না! তাহলে এ কার ছায়া? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গৃহে প্রবেশ করেন।"

হাদীসটি উল্লেখ করে ইমাম হাইসামী বলেন: "হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সুমাইয়া (শুমাইসা)। আবূ দাউদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। কেউ তাকে দুর্বল বলেন নি। অন্যান্য রাবী নির্ভরযোগ্য।" শুমাইসা নামক এ মহিলা তাবিয়ী আয়েশা (রা)-এর ছাত্রী ছিলেন। ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন, ইবন আবী হাযিম, দারাওয়ারদী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁকে সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারী সহীহ মুসলিমের রাবী। এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসটি সহীহ।[৫২০]

উপরের হাদীসতাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি:

**(ক)** সনদতাত্ত্বিকভাবে আমরা দেখলাম যে, তাঁর ছায়া প্রকাশিত না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। এ বিষয়ক দুটি হাদীসেরই পুরো সনদ বা সনদের দীর্ঘ অংশ অপরিজ্ঞাত। এছাড়া সনদে অজ্ঞাত পরিচয় ও জালিয়াত রাবী বিদ্যমান। এর বিপরীতে তাঁর ছায়া প্রকাশিত হতো অর্থের হাদীসটি সহীহ বা অধিকতর শক্তিশালী। যদি উভয় হাদীস সহীহ প্রমাণিত হতো তাহলে বলা যেত যে, কখনো তাঁর ছায়া প্রকাশিত হতো এবং কখনো হতো না।

**(খ)** অলৌকিক বিষয় সর্বদা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মানুষ সহজে তা ভুলে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অলৌকিক বিষয়গুলো অনেকগুলি সনদে বর্ণিত। মি'রাজ, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা, সূর্যগ্রহণ, খাদ্য ও পানীয় বিষয়ক মুজিযা ইত্যাদি সবই এরূপ। অথচ মুসলিম উম্মাহর প্রথম প্রায় ৫০০ বৎসরে প্রসিদ্ধ চার ইমাম বা অন্য কোনো ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, আকীদাবিদ বা বুজুর্গ তাঁর ছায়া না

থাকার বিষয়টি কোনোভাবে উল্লেখ করেন নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ বিষয়ক হাদীসগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন।

**(গ)** মহান আলাহ্ তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-কে অনেক অলৌকিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিলেন। সহীহ্ সনদে বর্ণিত এ সকল অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বিশ্বাস করা মুমিনের দায়িত্ব। পাশাপাশি কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত অলৌকিকত্ব ও বৈশিষ্ট্যই তাঁর মর্যাদা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট; জাল বা দুর্বল হাদীসের উপর বিশ্বাস ও ভক্তির ভিত্তি স্থাপনের কোনো প্রয়োজন নেই।

**(ঘ)** রাসূলুলাহ্ ﷺ-এর ছায়া প্রকাশিত না হওয়ার মত অলৌকিকত্ব মহান আল্লাহ্ তাঁকে প্রদান করতে পারেন। তিনি তাঁকে এর চেয়ে অনেক বড় বড় বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। তবে বিষয়টি অবশ্যই সহীহ্ সনদে প্রমাণিত হতে হবে। তা না হলে আমরা তাঁর নামে মিথ্যা বলার পাপে পাপী হব।

**(ঙ)** সর্বাবস্থায় কুরআন ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলি বাদ দিয়ে এরূপ বিষয়কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মর্যাদার মূল বিষয় বলে গণ্য করা খুবই দুঃখজনক। মহান আল্লাহই ভাল জানেন। আমরা তাঁর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

### ৩৩. উকাশার প্রতিশোধ গ্রহণ

একটি অতি পরিচিত গল্প উকাশার প্রতিশোধ নেয়ার গল্প। মূল মিথ্যা কাহিনীর উপরে আরো শত রঙ চড়িয়ে এ সকল গল্প বলা হয়। মূল বানোয়াট কাহিনী হলো, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ইন্তেকালের পূর্বে সাহাবীগণকে সমবেত করে বলেন, আমি যদি কাউকে কোনো যুলুম করে থাকি তবে আজ সে প্রতিশোধ বা বদলা গ্রহণ করুক। এক পর্যায়ে উকাশা নামক এক বৃদ্ধ উঠে বলেন, এক সফরে আপনার লাঠির খোঁচা আমার কোমরে লাগে। উকাশা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর কোমরে লাঠির খোঁচা মেরে প্রতিশোধ নিতে চান। হাসান, হুসাইন, আবু বাকর, উমার প্রমুখ সাহাবী (রাদিয়াল্লহু আনহুম) উকাশার সামনে নিজেদের দেহ পেতে দেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য, কিন্তু তিনি তাতে রাজি হন নি। উকাশার দাবী অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের গায়ের জামা খুলে দেন। উকাশা তাঁর পেটে চুমু দেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দেন।..... ইত্যাদি।

পুরো ঘটনাটিই বানোয়াট। তবে সনদ বিহীন বানোয়াট নয়, সনদ-সহ বানোয়াট। পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ নু'আইম ইসপাহানী তার 'হিলইয়াতুল আউলিয়া নামক গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সুলাইমান ইবনু আহমাদ বলেছেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-বারা বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল মুনয়িম ইবনু ইদরীস বলেছেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে, ওয়াহ্ব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে, তিনি জাবির ও ইবনু আব্বাস (রা) থেকে .... এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল মুনয়িম ইবনু ইদরীস (২২৮হি) তৃতীয় হিজরী শতকে বাগদাদের প্রসিদ্ধ গল্পকার ওয়ায়িয ছিলেন। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যক্তি জালিয়াত ছিলেন। তার ওয়াযের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য এরূপ বিভিন্ন গল্প তিনি সনদ-সহ বানিয়ে বলতেন। এ হাদীসটিও তার বানানো একটি হাদীস। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি জাল, বানোয়াট ও জঘন্য মিথ্যা।[৫২১]

### ৩৪. ওফাতের সময় মালাকুল মাউতের আগমন ও কথাবার্তা

প্রসিদ্ধ একটি গল্পঃ রাসূলুলাহ্ ﷺ-এর ওফাতের সময় মালাকুল মাউতের আগমন বিষয়ক। গল্পটির সার-সংক্ষেপ হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের দিন মালাকুল মাউত একজন বেদুঈনের বেশে আগমন করেন এবং গৃহের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এক পর্যায়ে ফাতেমা (রা) অনুমতি প্রদান করেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করে অনেক কথাবার্তা আলাপ আলোচনার পরে তাঁর পবিত্র রূহকে গ্রহণ করেন..। গল্পটি বানোয়াট। গল্পটি মূলত উপরের জাল হাদীসের অংশ। আরো অনেক গল্পকার এতে অনেক রং চড়িয়েছেন।[৫২২]

### ৩৫. স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর জানাযার নামায পড়েছেন!

আরেকটি প্রচলিত ওয়ায ও গল্প হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে তাঁর গোসল ও কাফনের পর তাঁর মুবারাক দেহকে মসজিদে রাখা হয়। প্রথমে স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন! গল্পটি বানোয়াট। এ গল্পটিও উপর্যুক্ত আব্দুল মুনয়িম ইবনু ইদরীসের বানানো গল্পের অংশ।[৫২৩]

### ৩৬. ইন্তেকালের পরে ১০ দিন দেহ মুবারক রেখে দেওয়া!

খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার নামে প্রচলিত 'রাহাতিল কুলুব' নামক বইয়ের বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এ বইয়ের ২৪শ মাজলিসে শাইখ নিজামউদ্দীন লিখেছেন, ২রা রবিউল আউয়াল ৬৫৬ হিজরীতে (৮/৩/১২৫৮ খৃ) তিনি তার পীর শাইখ ফরীদ উদ্দীনের দরবারে আগমন করলে তিনি বলেন, "আজকের দিনটা এখানেই থেকে যাও, কেননা আজ হযরত রেসালতে পানাহ (ﷺ)-এর উরস মোবারক। কালকে চলে যেও। এরপর বললেন, ইমাম সাবী (রহ) হতে রাওয়ায়েত আছে যে, হযরত রেছালতে পানাহ ﷺ- এর বেছাল মোবারক রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখে। তাঁর দেহ মোবারক মোজেজার জন্য দশ দিন রাখা হয়েছিলো। দুনিয়ার জীবিত কালে তাঁর পছিনা (ঘাম) মোবারকের সুগন্ধ ছিলো সমস্ত উৎকৃষ্ট সুগন্ধির চেয়েও উৎকৃষ্ট। সে একই খুশবু একই ভাবে বেরিয়েছে ঐ দশ দিন, একটুও কমেনি (সুবহানাল্লা)। হুজুর পাক (ﷺ)-এর এ মোজেজা দেখে কয়েক হাজার ইহুদী তখন মোসলমান হয়েছিল। এ দশদিনের প্রতিদিন

গরীব-মিসকিনদেরকে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে বিভিন্ন বিবিদের ঘর হতে। ঐ সময় হুজুর (ﷺ)-এর নয়টি হুজরা ছিল এবং নয়দিন তাঁদের সেখান থেকে দান করা হয়েছে। এবং দশম দিন, অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল দান করা হয়েছে হযরত সিদ্দিকে আকবর আবুবকর (রাদি)-এর ঘর থেকে। এদিন মদিনার সমস্ত লোককে পেট ভরে পানাহার করানো হয়েছে এবং এ দিনই তাঁর পবিত্র দেহ মোবারক দাফন করা হয়েছে। এ জন্যই মোসলমানগণ ১২ রবিউল আউয়াল উরস করে এবং ১২ রবিউল আউয়াল দিনটিই উরসের দিন হিসাবে প্রসিদ্ধ।"[৫২৪]

আমরা জানি না, খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রাহ)-এর গ্রন্থের মধ্যে পরবর্তী কালে কেউ এই কথাগুলো লিখেছে, নাকি কারো মুখ থেকে গল্পটি শুনে ফরীদ উদ্দীন (রাহ) এ কথাগুলো সরল মনে বিশ্বাস করেছেন এবং বলেছেন। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এ সকল পুস্তকের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের কোনো উপায় নেই। পূরো বইটিও জাল হতে পারে।

সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মোবারক দেহ ১০ দিন দাফন বিহীন রাখা, হাজার হাজার ইহূদীর ইসলাম গ্রহণ, ১০ দিন খানা খাওয়ানো ইত্যাদি সকল কথাই ভিত্তিহীন। রবিউল আউয়াল মাসের আমল প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশা আল্লাহ। তবে মুসলিম উম্মাহ একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার পূর্বাহ্নে ইন্তেকাল করেন। পরদিন মঙ্গলবার দিবসে তাঁর গোসল ও জানাযার সালাত আদায়ের শেষে দিবাগত সন্ধ্যায় বা রাতে তাঁকে দাফন করা হয়।

**নবম প্রসঙ্গঃ হায়াতুন্নবী বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত পরবর্তী জীবন**

কুরআনের অনেক আয়াতে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, শহীদগণ মৃত নন, তারা জীবিত ও রিয্ক পাচ্ছেন। নবীগণের বিষয়ে কুরআন কারীমে কিছু না বলা হলেও সহীহ হাদীসে তাঁদের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْن

"নবীগণ তাঁদের কবরের মধ্যে জীবিত, তাঁরা সালাত আদায় করেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫২৫]

অন্য একটি যয়ীফ সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لاَ يُتْرَكُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ بَعْدِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَلَكِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُنْفَخَ فِيْ الصُّوْرِ

"নবীগণকে ৪০ রাতের পরে তাঁদের কবরের মধ্যে রাখা হয় না; কিন্তু তারা মহান আল্লাহর সামনে সালাতে রত থাকেন; শিংগায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত।"

হাদীসটির বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু আলী আল-হাসনবী মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে পরিচিত। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস একে মাউযূ বলে গণ্য করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস এ অর্থের অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ে একে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৫২৬]

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মি'রাজের রাত্রিতে মূসা (আ)-কে নিজ কবরে সালাত আদায় করতে দেখেছেন এবং ঈসা (আ)-কেও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। আল্লামা বাইহাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ দর্শনকে উপরের হাদীসের সমর্থনকারী বলে গণ্য করেছেন।[৫২৭]

কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোনো কোনো পূর্ববর্তী নবীকে হজ্জ পালনরত অবস্থায় দেখেছেন। এ সকল হাদীসকেও কোনো কোনো আলিম নবীগণের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের নিদর্শন বলে গণ্য করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ দর্শনের বিষয়ে কাযী ইয়ায বলেন, এ দর্শনের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যা হলো, নবীগণ শহীদগণের চেয়েও মর্যাদাবান। কাজেই নবীগণের জন্য ইন্তিকালের পরেও এরূপ ইবাদতের সুযোগ পাওয়া দূরবর্তী কিছু নয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, তাঁরা জীবিত অবস্থায় যেভাবে হজ্জ করেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তার সূরাত দেখানো হয়েছে। কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ওহীর মাধ্যমে যা জানানো হয়েছে তাকে তিনি দর্শনের সাথে তুলনা করেছেন...।[৫২৮]

রাসূলুলাহর (ﷺ) ইন্তিকাল পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেছেন, রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেনঃ

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ

"যখনই যে কেউ আমাকে সালাম করে তখনই আল্লাহ আমার রূহকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যেন আমি তার সালামের

উত্তর দিতে পারি।”[৫২৯]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ بَعِيْدٍ أُعْلِمْتُهُ

“কেউ আমার কবরের কাছে থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করলে আমি শুনতে পাই। আর যদি কেউ দূর থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করে তাহলে আমাকে জানান হয়।”[৫৩০]

হাদীসটির একটি সনদ খুবই দুর্বল হলেও অন্য আরেকটি গ্রহণযোগ্য সনদের কারণে ইবনু হাজার, সাখাবী, সুয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ সনদটিকে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৩১]

আউস (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .... فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلام

“তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো শুক্রবার।... কাজেই, এ দিনে তোমরা আমার উপর বেশি করে দরুদ পাঠ করবে, কারণ তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হবে।” সাহাবীগণ বলেন : “হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো (কবরের মাটিতে) বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, মিশে যাবেন, কী-ভাবে তখন আমাদের দরুদ আপনার নিকট পেশ করা হবে? তিনি বলেন: “মহান আল্লাহ মাটির জন্য নিষিদ্ধ করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করা।”[৫৩২]

আরো অনেক সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, ফিরিশতাগণ সে সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর মুবারাকে পৌঁছিয়ে দেবেন। আম্মার বিন ইয়াসির (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত:

إِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِقَبْرِيْ مَلَكاً أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الْخَلاَئِقِ، فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَبْلَغَنِيْ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ: هَذَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ

“আল্লাহ আমার কবরে একজন ফিরিশতা নিয়োগ করছেন, যাকে তিনি সকল সৃষ্টির শ্রবণশক্তি প্রদান করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত যখনই কোনো ব্যক্তি আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে তখনই ঐ ফিরিশতা সালাত পাঠকারীর নাম ও তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করে আমাকে তাঁর সালাত পৌঁছে দিয়ে বলবে : অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর সালাত প্রেরণ করেছে।”

হাদীসটি বাযযার, তাবারানী ও আবুশ শাইখ সংকলন করেছেন। হাদীসের সনদে পরস্পর বর্ণনাকারী রাবীদের মধ্যে দুজন রাবী দুর্বল। এজন্য হাদীসটি যয়ীফ। তবে এ অর্থে আরো কয়েকটি দুর্বল সনদের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর সামগ্রিক বিচারে নাসিরুদ্দীন আলবানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে ‘হাসান’ বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করছেন।[৫৩৩]

উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওফাত পরবর্তী জীবন দান করা হয়েছে। এ জীবন বারযাখী জীবন, যা একটি বিশেষ সম্মান ও গায়েবী জগতের একটি অবস্থা। এ বিষয়ে হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে ততটুকুই বলতে হবে। হাদীসের আলোকে আমরা বলব, এ অলৌকিক জীবনে তাঁর সালাত আদায়ের সুযোগ রয়েছে। কেউ সালাম দিলে আল্লাহ তাঁর রূহ মুবারাককে ফিরিয়ে দেন সালামের জবাব দেয়ার জন্য। কবরের নিকট কেউ সালাম দিলে তিনি তা শুনেন, আর দূর থেকে সালাম দিলে তা তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। বাকি বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। উম্মাতের জানার প্রয়োজন নেই বলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকি বিষয়গুলো বলেন নি।

কিন্তু এ বিষয়ে অনেক মনগড়া কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর নামে বলা হয়। এ সকল কথা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলা হয়। মুমিনের উচিত গাইবী বিষয়ে কুরআন-হাদীসের উপর সর্বাত্মকভাবে নির্ভর করা এবং এর অতিরিক্ত কিছুই না বলা। গায়েবী জগৎ সম্পর্কে আমরা শুধুমাত্র ততটুকু কথা বলব, যতটুকু রাসূলুলাহ ﷺ আমাদেরকে বলে গিয়েছেন। বাকি বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। এর বাইরে কিছু বলার অর্থই হলো: **প্রথম,** আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে আন্দাযে মিথ্যা কথা বলা। **দ্বিতীয়,** আমরা দাবি করব যে, গায়েবী বিষয়ে আমাদের জানা জরুরি এমন কিছু বিষয় না শিখিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেছেন, ফলে এখন আমাদের যুক্তি ও গবেষণার মাধ্যমে তা জানতে হচ্ছে।

**৩৭. তাঁর ইন্তিকাল পরবর্তী জীবন জাগতিক জীবনের মতই**

এ সকল বানোয়াট কথার মধ্যে অন্যতম হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও নবীগণের ইন্তিকাল পরবর্তী এ বারযাখী জীবনকে পার্থিব বা জাগতিক জীবনের মতই মনে করা। এ ধারণাটি ভুল এবং তা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের রীতির পরিপন্থী। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও সূফী মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ দরবেশ হূত ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

রাসূলুলাহ ﷺ-এর ওফাতের পরের ঘটনাগুলো হাদীসগ্রন্থগুলোতে পাঠ করলেই আমরা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, সাহাবীগণ রাসূলুলাহ ﷺ-কে কখনোই জাগতিক জীবনের অধিকারী বলে মনে করেন নি। খলীফা নির্বাচনের বিষয়, গোসলের বিষয়, দাফনের বিষয়, পরবর্তী সকল ঘটনার মধ্যেই আমরা তা দেখতে পাই। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পরামর্শ, দোয়া ও অনুমতি ছাড়া তাঁরা কিছুই করতেন না। কিন্তু তাঁর ওফাতের পরে কখনো কোনো সাহাবী তাঁর কবরে দোয়া, পরামর্শ বা অনুমতি গ্রহণের জন্য আসেন নি। সাহাবীগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন, যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন বা বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। কখনোই খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ দলবেঁধে বা একাকী রাসূলুলাহ ﷺ-এর কবর মুবারাকে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া-পরামর্শ চান নি।

আবু বকর (রা)-এর খিলাফত গ্রহণের পরেই কঠিনতম বিপদে নিপতিত হয় মুসলিম উম্মাহ। একদিকে বাইরের শত্রু, অপরদিকে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, সর্বোপরি প্রায় আধা ডজন ভণ্ড নবী। মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের সংকট। কিন্তু একটি দিনের জন্যও আবু বকর (রা) সাহাবীগণকে নিয়ে বা নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের নিকট যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চান নি। এমনকি আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্যও কবর শরীফে সমবেত হয়ে কোনো অনুষ্ঠান করেন নি। কী কঠিন বিপদ ও যুদ্ধের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন আলী (রা)! অথচ তাঁর সবচেয়ে আপনজন রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর কবর শরীফে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চান নি বা আল্লাহর কাছে দোয়ার জন্য কবর শরীফে কোনো অনুষ্ঠান করেন নি।

রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পরে ফাতিমা, আলী ও আব্বাস (ﷺ) খলীফা আবূ বাক্র (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার চেয়েছেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে অনেক মতভেদ ও মনোমালিন্য হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশার (রা) সাথে আমীরুল মুমিনীন আলীর (রা) কঠিন যুদ্ধ হয়েছে, আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সাথেও তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। এসকল যুদ্ধে অনেক সাহাবীসহ অসংখ্য মুসলিম নিহত হয়েছেন। কিন্তু এসকল কঠিন সময়ে তাঁদের কেউ কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে পরামর্শ চান নি। তিনি নিজেও কখনো এসকল কঠিন মুহূর্তে তাঁর কন্যা, জামাতা, চাচা, খলীফা কাউকে কোনো পরামর্শ দেন নি। এমনকি কারো কাছে রূহানীভাবেও প্রকাশিত হয়ে কিছু বলেন নি। আরো লক্ষণীয় যে, প্রথম শতাব্দীগুলোর জালিয়াতগণ এ সকল মহান সাহাবীর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক জাল হাদীস বানিয়েছে, কিন্তু কোনো জালিয়াতও প্রচার করে নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওফাতের পরে কবর শরীফ থেকে বা সাহাবীগণের মাজলিসে এসে অমুক সাহাবীর পক্ষে বা বিপক্ষে যুদ্ধ করতে বা কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৩৪]

**৩৮. তিনি আমাদের দরুদ-সালাম শুনতে বা দেখতে পান**

আব্দুল হাই লাখনবী বলেন, প্রচলিত জাল ও মিথ্যাগুলোর একটি:

إِنَّهُ ﷺ يَسْمَعُ صَلاَةَ مَنْ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ نَائِياً مِنْ قَبْرِهِ بِلاَ وَاسِطَةٍ

"যদি কেউ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর দরুদ পাঠ করে, তবে সে ব্যক্তি যত দূরেই থাক, তিনি কারো মাধ্যম ছাড়াই তা শুনতে পান।"[৫৩৫]

**৩৯. তিনি মীলাদের মাহফিলে উপস্থিত হন**

আব্দুল হাই লাখনবী বলেন: প্রচলিত আরেকটি জাল ও মিথ্যা কথা:

يَحْضُرُ ﷺ بِنَفْسِهِ فِيْ مَجَالِسِ وَعْظِ مَوْلِدِهِ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْلِدِ تَعْظِيْماً وَإِكْرَاماً

"মাওলিদের ওয়াযের মাজলিসে তাঁর মাওলিদ বা জন্মের কথা উল্লেখের সময় তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত হন। এ কথার উপরে তারা তাঁর মাওলিদের বা জন্মের কথার সময় সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনের জন্য কিয়াম বা দাঁড়ানোর প্রচলন করেছে।"[৫৩৬]

উপরের দুটি কথাই সনদহীন, ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা কথা। উপরন্তু এ কথা উপরে আলোচিত সহীহ হাদীসগুলোর সুস্পষ্ট বিরোধী।

**দশম প্রসঙ্গ: আলিমুল গাইব ও হাযির-নাযির প্রসঙ্গ**

**৪০. রাসূলুলাহ ﷺ-এর ইলমুল গাইবের অধিকারী হওয়া**

আব্দুল হাই লাখনবী বলেন: প্রচলিত আরেকটি জাল ও মিথ্যা কথা:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُعْطِيَ عِلْمَ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ مُفَصَّلاً وَوُهِبَ لَهُ عِلْمُ كُلِّ مَا مَضَى وَمَا يَأْتِيْ كُلِّيًّا وَجُزْئِيًّا وَأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ عِلْمِهِ وَعِلْمِ رَبِّهِ مِنْ حَيْثُ الإِحَاطَةِ وَالشُّمُوْلِ، وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ عِلْمَ اللهِ أَزَلِيٌّ أَبَدِيٌّ بِنَفْسِ ذَاتِهِ بِدُوْنِ تَعْلِيْمِ غَيْرِهِ بِخِلاَفِ عِلْمِ الرَّسُوْلِ فَإِنَّهُ حَصَلَ لَهُ بِتَعْلِيْمِ رَبِّهِ

"রাসূলুলাহ (ﷺ) সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের ও সকল কিছুর বিস্তারিত জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছিলেন। যা কিছু অতীত হয়েছে এবং যা কিছু ভবিষ্যতে ঘটবে সবকিছুরই বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি জ্ঞান তাঁকে দেয়া হয়েছিল। ব্যাপকতায় ও গভীরতায় রাসূলুল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর প্রতিপালক মহান আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র পার্থক্য হলো, আল্লাহর জ্ঞান অনাদি ও স্বয়ংজ্ঞাত, কেউ তাঁকে শেখান নি। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তাঁর প্রভুর শেখানোর মাধ্যমে।"

আল্লামা লাখনবী বলেন: এগুলো সবই সুন্দর করে সাজানো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। ইবনু হাজার মাক্কী তার 'আল-মিনাহুল মাক্কিয়াহ' গ্রন্থে ও অন্যান্য প্রাজ্ঞ আলিম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ কথাগুলো ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সামগ্রিক ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। একমাত্র তিনিই সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বা আলিমুল গাইব। এ জ্ঞান একমাত্র তাঁরই বিশেষত্ব ও তাঁরই গুণ। আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য কাউকে এ গুণ প্রদান করা হয় নি। হ্যাঁ, আমাদের নবী (ﷺ)-এর জ্ঞান অন্য সকল নবী-রাসূলের (আ) জ্ঞানের চেয়ে বেশি। গাইবী বা অতিন্দ্রিয় বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁর প্রতিপালক অন্যান্য সবাইকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার চেয়ে অধিকতর ও পূর্ণতর শিক্ষা দিয়েছেন তাঁকে। তিনি জ্ঞান ও কর্মে পূর্ণতম এবং সম্মান ও মর্যাদায় সকল সৃষ্টির নেতা।[৫৩৭]

মোল্লা আলী কারীও অনুরূপ কথা বলেছেন।[৫৩৮]

### ৪১. রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর হাযির-নাযির হওয়া

রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর 'ইলমুল গাইব' ও মীলাদে উপস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি প্রচলিত বানোয়াট কথা যে, তিনি 'হাযির-নাযির'। হাযির-নাযির দুটি আরবী শব্দ। (حاضر) হাযির অর্থ উপস্থিত ও (ناظر) নাযির অর্থ দর্শক, পর্যবেক্ষক বা সংরক্ষক। 'হাযির-নাযির' বলতে বোঝান হয় 'সর্বত্র বিরাজমান ও সবকিছুর দর্শক'। অর্থাৎ তিনি সদা-সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত বা বিরাজমান এবং তিনি সদা সর্বদা সবকিছুর দর্শক। স্বভাবতই যিনি সদাসর্বত্র বিরাজমান ও সবকিছুর দর্শক তিনি সর্বজ্ঞ ও সকল যুগের সকল স্থানের সকল গাইবী জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'হাযির-নাযির' দাবি করেন, তাঁরা দাবি করেন যে, তিনি শুধু সর্বজ্ঞই নন, উপরন্তু তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

সম্মানিত পাঠক, নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

**প্রথমত:** এ গুণটি শুধু আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, বান্দা যেখানেই থাক্ তিনি তার সাথে আছেন, তিনি বান্দার নিকটে আছেন... ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্পর্কে কখনোই ঘুণাক্ষরেও কুরআন বা হাদীসে বলা হয় নি যে, তিনি সর্বদা উম্মাতের সাথে আছেন, অথবা সকল মানুষের সাথে আছেন, অথবা কাছে আছেন, অথবা সর্বত্র উপস্থিত আছেন, অথবা সবকিছু দেখছেন। কুরআনের আয়াত তো দূরের কথা একটি যয়ীফ হাদীসও দ্ব্যর্থহীনভাবে এ অর্থে কোথাও বর্ণিত হয় নি। কাজেই যারা এ কথা বলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা কথা বলেন। কোনো একটি সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, তিনি বলেছেন 'আমি হাযির-নাযির'। অথচ তাঁর নামে এ মিথ্যা কথাটি বলা হচ্ছে। এমনকি কোনো সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী বা ইমাম কখনোই বলেন নি যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাযির-নাযির'।

**দ্বিতীয়ত:** কুরআন-হাদীসে বারংবার অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'ইলমুল গাইব' বা গোপন জ্ঞানের অধিকারী নন। রাসূলুলাহ (ﷺ)-কে 'হাযির-নাযির' বলে দাবি করা উক্ত সকল স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করা।[৫৩৯]

**তৃতীয়,** আমরা দেখেছি, বিভিন্ন হাদীসে তিনি বলেছেন, উম্মাতের দরুদ-সালাম তাঁর কবরে উপস্থিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হাযির-নাযির বলে দাবি করার অর্থ দরুদ-সালাম কবরে পৌঁছানোর হাদীসগুলোকে মিথ্যা বলে গণ্য করা। উম্মাতের দরুদ-সালাম তাঁর কাছে উপস্থিত হয় না, বরং তিনিই উম্মাতের কাছে উপস্থিত হন!! কাজেই যারা এ দাবিটি করছেন, তাঁরা শুধু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। উপরন্তু তাঁরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিথ্যাবাদী বলে দাবি করেন, নাউযু বিল্লাহ! নাউযু বিল্লাহ!!

### ৪২. এ সকল মিথ্যার উৎস ও কারণ

এখানে পাঠকের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ ইলমুল গাইবের অধিকারী, হাযির-নাযির, ইত্যাদি যখন কোনো হাদীসেই বর্ণিত হয় নি এবং কুরআনেও এভাবে বলা হয় নি, তখন কেন অনেক মানুষ এগুলো বলছেন? তাঁরা কি কিছুই বুঝেন না?

এ বইয়ের পরিসরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইলমুল গাইব, হাযির-নাযির ও অন্যান্য বিষয়ে বানোয়াট কথা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলার পিছনে দুটি কারণ প্রধান:

**প্রথম কারণ: এ বিষয়ক কিছু বানোয়াট কথা বা বিভিন্ন আলিমের কথার উপর নির্ভর করা। পাশাপাশি দ্ব্যার্থবোধক বিভিন্ন আয়াত বা হাদীসের উপর নির্ভর করে সেগুলোকে নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করা। আর এ সকল দ্ব্যর্থবোধক আয়াত ও হাদীসের বিশেষ ব্যাখ্যাকে বজায় রাখতে অগণিত আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট অর্থকে বিকৃত করা বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করা।**

অতিভক্তির নামে 'মিথ্যা' ও মিথ্যা প্রতিষ্ঠা করতে সত্য ওহীর 'ব্যাখ্যা' এ দুটিই ধর্ম বিকৃত করে। খৃস্টধর্মের বিকৃতি এর সুস্পষ্ট নমুনা। আমরা মিথ্যা ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তাওহীদকে শিরকে রূপান্তরিত করার কিছু নমুনা উল্লেখ করেছি। বস্তুত সাধু পল ও তাঁর অনুসারীরা তিনটি পর্যায়ে ঈসা (আ)-এর ধর্মকে বিকৃত করেন: (১) ঈসার (আ) নামে অতিভক্তিমূলক কিছু কথা প্রচলন করেন, যা তিনি বলেন নি, এমনকি প্রচলিত ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান তাঁর বক্তব্যেও তা নেই। (২) ঈসা মাসীহের কিছু দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট কথাকে নিজেদের এ সকল বানোয়াট কথার পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করতে শুরু করেন। (৩) এ সকল মিথ্যা ও 'দলীল'-এর ভিত্তিতে তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান সকল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কথাগুলো নানারকমের ব্যাখ্যা করে বাতিল করতে থাকেন। আল্লাহ বলেন:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ

"হে কিতাবীগণ, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ আলাহর রাসূল, এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর থেকে (আগত) আত্মা (আদেশ)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং 'তিন' বলো না ...।"[৫৪০]

অর্থাৎ আল্লাহ যতটুকু বলেছেন ততটুকুই বল। তাকে আল্লাহর 'কালিমা' বল; কারণ আল্লাহ তাকে পিতা ছাড়া 'হও' বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ থেকে বাড়িয়ে বলো না যে, তিনি আল্লাহর অনাদি-অনন্ত কালাম বা জ্ঞানের মুজাস্সাম বা দেহরূপ। তাঁকে আল্লাহর রূহ বল; কারণ তিনি আল্লাহর সৃষ্ট একটি আত্মা। কিন্তু এ থেকে বাড়িয়ে বলো না যে, যেহেতু তিনি আল্লাহর রূহ কাজেই তিনি আল্লাহর যাতের অংশ ও আল্লাহরই মত জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী। এভাবে আল্লাহকে আল্লাহ (পিতা), কালিমা (পুত্র) ও রূহ (পবিত্র আত্মা) তিন ব্যক্তিতে ভাগ করে ত্রিত্ববাদের শিরকে লিপ্ত হয়ো না।

আল্লাহ তাঁকে 'আল্লাহর কালিমা' ও 'আল্লাহর রূহ' বলেছেন। প্রচলিত বাইবেলে তিনি আল্লাহকে পিতা বলেছেন, নিজেকে, শিষ্যদেরকে ও সকল মুমিনকে আল্লাহর পুত্র বলেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁকে আল্লাহ, আল্লাহর যাতের (সত্তার) অংশ বা 'তিন আলাহর একজন' বলা হয় নি। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর একত্ব, শরীয়ত পালন, ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা, মানুষ, গাইব সম্পর্কে অজ্ঞ, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কাউকে নাজাত দিতে অক্ষম ইত্যাদি বলা হয়েছে। সাধু পল প্রথমে কিছু অতিভক্তিমূলক মিথ্যা চালু করলেন: ঈসা স্বয়ং আল্লাহ, তিনি আল্লাহর যাতের অংশ, আল্লাহর বাক্যের মুজাস্সাম বা দেহরূপ (God Incarnate), তিনি সৃষ্ট নন, বরং জন্ম দেওয়া (ঔরসজাত), তিনি পিতার মতই জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী, মধ্যস্থ ও মুক্তিদাতা, তাকে বিশ্বাস করলে আর শরীয়ত পালন লাগে না... ইত্যাদি। এরপর তাওরাত-ইঞ্জিলের দ্ব্যর্থবোধক কিছু কথার ইচ্ছামাফিক ব্যাখ্যা করে সেগুলিকে 'দলীল' হিসেবে পেশ করলেন। এরপর তাদের উদ্ভাবিত 'মিথ্যা' ও নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা এ দুটির ভিত্তিতে তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলের তাওহীদ ও শরীয়ত বিষয়ক সকল নির্দেশ বাতিল করে দেন। **"কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম"** বইটি পড়লে পাঠক বিস্তারিত জানতে পারবেন।

আমার লেখা **"কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা"** বইটি পড়লে পাঠক দেখবেন যে, ইসলামের প্রথম যুগ থেকে যারা বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যেও একই কারণ বিদ্যমান। খারিজী, শিয়া, কাদারিয়া, জাবারিয়া, মুরজিয়া, মু'তাযিলী ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ই কুরআন-সুন্নাহ মানেন। একটি কারণেই তারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। নিজেদের পছন্দমত কিছু ওহী বহির্ভূত 'মত' তৈরি করা, এরপর কুরআন-হাদীসের কিছু দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্যকে দলীল হিসেবে পেশ করা। সর্বশেষ এ সকল 'মত' ও 'ব্যাখ্যা'র ভিত্তিতে ওহীর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ব্যাখ্যার নামে বাতিল ও অকার্যকর করা।

'ইলমুল গাইব' ও 'হাযির-নাযির' বিষয়টি ইসলামের প্রথম কয়েকশত বছর ছিল না। পরবর্তী কালে এর উৎপত্তি। এ বিষয়েও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আসমান-যমীনের মধ্যে কেউ গাইব জানেন না। বারংবার বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'গাইব' জানেন না। মাক্কী সূরায়, মাদানী সূরায়, মদীনায় অবতীর্ণ একেবারে শেষ দিকের সূরায় সকল স্থানেই তা বলা হয়েছে।[৫৪১] এর বিপরীতে একটি আয়াতেও বলা হয় নি যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আলিমুল গাইব'। তিনি 'গাইবের সবকিছু জানেন' এ কথা তো দূরের কথা 'তিনি গাইব জানেন' এ প্রকারের একটি কথাও কোথাও বলা হয় নি। তবে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ বলেছেন, এগুলো গাইবের সংবাদ যা আপনাকে ওহীর মাধ্যমে জানালাম... ইত্যাদি।

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি 'গাইব' বা অদৃশ্য জ্ঞানের মালিক নয়, তিনি মনের কথা জানেন না, তিনি গোপন কথা জানেন না এবং তিনি ভবিষ্যত জানেন না। আয়েশা, উম্মু সালামা, আসমা বিনত আবী বাকর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আনাস ইবনু মালিক, আবূ সাঈদ খুদরী, সাহল ইবনু সা'দ, আমর ইবনুল আস প্রমুখ প্রায় দশ জন সাহাবী (رضي الله عنهم) থেকে অনেকগুলো সহীহ সনদে বর্ণিত 'মুতাওয়াতির' হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেয়া

হবে না, বাধা দেয়া হবে। আমি বলব : এরা তো আমারই উম্মাত। তখন উত্তরে বলা হবে:

إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ

"আপনার পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না।"[৫৪২]

এ সকল অগণিত সহীহ হাদীসের বিপরীতে একটি হাদীসেও তিনি বলেন নি যে, আমি 'আলিমুল গাইব', বা আমি সকল গোপন জ্ঞানের অধিকারী, অথবা আমি তোমাদের সকল কথাবার্তা বা কাজ কর্মের সময় উপস্থিত থাকি, অথবা আমি ঘরে বসেই তোমাদের সকল কাজ কর্ম ও গোপন বিষয় দেখতে পাই ... এরূপ কোনো কথাই তিনি বলেন নি।

তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করেছেন, অনেক মানুষের গোপন বিষয় বলেছেন, কোনো কোনো হাদীসে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, স্বপ্নে বা সালাতে দাঁড়িয়ে তিনি জান্নাত, জাহান্নাম সবকিছু দেখেছেন। তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে পিছনের মুসল্লীদেরকেও দেখতে পান বলে জানিয়েছেন। কিন্তু কখনোই বলেন নি যে, তিনি পর্দার আড়ালে, মনের মধ্যে বা দূরের কোনো কিছু দেখেন। বরং বারংবার এর বিপরীত কথা বলেছেন।

এখন মুমিনের দায়িত্ব এ সব কিছু সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা। কুরআনের বিভিন্ন সুস্পষ্ট আয়াত ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) 'গাইব' জানতেন না। আবার কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে গাইবের অনেক বিষয় জানিয়েছেন। তাঁর জ্ঞান ছিল সকল নবী-রাসূলের জ্ঞানের চেয়ে বেশি ও পূর্ণতর।

একান্ত প্রয়োজন না হলে কোনো ব্যাখ্যায় যেতে নেই। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করলেও গুরুত্বের কম বেশি হবে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে। স্পষ্ট কথাকে অস্পষ্ট কথার জন্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বাতিল করা যাবে না। বরং প্রয়োজনে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কথার জন্য অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক কথার ব্যাখ্যা করতে হবে। 'খবর ওয়াহিদ' বা একক হাদীসের জন্য কুরআনের স্পষ্ট বাণী বা মুতাওয়াতির ও মাশহূর হাদীস বাতিল করা যাবে না। প্রয়োজনে কুরআন বা প্রসিদ্ধ হাদীসের জন্য একক ও দ্ব্যর্থবোধক হাদীসের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করতে হবে।

**৪৩. দলীল ও ব্যাখ্যার তুলনামূলক পর্যালোচনা**

যারা রাসূলুলাহ ﷺ-এর ইলমুল গাইবের বা হাযির-নাযির হওয়ার দাবি করেন তাঁরা নিজেদের পছন্দ বা বিভিন্ন আলিমের বক্তব্যের ভিত্তিতে একটি 'মত' গ্রহণ করেন। এরপর এ সকল দ্ব্যর্থবোধক বা ফযীলত বোধক আয়াত ও হাদীসকে তাঁদের মতের পক্ষে ব্যাখ্যা করে সে ব্যাখ্যাকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। এরপর তাঁদের 'মত' ও 'ব্যাখা'র ভিত্তিতে অগণিত সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেন। পাঠকের হৃদয়ঙ্গমের জন্য এখানে তাঁদের এরূপ কয়েকটি 'দলীল' আলোচনা করছি।

**প্রথম দলীল:** কুরআনে বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'শাহিদ' ও 'শাহীদ' (شاهد وشهيد) বলা হয়েছে।[৫৪৩] এ শব্দ দুটির অর্থ 'সাক্ষী', 'প্রমাণ', 'উপস্থিত' (witness, evidence, present) ইত্যাদি। সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুফাস্সিরগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে (ﷺ) দীন প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে ও সাক্ষীরূপে প্রেরণ করেছেন। যারা তাঁর প্রচারিত দীন গ্রহণ করবেন, তিনি তাঁদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। এছাড়া পূর্ববর্তী নবীগণ যে তাদের দীন প্রচার করেছেন সে বিষয়েও তিনি এবং তাঁর উম্মাত সাক্ষ্য দিবেন। অনেকে বলেছেন, তাঁকে আল্লাহ তাঁর একত্বের বা ওয়াহদানিয়্যতের সাক্ষী ও প্রমাণ-রূপে প্রেরণ করেছেন।[৫৪৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক স্থানে মুমিনগণকেও মানব জাতির জন্য 'শাহীদ' বলা হয়েছে।[৫৪৫] অনেক স্থানে আল্লাহকে 'শাহীদ' বলা হয়েছে।[৫৪৬]

যারা রাসূলুলাহ (ﷺ)-কে 'সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী' বা 'হাযির-নাযির' বলে দাবি করেন তাঁরা এই 'দ্ব্যর্থবোধক' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেন। এরপর সেই অর্থের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কুরআনের সকল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বাণী বাতিল করে দেন। তাঁরা বলেন, 'শাহিদ' অর্থ উপস্থিত। কাজেই তিনি সর্বত্র উপস্থিত। অথবা 'শাহিদ' অর্থ যদি সাক্ষী হয় তাহলেও তাঁকে সর্বত্র উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ না দেখে তো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। আর এভাবে তিনি সদা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান বা হাযির-নাযির ও সকল স্থানের সকল গোপন ও গাইবী জ্ঞানের অধিকারী।

তাঁদের এ ব্যাখ্যা ও দাবির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

**প্রথমত:** তাঁরা এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী, তাবিয়ী ও পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের মতামত গ্রহণ না করে নিজেদের মর্জি মাফিক ব্যাখ্যা করেন এবং সাহাবী-তাবিয়ীদের ব্যাখ্যা বাতিল করে দেন।

**দ্বিতীয়ত:** তাঁরা একটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যাখ্যাকে মূল আকীদা হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের

অগণিত দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা নিজেদের মর্জিমাফিক বাতিল করে দিলেন। তাঁরা এমন একটি অর্থ গ্রহণ করলেন, যে অর্থে একটি দ্ব্যর্থহীন আয়াত বা হাদীসও নেই। সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী বা কোনো ইমামও কখনো এ কথা বলেন নি।

**তৃতীয়ত:** তাঁদের এ ব্যাখ্যা ও দাবি মূলতই বাতিল। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রত্যেক মুসলিমকেই 'ইলমে গাইবের অধিকারী' ও হাযির-নাযির বলে দাবি করতে হবে। কারণ মুমিনগণকেও কুরআনে 'শাহীদ' অর্থাৎ 'সাক্ষী' বা 'উপস্থিত' বলা হয়েছে এবং বারংবার বলা হয়েছে যে, তাঁরা পূর্ববর্তী সকল উম্মাত সহ পুরো মানব জাতি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবেন। আর উপস্থিত না হলে তো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। কাজেই তাঁদের ব্যাখ্যা ও দাবি অনুসারে বলতে হবে যে, প্রত্যেক মুমিন সৃষ্টির শুরু থেকে বিশ্বের সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান এবং সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন। কারণ না দেখে তাঁরা কিভাবে মানবজাতির পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন?!

**দ্বিতীয় দলীল:** কুরআন কারীমে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

"নবী মু'মিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর (closer) এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। এবং আল্লাহর কিতাবে আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর।"[৫৪৭]

এখানে 'আউলা' (أولى) শব্দটির মূল হলো 'বেলায়াত' (الولاية), অর্থাৎ বন্ধুত্ব, নৈকট্য, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি। "বেলায়েত" অর্জনকারীকে "ওলী" (الولي), অর্থাৎ বন্ধু, নিকটবর্তী বা অভিভাবক বলা হয়। 'আউলা' অর্থ 'অধিকতর ওলী'। অর্থাৎ অধিক বন্ধু, অধিক নিকটবর্তী, অধিক যোগ্য বা অধিক দায়িত্বশীল (more entitled, more deserving, worthier, closer)।

এখানে স্বভাবতই ঘনিষ্ঠতর বা নিকটতর (closer) বলতে ভক্তি, ভালবাসা, দায়িত্ব, সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা বুঝানো হচ্ছে। মুমিনগণ রাসূলুল্লাহকে তাঁদের নিজেদের চেয়েও বেশি আপন, বেশি প্রিয় ও আনুগত্য ও অনুসরণের বেশি হক্কদার বলে জানেন। এই 'আপনত্বের' একটি দিক হলো যে, তাঁর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আবার উম্মাতের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরদ ও প্রেম উম্মাতের আপনজনদের চেয়েও বেশি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন। জাবির, আবূ হুরাইরা প্রমুখ সাহাবী (رضي الله عنهم) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي (فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، عَلَيَّ قَضَاؤُهُ) فَأَنَا مَوْلاهُ

"প্রত্যেক মুমিনের জন্যই দুনিয়া ও আখেরাতে আমি তার অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহর বাণী পাঠ কর: "নবী মু'মিনগণের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর"। কাজেই যে কোনো মুমিন যদি মৃত্যুবরণ করে এবং সে সম্পদ রেখে যায়, তবে তার উত্তরাধিকারীগণ যারা থাকবে তারা সে সম্পদ গ্রহণ করবে। আর যদি সে ঋণ রেখে যায় বা অসহায় সন্তান-সন্তুতি রেখে যায় তবে তারা যেন আমার কাছে আসে; তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপরেই থাকবে। কারণ আমিই তার আপনজন।"[৫৪৮]

কিন্তু 'হাযির-নাযির'-এর দাবিদারগণ দাবি করেন যে, এখানে দৈহিক নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। কাজেই তিনি সকল মুমিনের কাছে হাযির আছেন।

এখানেও আমরা দেখছি যে একটি বানোয়াট ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা কুরআন ও হাদীসে অগণিত দ্ব্যর্থহীন নির্দেশকে বাতিল করে দিচ্ছেন। তাঁরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করছেন না। সর্বোপরি তাদের এ ব্যাখ্যা সন্দেহাতীতভাবেই বাতিল। কারণ এ আয়াতেই বলা হয়েছে যে "আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর"। অন্যত্রও বলা হয়েছে যে, "আত্মীয়গণ একে অপরের ঘনিষ্ঠতর বা নিকটতর।"[৫৪৯] তাহলে এদের ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের বলতে হবে যে, সকল মানুষই হাযির নাযির। কারণ সকল মানুষই কারো না কারো আত্মীয়। কাজেই তারা সদাসর্বদা তাদের কাছে উপস্থিত এবং তাদের সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন!

অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী (ﷺ) ও মুমিনগণ মানুষদের মধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর সবচেয়ে 'নিকটতর' বা 'ঘনিষ্ঠতর' (أولى)।[৫৫০] এখানে দাবি করতে হবে যে, সকল মুমিন ইবরাহীমের নিকট উপস্থিত...!

অন্য হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় আগমন করেন, তখন ইহূদীদের আশূরার সিয়াম পালন করতে দেখেন। তিনি তাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলে, এ দিনে আল্লাহ মূসা (আ) ও ইস্রাঈল সন্তানদেরকে ফেরাউনের উপর বিজয় দান করেন। এজন্য মূসা (আ) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ দিন সিয়াম পালন করেন। তখন তিনি বলেন:

نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ (مِنْهُمْ) وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

"তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা (আ)-এর নিকটতর। একথা বলে তিনি এ দিনে সিয়াম পালনের নির্দেশ প্রদান করেন।"[৫৫১] এখন আমাদের দাবি করতে হবে যে, আমরা মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক সদস্য মূসার কাছে উপস্থিত!!

**তৃতীয় দলীল:** আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (رَقِيَ الْمِنْبَرَ) فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلا بِالانْصِرَافِ (أَتِمُّوا الصُّفُوفَ) فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي (خَلْفَ ظَهْرِي/مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)، فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ (مِنْ أَمَامِيْ)

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। সালাতের পরে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে (মিম্বরে আরোহণ করে) তিনি বলেনঃ হে মানুষেরা, আমি তোমাদের ইমাম। কাজেই তোমরা আমার আগে রুকু করবে না, সাজদা করবে না, দাঁড়াবে না এবং সালাত শেষ করবে না। (অন্য বর্ণনায়: কাতারগুলো পূর্ণ করবে।) কারণ আমি তোমাদেরকে দেখতে পাই আমার সামনে এবং আমার পিছনে, যখন তোমরা রুকু কর এবং যখন তোমরা সাজদা কর। (অন্য বর্ণনায়ঃ সালাতের মধ্যে এবং রুকুর মধ্যে আমি আমার পিছন থেকে তোমাদেরকে দেখি যেমন আমি সামনে থেকে তোমাদেরকে দেখি।)[৫৫২]

এ অর্থে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلا خُشُوعُكُمْ وَإِنِّي لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي

"তোমরা কি এখানে আমার কিবলাহ দেখতে পাচ্ছ? আল্লাহর কসম, তোমাদের রুকু, সাজদা এবং বিনম্রতা আমার কাছে অপ্রকাশিত থাকে না এবং আমি তোমাদেরকে আমার পিঠের পিছনে দেখি।"[৫৫৩]

এ হাদীস থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারছি। তা হলো অন্যান্য মানুষ যেভাবে সামনে দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পিছনেও সেভাবে সাহাবীগণের রুকু-সাজদা ইত্যাদি দেখতেন। ইসলামী আকীদার অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এখানেও তিনটি ধারা বিদ্যমানঃ

**(ক)** মুতাযিলী ও 'আকল' বা জ্ঞানবুদ্ধির অনুসারী বলে দাবিদার কিছু মুসলিম। তাঁরা সহীহ হাদীসে প্রমাণিত এ বিষয়টিকে তাঁর 'বাশারিয়্যাত' বা মানবত্বের সাথে সাংঘর্ষিক বলে কল্পনা করে এ অর্থের হাদীসগুলি ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেনঃ এখানে 'দেখি' অর্থ 'ধারণা করি', কারণ 'দেখা' আরবীতে 'ধারণা' বা মনের দেখা অর্থে ব্যবহৃত হয়, অথবা দেখি অর্থ আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়... ইত্যাদি। তাঁদের দাবিঃ কুরআন প্রমাণ করে যে, তিনি মানুষ, আর মানুষ পিছনে দেখতে পরে না, অতএব কুরআনের অর্থ সংরক্ষণের জন্য এ হাদীসের এরূপ ব্যাখ্যা জরুরী। তাঁরা দাবি করেন, তাদের এ ব্যাখ্যা আরবী ভাষা ও কুরআন-হাদীসের ব্যাবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে এরূপ ব্যাখ্যা ওহীর বিকৃতি মাত্র। মানবত্ব ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈপরীত্য কল্পনা করার কারণেই এ বিকৃতি।

**(খ)** শীয়া ও পরবর্তীকালে সুন্নীগণের মধ্যকার অতিভক্তিতে নিমজ্জিত মুসলিমগণ। তাঁরা 'পিছনে দেখা'-র এ হাদীসটির একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেন, তা হলো: 'বিশ্বের সকল স্থান ও সময়ের সবকিছু দেখতে পাওয়া'। এর ভিত্তিতে তাঁরা তাঁকে 'আলিমুল গাইব' ও 'হাযির-নাযির' বলে দাবি করেন। এরপর তাঁর বাশারিয়্যাত বিষয়ক ও 'গাইব না জানা' বিষয়ক কুরআন-হাদীসের অগণিত সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলো ব্যাখ্যাপূর্বক বাতিল করেন।

**(গ)** সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ধারা। তাঁরা বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব ও 'পশ্চাত-দর্শন' উভয় বিষয়কে স্বাভাবিক ও প্রসিদ্ধ অর্থে গ্রহণ করেন এবং সরল অর্থে বিশ্বাস করেন।

হাদীসটি পাঠ করলে বা শুনলে যে কেউ অনুভব করবেন যে, বিষয়টি স্বাভাবিক দৃষ্টি ও দর্শনের বিষয়ে। মানুষ যেরূপ সামনের দিকে দেখতে পায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে সেভাবেই পিছনে দেখতে পেতেন। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে, এ দর্শন ছিল সালাতের মধ্যে ও রুকু সাজদার মধ্যে। অন্য সময়ে তিনি এইরূপ দেখতেন বলে কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তা সত্ত্বেও যদি তা মনে করা হয় যে, তিনি সর্বদা এইরূপ সামনে ও পিছনে দেখতে পেতেন, তবুও এ হাদীস দ্বারা কখনোই বুঝা যায় না যে, তিনি দৃষ্টির আড়ালে, ঘরের মধ্যে, পর্দার অন্তরালে, মনের মধ্যে বা অনেক দূরের সবকিছু দেখতে পেতেন। তা সত্ত্বেও যদি কুরআন ও হাদীসের বিপরীত ও বিরোধী না হতো, তবে আমরা এই হাদীস থেকে দাবি করতে পারতাম যে, তিনি এভাবে সর্বদা সর্বস্থানের সর্বকিছু দেখতেন এবং দেখছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন আয়াতে ও অগণিত সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টত ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বারংবার এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। মূলত মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূল (ﷺ)-কে এরূপ ঝামেলা ও বিড়ম্বনাময় দায়িত্ব থেকে ঊর্ধ্বে রেখেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী বলেনঃ

ظاهر الحديث إن ذلك يختص بحالة الصلاة ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحواله وأغرب الداودي الشارح فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة

"হাদীসের বাহ্যিক বা স্পষ্ট অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, পিছন থেকে দেখতে পাওয়ার এ অবস্থাটি শুধুমাত্র সালাতের জন্য খাস। অর্থাৎ তিনি শুধু সালাতের মধ্যেই এইরূপ পিছন থেকে দেখতে পেতেন। এমনও হতে পারে যে, সর্বাবস্থাতেই তিনি এইরূপ দেখতে পেতেন।.... দাঊদী[৫৫৪] নামক ব্যাখ্যাকার একটি উদ্ভট কথা বলেছেন। তিনি এ বর্ণনায় 'পরে' শব্দটির অর্থ 'মৃত্যুর পরে' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ উম্মাতের কর্ম তাঁর কাছে পেশ করা হবে। সম্ভবত তিনি আবূ হুরাইরার (রা) হাদীসের সামগ্রিক অর্থ চিন্তা করেন নি, যেখানে এ কথার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে...।[৫৫৫]

এখানে লক্ষণীয় যে, দাঊদীর যুগ বা হিজরী ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত এরূপ উদ্ভট ব্যাখ্যাকারীরাও 'দেখা' বলতে 'উম্মাতের কর্ম তাঁর কাছে উপস্থিত করা হলে দেখেন' বলে দাবি করতেন। তিনি মদীনায় নিজ কবরে অবস্থান করে সবত্র সবকিছু দেখেন অথবা সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত হয়ে সব কিছু দেখেন বলে কেউ কল্পনা করে নি। সর্বোপরি পিছনে 'দেখা' বা 'গায়েবী দেখা' দ্বারা 'সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিতি' বা সবকিছু দেখা প্রমাণিত হয় না। কুরআনে বলা হয়েছে যে, শয়তান ও তার দল মানুষদেরকে গায়েবীভাবে দেখে:

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ

"সে (শয়তান) ও তার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।"[৫৫৬]

এখানে কি কেউ দাবি করবেন যে, যেহেতু "তেমাদিগকে দেখে' (يراكم) বর্তমান কালের ক্রিয়া, সেহেতু শয়তান ও তার দলের প্রত্যেকে 'হাযির ও নাযির': তারা সদা সর্বদা সকল স্থানের সকল মানুষকে একই ভাবে দেখছে?

**চতুর্থ দলীল:** বিভিন্ন হাদীসে উম্মাতের বিভিন্ন কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উম্মাতের দরুদ-সালাত তাঁর নিকট পেশ করা হয় অর্থে অনেকগুলো সহীহ হাদীস বর্ণিত। এছাড়া উম্মাতের সাধারণ কর্মও তাঁর নিকট পেশ করা হয় অর্থে হাদীস বর্ণিত।

এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَنُحَدِّثُ لَكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ ، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ.

"আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তোমরা কথা বল এবং আমিও তোমাদের সাথে কথা বলি। এবং আমার মৃত্যু তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তোমাদের কর্ম আমার কাছে পেশ করা হবে। আমি ভালকর্ম দেখলে সেজন্য আল্লাহর প্রশংসা করব এবং খারাপকর্ম দেখলে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছ ক্ষমা চাইব।" ইমাম হাইসামী বলেন: সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। কোনো কোনো মুহাদ্দিস সনদের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন।[৫৫৭]

এরূপ একটি বক্তব্য প্রসিদ্ধ তাবিয়ী সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব (৯০ হি) থেকেও দুর্বল সনদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে উম্মাতের জন্য "শাহিদ" হবেন বা সাক্ষ্য দিবেন তা ব্যাখ্যা করতে ইবনুল মুসাইয়িব বলেন:

ليس من يوم إلا تعرض على النبي ﷺ أمته غُدْوة وعَشيّة، فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم،

"প্রতি দিনই সকালে বিকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তাঁর উম্মাতকে পেশ করা হয়, ফলে তিনি তাদেরকে তাদের নামে ও কর্মে চিনতে পারেন। এজন্য তিনি তাদের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।"[৫৫৮]

উম্মাতের আমল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট পেশ করার এ সকল হাদীসকে তাঁর 'হাযির-নাযির' ও 'আলিমুল গাইব' হওয়ার 'দলীল' হিসেবে পেশ করা হয়। এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(১) উপরের হাদীসটি এবং সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িবের বক্তব্য নিশ্চিতভাবে 'হাযির-নাযির' ও 'আলিমুল গাইব' মতটি বাতিল প্রমাণ করে। কারণ এগুলি প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সদা-সর্বদা সবত্র হাযির (উপস্থিত) বা সবকিছুর নাযির (দর্শক) নন; বরং বরং উম্মাতের আমল তাঁর কাছে 'হাযির' করা হলে তিনি শুধু 'আমলের' নাযির বা দর্শক হন। তিনি উম্মাতের নিকট হাযির হন না; বরং

উম্মাতের আমল তাঁর নিকট হাযির করা হয়।

**(২)** আমরা দেখেছি যে, দশজনেরও অধিক সাহাবী থেকে অনেক সহীহ সনদে বর্ণিত, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তাঁর ওফাতের পরে সাক্ষী বা হাযির-নাযির হয়ে উম্মাতের সকল কর্ম দেখাশুনা করার ঝামেলা মহান আলাহ তাঁকে দেন নি। বরং তাদের অনেকের পরিবর্তন-উদ্ভাবন তিনি জানবেন না। দু-একটি দুর্বল বা একক হাদীসের মর্যিমাফিক "ব্যাখ্যা"-কে আকীদার মূল বানিয়ে তার ভিত্তিতে কুরআন এবং মুতাওয়াতির হাদীসগুলির সুস্পষ্ট নির্দেশনা ব্যাখ্যার নামে বাতিল করার অর্থ 'মিথ্যা' ও 'ব্যাখ্যা' দ্বারা ধর্ম বিকৃত করা।

**চতুর্থ দলীল:** মহান আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

"তুমি কি দেখ নি কেমন করলেন তোমার রব হস্তীবাহিনীর সাথে।"[৫৫৯]

রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর "হাযির নাযির" ও "ইলমুল গাইব" প্রমাণ করতে এ আয়াত উল্লেখ করা হয়। তাঁরা বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্মের পূর্বেও আবরাহার হস্তীবাহিনীর বিপর্যয় দেখেছিলেন। এথেকে বুঝা যায় যে, তিনি পূর্বের ও পরের সকল কিছু দেখেন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং সদা-সর্বত্র হাযির বা বিরাজমান!!

এদের কেউ হয়ত সত্যিই অজ্ঞ এবং কেউ জ্ঞানপাপী। তা নাহলে আরবী ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ সকলেই জানেন যে, আরবীতে "দেখা" বলতে শুধু চক্ষুর দেখা বুঝানো হয় না, জানা বা জ্ঞানলাভও বুঝানো হয়। কুরআনে এরূপ ব্যবহার অগণিত। দুটি নমুনা দেখুন। কাফিরদের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ

"তারা কি দেখে নি আমি ধ্বংস করলাম তাদের পূর্বে কত জাতি?"[৫৬০]

তাঁদের যুক্তির ধারায় এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবূ জাহল-সহ সকল কাফিরই "হাযির-নাযির" বা অতীত-বর্তমান সবকিছুর দর্শক। তারা নূহ (আ) এবং অন্যান্য নবীদের (আ) যুগের কাফিরগণের ধ্বংসলীলার সময় উপস্থিত ছিল ও তা অবলোকন করেছিল!! অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا

"তোমরা কি দেখ নি কিভাবে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ সপ্ত আসমানকে স্তর-বিন্যস্তকরে?"[৫৬১]

আমরা কি বলব যে, কুরআন পাঠকারী ও শ্রোতা সকলেই সপ্ত আকাশ সৃষ্টির সময় "হাযির" বা উপস্থিত ছিলেন এবং তা অবলোকন করেছিলেন?!

"হাযির-নাযির", "ইলমুল গাইব" ইত্যাদি বিষয়ের সকল "দলীল"-ই এরূপ। এভাবে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে এ সকল বানোয়াট ও মিথ্যা কথা যারা বলেন, তাঁরা তাঁদের কথাগুলোর পক্ষে একটিও দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীস পেশ করছেন না। তাঁরা অপ্রাসঙ্গিক বা দ্ব্যর্থবোধক কিছু আয়াত বা হাদীসকে মনগড়াভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এরপর এরূপ ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করে তাঁরা অগণিত আয়াত ও সহীহ হাদীস বাতিল করে দেন। যারা এরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান তাঁদের অনেকের নেক নিয়্যাত ও ভক্তি-ভালবাসা হয়ত নির্ভেজাল। তবে তাঁরা ভাল উদ্দেশ্যে ওহীর নামে মিথ্যা বলেছেন এবং রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নামে এমন কথা বলেছেন যা তিনি কখনোই নিজের বিষয়ে বলেন নি।

**দ্বিতীয় কারণ: এ সকল কথাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা-বৃদ্ধিকর বলে মনে করা এবং এ সকল কথা বললে তাঁর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি বা পূর্ণতা পাবে বলে মনে করা।**

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভক্তি ও ভালবাসা এবং তাঁর প্রশংসা করা ঈমানের মূল ও মুমিনের অন্যতম সম্বল। তবে এ জন্য কুরআনের অগণিত আয়াত ও অগণিত সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশের বাইরে আমাদের যয়ীফ, মিথ্যা, বানোয়াট কথা বলতে হবে, বা যুক্তি, তর্ক, ব্যাখ্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি দিয়ে কিছু কথা বানাতে হবে এ ধারণাটিই ইসলাম বিরোধী।

সর্বোপরি, আমরা যে বিষয়টিকে তাঁর জন্য মর্যাদাকর বলে মনে করছি সেটা প্রকৃতপক্ষে অমর্যাদাকর হতে পারে। হাযির-নাযির বিষয়টিই দেখুন। আমরা জানি, মর্যাদাহীন ব্যক্তিই মর্যাদাশীল ব্যক্তির নিকট 'হাযির' হন। রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, প্রশাসক, বিচারক এবং সকল পর্যায়ের মর্যাদাময় মানুষদের কাছে সাধারণ মানুষেরা 'হাযির' হন। এ সকল মর্যাদাময় মানুষেরা কখনোই সাধারণ মানুষদের কাছে 'হাযিরা' দিয়ে বেড়ান না। প্রয়োজনে কর্মচারী-কর্মকর্তাগণ মানুষদের তথ্যাদি নিয়ে তাদের কাছে হাযির হন।

সহীহ হাদীসগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ মর্যাদাই প্রমাণ করেছে। তিনি তাঁর পবিত্র কবরে অবস্থান করছেন। মহান আল্লাহ অগণিত ফিরিশতা নিয়োগ করেছেন যারা পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে উম্মাতের দরুদ-সালাম তাঁর নিকট পেশ করেন। এটিই তো মর্যাদার

পূর্ণতা। কিন্তু অতিভক্তির নামে যদি কেউ দাবি করেন যে, তিনি নিজেই উম্মাতের দ্বারে দ্বারে হাযিরা দিয়ে বেড়ান তবে তা তাঁর মর্যাদা বাড়াবে না কমাবে তা পাঠক একটু চিন্তা করুন।

এজন্য মুমিনের নাজাতের একমাত্র উপায় সকল ক্ষেত্রে বিশেষত, আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর উপর নির্ভর করা। আমলের ক্ষেত্রে কোনো আমল কারো জন্য জরুরী আর কারো জন্য কম জরুরী বা অপ্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসের বিষয় তা নয়। তা সকলের জন্য সমান। এজন্য আলিমগণ বলেছেন যে, বিশ্বাসের ভিত্তি হবে কুরআন কারীম বা মুতাওয়াতির হাদীসের উপর। অর্থাৎ যে বিষয়টি বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য প্রয়োজন সে বিষয়টি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সকল সাহাবীকে জানিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষাতেই জানিয়েছেন। আর এরূপ বিষয় অবশ্যই কুরআনে থাকবে বা ব্যাপক প্রচারিত 'মুতাওয়াতির' হাদীসে থাকবে।

বিশ্বাসের ভিত্তি 'গাইবী' বিষয়ের উপরে। এ সকল বিষয়ে ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা দেয়া যায় না। কর্ম বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট বিধান নেই এরূপ অনেক নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবিত হয়, এজন্য সেক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। যেমন মাইক, ধুমপান ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় সেরূপ নয়। এগুলোতে নতুন সংযোজন সম্ভব নয়। এজন্য আকীদা বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন ইমামগণ।[৫৬২] আল্লাহর গুণাবলি, নবীগণের সংখ্যা, মর্যাদা, ফিরিশতাগণের সংখ্যা, সৃষ্টি, কর্ম, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীসে যেভাবে যতটুকু বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা ওহীর কথাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারি, কিন্তু যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারি না।

এজন্য মুমিনের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো, কুরআন কারীমের সকল কথাকে সমানভাবে গ্রহণ করা এবং কোনো কথাকে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য কথাকে বাতিল বা ব্যাখ্যা না করা। অনুরূপভাবে সকল সহীহ হাদীসকে সহজভাবে মেনে নেয়া। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সাহাবীগণের অনুসরণ করা। যে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট কিছু নেই এবং সাহাবীগণও কিছু বলেন নি, সে বিষয়ে চিন্তা না করা, কথা না বলা ও বিতর্কে না জড়ানো।

### একাদশ প্রসঙ্গ: মীলাদুন্নবী (ﷺ) উদযাপন

আমি **'এহইয়াউস সুনান'** ও **'রাহে বেলায়াত'** পুস্তকদ্বয়ে মীলাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, আলিমগণের মতামত ও সুন্নাত পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৫৬৩] আমরা দেখেছি যে, মীলাদ মাহফিলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মীলাদ, সীরাত, শামাইল ও হাদীস আলোচনা করা, দরুদ-সালাম পাঠ করা, মহব্বত বৃদ্ধি করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত-সম্মত ইবাদত পালন করা হয়। নাম ও পদ্ধতিগত কারণে বিভিন্ন মতভেদ দেখা দিয়েছে। তবে পক্ষ-বিপক্ষ সকলেই একমত যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলোতে "মীলাদুন্নবী" বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম পালনের প্রচলন ছিল না। মীলাদুন্নবীর সমর্থক কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলিমের বক্তব্য দেখুন:

**(ক)** নবম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা ইবনু হাজর আসকালানী (৮৫২ হি) মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন: "মাওলিদ পালন মূলত বিদ'আত। ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন শতাব্দীর সালফে সালেহীনের কোনো একজনও এই কাজ করেন নি।"[৫৬৪]

**(খ)** এ শতকের অন্য একজন প্রসিদ্ধ আলিম আলামা আবুল খাইর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান সাখাবী (৯০২ হি.)। তিনিও মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের সমর্থক। তিনি লিখেছেন : "ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালফে সালেহীনের কোনো একজন থেকেও মাওলিদ পালনের কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না। মাওলিদ পালন বা উদ্‌যাপন পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। এরপর থেকে সকল দেশের ও সকল বড় বড় শহরের মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মমাস পালন করছেন... বরকত লাভ করছেন।"[৫৬৫]

**(গ)** নবম-দশম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী মীলাদের সমর্থনে অনেক পুস্তিকা রচনা করেন। 'হুসনুল মাকদাস ফী আমালিল মাওলিদ' পুস্তিকায় তিনি মীলাদের সমর্থনে বলেন:

عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي ﷺ وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبيﷺ وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف، وأول من أحدث فعل ذلك صاحب اربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري...

"মীলাদ পালন হলো: মানুষদের একত্রিত হওয়া, সাধ্যমত কুরআন তিলাওয়াত করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম এবং জন্মের সময় যে সকল অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল তা আলোচনা করা, এরপর দস্তরখান বিছানো হলে খাদ্য গ্রহণ করে প্রস্থান করা। এর অতিরিক্ত কিছুই করা হয় না। আমার মতে এরূপ কর্ম বিদআতে হাসানা, এর জন্য সাওয়াব পাওয়া যাবে; কারণ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

তাযীম, তাঁর পবিত্র জন্মে খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এ বিষয়টি উদ্ভাবন করেন তিনি ইরবিলের শাসক আল-মালিকুল মুযাফ্ফর আবূ সায়ীদ কুকবূরী (মৃত্যু ৬৩০ হি)... ।"[৫৬৬]

**(ঘ)** দশম হিজরীর অন্যতম প্রসিদ্ধ সীরাতুন্নবী ও মীলাদুন্নবী গবেষক মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ইউসূফ সালিহী শামী (৯৪২ হি)। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'সীরাহ শামিয়্যাহ' গ্রন্থে মীলাদুন্নবী উদযাপনের গুরুত্ব প্রমাণের জন্য আলিমগণের বক্তব্য, যুক্তি, স্বপ্ন ও কাশফ উদ্ধৃত করে দীর্ঘ অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনিও সুস্পষ্টত উল্লেখ করেছেন যে, মীলাদুন্নবী পূর্ববর্তী যুগে ছিল না, সর্বপ্রথম ইরবিলের শাসক কুকবূরী তা প্রচলন করেন।[৫৬৭]

**(ঙ)** মীলাদের সমর্থক লাহোরের প্রখ্যাত আলিম সাইয়্যিদ দিলদার আলী (১৯৩৫ খৃ) মীলাদের পক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন: "মীলাদের কোনো আসল বা সূত্র প্রথম তিন যুগের কোনো সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয় নি; বরং তাঁদের যুগের পরে এর উদ্ভাবন ঘটেছে।"[৫৬৮]

**(ছ)** মীলাদের সমর্থনে বিগত ৮০০ বৎসরে অনেক প্রসিদ্ধ আলিম অনেক দলীল, যুক্তি, মত, কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদির কথা লিখেছেন। তবে তাঁরা সকলেই উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগে মীলাদ ছিল না। এজন্য তা বিদআতে হাসানা।

**(জ)** মীলাদের সমর্থক সকল আলিমই আনুষঙ্গিক দলীলের উপর নির্ভর করেছেন। যেমন, মীলাদের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ-সালাম পাঠ, দান-সাদকা ইত্যাদি নেক আমল করা হয়, কাজেই তা মন্দ হবে কেন? আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের সংবাদ পেয়ে খুশি হয়ে তার দাসীকে মুক্ত করে, এজন্য তিনি কাফির হয়েও কবরে উপকার লাভ করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্ম বিষয়ে কথা বলেছেন, সাহাবীগণ একে অপরের কাছে তাঁর গুণাবলি শুনতে চাইতেন, তাঁরা সালাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন বিষয়ক কুরআনের আয়াত পাঠ করতেন.... কাজেই মীলাদ-কিয়াম কুরআন-সুন্নাহ সম্মত ...। আমরা স্বভাবতই বুঝি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ মীলাদুন্নবী পালন করেছেন মর্মে কোনো একটি যয়ীফ বা জাল হাদীসও যদি থাকতো তাহলে কেউই এ সকল আনুষঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক দলীল দিয়ে মীলাদ প্রমাণের চেষ্টা করতেন না। বরং সরাসরি উক্ত দলীল পেশ করতেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, হিজরী ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে 'ঈদ মীলাদুন্নবী' উদ্ভাবন ও প্রচলন হওয়ার পরে বিগত প্রায় ৮০০ বৎসর যাবৎ মুসলিম উম্মাহর অগণিত আলিম মীলাদকে পছন্দ করেছেন এবং এর পক্ষে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই এর পক্ষে জালিয়াতি করেন নি। বরং মীলাদের সমর্থক আলিমগণও মীলাদ প্রসঙ্গে জাল হাদীস বর্ণনা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে কিছু নির্লজ্জ জালিয়াত এ বিষয়ে জাল হাদীস ও জাল পুস্তক প্রকাশ করেছে।

**৪৪. জাল বইয়ের জাল হাদীস**

হিজরী দশম শতকের প্রসিদ্ধ আলিম ইবন হাজার হাইতামী মাক্কী (৮৯৯-৯৭৪/১৪৯৪-১৫৬৬ হি)-এর নামে তুরস্কের মাকতাবাতুল হাকীকাহ নামক একটি প্রকাশনা সংস্থা গত ১৯৯৩ খৃ (১৪১৪ হি) "আন-নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম ফী মাওলিদি সাইয়িদি ওয়ালাদি আদাম" (বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আদম সন্তানদের নেতার জন্মের মধ্যে) নামে একটি বই প্রকাশ করেছে। এ বইটির মধ্যে মীলাদের পক্ষে সাহাবীগণের নামে অনেকগুলো সনদ বিহীন জাল হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এ জাল বইটির প্রথম অধ্যায় নিম্নরূপ:

فصل في بيان فضل مولد النبي ﷺ. قال أبو بكر الصديق ﷺ مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَماً عَلَى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ رَفِيْقِيْ فِيْ الْجَنَّةِ. وقال عمر ﷺ: مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ أَحْيَا الإِسْلاَمَ. وقال عثمان ﷺ: من أنفق درهما على قراءة مَوْلِدَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَأَنَّماَ شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ أَوْ حُنَيْنٍ. وقال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ سَبَباً فِيْ قِرَاءَتِهِ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ بِالإِيْمَانِ ويدخل الجنة بغير حساب. وقال الحسن البصري رضي الله عنه وددت لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا فأنفقته على قراءة مولد النبي ﷺ.... وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من جمع لمولد النبي ﷺ إخواناً وهيَّأ طعاما وأخلى مكانا وعمل إحسانا وصار سببا لقراءته بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم....

"প্রথম পরিচ্ছেদ মীলাদুন্নবী (ﷺ)-এর মর্যাদা বর্ণনায়। আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী পাঠের জন্য এক দিরহাম ব্যয় করবে সে জান্নাতে আমার সাথী হবে। উমার (রা) বলেন: যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবীর তা'যীম করবে সে ইসলামকে জীবিত করবে। উসমান (রা) বলেন: যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী পাঠের জন্য এক দিরহাম ব্যয় করবে সে যেন বদর বা হুনাইনের যুদ্ধে যোগদান করলো। আলী (রা) বলেন: "যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবীর তা'যীম করবে এবং মীলাদুন্নবী পাঠের কারণ হবে, সে দুনিয়া হতে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাসান বসরী (রাহ) বলেন: আমার কামনা হয় যে, যদি আমার উহদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকত তবে আমি তা মীলাদুন্নবী পড়ার জন্য ব্যয় করতাম। ... ইমাম শাফিয়ী (রাহ) বলেন: যদি কেউ মীলাদুন্নবীর জন্য

বন্ধুদেরকে জমায়েত করে, খাবার প্রস্তুত করে, স্থান খালি করে দেয়, দান-খয়রাত করে এবং তার কারণে মীলাদুন্নবী পড়া হয় তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহগণের সাথে উত্থিত করবেন এবং সে জান্নাতে থাকবে ।..."

এভাবে আরো অনেক তাবিয়ী, তাবি তাবিয়ী ও পরবর্তী বুজুর্গগণের নামে মীলাদুন্নবী 'পড়া'-র ফযীলতে অনেক বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এখানে দুটি বিষয় আলোচনা করব: (১) বইটি ইবন হাজার হাইসামীর নামে একটি জাল বই এবং (২) এ সকল হাদীস ও বক্তব্য সবই নির্লজ্জ জালিয়াতদের বানানো মিথ্যা কথা। নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

(ক) আল্লামা ইবনু হাজার হাইতামীর পুরো নাম: আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাজার শিহাবুদ্দীন মাক্কী শাফিয়ী। তিনি মীলাদুন্নবী উদযাপন ও মীলাদ পালনের সমর্থক ছিলেন। মীলাদুন্নবী বিষয়ক তাঁর রচিত একটি গ্রন্থের নাম "ইতমামুন নি'মাতিল কুবরা আলাল আলাম বিমাওলিদি সাইয়িদি ওয়লাদি আদাম", সংক্ষেপে: 'আন-নি'মাতুল কুবরা'। গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। বিগত ৪০০ বৎসরে অনেক আলিম এ গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন এবং গ্রন্থটির অনেক পাণ্ডুলিপি বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিদ্যমান।

এখানে আরব বিশ্বের কয়েকটি গ্রন্থাগার ও পাণ্ডুলিপি নম্বর উল্লেখ করছি। ইরাকের সুলাইমানিয়া প্রদেশের ওয়াকফ গ্রন্থাগার (মাকতাবাতুল আওকাফ), নং ১৩/৪৫৬-আইন এবং পাণ্ডুলিপি নং তা/মাজামী/২১৫-২১৮। সৌদি আরবের রিয়াদস্থ বাদশাহ ফয়সল গবেষণা কেন্দ্র, পাণ্ডুলিপি নং- ০২৬৩৩, ১৫২২-ফা-কাফ এবং পাণ্ডুলিপি বিষয়ক অধিদপ্তর, পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগার, নং ১৫৮৫, ৭০৩০, ১৪৪৬। মরক্কোর খাযানাতু তাতওয়ান গ্রন্থাগারে, পাণ্ডুলিপি নং ১৩/৪৫৬-আইন। ইয়ামানের সানআ শহরের বড় মসজিদের প্রাচীন গ্রন্থাগার: মাকতাবাতুল জামিয়িল কাবীর, পাণ্ডুলিপি নং ২২-মীম-জীম। সিরিয়ার দামেশক শহরের যাহিরিয়া গ্রন্থাগার, পাণ্ডুলিপি নং ৮৭২২, ৮১৬৪, ১১৩০১, ১১৩৪১, ৮৫৭১, ১১৩৬১, ৯৪৮৩, ৯৫৫৩। এ সকল পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে এ বইটি ইদানিং বৈরুত থেকে ছাপা হয়েছে।

(২) তুরস্কের মাকতাবাতুল হাকীকাহ প্রকাশিত 'আন-নি'মাতুল কুবরা' গ্রন্থটির সাথে এ সকল পাণ্ডুলিপির কোনোরূপ মিল নেই। বস্তুত বইটির কভারের নাম ও লেখকের নাম ছাড়া ভিতরের সবই জাল।

(৩) 'আন-নি'মাতুল কুবরা'-র মূল পাণ্ডুলিপিগুলোর বক্তব্য নিম্নরূপ:

أحمد الله أتم الحمد كله وأشكره أفضل الشكر وأشمله ... أكتب ورقات في بيان أصل عمل المولد النبوي... دعاني إلى ذلك اختلاف الناس في أصل عمل المولد وهل هو بدعة أو لا وإكثار القصاص والوعاظ في ذكر أخبار موضوعة وحكايات وأشعار مصنوعة غير مستحيين من الله ورسوله في الكذب عليهما عمدا تارة وجهلا أخرى، ومن ثم قال الأئمة يجب على كل عارف الإنكار عليهم باليد فاللسان فالقلب.... الفصل الأول في أصل عمل المولد. إعلم أنه بدعة لأنه لم ينقل عن أحد من السلف في القرون الثلاثة التي شهد النبي ﷺ بخيريتها؛ لكنها بدعة حسنة لما اشتملت عليه من الإحسان الكبير للفقراء ومن قراءة القرآن وإكثار الذكر والصلاة على النبي ﷺ..... إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدا أكبر فأهل الإسلام أولى بذلك وأجدر...

"আল্লাহর প্রশংসা করছি সকল পরিপূর্ণ প্রশংসা এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সর্বোত্তম ও পূর্ণতম কৃতজ্ঞতা... মীলাদুন্নবী পালনের মূলভিত্তি বর্ণনা করার জন্য আমি একটি পুস্তিকা লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম....। এটি লিখতে আমি উদ্বুদ্ধ হলাম তার কারণ মীলাদ পালনের মূলভিত্তি বিষয়ে মানুষেরা মতভেদ করেছে যে তা বিদআত কি না। আর গল্পকার বক্তা ও ওয়ায়িজগণ ব্যাপকভাবে জাল হাদীস এবং ভিত্তিহীন গল্প ও কবিতা বলছেন। তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) থেকে একটুও লজ্জাবোধ করেন না- নির্লজ্জভাবে তাঁদের নামে মিথ্যা বলেন- কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে এবং কখনো মুর্খতার কারণে। এজন্যই ইমামগণ বলেছেন: প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব দায়িত্ব হাত দিয়ে, জিহ্বা দিয়ে বা অন্তর দিয়ে এদের প্রতিবাদ করা।... প্রথম পরিচ্ছেদ মীলাদ পালনের মূল ভিত্তি বর্ণনার জন্য। পাঠক জেনে রাখুন যে, মীলাদ পালন বিদআত; কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে তিন যুগের কল্যাণের সাক্ষ্য দিয়েছেন সে তিন যুগের সালফ সালিহীন কোনো ব্যক্তি থেকে এ কর্ম বর্ণিত হয় নি। তবে তা বিদআতে হাসানা বা ভাল বিদআত। কারণ এর মধ্যে অনেক ভাল কাজ অন্তর্ভুক্ত। যেমন দরিদ্রদের ব্যাপক কল্যাণ ও সহযোগিতা করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, বেশি বেশি যিকর ও দরুদ পাঠ.....। ক্রুশের অনুসারী খৃস্টানগণ যদি তাদের নবীর জন্মের রাতকে সবচেয়ে বড় ঈদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে তবে এ কাজে ইসলামের অনুসারীদের অধিকার অধিকতর। .....।"[৫৬৯]

(৪) আমরা দেখছি যে, মূল 'নি'মাতুল কুবরা' গ্রন্থের প্রথমেই ইবন হাজার হাইতামী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের যুগের একজন মানুষও মীলাদুন্নবী পালনের কথা জানতেন না। খৃস্টান সম্প্রদায় ২৫ ডিসেম্বর যীশুখৃস্টের জন্মদিনকে বড়দিন বা 'ঈদে মীলাদুল মাসীহ' হিসেবে পালন করেন। বিশেষত ৫ম হিজরী শতকের শেষে ৪৯১ হি/ ১০৯৭ খৃ থেকে খৃস্টান ক্রুসেডারগণ সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক ও মিসরের বিভিন্ন দেশ দখল করে খৃস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সকল দেশে দখলদার

খৃস্টানগণ মহাসমারোহে বড়দিন বা 'ঈদে মীলাদুল মাসীহ' পালন করতেন। বিষয়টি মুসলিমদেরকে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' পালনের প্রেরণা দেয়। শতবর্ষ পরে ষষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ প্রান্তে এসে মুসলিম সমাজও ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন শুরু করে।

পক্ষান্তরে জাল 'নি'মাতুল কুবরা' বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদের মূল বক্তব্য যে, খুলাফায়ে রাশেদীন সকলেই মীলাদ পালন করতেন এবং মীলাদ পালনকেই দীনের সবচেয়ে বড় বিষয় বলে প্রচার করতেন। চার খলীফা যখন এভাবে মীলাদের মহাগুরুত্ব প্রচার করতেন তখন স্বভাবতই তাঁদের যুগের সকল সাহাবী-তাবিয়ী প্রতিদিনই মহাসমারোহে তা পালন করতেন!!

(৫) আলিমদের উদ্ধৃতিও জাল 'নিমাতুল কুবরা'-র জালিয়াতি প্রমাণ করে। সীরাহ হালাবিয়্যাহর লেখক আলামা হালাবী (১০৪৪ হি), তাফসীর রুহুল বায়ানের লেখক আলামা ইসমাঈল হাক্কী (১১২৭ হি), 'জা'আল হক্ক' গ্রন্থের লেখক মুফতি আহমাদ ইয়ার খান প্রমুখ আলিম মীলাদের পক্ষে ইবন হাজার হাইতামী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি তা বিদআতে হাসানা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মীলাদের পক্ষে সাহাবী-তাবিয়ীগণ থেকে কোনো হাদীস উদ্ধৃত করেছেন বলে কেউই উল্লেখ করেন নি। পাণ্ডুলিপির বর্ণনায় রচিত গ্রন্থগুলোতেও উপরে উদ্ধৃত মূল পাণ্ডুলিপির বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।[৫৭০]

(৬) এভাবে আমরা নিশ্চিত যে, মাকতাবাতুল হাকীকাহ প্রকাশিত এ বইটি ইবন হাজার হাইসামীর নি'মাতুল কুবরার নাম চুরি করে প্রকাশিত একটি জাল বই। তবে লক্ষ্যণীয় যে, এ জাল বইটি যদি জাল না হয়ে ইবন হাজার হাইতামী মাক্কী শাফিয়ীর নিজের লেখা বলে প্রমাণ হতো তাতেও এ গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতা প্রমাণ হতো না। ইবন হাজার মাক্কী শাফিয়ী তো দূরের কথা, স্বয়ং ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস মাক্কী শাফিয়ীও বা অন্য কোনো ইমাম, মুজতাহিদ, পীরানে পীর বা বুজুর্গও যদি এভাবে সনদবিহীন কোনো কথা উদ্ধৃত করেন তবে তা সনদ অনুসন্ধান ও যাচাই না করে কোনো মুসলিম কখনোই গ্রহণ করবেন না। ইমাম শাফিয়ী উদ্ধৃত অনেক হাদীস পরবর্তী শাফিয়ী ফকীহগণ দুর্বল বা জাল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। হানাফী, মালিকী, হাম্বালী, কাদিরী, চিশতী, শাযিলী... সকল মাযহাব ও তরীকার আলিমগণ একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। প্রথম পর্বে আমরা এ সকল বিষয় আলোচনা করেছি।

(৭) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের হাদীসের ভাষা, শব্দ ও পরিভাষা সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে তিনিও বুঝতে পারবেন যে, এগুলো সবই জাল কথা। কোনো ইংরেজি ডকুমেন্ট জাল করতে যেয়ে পানি খাওয়ার ইংরেজি (eating water), অথবা আরবী ডকুমেন্ট জাল করতে যেয়ে "নামায পড়া"-র আরবী "قراءة الصلاة" লিখলে কোনো যাচাই ছাড়াই বুঝা যায় যে, ডকুমেন্টটি জাল এবং জালিয়াত একজন বাঙালী। তেমনি 'মীলাদ পাঠের' আরবী (قراءة المولد/ قراءة الميلاد) শুনলে কুরআন-হাদীসের আরবী বিষয়ে অভিজ্ঞ যে কেউ নিশ্চিত বুঝবেন যে, কথাটি কখনোই সাহাবীদের যুগের কারো কথা নয়; বরং সুনিশ্চিত জাল কথা এবং এ জালিয়াত তুর্কী বা তুর্কী যুগের তুর্কী ভাষা দ্বারা প্রভাবিত কোনো আরব জালিয়াত। ৬০০ হিজরীর দিকে মীলাদ উদযাপন শুরু হলে প্রথম কয়েক শত বৎসর একে (الاحتفال بالمولد) 'মীলাদ উদযাপন, (عمل المولد) মীলাদ পালন ইত্যাদি বলা হতো। বিগত ২/৩ শত বৎসর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যে মীলাদ মাহফিলে মীলাদ বিষয়ক পুস্তিকা পাঠের প্রচলন হয়েছে। এজন্য বিগত ১/২ শত বৎসর যাবৎ মীলাদ অনুষ্ঠানকে অনেক সময় "মীলদুন্নবী পাঠ" বলা হয়। জালিয়াতগণ এ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

**৪৫. আরো কয়েকটি জাল হাদীস**

মীলাদ পালনের পক্ষে জালিয়াতদের বানানো আরো দুটি হাদীস:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث ذات يوم في بيته وقائع ولادته ﷺ إذ جاء النبي ﷺ وقال: حلَّت لكم شفاعتي.

"ইবন আব্বাস বলেন, একদিন তিনি নিজ বাড়িতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের ঘটনাবলি বর্ণনা করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেন এবং বলেন: তোমাদের জন্য আমার শাফাআত পাওনা হলো।" (জালিয়াত লক্ষ্য করে নি যে, ইবন আব্বাসের বয়স ৮ বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়। তিনি কি ৫/৬ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়েদের হাদীস শুনাচ্ছিলেন!)

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مررت مع النبي ﷺ إلى بيت عامر الأنصاري يعلم وقائع ولادته لأبنائه وعشيرته ويقول: هذا اليوم، فقال النبي ﷺ: إن الله فتح عليكم أبواب الرحمة وملائكته يستغفرون لكم.

আবূ দারদা (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমির আনসারীর (রা) বাড়ির পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তাঁর সন্তান ও পরিবারের মানুষদের তাঁর জন্মের ঘটনাবলি শেখাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন: আজই সেই দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য রহমতের দরজাগুলো খুলে দিয়েছেন এবং ফিরিশতাগণ তোমাদের জন্য ক্ষমা চাচ্ছে।"

বর্তমানে মীলাদের পক্ষের কোনো কোনো আলিম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি), আব্দুল হক্ক ইলাহাবাদী ও অন্যান্য আলিমের নামে এ সকল হাদীস উদ্ধৃত করছেন। এগুলোর কোনোরূপ সনদ কেউ উল্লেখ করেন নি। এমনকি ইসলামের প্রথম ৫০০ বৎসরে সংকলিত কোনো গ্রন্থে এগুলো সনদসহ বা সনদ ছাড়া সংকলিত হয়েছে বলেও কেউ প্রমাণ বা দাবি করেন নি।

**৪৬. ৬০০ বছর যাবৎ সকল ইমাম ও বুজুর্গই কি মীলাদ বিরোধী?**

সম্মানিত পাঠক, ইহূদী-খৃস্টানগণ তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি কিতাবের নামে জালিয়াতি করে তাদের ধর্মকেই বিকৃত করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলিম উম্মাহও ইহূদী-খৃস্টানদের হুবহু অনুকরণ করে বিভ্রান্তির গভীরে নিমজ্জিত হবে বলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মাতকে বারবার সাবধান করেছেন।[৫৭১] আমরা দেখি যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে হাদীসের নামে জালিয়াতির প্রবণতা ইহূদী-খৃস্টানদের মতই ব্যাপকতা লাভ করে। তবে মহান আল্লাহ দীন ইসলামকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছেন। সাহাবীদের যুগ থেকে উম্মাতকে সনদ সংরক্ষণ ও সনদ-যাচাইয়ের তাওফীক দিয়ে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করার পথটি রক্ষা করেছেন। ইহূদী-খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের মৌলিক পার্থক্য এখানেই। অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলোতে সনদ সংরক্ষণ ও বিচারের ব্যবস্থা না থাকায় সহীহ ও জাল এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, পার্থক্য করার কোনো যুক্তিসম্মত পদ্ধতি নেই, ফলে প্রত্যেকে নিজ নিজ যুক্তি-বুদ্ধি ও পছন্দ অনুসারে কিছু সহীহ ও কিছু জাল বলে দাবি করেন। আর ইসলামের মধ্যে জালিয়াতগণ অনেক জালিয়াতি করলেও যাচাই করার পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু যদি কেউ জালিয়াতি করতে চান বা জাল কথা গ্রহণ করতে চান তবে তার কথা ভিন্ন।

সম্মানিত পাঠক, ন্যূনতম পর্যায়ের সাধারণ জ্ঞানের যে কোনো মুসলিম বুঝতে পারেন যে, এ কথাগুলো জাল। কারণ এগুলোর কোনো সনদ নেই। ইসলামের প্রথম ৬/৭ শত বছরের মধ্যে লিখিত কোনো গ্রন্থে সনদ-বিহীনভাবেও এ মিথ্যা কথাগুলো উল্লেখ করা হয় নি। তবে এ সকল হাদীসকে সহীহ বলে গ্রহণ করা আরো ভয়ঙ্কর বিষয়। নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

**(ক)** মীলাদের সমর্থকগণ নিশ্চিত করেছেন যে, প্রথম তিন প্রজন্মের কেউ মীলাদ উদযাপন করেন নি। পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ গবেষক প্রফেসর ড. তাহির কাদিরী রচিত 'মীলাদুন্নবী' গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, তিনি নিজেও নিশ্চিত করেছেন যে, বাদশাহ কুকবূরী (মৃত্যু ৬৩০ হি) প্রথম মীলাদ উদযাপন শুরু করেন। এছাড়া তিনি মীলাদের সমর্থনে গত ৮০০ বৎসরের অনেক প্রসিদ্ধ আলিমের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন, প্রথম তিন প্রজন্মের কেউ মীলাদ পালন করেন নি।[৫৭২] এখন উপরের জাল হাদীসগুলোকে সহীহ বলে দাবি করার অর্থ সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী তিন প্রজন্মের সকলকে বিভ্রান্ত বলে দাবি করা (নাউযূ বিল্লাহ)। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের এতগুলো বক্তব্য জানার পরেও যারা মীলাদ পালন করেন নি তাদের চেয়ে হতভাগা-বদকার ও রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর মর্যাদার শত্রু আর কে হতে পারে!! (নাউযু বিল্লাহ)

**(খ)** এ সকল হাদীসকে সহীহ বলে মানতে হলে হাজার বৎসরের সকল হাদীস সংকলক মুহাদ্দিসকে নবীজী (ﷺ)-এর দুশমন (!!) বলে গণ্য করতেই হবে। কারণ, ইবন আব্বাস (রা), আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত মীলাদের মর্যাদা বিষয়ক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস এবং আবূ বকর (রা), উমার (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা) থেকে বর্ণিত মীলাদের হাদীসগুলো তাঁরা গোপন করেছেন। এ সকল সাহাবী (রা) থেকে সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদে বর্ণিত অতি সাধারণ বিষয়ে অগণিত হাদীস তাঁরা সংকলন করলেন, অথচ এত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগুলো তাঁরা কেউ কোনোভাবে সংকলন করলেন না!!

ইসলামের প্রথম হাজার বৎসরে সংকলিত হাদীসগ্রন্থগুলোতে হাঁটাচলা, পানাহার, মলমূত্র ইত্যাদি বিষয়ে অগণিত অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদ বিদ্যমান। কিন্তু 'কিরাআতুল মাওলিদ' (মীলাদ পাঠ), 'আমালুল মাওলিদ' (মীলাদ পালন), 'ইহতিফালুল মাওলিদ' (মীলাদ উদযাপন) ইত্যাদি নামে এ সকল হাদীসের গ্রন্থে একটি অধ্যায় তো দূরের কথা, একটি পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদও তারা লিখেন নি এবং একটি হাদীসও তাঁরা সংকলন করেন নি।

**(খ)** ইমাম আবূ হানীফাসহ চার ইমাম ও ইসলামের প্রথম ৬০০ বৎসরের সকল ফকীহ একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা ও মীলাদের দুশমন বলে গণ্য হবেন। কারণ, তাঁরা তাঁদের ফিকহী গ্রন্থগুলোতে অতি সামান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের কারো গ্রন্থে 'কিরাআতুল মাওলিদ' (মীলাদ পাঠ), 'আমালুল মাওলিদ' (মীলাদ পালন), 'তাযীমুল মাওলিদ' (মীলাদের তাযীম) ইত্যাদি নামে কোনো একটি অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ বা মাসআলা তাঁরা লিখলেন না। এর গুরুত্বও বললেন না!

**(গ)** উম্মাতের প্রথম ৬০০ বৎসরের সকল আলিমই মীলাদ-বিরোধী ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদার দুশমন (!!!) বলে গণ্য হবেন। কারণ, ৬০৪ হিজরী সালে মীলাদুন্নবী পালনের উদ্ভব হওয়ার পর থেকে বিগত ৮০০ বৎসরে উম্মাতের আলিম ও বুজুর্গগণ মীলাদুন্নবী বিষয়ে হাজার হাজার পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন। কিন্তু এর আগের ৬০০ বৎসরে একজন আলিম বা বুজুর্গ মীলাদুন্নবী বিষয়ে একটি পুস্তিকাও রচনা করেন নি। মীলাদের সমর্থক আলিমগণও বারবার উল্লেখ করেছেন যে, মীলাদ বিষয়ক প্রথম বই রচনা করেন আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনু দেহিয়া (৬৩৩ হি.)। তাঁর রচিত এ বইয়ের নাম: "আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাযীর"।[৫৭৩] পূর্ববর্তী ৬০০ বৎসরের ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, পীরানে পীর, বুজুর্গ কেউ মীলাদ বিষয়ে একটি পুস্তিকাও লিখেন নি। তাঁরা অনেক বই লিখেছেন, কিন্তু তাঁদের লেখা বইয়ের মধ্যে 'কিরাআতুল মাওলিদ' (মীলাদ পাঠ) বা 'আমালুল মাওলিদ' (মীলাদ পালন) বিষয়ে একটি ছোট্ট অনুচ্ছেদ বা বাক্যও লিখেন নি!

আমরা যখন বলি যে, ইসলামের প্রথম ৬০০ বৎসর মীলাদ পালন ছিল না, পরে উদ্ভব হয়েছে তখন বিষয়টি খুবই সহজ হয়ে যায়।

যেহেতু তাঁদের সময়ে কেউ মীলাদ পালন করার বিষয়টি জানতই না সেহেতু তাঁরা এ বিষয়ে কিছু লিখেন নি। কিন্তু যখন প্রমাণ হয় যে, হাদীসে নববী এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যে মীলাদের গুরুত্ব বিদ্যমান তখন বিষয়টি ভিন্ন হয়ে যায়। হাদীসে মীলাদের এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মীলাদের বিষয়ে একটি লাইন লিখলেন না! জীবনে মীলাদ পালন করলেন না! তাঁরা কেমন মুসলমান???

বিষয়টি কী প্রমাণ করে? স্বভাবতই প্রমাণ করে যে, উম্মাতের প্রথম ৬০০ বৎসরে মুসলিমগণ 'কিরাআতুল মাওলিদ' (মীলাদ পাঠ), 'আমালুল মাওলিদ' (মীলাদ পালন) ইত্যাদি কিছুই জানতেন না। কিন্তু যদি কেউ উপরের হাদীসগুলোকে সহীহ বলে দাবি করেন তবে তাকে মানতেই হবে যে, উম্মাতের প্রথম ৬০০ বৎসরের সকল ইমাম, মুজাদ্দিদ, পীরানে পীর, বুজুর্গ সকলেই মীলাদ বিরোধী ছিলেন। শুধু তাই নয়, উপরন্তু তাঁরা মীলাদ বিষয়ক হাদীস গোপনের মত মহাপাপ করেছেন।

**(ঘ)** ইমাম শাফিয়ীর প্রতিটি বক্তব্য সংকলন ও আলোচনা করেছেন বাইহাকী, নাবাবী ও অন্যান্য শাফিয়ী মুহাদ্দিস-ফকীহ। ইবন হাজার হাইতামী শাফিয়ীর নামে জালকৃত এ বইয়ে মীলাদের গুরুত্ব বিষয়ে তাঁর এ মহান বক্তব্যটি তাঁরা সকলেই গায়েব করে দিয়েছেন! শাফিয়ী মাযহাবের কোনো গ্রন্থে এ বক্তব্য নেই। এমনকি ইবন হাজার হাইতামীর লেখা শাফিয়ী মাযহাবের বড়বড় ফিকহী গ্রন্থেও তিনি মীলাদ বিষয়ে ইমাম শাফিয়ীর এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেন নি। আমাদের মানতে হবে যে, এ বক্তব্য জাল অথবা নাবাবী, বাইহাকী, গাযালী, সুয়ূতী, ইবন হাজার আসকালানী, ইবন হাজার হাইতামী ও সকল শাফিয়ী ফকীহ তাঁদের ঈমানী ত্রুটির কারণে মীলাদের প্রসঙ্গ গোপন করেছেন!!

**৪৭. ৮০০ বছরের সকল মীলাদ-পন্থীই কি সত্যগোপনকারী?**

সম্মানিত পাঠক, এখানে আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ৮০০ বৎসর যাবৎ অগণিত আলিম মীলাদের পক্ষে বইপত্র লিখেছেন। তাঁরা সকলেই মীলাদকে বিদআতে হাসানা বলেছেন এবং ইসলামের প্রথম তিন যুগে কেউ মীলাদ পালন করেন নি বলে বারবার নিশ্চিত করেছেন। উপরের জাল হাদীসগুলোকে সহীহ মানতে হলে আমাদের মানতে হবে যে, তাঁরা সকলেই সত্য গোপন করেছেন এবং মীলাদের অবমর্যাদা করেছেন। তাঁরা আবূ লাহাবের আমল দিয়ে মীলাদ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুস্পষ্ট হাদীসগুলো গোপন করেছেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ইতিহাস, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ে সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করে পানাহার, শয়ন-নিদ্রা, মলমূত্র এবং অন্যান্য অতি সাধারণ বিষয়ের হাদীসগুলো তারা সংগ্রহ, সংকলন ও যাচাই-বাছাই করলেন, অথচ মীলাদের গুরুত্ব বিষয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগুলো তারা সংকলন বা মূল্যায়ন কিছুই করলেন না!!

সম্মানিত পাঠক, খৃস্টান প্রচারকণ বাংলাদেশের মুসলিমদের নানাবিধ প্রতারণার মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করছেন। জালিয়াতিতে ভরা 'কিতাবুল মোকাদ্দস', ইঞ্জিল শরীফ ইত্যাদিকে 'আল্লাহর কালাম' হিসেবে পেশ করে তারা মুসলিমদের প্রতারণা করছেন। আমরা যখন ময়দানে তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জালিয়াতি প্রমাণ করতে যাই তখন তারা বিভিন্ন অযুহাতে পালিয়ে যান বা এড়িয়ে যান। কিন্তু ময়দান ফাঁকা হলেই তারা সরল মুসলিমদের বলেন, কুরআনেই তো আছে তাওরাত-ইঞ্জিল আল্লাহর কালাম, সেগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে। আর আমাদের হাতের এগুলোই আদি-অকৃত্রিম তাওরাত-ইঞ্জিল। কাজেই এগুলো বিশ্বাস না করলে মুসলমান থাকা যাবে না!!

জাল হাদীসের বিষয়টিও একইরূপ। বিগত দেড় হাজার বছর যাবৎ যত জাল হাদীস ও জাল পুস্তক প্রকাশ পেয়েছে, উম্মাতের আলিমগণ সেগুলোর জালিয়াতি উন্মোচন করেছেন। কিন্তু যারা যে কোনোভাবে নিজের মত প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর তারা জালিয়াতির এ সকল প্রমাণ খণ্ডনের চেষ্টা না করে এবং হাদীসগুলোর সনদ অনুসন্ধান না করেই সাধারণ মুসলিমদের সামনে এগুলোকে হাদীস হিসেবে পেশ করে নিজেদের মত প্রমাণের চেষ্টা করছেন। জাল 'নি'মাতুল কুবরা' গ্রন্থের ও মীলাদ বিষয়ক অন্যান্য জাল হাদীসের একই অবস্থা।

জালিয়াতি ও বিকৃতির অগণিত অকাট্য প্রমাণ জানার পরেও ইহূদী-খৃস্টানগণ বিভিন্ন অজুহাতে তাদের জাল ধর্মগ্রন্থগুলো প্রচার করে চলেছেন। মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও কিছু মানুষ এরূপই করছেন। তুরস্কের মাকতাবাতুল হাকীকাহ প্রকাশিত এ জাল বইটির জালিয়াতি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এবং এতে উল্লেখিত হাদীসগুলো সনদবিহীন ও ভিত্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও মীলাদ সমর্থক কিছু আলিম এ বইটির অনুবাদ ও প্রচার করছেন। হাদীসগুলোর সনদ অনুসন্ধানের কোনোরূপ চেষ্টাও করছেন না। ইহূদী-খৃস্টান ধর্মে জাল কথাগুলো সহীহ কথার সাথে মিশে গিয়েছে। তবে সনদ ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য যাচাইয়ের পথ খোলা রেখেছেন। হাজার বছর চলে গেলেও এবং হাজার হাজার প্রসিদ্ধ ইমাম আলিমের নামে জালিয়াতি করলেও কোনো জাল কথাই ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। সত্যানুসন্ধানীর জন্য নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ যাচাইয়ের পথ উন্মুক্ত।

রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নামে বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের নামে মীলাদের পক্ষে এতগুলো হাদীস দেখে মুমিনের জন্য আনন্দিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে তাঁর ঈমানের দাবি যে, তিনি প্রথমেই এগুলোর সনদ ও সূত্র উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন। নয়শত বা হাজার বছর পরে একজন আলিম একটি হাদীস বলছেন, তাহলে নিশ্চয় পুরাতন কোনো গ্রন্থে তা রয়েছে। মীলাদের পক্ষের বা বিপক্ষের প্রত্যেক আলিমের দায়িত্ব এগুলোর সনদ অনুসন্ধান ও যাচাই। যদি সনদ পাওয়া যায় ও গ্রহণযোগ্য হয় তবে সেগুলো মেনে নেওয়া প্রত্যেক মুমিনের ঈমানের দাবি। আর যদি সনদ না পাওয়া যায় বা সনদ জাল বলে প্রমাণ হয় তবে এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব। ইবন হাজার হাইতামী এবং অন্যান্য ইমাম ও মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসের সনদ না জেনে বা অন্তত হাদীসের কোন গ্রন্থে তা সংকলিত তা নিশ্চিত না হয়ে সনদ-বিহীন হাদীস উল্লেখ করা ভয়ঙ্কর হারাম কর্ম এবং কোনো খতীব, ওয়ায়িজ বা লেখক এরূপ করলে তাকে রাষ্ট্রীয়

ভাবে শাস্তি দেওয়া জরুরী ।[৫৭৪]

সম্মানিত পাঠক, মীলাদ ও অন্য যে কোনো বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে ভিন্ন মত পোষণ করা, ইজতিহাদ করা ও প্রমাণ পেশ করার অধিকার সকলেরই রয়েছে । কিন্তু তাই বলে জালিয়াতি!! মহান আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন ।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ:
## বেলায়াত, আওলিয়া ও ইলম বিষয়ক

আল্লাহর ওলীগণের পরিচয়, কর্ম ও মর্যাদার বিষয়ে কুরআন-হাদীসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে । **এহইয়াউস সুনান** ও **রাহে বেলায়াত** পুস্তকদ্বয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । এ বিষয়ে অনেক মিথ্যা কথা মুসলিম সমাজে প্রচার করেছে জালিয়াতগণ । অনেক সরলপ্রাণ নেককার বুযুর্গ সরল মনে এগুলো বিশ্বাস করেছেন । এখানে এ বিষয়ক কিছু কথা উল্লেখ করছি ।

**১. ওলীদের কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা সত্য**

প্রচলিত একটি গ্রন্থে লেখা হয়েছে: "আল্লাহ তায়ালার বন্ধুদের শানে কোরান শরীফ ও হাদীস শরীফের কয়েকটি বাণী:.... কারামাতুল আউলিয়া হাক্কুন- আল-হাদীস । অর্থ আউলিয়া-এর অলৌকিক ক্ষমতা সত্য ।"[৫৭৫]

এখানে এ বাক্যটি 'আল-হাদীস' বলে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী বলে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে জালিয়াতি করা হয়েছে । এছাড়াও বাক্যটির বিকৃত ও ভুল অনুবাদ করা হয়েছে । এখানে আমরা দুটি বিষয় আলোচনা করব: (১) এ বাক্যটির উৎস ও (২) এ বাক্যটির অর্থ ।

**প্রথমত: বাক্যটির উৎস**

كَرَامَاتُ الأَوْلِيَاءِ حَقٌّ

"ওলীগণের কারামত সত্য" এ বাক্যটি আলিমগণের কথা । এটি কোনো হাদীস নয় । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনোই এ কথা বলেন নি বা তাঁর থেকে কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে তা বর্ণিত হয় নি । উপরন্তু 'কারামত' শব্দটিই কুরআন বা হাদীসের শব্দ নয় । নবী ও ওলীগণের অলৌকিক কর্মকে কুরআন ও হাদীসে 'আয়াত' বা চিহ্ন বলা হয়েছে । দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী থেকে নবী-রাসূলগণের 'আয়াত'কে 'মুজিযা' এবং ওলীগণের 'আয়াত'কে 'কারামাত' বলা শুরু হয় ।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মু'তাযিলা ও অন্যান্য কিছু সম্প্রদায়ের মানুষেরা ওলীগণের দ্বারা অলৌকিক কর্ম সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করেন । তাদের এ মতটি কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী । কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস প্রমাণ করে যে, নবীগণ ছাড়াও আল্লাহ নেককার মানুষদেরকে কখনো কখনো অলৌকিক চিহ্ন বা 'আয়াত' প্রদান করেন । এজন্য সুন্নাত-পন্থী আলিমগণ বলেন: "কারামাতুল আউলিয়া হাক্ক ।"

**দ্বিতীয়ত: বাক্যটির অর্থ**

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী নয়; বরং আলিমগণের বক্তব্য । কাজেই বাক্যটিকে 'হাদীস' বলে জালিয়াতি করা হয়েছে । এছাড়া উপরের উদ্ধৃতিতে বাক্যটির ভুল অনুবাদ করা হয়েছে । ফলে অনুবাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জালিয়াতি ঘটেছে ।

**ক. 'কারামত' বনাম 'অলৌকিক ক্ষমতা'**

এ বাক্যে তিনটি শব্দ রয়েছে: কারামত, আউলিয়া, হক্ক । উপরের উদ্ধৃতিতে প্রথম শব্দ 'কারামত'-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অলৌকিক ক্ষমতা' । এ অনুবাদটি শুধু ভুলই নয়, বরং ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক । কারামত অর্থ অলৌকিক কর্ম বা চিহ্ন, অলৌকিক ক্ষমতা নয় । আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনোরূপ 'অলৌকিক ক্ষমতা' আছে বলে বিশ্বাস করা শির্‌ক ।

'কারামত' শব্দটির মূল অর্থ 'সম্মাননা' । ইসলামী পরিভাষায় 'কারামত' অর্থ 'নবী-রাসূলগণ ব্যতীত অন্যান্য নেককার মানুষের দ্বারা সংঘটিত অলৌকিক কর্ম ।' 'অলৌকিক চিহ্ন'কে 'অলৌকিক ক্ষমতা' মনে করা শির্‌কের অন্যতম কারণ । খৃস্টানগণ দাবি করেন, 'মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা ঈশ্বর ছাড়া কারো নেই, যীশু মৃতকে জীবিত করেছেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, যীশু ঈশ্বর বা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল ।

কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, কোনো অলৌকিক কর্ম বা চিহ্ন কোনো নবী-রাসূল বা কেউ নিজের ইচ্ছায় ঘটাতে বা দেখাতে পারেন না; শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটতে পারে । কোনো ওলী বা নেককার ব্যক্তি কর্তৃক কোনো অলৌকিক কর্ম সংঘটিত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, এ কর্মটি সম্পাদন করা সে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন বা তার নিজের ক্ষমতা । এর অর্থ হলো একটি বিশেষ ঘটনায় আল্লাহ তাকে সম্মান করে একটি অলৌকিক চিহ্ন প্রদান করেছেন । অন্য কোনো সময়ে তা নাও দিতে পারেন ।

একটি উদাহরণ দেখুন । নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত, ২৩ হিজরীর প্রথম দিকে উমার (রা) মসজিদে নাবাবীতে জুমুআর খুতবা প্রদান কালে উচ্চস্বরে বলে উঠেন: (يا سارية، الجبلَ) "হে সারিয়া, পাহাড় ।" সে সময়ে মুসলিম সেনাপতি সারিয়া ইবনু যুনাইম পারস্যের এক

যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার উপক্রম করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি উমারের এ বাক্যটি শুনতে পান এবং পাহাড়ের আশ্রয়ে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন।[৫৭৬]

এ ঘটনায় আমরা উমার (রা)-এর একটি মহান কারামত দেখতে পাই। তিনি হাজার মাইল দূরের যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা 'অবলোকন' করেছেন, মুখে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং সে নির্দেশনা সারিয়া শুনতে পেয়েছেন।

এ কারামতের অর্থ হলো, মহান আল্লাহ তাঁর এ মহান ওলীকে এ দিনের এ মুহূর্তে এ বিশেষ 'সম্মাননা' প্রদান করেন, তিনি দূরের দৃশ্যটি হৃদয়ে অনুভব করেন, নির্দেশনা দেন এবং তাঁর নির্দেশনা আল্লাহ সারিয়ার কাছে পৌঁছে দেন। এর অর্থ এ নয় যে, উমার (রা)-এর হাজার মাইল দূরের সব কিছু অবলোকন করার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, অথবা তিনি ইচছা করলেই এভাবে দূরের কিছু দেখতে পেতেন বা নিজের কথা দূরে প্রেরণ করতে পারতেন।

এ বছরেরই শেষে ২৩ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসের ২৭ তারিখে ফজরের সালাত আদায়ের জন্য যখন উমার (রা) তাকবীরে তাহরীমা বলেন, তখন তাঁরই পিছেন চাদর গায়ে মুসল্লীরূপে দাঁড়ানো আল্লাহর শত্রু আবূ লু'লু লুকানো ছুরি দিয়ে তাঁকে বারংবার আঘাত করে। তিনি অচেতন হয়ে পড়ে যান। চেতনা ফিরে পেলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে কে আঘাত করল? তাঁকে বলা হয়, আবূ ল'লু। তিনি বলেন, আল-হামদু লিল্লাহ, আমাকে কোনো মুসলিমের হাতে শহীদ হতে হলো না। এর কয়েকদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫৭৭]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মহান আল্লাহ প্রথম ঘটনায় হাজার মাইল দূরের অবস্থা উমারকে দেখিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনায় পাশে দাঁড়ানো শত্রুর বিষয়ে তাঁকে জানতে দেন নি। কারণ 'কারামত' কখনোই ক্ষমতা নয়, কারমাত আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সম্মাননা মাত্র।

**খ. ওলী ও আউলিয়া**

ওলী ও বেলায়াতের অর্থ, পরিচয় ও বেলায়াত অর্জনের সুন্নাত পদ্ধতি জানতে পাঠককে আমরা লেখা **'রাহে বেলায়াত'** বইটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি। মূলত 'বেলায়াত' (الولاية) শব্দের অর্থ বন্ধুত্ব, নৈকট্য, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি। "বেলায়েত" অর্জনকারীকে "ওলী" (الولي), অর্থাৎ বন্ধু, নিকটবর্তী বা অভিভাবক বলা হয়। ওলীদের পরিচয় প্রদান করে মহান আল্লাহ বলেন:

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

"জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবেন না- যারা ঈমান এনেছেন এবং তাকওয়া অবলম্বন করেন।"[৫৭৮]

"ঈমান" অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাস- যে বিশ্বাস শিরক, কুফর ও বিদআত থেকে মুক্ত। "তাকওয়া" শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। ফরয-ওয়াজিব পালন ও হারাম-পাপ বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষার নাম-ই তাকওয়া। এ আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানছি যে, দুটি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া। এ দু'টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওলীর বা বেলায়াতের পথের কর্মকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন: ফরয ও নফল। সকল ফরয পালনের পরে অনবরত বেশি বেশি নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্যের পথে বেশি বেশি অগ্রসর হতে থাকে।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী। ঈমান ও তাকওয়া যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি তত বেশি ওলী। ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১হি) ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ, আবু ইউসূফ (রাহ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বর্ণনা করে বলেন:

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ، وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ

"সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর কাছে কারামত-প্রাপ্ত (ততবেশি ওলী বা ততবেশি সম্মানিত)।[৫৭৯]

তাহলে ওলী ও বেলায়েতের মানদণ্ড হচ্ছে: ঈমান ও তাকওয়া: সকল ফরয কাজ আদায় এবং বেশি বেশি নফল ইবাদত করা। যদি কোনো মুসলিম পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসারে সঠিক ঈমান সংরক্ষণ করেন, সকল প্রকারের হারাম ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করেন, তাঁর উপর ফরয যাবতীয় দায়িত্ব তিনি আদায় করেন এবং সর্বশেষে যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল ইবাদত আদায় করেন তিনিই আল্লাহর ওলী বা প্রিয় মানুষ। এ সকল বিষয়ে যিনি যতুটুকু অগ্রসর হবেন তিনি ততটুকু আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াত অর্জন করবেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, 'বেলায়াত' কোনো পদ-পদবী নয় এবং ইসলামের 'ওলী' বলে কোনো বিশেষ পদ বা পর্যায় নেই। প্রত্যেক মুমিনই ওলী। যে যত বেশি ঈমান ও তাকওয়া অর্জন করবেন তিনি তত বেশি ওলী।

**গ. হক্ক**

'কারমাতুল আউলিয়া হক্ক' বা 'ওলীগণের অলৌকিক কর্ম সত্য' অর্থ ওলীগণ থেকে অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। যদি কোনো বাহ্যত মুমিন মুত্তাকী মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশ পায় বা এরূপ ঈমানদার-মুত্তাকী মানুষ থেকে অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয়েছে বলে সহীহ সনদে জানা যায় তবে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মাননা বলে বুঝতে হবে। তা অস্বীকার করা বা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেয়া মু'তাযিলীদের আকীদা।

'ওলীদের কারামত সত্য' বলতে দু প্রকারে ভুল অর্থ করা হয়:

(১) কেউ মনে করেন, ওলীদের নামে যা কিছু কারামত বা অলৌকিক কথা বলা হবে সবই সত্য মনে করতে হবে। কথাটি জঘন্য ভুল। আমরা দেখেছি, যাচাই ছাড়া কোনো সংবাদ গ্রহণ করতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। কথিত, লিখিত বা বর্ণিত কথাগুলি যাচাই ছাড়া গ্রহণ ও বর্ণনা করা হাদীসে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং এরূপ ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলে গণ্য করা হয়েছে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে যা কিছু কথিত বা বর্ণিত হয় তা যাচাই ছাড়া বিশ্বাস বা গ্রহণ করা যেমন হারাম, তেমনি ওলীগণের নামে কথিত, লিখিত বা বর্ণিত কোনো তথ্য সনদ যাচাই ছাড়া গ্রহণ, বর্ণনা বা বিশ্বাস করাও হারাম। প্রকৃত সত্য যে, জাল হাদীসের মত অগণিত 'জাল' কারামত ওলীদের নামে সমাজে ছড়ানো হয়েছে।

(২) কেউ মনে করেন যে, 'ওলীগণের কারামত সত্য' অর্থ ওলীগণের কারামত থাকতেই হবে বা কারামতই ওলীগণের আলামত বা চিহ্ন। এ ধারণাটি কঠিন ভুল। ঈমান ও তাকওয়া ছাড়া ওলীর আর কোনো পরিচয় নেই। ঈমান ও আমালের বাহ্যিক প্রকাশ ছাড়া 'ওলী'-র পরিচয়ের জন্য কেনো চিহ্ন, মার্কা বা সার্টিফিকেট নেই। কোনো 'কারামত' কখনোই বেলায়াতের মাপকাঠি নয়। আল্লাহর প্রিয়তম ওলীর কোনো প্রকার কারামত নাও থাকতে পারে। আমরা জানি আল্লাহর প্রিয়তম ওলী সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশেরই কোনো কারামত বর্ণিত হয় নি। আবার পাপী বা কাফির মুশরিক থেকেও অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হতে পারে। সর্বোপরি কারামতের অধিকারী ওলীও কোনো বিশেষ পদমর্যাদার ব্যক্তি নন বা পদস্খলন থেকে সংরক্ষিত নন। কর্মে ত্রুটি হলে তিনি শাস্তিভোগ করবেন। কুরআন উল্লেখ করেছে যে, কারামতের অধিকারী ওলীও গোমরাহ ও বিভ্রান্ত হয়েছেন।[৫৮০]

**২. ওলীগণ মরেন না**

আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি বাক্য:

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ يَمُوْتُوْنَ، بَلْ يَنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ

প্রচলিত একটি পুস্তকে এ বাক্যটির অনুবাদ লেখা হয়েছে: "নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন মৃত্যু নেই বরং তাঁরা স্থানান্তরিত হয় ধ্বংসশীল ইহ জগৎ হতে স্থায়ী পরজগতে"-আল হাদীস।[৫৮১]

এখানে উল্লেখ্য যে, আব্দুল কাদির জীলানীর (রাহ) নামে প্রচলিত 'সিররুল আসরার' পুস্তকে এ হাদীসটি অন্যভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

اَلْمُؤْمِنُوْنَ لاَ يَمُوْتُوْنَ، بَلْ يَنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ

"মুমিনগণের কোন মৃত্যু নেই বরং তাঁরা স্থানান্তরিত হয় ধ্বংসশীল ইহজগৎ হতে স্থায়ী পরজগতে।"

দুটি কথাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে জঘন্য মিথ্যা, বানোয়াট ও জাল কথা। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট সনদেও তা বর্ণিত হয় নি।

আমরা জানি যে, মুমিন-কাফির প্রতিটি মানুষই মৃত্যুর মাধ্যমে "ধ্বংসশীল ইহ জগৎ থেকে স্থায়ী পরজগতে স্থানান্তরিত হয়।" এখানে কারো কোনো বিশেষত্ব নেই। কুরআন ও হাদীস দ্বারা শহীদগণের পারলৌকিক বিশেষ জীবন প্রমাণিত। সহীহ হাদীসের আলোকে নবীগণের পারলৌকিক বিশেষ জীবন প্রমাণিত। এছাড়া অন্য কোনো নেককার মানুষের পারলৌকিক বিশেষ কোনো জীবন প্রমাণিত নয়। আলিমগণ, ওলীগণ, মুআযযিনগণ... ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার নেককার মানুষের মৃত্যু পরবর্তী 'হায়াত' বা জীবন সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই সনদ বিহীন, ভিত্তিহীন কথা।[৫৮২]

**৩. ওলীগণ কবরে সালাত আদায়ে রত**

ওলীগণের পারলৌকিক জীবন বিষয়ক আরেকটি জাল কথা

اَلأَنْبِيَاءُ وَالأَوْلِيَاءُ يُصَلُّوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ كَمَا يُصَلُّوْنَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ

"নবীগণ ও ওলীগণ তাঁদের কবরের মধ্যে সালাত আদায় করেন, যেমন তাঁরা তাঁদের বাড়িতে সালাত আদায় করেন।"[৫৮৩]

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, নবীগণের ক্ষেত্রে হাদীসটি সহীহ। তবে এখানে 'ওলীগণ' শব্দটির সংযোগ বানোয়াট।

**৪. ওলীগণ আলাহর সুবাস**

প্রচলিত একটি পুস্তকে লিখিত হয়েছে: "আল-আউলিয়াও রায়হানুলাহ- আল হাদীস। অর্থ আউলিয়া আলাহর সুবাস।"[৫৮৪]

কথাটি কোনো কোনো বুজুর্গ বলেছেন, হাদীস হিসেবে এটি জাল। ওলীগণকে আল্লাহর সুবাস বলায় কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহর রিযককে আল্লাহর সুবাস বলা হয়েছে, সন্তানকেও আল্লাহর সুবাস বলা হয়েছে।[৫৮৫] কিন্তু এ কথাটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলতে হলে সহীহ সনদে তা বর্ণিত হতে হবে। কিন্তু এ কথাটির কোনো জাল সনদও নেই।

**৫. ওলীগণ আল্লাহর জুব্বার অন্তরালে**

প্রচলিত একটি পুস্তকে লিখিত হয়েছে: "ইন্না আউলিয়াই তাহ্তা কাবাই লা ইয়ারিফুহুম গাইরী ইল্লা আউলিয়াই।- হাদীসে কুদসী। অর্থ: নিশ্চয়ই আমার বন্ধুগণ আমার জুব্বার অন্তরালে অবস্থান করেন, আমি ভিন্ন তাঁদের পরিচিতি সম্বন্ধে কেহই অবগত নহে, আমার আউলিয়াগণ ব্যতীত।"[৫৮৬]

এটিও একটি ভিত্তিহীন ও জাল কথা। সহীহ, যয়ীফ বা জাল কোনো সনদে এ কথাটি বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায় নি। সনদবিহীন অন্যান্য জাল হাদীসের মত এ কথাটিও সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। আর নবম-দশম হিজরী শতকের কোনো কোনো আলিম ভিত্তিহীন জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে সনদ বিহীন ভাবে এ কথাটি তাদের পুস্তকে উল্লেখ করেছেন।[৫৮৭]

**৬. ওলীদের খাস জান্নাত: শুধুই দীদার**

আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, আল্লাহর খাস ওলীগণ জান্নাতের নেয়ামতের জন্য ইবাদত করেন না, বরং শুধুই 'মহব্বত' বা 'দীদারের' জন্য। এ অবস্থাকে 'সর্বোচ্চ' অবস্থা বলে মনে করা হয়। এ মর্মে একটি জাল হাদীস:

إِنَّ للهِ جَنَّةً لاَ فِيْهَا حُوْرٌ وَلاَ قَصْرٌ وَلاَ عَسَلٌ وَلاَ لَبَنٌ

"আল্লাহর এমন একটি জান্নাত আছে যেখানে হুর, অট্টালিকা, মধু এবং দুগ্ধ নেই। (বরং শুধু দীদারে ইলাহী-মাওলার দর্শন)।" কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সনদবিহীন একটি জাল কথা।[৫৮৮]

**৭. ওলী-আল্লাহদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত সবই হারাম!**

উপরের অর্থেই আরেকটি বানোয়াট কথা:

اَلدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الآخِرَةِ، وَالآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ اللهِ

"আখিরাত-ওয়ালাদের জন্য দুনিয়া হারাম আর দুনিয়া-ওয়ালাদের জন্য আখিরাত হারাম। আর আল্লাহ-ওয়ালাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারাম।" (অর্থাৎ উভয়কে হারাম না করে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায় না)

দাইলামী (৫০৯ হি) 'ফিরদাউস'-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর পুত্র আবূ মানসূর দাইলামী (৫৫৮হি) তার 'মুসনাদুল ফিরদাউস' গ্রন্থে এর একটি সনদ উল্লেখ করেছেন। সনদের অধিকাংশ রাবীই একেবারে অজ্ঞাত পরিচয়। অন্যরা দুর্বল। এজন্য হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করা হয়েছে।[৫৮৯]

এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, (১) আখিরাত-ওয়ালাদের জন্য দুনিয়া হারাম এবং (২) আল্লাহ-ওয়ালাদের জন্য দুনিয়া আখিরাত উভয়ই হারাম। এ কথা দুটি কুরআন কারীম ও অগণিত সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। মহান আল্লাহ ঠিক এর বিপরীত কথা বলেছেন। তিনি তাঁর প্রিয়তম রাসূল ﷺ ও শ্রেষ্ঠতম আল্লাহ-ওয়ালা সাহাবীগণসহ সকল আলাহওয়ালা ও আখিরাত-ওয়ালাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌন্দর্য ও আনন্দ হারাম করেন নি বলে ঘোষণা করেছেন: "আপনি বলুন: আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সৌন্দর্য ও পবিত্র আনন্দ ও মজার বস্তুগুলো বের (উদ্ভাবন) করেছেন তা হারাম বা নিষিদ্ধ করলো কে? আপনি বলুন: সেগুলো মুমিনদের জন্য পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতে শুধুমাত্র তাদের জন্যই।"[৫৯০]

এরূপ একটি জাল কথা: "ঐ ব্যক্তি আমার প্রিয়তম যে আমাকেই চায় শাস্তির ভয়ে কিংবা পুরস্কারের আশায় নহে।... তাহা অপেক্ষা অপরাধী কে, যে দোজখের ভয়ে কিংবা বেহেশতের আশায় আমাকে অর্চনা করে..।"[৫৯১]

কুরআনে 'আল্লাহওয়ালা' ও 'আখেরাতওয়ালা'দিগকে দুনিয়া ও আখিরাতের নেয়ামত প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুলাহ ﷺ সর্বদা এভাবে দোয়া করতেন। আর আখিরাতের নেয়ামত তো আল্লাহওয়ালা ও আখেরাতওয়ালাদের মূল কাম্য। আল্লাহওয়ালা হতে হলে, জান্নাতের নিয়ামতের আশা আকাঙ্খা বর্জন করতে হবে, এ ধারণাটি কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধী। কোনো কোনো নেককার মানুষের মনে এরূপ ধারণা আসতে পারে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সর্বদা জান্নাতের নিয়ামত

চেয়েছেন, সাহাবীগণকে বিভিন্ন নিয়ামতের সুসংবাদ দিয়েছেন। সর্বোপরি মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে সর্বোচ্চ মর্যাদার নবী-ওলীগণ এবং সাধারণ ওলীগণ সকলের জন্য জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন।

**৮. শরীয়ত, তরীকত, মারিফত ও হাকীকত**

এগুলো সমাজে প্রচলিত অতি পরিচিত চারটি পরিভাষা। কুরআন-হাদীসে "শরীয়ত" শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের চারটি পর্যায় বা স্তর অর্থে তরীকত, মারেফত ও হাকীকত পরিভাষাগুলো কুরআন বা হাদীসে কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। কখনোই কোনো সাহাবী, তাবিয়ী, প্রসিদ্ধ চার ইমাম বা অন্য কেউ ইসলামের চারটি স্তর বা পর্যায় হিসেবে এ পরিভাষাগুলি ব্যবহার করেন নি। প্রথমে শীয়াগণ এগুলি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করেন। পরে সুন্নী সরল সূফীগণের মধ্যে পরিভাষাগুলি প্রসার লাভ করে। বিশেষত, ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীর পর মিসর, ইয়ামান, ইরান, ইরাক, বাগদাদ ও মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শীয়াগণের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে শীয়া আকীদার অনেক কিছুই সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর এ সুযোগে জালিয়াতগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে হাদীস বানিয়ে বলেছে:

اَلشَّرِيْعَةُ شَجَرَةٌ وَالطَّرِيْقَةُ أَغْصَانُهَا وَالْمَعْرِفَةُ أَوْرَاقُهَا وَالْحَقِيْقَةُ ثَمَرُهَا

"শরীয়ত একটি বৃক্ষ, তরীকত তার শাখা-প্রশাখা, মারিফত তার পাতা এবং হাকীকত তার ফল।"[৫৯২]

মিথ্যাচারিদের আল্লাহ লাঞ্ছিত করুন। তাদের বানানো আরেকটি কথা:

اَلشَّرِيْعَةُ أَقْوَالِيْ وَالطَّرِيْقَةُ أَفْعَالِيْ وَالْحَقِيْقَةُ حَالِيْ وَالْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِيْ

"শরীয়ত আমার কথাবার্তা, তরীকত আমার কাজকর্ম, হাকীকত আমার অবস্থা এবং মারিফাত আমার মূলধন।"[৫৯৩]

আরবী মা'রিফাত (المعرفة) শব্দটি আরাফা (عرف) ক্রিয়াপদ থেকে গৃহীত। এর অর্থ (إدارك الشيء بحاسة من حواسه) কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে কোনো কিছু অবগত হওয়া বা পরিচয় লাভ করা। এভাবে মূলত ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান বা পরিচয়কে "মারিফাত" বলা হয়। তবে সাধারণত 'মারিফাত' বলতে "জ্ঞান", "পরিচয়" বা শিক্ষা (knowledge, education) বুঝানো হয়।

"শরীয়ত, তরীকত, হাকীকাত ও মারিফাত" এ পর্যায়ক্রমিক ধারায় "মারিফাত"-কে শরীয়তের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহ সুস্পষ্টভাবেই মারিফাতকে শরীয়তের নিম্নের স্থান দিয়েছে। 'জ্ঞান' অর্থে 'মারিফাত' ঈমান অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আল্লাহর মারিফাত বা আল্লাহর পরিচয় লাভ মানুষকে তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করে। তবে কুরআন-হাদীসে মূলত "ইলম" এবং "ফিকহ"-এর প্রশংসা করা হয়েছে, "মারিফাত"-এর কোনো বিশেষ প্রশংসা করা হয় নি। "মারিফাত" ঈমানের পথে পরিচালিত করলে তা প্রশংসনীয়। উপরন্তু কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "মারিফাত" অর্জনের পরেও মানুষ কুফর বা অবিশ্বাসে লিপ্ত হয়। কুরআনে একাধিক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহূদী-খৃস্টানদের অনেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর দীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ "মারিফাত" অর্জনের পরেও কুফরী করত।[৫৯৪] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

"অতঃপর যখন তাদের নিকট তা (কুরআন) আগমন করল, তারা তার মারিফাত অর্জনের (প্রকৃত পরিচয় জানার) পরেও কুফরী করল।"[৫৯৫]

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহর নিয়ামতের মারিফাত (প্রকৃত পরিচয়) তারা লাভ করে- অতঃপর তারা তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।"[৫৯৬]

কুরআন-সুন্নাহ মুমিনদেরকে "মারিফাত" অর্জনের নির্দেশ দেয় নি, বরং ইলম অর্জনের নির্দেশ দিয়েছে; কারণ "মারিফাত" তো ঈমান অর্জনের পূর্বের অবস্থা। কিন্তু শীয়াগণ মারিফাতকে ঈমান, ইসলাম ও শরীয়ত থেকে পৃথক উচ্চপর্যায়ের বিষয় বলে প্রচার করেন এবং মারিফাতকে "তত্ত্বজ্ঞান" বা গোপন বা পৃথক কোনো জ্ঞান বলে প্রচার করেন। এ সকল বিভ্রান্তির অপনোদনে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর নিম্নের বক্তব্য প্রণিধানযোগ:

نَعْرِفُ اللهَ تَعَالَي حَقَّ مَعْرِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ اللهُ نَفْسَهُ فِيْ كِتَابِهِ بِجَمِيْعِ صِفَاتِهِ .. وَيَسْتَوِيْ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ فِيْ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِيْنِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرِّضَا وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالإِيْمَانِ فِيْ ذَلِكَ، وَيَتَفَاوَتُوْنَ فِيْمَا دُوْنَ الإِيْمَانِ فِيْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

"মহান আলাহর প্রকৃত মা'রিফাত আমরা লাভ করেছি, তিনি যেভাবে তাঁর কিতাবে তাঁর নিজের বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে তাঁর সকল বিশেষণ সহকারে। ... মুমিনগণ সকলেই সমান মারিফাতের বিষয়ে, এবং ইয়াকীন, তাওয়াক্কুল, মাহাব্বাত, রিযা (সন্তুষ্টি), খাওফ

(ভয়), রাজা (আশা) এবং এ সকল বিষয়ের ঈমান-এর ক্ষেত্রে। তাদের মর্যাদার কমবেশি হয় মূল ঈমান বা বিশ্বাসের অতিরিক্ত যা কিছু আছে তার সবকিছুতে।"[৫৯৭]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় সুস্পষ্ট: (১) মারিফাত ঈমানেরই সহযাত্রী। আল্লাহর সত্যিকার মারিফাত লাভই ঈমানের পথে পরিচালিত করে; এজন্য সকল মুমিনই আল্লাহর হক্ক বা প্রকৃত মারিফাত লাভ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁরা সকলেই সমমর্যাদার। (২) আল্লাহর মারিফাত গোপন কোনো তত্ত্বজ্ঞান নয় বা তা অর্জনের জন্য গোপন কোনো পথ নেই। মহান আল্লাহ তাঁর নিজের বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে যা জানিয়েছেন তা অবগত হওয়াই তাঁর প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মারিফাত।

### ৯. ছোট জিহাদ ও বড় জিহাদ

কথিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বলেন:

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الأَكْبَرِ... جِهَادُ الْقَلْبِ/ مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ

"আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। ... বড় জিহাদ হলো মনের সাথে জিহাদ বা নিজের প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রাম।"

ইবনু তাইমিয়া হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বাতিল বলে গণ্য করেছেন। ইরাকী, সুয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি দুর্বল সনদে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সহীহ সনদে কথাটি ইবরাহীম ইবনু আবী আবলা (১৫২ হি) নামক প্রসিদ্ধ তাবিয়ী থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন যে, হাদীসটি মূলত এ তাবিয়ীর বক্তব্য। অনেক সময় দুর্বল রাবীগণ সাহাবী বা তাবিয়ীর কথাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসেবে বর্ণনা করেন।[৫৯৮]

### ১০. প্রবৃত্তির জিহাদই কঠিনতম জিহাদ

আমাদের সমাজে এ অর্থে আরেকটি 'হাদীস' প্রচলিত:

أَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوَى

"সবচেয়ে কঠিন জিহাদ প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ।"

কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয়। তাঁর কথা হিসেবে কোনো সনদেই তা বর্ণিত হয় নি। প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ইবরাহীম ইবনু আদহাম (১৬১হি) থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত।[৫৯৯]

উল্লেখ্য যে, এ অর্থের কাছাকাছি সহীহ হাদীস রয়েছে। ফুদালাহ ইবনু উবাইদ (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের ওয়াযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلَّهِ (وفي رواية: فِي طَاعَةِ اللَّهِ)

"আর মুজাহিদ তো সে ব্যক্তি যে আল্লাহর জন্য/ আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজের প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে।"[৬০০]

দুঃখজনক যে, বিভিন্ন প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে সংকলিত সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে ভিত্তিহীন বানোয়াট কথাগুলো আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলি।

### ১১. আলিম বনাম আরিফ

আমরা একটু আগেই শরীয়ত-মারিফাত বিষয় জেনেছি। মারিফাত অর্জনকারীকে 'আরিফ' এবং ইলম অর্জনকারীকে 'আলিম' বলা হয়। আমরা দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে মারিফতের কোনো প্রশংসা করা হয় নি; বরং ইলমের প্রশংসা করা হয়েছে। 'মারিফাত' অর্থে 'তত্ত্বজ্ঞান', 'গুপ্তজ্ঞান' বা 'বিশেষজ্ঞান' বুঝাতে, 'আরিফ' বলতে তত্ত্বজ্ঞানী বুঝাতে, আলিম (ইলম অর্জনকারী) এবং আরিফ (মারিফাত অর্জনকারী)-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে বা আরিফের মর্যাদা বুঝাতে কুরআন ও হাদীসে কোনো কিছুই বলা হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট কথা। এরূপ একটি জাল হাদীস:

اَلْعَالِمُ يَتَنَقَّشُ وَالْعَارِفُ يَصْقِلُ

"আলিম নকশা অঙ্কিত করে এবং আরিফ (খোদাতত্ত্ব জ্ঞানে জ্ঞানী) তা পরিষ্কার করে।"[৬০১]

### ১২. আল্লাহর স্বভাব গ্রহণ কর

সূফীগণের মধ্যে প্রচলিত একটি ভিত্তিহীন সনদবিহীন জাল 'হাদীস':

تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللهِ

"তোমরা আল্লাহর আখলাক বা স্বভাব-আচরণ গ্রহণ কর।"[৬০২]

**১৩. একা হও আমার নিকটে পৌঁছাবে**

تَجَرَّدْ تَصِلْ إِلَيَّ

"একা হও আমার কাছে পৌঁছাবে।"[৬০৩]

উপরের কথাগুলি সবই সনদহীন, ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ সনদেও এ কথাগুলো বর্ণিত হয়নি।

**১৪. সামা বা প্রেম-সঙ্গীত শ্রবণ কারো জন্য ফরয...**

'সামা' (সেমা) অর্থ 'শ্রবণ"। সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগে 'সামা' বলতে কুরআন শ্রবণ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী ও বাণী শ্রবণকেই বোঝান হতো। এগুলোই তাঁদের মনে আল্লাহ-প্রেম ও নবী-প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করত। কোনো মুসলিম কখনই আল্লাহর প্রেমের জন্য গান শুনতেন না। সমাজের অধার্মিক মানুষদের মধ্যে বিনোদন হিসাবে গানবাজনার প্রচলন ছিল, কিন্তু আলিমগণ তা হারাম জানতেন। ২/১ জন বিনোদন হিসাবে একে জায়েয বলেছেন; কিন্তু কখনই এসকল কর্ম আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বলে গণ্য হয় নি।

ক্রমান্বয়ে 'সামা' বলতে 'গান-বাজনা' বুঝানো হতে থাকে। আর গানের আবেশে উদ্বেলিত হওয়া ও নাচানাচি করাকে 'ওয়াজদ' অর্থাৎ 'আবেগ, উত্তেজনা, উন্মত্ততা (passion, ardor) বলা হতো। এ 'সামা' বা সঙ্গীত ও 'ওয়াজদ' অর্থাৎ গানের আবেশে তন্ময় হয়ে নাচানাচি বা উন্মত্ততা ৫ম হিজরী শতাব্দী থেকে সূফী সাধকদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম অংশ হয়ে যায়। সামা ব্যতিরেকে কোনো সূফী খানকা বা সূফী দরবার কল্পনা করা যেত না। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (৫০৫হি) ও অন্য কোনো কোনো আলিম সূফীগণের প্রতি ভক্তির কারণে এরূপ গান বাজনা ও নর্তন কুর্দনকে জায়েয, শরীয়ত-সঙ্গত ও বিদ'আতে হাসানা বলে দাবি করেছেন।[৬০৪]

এদিকে যখন সামা-সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেল নেককার মানুষদের মাঝে তখন জালিয়াতগণ তাদের মেধা খরচের একটি বড় ক্ষেত্র পেয়ে গেল। তারা সামা, ওয়াজদ ইত্যাদির পক্ষে বিভিন্ন হাদীস বানিয়ে প্রচার করে। যেমন বলা হয়েছে: "হুযুর (ﷺ) এরশাদ করেছেন:

اَلسَّمَاعُ لِقَوْمٍ فَرْضٌ وَلِقَوْمٍ سُنَّةٌ وَلِقَوْمٍ بِدْعَةٌ، وَالْفَرْضُ لِلْخَوَاصِّ، وَالسُّنَّةُ لِلْمُحِبِّيْنَ وَالْبِدْعَةُ لِلْغَافِلِيْنَ

"সামা কারো জন্য ফরয, কারো জন্য সুন্নাত এবং কারো জন্য বিদ'আত। খাস লোকদের জন্য ফরয, প্রেমিকদের জন্য সুন্নাত এবং গাফিলদের জন্য বিদআত।"[৬০৫]

এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বানানো একটি ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা, যা কোনো যয়ীফ বা জাল সনদেও বর্ণিত হয় নি। এছাড়া ইসলামী পরিভাষা বিষয়ে যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে তিনি জানেন যে, ফরয, সুন্নাত, বিদআত ইত্যাদি পরিভাষার এরূপ ব্যবহার কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নি।

**১৫. যার ওয়াজদ বা উন্মত্ততা নেই তার ধর্মও নেই, জীবনও নেই**

গানের মাজলিসে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে অচেতন হওয়া বা নাচানাচি করাকে ইশকের বড় নিদর্শন বলে গণ্য করা হতো। জালিয়াতরা এ বিষয়ে কিছু হাদীস বানিয়েছে। এরূপ একটি 'হাদীস' উল্লেখ করা হয়েছে:

مَنْ لاَ وَجْدَ لَهُ لاَ حَيَاةَ لَهُ/ لاَ دِيْنَ لَهُ

"যার 'ওয়াজদ' বা উত্তেজনা-উন্মত্ততা নেই তার জীবন নেই/ধর্ম নেই।"[৬০৬]

এ কথাটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সনদহীন বানোয়াট কথা।

**১৬. যে গান শুনে আন্দোলিত না হয় সে মর্যাদাশালী নয়**

এ বিষয়ে অন্য একটি জাল হাদীস প্রসিদ্ধ। এ হাদীসটির একটি সনদও আছে। সনদের মূল রাবী মিথ্যাবাদী জালিয়াত। এ হাদীসে বলা হয়েছে: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে একটি প্রেমের কবিতা পাঠ করা হয়। গানে বলা হয়: 'প্রেমের সর্প আমার কলিজায় দংশন করেছে। এর কোনো চিকিৎসক নেই, ঔষধও নেই। শুধু আমার প্রিয়তম ছাড়া। সে আমার অসুস্থতা এবং সেই আমার ঔষধ।' এ কবিতা শুনে তিনি উত্তেজিত উদ্বেলিত হয়ে নাচতে বা দুলতে থাকেন। এমনকি তাঁর চাদরটি গা থেকে পড়ে যায়। তাঁর সাথে সাহাবীগণও এভাবে নাচতে বা দুলতে থাকেন...। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لَيْسَ بِكَرِيْمٍ مَنْ لَمْ يَهْتَزَّ عِنْدَ السَّمَاعِ

"সামার (শ্রবণের) সময় যে আন্দোলিত হয় না সে মর্যাদাশালী নয়।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ হাদীসটি জঘন্য মিথ্যা ও জাল কথা।[৬০৭]

**১৭. গওস, কুতুব, আওতাদ, আকতাব, আবদাল, নুজাবা**

আমাদের সমাজে ধার্মিক মানুষদের মধ্যে বহুল প্রচলিত পরিভাষার মধ্যে রয়েছে, গওস, কুতুব, আবদাল, আওতাদ, আকতাব ইত্যাদি শব্দ। আমরা সাধারণভাবে আওলিয়ায়ে কেরামকে বুঝাতে এ সকল শব্দ ব্যবহার করি। এছাড়া এ সকল পরিভাষার বিশেষ অর্থ ও বিশেষ বিশেষ পদবীর কথাও প্রচলিত। আরো প্রচলিত আছে যে, দুনিয়াতে এতজন আওতাদ, এতজন আবদাল, এতজন কুতুব, এতজন গাওস ইত্যাদি সর্বদা বিরাজমান...। এগুলো সবই ভিত্তিহীন কথা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে বানোয়াট কথা। একমাত্র 'আবদাল' ছাড়া অন্য কোনো শব্দ কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

'গওস' কুতুব, আওতাদ... ইত্যাদি সকল পরিভাষা, পদ-পদবী ও সংখ্যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ সকল বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কেনো কিছুই সহীহ বা গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। শুধুমাত্র 'আবদাল' শব্দটি একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

'আবদাল' শব্দটি 'বদল' শব্দের বহুবচন। আবদাল অর্থ বদলগণ। একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক নেককার মানুষ আছেন যাদের কেউ মৃত্যু বরণ করলে তার 'বদলে' অন্যকে আল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত করেন। এজন্য তাদেরকে 'আবদাল' বা 'বদলগণ' বলা হয়। এ বিষয়ে বর্ণিত প্রতিটি হাদীসেরই সনদ দুর্বল। কোনো সনদে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে। কোনো সনদ বিচ্ছিন্ন। কোনো সনদে দুর্বল রাবী রয়েছেন। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস 'আবদাল' বিষয়ক সকল হাদীসকে এককথায় ও ঢালাওভাবে মুনকার, বাতিল বা মাউযূ বলে উল্লেখ করেছেন।

অন্য অনেক মুহাদ্দিস একাধিক সনদের কারণে এগুলোকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের বিস্তারিত আলোচনা ও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসগুলোর পর্যালোচনা করে আমার কাছে দ্বিতীয় মতটিই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। দুটি বিষয় 'আবদাল' শব্দটির ভিত্তি প্রমাণ করে: **(ক)** এ বিষয়ক বিভিন্ন হাদীস এবং **(খ)** দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর অনেক তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী, মুহাদ্দিস, ইমাম ও ফকীহ এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, এ শব্দটির ভিত্তি ও উৎস রয়েছে।

অন্যান্য সকল বিষয়ের মত 'আবদাল' বিষয়েও অনেক মিথ্যা কথা 'হাদীস' বলে প্রচারিত হয়েছে। এগুলোর পাশাপাশি এ বিষয়ক নিম্নের তিনটি হাদীসকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।

**প্রথম হাদীস:** শুরাইহ ইবনু উবাইদ (১০১হি) নামক একজন তাবিয়ী বলেন, আলী (রা)-এর সাথে যখন মুয়াবিয়া (রা)-এর যুদ্ধ চলছিল, তখন আলীর (রা) অনুসারী ইরাকবাসীগণ বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি মুয়াবিয়ার অনুসারী সিরিয়াবাসীগণের জন্য লানত বা অভিশাপ করুন। তখন তিনি বলেন, না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

الأَبْدَالُ (الْبَدَلاءُ) (يَكُونُونَ) بِالشَّامِ، وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلاً يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ، وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الأَعْدَاءِ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ.

"আবদাল (বদল-গণ) সিরিয়ায় থাকবেন। তাঁরা ৪০ ব্যক্তি। যখনই তাঁদের কেউ মৃত্যু বরণ করেন তখনই আল্লাহ তাঁর বদলে অন্য ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করেন। তাদের কারণে আল্লাহ বৃষ্টি প্রদান করেন। তাঁদের কারণে শত্রুর উপর বিজয় দান করেন। তাদের কারণে সিরিয়ার অধিবাসীদের থেকে তিনি আযাব দূরীভুত করবেন।"

এ হাদীসের সনদের সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য এবং বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক গৃহীত। শুধুমাত্র শুরাইহ ইবনু উবাইদ ব্যতিক্রম। তাঁর হাদীস বুখারী ও মুসলিমে নেই। তবে তিনিও বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী হিসাবে স্বীকৃত। কাজেই হাদীসটির সনদ সহীহ। কোনো কোনা মুহাদ্দিস সনদটি বিচ্ছিন্ন বলে মনে করেছেন। তাঁরা বলেন, শুরাইহ বলেন নি যে, আলীর মুখ থেকে তিনি কথাটি শুনেছেন। বরং তিনি শুধু ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এতে মনে হয়, শুরাইহ সম্ভবত অন্য কারো মাধ্যমে ঘটনাটি শুনেছেন, যার নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। তবে বিষয়টি নিশ্চিত নয়। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের সময় শুরাইহ কমবেশি ৩০ বছর বয়সী ছিলেন। কাজেই তাঁর পক্ষে আলী (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করা বা এ ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা অসম্ভব ছিল না। এজন্য বাহ্যত হাদীসটির সনদ অবিচ্ছিন্ন বলেই মনে হয়।

যিয়া মাকদিসী উল্লেখ করেছেন যে, অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সনদে এ হাদীসটি আলীর (রা) নিজের বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এ হাদীসটি আলীর (রা) বক্তব্য বা মাউকূফ হাদীস হিসেবে সহীহ।[৬০৮]

**দ্বিতীয় হাদীস:** তাবিয়ী আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু কাইস বলেন, উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

الأَبْدَالُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلاثُونَ مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، عَزَّ وَجَلَّ، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ، تَعَالَى، مَكَانَهُ رَجُلاً.

"এ উম্মাতের মধ্যে 'বদল'গণ (আবদাল) ত্রিশ ব্যক্তি। এরা দয়ালু আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আ)-এর মত। যখন এদের কেউ মৃত্যু বরণ করেন, তখন আল্লাহ তা'লা তার বদলে অন্য ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করেন।"

এ হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু কাইসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ আছে। ইজলী ও আবূ যুর'আ তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে মুনকার, অর্থাৎ আপত্তিকর বা অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান পর্যায়ের বলে গণ্য করেছেন।[৬০৯]

**তৃতীয় হাদীসঃ** আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

لَنْ تَخْلُوَ الأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً مِثْلَ خَلِيلِ الرَّحْمنِ فَبِهِمْ تُسْقَوْنَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ أَبْدَلَ الله مَكَانَهُ آخَرَ

"যমীন কখনো ৪০ ব্যক্তি থেকে শূন্য হবে না, যাঁরা দয়ালু আল্লাহর খলীল ইবরাহীমের মত হবেন। তাঁদের কারণেই তোমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হও, এবং তাঁদের কারণেই তোমরা বিজয় লাভ কর। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ মৃত্যু বরণ করলে আল্লাহ তাঁর বদলে অন্য ব্যক্তিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।"

হাদীসটি তাবারানী সংকলন করেছেন। সনদের একাধিক বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে আপত্তি আছে। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। তবে আল্লামা হাইসামী হাদীসটিকে 'হাসান' বলে গণ্য করেছেন।[৬১০]

উপরের তিনটি হাদীস ছাড়াও 'আবদাল' বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি হাদীস পৃথকভাবে যয়ীফ বা অত্যন্ত যয়ীফ হলেও সামগ্রিকভাবে আবদালের অস্তিত্ব প্রমাণিত। স্বভাবতই এ প্রমাণিত বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক জাল ও বানোয়াট কথাও বলা হয়েছে। আবদাল বা বদলগণের দায়িত্ব, পদমর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক বানোয়াট কথা রয়েছে।

'আবদাল' বা বদলগণের নিচের পদে ও উপরে অনেক বানোয়াট পদ-পদবীর নাম বলা হয়েছে। যেমন ৩০০ জন নকীব/ নুকাবা, ৭০ জন নাজীব/ নুজাবা, ৪০ জন বদল/আবদাল, ৪ জন আমীদ/উমুদ, ১ জন কুতুব বা গাউস... ইত্যাদি। 'আবদাল' ছাড়া বাকী সকল নাম বা পদ-পদবী ও সংখ্যা সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- থেকে বর্ণিত কেনো একটি সহীহ বা যয়ীফ সনদেও কুতুব, গাওস, নজীব, নকীব ইত্যাদির কথা কোনোভাবে বর্ণিত হয় নি। এছাড়া এদের দেশ, পদ মর্যাদা, দায়িত্ব, কর্ম ইত্যাদি যা কিছু বলা হয়েছে সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহ বা যয়ীফ সনদে কিছুই বর্ণিত হয় নি, যদিও গত কয়েক শতাব্দীতে কোনো কোনো আলিম এ বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছেন।[৬১১]

এখানে এ সম্পর্কিত দুটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিঃ (১) আবদালের পরিচয় ও (২) আবদালের দায়িত্ব।

**ক. আবদালের পরিচয়**

আবদালের পরিচয় সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। আবদাল বা বদলগণ নিজেদেরকে বদল বলে চিনতে বা বুঝতে পারেন বলেও কোনো হাদীসে কোনোভাবে উল্লেখ করা হয় নি। তবে বাহ্যিক নেক আমল দেখে দ্বিতীয় শতক থেকে নেককার মানুষকে আবদালের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হতো। কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে এ বিষক কিছু বাহ্যিক আমলের কথা বলা হয়েছে। একটি দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

إِنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوْهَا بِصَلاَةٍ وَلاَ بِصَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ (بِكَثْرَةِ صَوْمٍ وَلاَ صَلاَةٍ)... وَلَكِنْ ... بِالسَّخَاءِ وَالنَّصِيْحَةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ (سَلاَمَةِ الصُّدُوْرِ وَسَخَاوَةِ الأَنْفُسِ وَالرَّحْمَةِ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ

"তাঁরা এ মর্যাদা বেশি বেশি (নফল) সালাত, সিয়াম বা দান-সাদকা করে লাভ করেন নি.. বরং বদান্যতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও সকল মুসলিমের প্রতি দয়া, ভালবাসা ও নসীহতের দ্বারা তা লাভ করেছেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৬১২]

বিভিন্ন যয়ীফ হাদীস এবং তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের বক্তব্যের আলোকে আল্লামা সাখাবী, সুয়ূতী, আজলূনী প্রমুখ আলিম বদলগণের কিছু আলামত উল্লেখ করেছেনঃ অন্তরের প্রশস্ততা, বদান্যতা, ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, হারাম থেকে বিরত থাকা, আলাহর দীনের জন্য ক্রোধান্বিত হওয়া, কাউকে আঘাত না করা, কেউ ক্ষতি করলে তার উপকার করা, কেউ কষ্ট দিলে তাকে ক্ষমা

করা, উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য প্রতিদিন দোয়া করা, নিঃসন্তান হওয়া, কাউকে অভিশাপ না দেয়া... ইত্যাদি।[৬১৩]

**খ. আবদালের দায়িত্ব**

আমাদের মধ্যে আরো প্রচলিত যে, গাওসের অমুক দায়িত্ব, কুতুবের অমুক দায়িত্ব, আবদালের অমুক দায়িত্ব... ইত্যাদি। এগুলোও ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। অগণিত বুযুর্গ ও নেককার মানুষ সরল বিশ্বাসে এ সকল ভিত্তিহীন শোনা কথা সঠিক মনে করেন এবং বলেন। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, আবদাল ব্যতীত বাকি সকল পদ-পদবী ও পরিভাষাই ভিত্তিহীন। আর আবদালের ক্ষেত্রে কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে 'তাঁদের কারণে বা তাঁদের জন্য আল্লাহ বৃষ্টি দেন ইত্যাদি।" এ কথাটির দুটি অর্থ রয়েছে:

**প্রথম অর্থ: তাদের নেক আমলের বরকত লাভ**

নেককার মানুষের নেক আমলের কারণে আল্লাহ জাগতিক বরকত প্রদান করেন। সহীহ হাদীসে আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে দু ভাই ছিলেন। এক ভাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আগমন করতেন এবং অন্য ভাই অর্থোপার্জনের কর্মে নিয়োজিত থাকতেন। উপার্জনকারী ভাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আগমন করে তার অন্য ভাই সম্পর্কে অভিযোগ করেন যে, সে তাকে কর্মে সাহায্য করে না। তখন তিনি বলেন:

لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ

"হতে পারে যে, তুমি তার কারণে রিয্ক প্রাপ্ত হচ্ছ।"[৬১৪]

**দ্বিতীয় অর্থ: তাঁদের দোয়া লাভ**

দ্বিতীয় অর্থ হলো, তাদের দোয়ার কারণে আল্লাহ রহমত ও বরকত প্রদান করবেন। আল্লাহর তাঁর প্রিয় নেককার বান্দাদের দোয়া কবুল করেন বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আবদাল বিষয়ক একাধিক যয়ীফ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এদের দোয়ার বরকত মানুষ লাভ করবে। নেককার মানুষদের প্রকৃতিই হলো যে, তাঁরা সদা-সর্বদা সকল মুসলিমের ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এ দোয়ার বরকত মুসলিম উম্মাহ লাভ করে।

এখানে তিনটি ভুল ও বিকৃত অর্থ সমাজে প্রচলিত:

**প্রথম ভুল: দোয়া কবুলের বাধ্যবাধকতা**

অনেকে ধারণা করেন 'আবদাল' বা এ প্রকারের কোনো নেককার মানুষ দোয়া করলে আল্লাহ শুনবেনই। কাজেই আল্লাহ খুশি থাকুন আর বেজার থাকুন, আমি কোনো প্রকারে অমুক ব্যক্তির কাছে থেকে দোয়া আদায় করে নিতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। এই ধারণা শুধু ভুলই নয়, উপরন্তু ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক ও শির্কমূলক।

প্রথম, কে বদল বা আবদাল তা আমরা কেউই জানি না। এ বিষয়ে সবই ধারণা ও কল্পনা। দ্বিতীয়ত, কারো দোয়া কবুল করা বা না করা একান্তই আল্লাহর ইচ্ছা। কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি আলাহ তাঁর প্রিয়তম হাবীব ও খালীল মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহর (ﷺ) মনের অব্যক্ত আশাটিও পূরণ করেছেন। আবার তিনি তাঁর মুখের দোয়াও কবুল করেন নি। তিনি একজন মুনাফিকের জন্য ক্ষমার দোয়া করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ কবুল করেন নি। উপরন্তু বলেছেন, ৭০ বার এভাবে দোয়া করলেও তা কবুল হবে না। একজন কারামতপ্রাপ্ত-ওলী, আল্লাহর মর্যির বাইরে দোয়া করেছিলেন বলে তাকে কঠিনভাবে শাস্তি দেওয়া হয়।[৬১৫]

**দ্বিতীয় ভুল: দোয়া কবুলের মাধ্যম বা ওসীলা**

'তাঁর কারণে বা মাধ্যমে তুমি রিযিক পাও', 'তাদের কারণে বা মাধ্যমে তোমরা বৃষ্টি পাও...' ইত্যাদি কথার একটি বিকৃত ব্যাখ্যা হলো, এ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের দোয়া বা সুপারিশ ছাড়া বোধহয় আল্লাহ এগুলো দিবেন না। এরা বোধহয় রাজা-বাদশাহের মন্ত্রীদের মত, তাঁদের সুপারিশ ছাড়া চলবে না। পৃথীবিতে রাজা, শাসক ও মন্ত্রীদের কাছে কোনো আবেদন পেশ করতে হলে তাদের একান্ত আপনজনদের মাধ্যমে তা পেশ করলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহর কাছে সরাসরি চাওয়ার চেয়ে এদের মাধ্যমে চাওয়া হলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

এ ধারণাগুলো সুস্পষ্ট শিরক। পৃথিবীর বাদশা আমাকে চেনেন না, আমার সততা ও আন্তরিকতার কথা তাঁর জানা নেই। কিন্তু তাঁর কোনো প্রিয়পাত্র হয়ত আমাকে চেনেন। তার সুপারিশ পেলে বাদশাহর মনে নিশ্চয়তা আসবে যে, আমি তাঁর দয়া পাওয়ার উপযুক্ত মানুষ। আল্লাহ তা'আলার বিষয় কি তদ্রূপ? তিনি কি আমাকে চেনেন-না? আল্লাহর কোনো ওলী, কোনো প্রিয় বান্দা কি আমাকে আল্লাহর চেয়ে বেশি চেনেন? না বেশি ভালবাসেন? অথবা বেশি করুণা করতে চান? এছাড়া পৃথিবীর বাদশাহ বা বিচারকের মানবীয় দুর্বলতার কারণে পক্ষপাতিত্বের বা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভয় আছে, সুপারিশের মাধ্যমে যা দূরীভুত হয়। আল্লাহর ক্ষেত্রে কি এমন কোনো ভয় আছে?

কে আল্লাহর কাছে মাকবূল ও প্রিয় তা কেউই বলতে পারে না। আমরা আগেই দেখেছি, নেককার মানুষদের প্রকৃতিই হলো যে, তাঁরা সদা সর্বদা সকল মুসলিমের ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এ দোয়ার বরকত

মুসলিমগণ লাভ করেন। এছাড়া কোনো মুসলিমকে ব্যক্তিগতভাবে, অথবা মুসলিম সমাজকে সমষ্টিগতভাবে কোনো নির্ধারিত নেককার ব্যক্তির কাছে যেয়ে দোয়া চাইতে হবে, এ কথা কখনোই এ সকল হাদীসের নির্দেশনা নয়। ইসলামের বরকতময় যুগগুলোতে সাহাবী, তাবিয়ী,তাবি-তাবিয়ী বা তৎকালীণ মানুষেরা কখনোই এরূপ করেন নি।

**তৃতীয় ভুল: দায়িত্ব বা ক্ষমতা**

অনেকে মনে করেন, আবদাল বা আউলিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ বৃষ্টি, বিজয় ইত্যাদির দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিয়েছেন। এরা নিজেদের সুবিধামত তা প্রদান করেন। এ ধারণাটি হিন্দু ও মুশরিকদের দেব-দেবতায় বিশ্বাসেরই মত শিরক। এ বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহ কোনো জীবিত বা মৃত কোনো নবী, ওলী বা কোনো মানুষকেই কোনো দায়িত্ব বা অধিকার প্রদান করেন নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় বা মনে করা হয় সবই জঘন্য মিথ্যা কথা ও কুরআন ও হাদীসের অগণিত সুস্পষ্ট কথার বিপরীত কথা। আল্লাহ ফিরিশতাগণকে বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু কোনো ক্ষমতা দেন নি। কোনো জীবিত বা মৃত মানুষকে কোনোরূপ কোনো দায়িত্ব প্রদান করেন নি।

মুসলিম সমাজের অনেকেই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনভাবে মনের আন্দাযে ধারণা করেন যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এরপর মনের আন্দাযে ধারণা করেন যে, আল্লাহ তাকে হয়ত কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন। এরপর মনগড়াভাবে এদের কাছে চাইতে থাকেন। আর এ সকল জঘন্য শিরককে সমর্থন করার জন্য কোনো কোনো জ্ঞানপাপী উপরের 'আবাদল' বিষয়ক হাদীসগুলো বিকৃত করে ব্যবহার করেন।

**১৮. আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) বিষয়ক**

মুসলিম উম্মার ইতিহাসের অবক্ষয়, বিচ্ছিন্নতা, অজ্ঞানতা ও বহির্শক্রুর আক্রমনের যুগের, হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, ফকীহ ও সূফী ছিলেন আব্দুল কাদির জীলানী। তিনি ৪৭১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯০ বৎসর বয়সে (৫৬১ হি/১১৬৬খৃ) ইন্তেকাল করেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের একজন বড় ফকীহ ছিলেন। এছাড়া তাসাউফের বড় সাধক ও ওয়ায়িয ছিলেন। তাঁর ওয়াযের প্রভাবে অগণিত মানুষ সে অন্ধকার যুগে আল্লাহর দীনের পথে ফিরে আসেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর অনেক কারামত প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর ছাত্রগণ বা নিকটবর্তীগণ, যেমন যাহাবী, সাম'আনী ও অন্যান্যরা তাঁর বিশুদ্ধ জীবনী রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি নিজে অনেক গ্রন্থ লিখে হাম্বলী মাযহাব অনুসারে মুসলিমগণের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষা প্রদান করেন। যদিও তিনি তৎকালীন মাযহাবী কোন্দোলের প্রভাবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও তাঁকে অনুসারীদেরকে জাহান্নামী ফিরকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন[৬১৬], তবুও হানাফীগণ-সহ সকল মাযহাবের মানুষই তাঁকে ভক্তি করেন।

পরবর্তী যুগে তাঁর নামে অগণিত আজগুবি ও মিথ্যা কথা কারামতের নামে বানানো হয়। এসকল কথা যেমন ভিত্তিহীন ও মিথ্যা, তেমনি তা ইসলামী ধ্যানধারণার পরিপন্থী। তবে এখানে আমাদের আলোচ্য হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন্দ্রিক মিথ্যা কথা। আব্দুল কাদির জীলানীকে (রাহ) কেন্দ্র করে মিথ্যাবাদীদের বানোয়াট কথার একটি হলো, মি'রাজের রাত্রিতে নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল কাদির জিলানীর কাঁধে পা রেখে আরশে উঠেছিলেন। কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বানোয়াট জঘন্য মিথ্যা কথা। কোনো হাদীসের গ্রন্থেই এর অস্তিত্ব নেই। আর যে কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন নি, কোনো হাদীসের গ্রন্থে নেই বা সনদ নেই, সে সকল আজগুবি বানোয়াট কথা একজন মুমিন কিভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলতে পারেন সে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। যেখানে সাহাবীগণ তাঁদের মুখস্থ ও জানা কথা সামান্য কমবেশি হওয়ার ভয়ে বলতে সাহস পেতেন না, সেখানে নির্বিচারে যা শুনছি তাই তাঁর নামে বলে কিভাবে কিয়ামতের দিন তাঁর সামনে মুখ দেখাব!

**১৯. পীর-মুরীদি: যার পীর নেই তার পীর শয়তান**

পীর-মুরীদি বিষয়ক সুন্নাত, খেলাফে সুন্নাত, বিদআত ও শিরক-কুফর বিষয়াদি আমি অন্যান্য গ্রন্থে আলোচনা করেছি। 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে[৬১৭], 'ফুরফুরার পীর আবূ জাফর সিদ্দিকী রচিত আল-মাউযূআত' গ্রন্থের পর্যালোচনায়[৬১৮], 'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা গ্রন্থে[৬১৯] এবং রাহে বেলায়াত গ্রন্থে[৬২০] আলোচনা করেছি। মূলত আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াতের পথে অগ্রসর হতে নেককার মানুষদের সাহচর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেককার মানুষদের ভালবাসা, তাদের সাহচর্য গ্রহণ, তাদের সাথে মাঝে মাঝে বসে আল্লাহর নৈকট্য বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি কর্ম শুধু ইবাদতই নয়; উপরন্তু অন্যান্য ইবাদত পালনের সহায়ক। এ ইবাদত পালনের জন্যই পীর-মুরিদী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে মুসলিম সমাজে। ক্রুসেড যুদ্ধোত্তর এবং বিশেষত তাতার আক্রমনোত্তর মুসলিম বিশ্বে সূফী মাশাইখগণ-ই মূলত দীনী দাওয়াতের ধারা অব্যাহত রাখেন। পাশাপাশি তাসাউফের নামে ব্যাপক শিরক-বিদআত ও কুসংস্কার সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়। অগণিত জাল হাদীস এ সকল শিরক ও বিদআতের সমর্থনে তৈরি করা হয়। এ সকল জাল হাদীসের একটি:

مَنْ لاَ شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ

"যার শাইখ (পীর) নেই তার শাইখ (পীর) শয়তান।"

এ বইয়ের প্রথম পর্বে "জাল হাদীস চিহ্নিতকরণে বাঙালী আলিমগণ" শীর্ষক নবম পরিচ্ছেদে দেখেছি যে, এ কথাটি হাদীস হিসেবে ভিত্তিহীন ও জাল কথা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা কোনো সাহাবী-তাবিয়ী থেকে কোনোরূপ সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদেও কথাটি বর্ণিত হয় নি। অনেক পরের যুগের কোনো কোনো বুজুর্গ এ কথাটি বলেছেন। এ কথাটির ভাল ও খারাপ অর্থ হতে পারে।

**(ক)** কুরআন-হাদীসের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য আলিমগণের সহযোগিতা গ্রহণ মুমিনের জন্য জরুরী । আল্লাহ বলেন: "তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর"[৬২১]। আল্লাহ আরো বলেন: "প্রত্যেক জনগোষ্ঠী থেকে কিছু মানুষ বেরিয়ে যেয়ে দীনের বিষয়ে ফিকহ অর্জন করবে; যেন তারা ফিরে এসে তাদের জনপদকে ভয় প্রদর্শন করে; ফলে তারা সতর্ক হবে।"[৬২২] এজন্য আলিমগণের কোনোরূপ সাহচর্য ও সহযোগিতা ছাড়া একাকী কুরআন-হাদীস পড়ে নিজে যা বুঝলাম সেটিকেই চূড়ান্ত বলে হঠকারিতা করা মুমিনকে শয়তানের খপ্পরে ফেলতে পারে। এ অর্থে হয়ত অতীত যুগের কোনো আলিম এ কথাটি বলে থাকতে পারেন।

**(খ)** এ কথাটি থেকে অনেকেই দাবি করেন যে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কোনো 'একজন' মানুষকে 'শাইখ' বা 'পীর' হিসেবে গ্রহণ করা জরুরী। যদি কেউ কোনো মানুষকে পীর না 'ধরে' তবে সে শয়তানের মুরীদ হিসেবে গণ্য হবে এবং সে নাজাত বা জান্নাত লাভ করবে না। এরূপ ধারণা ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তি।

**(গ)** ইলম বা তাযকিয়া অর্জনের জন্য সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ীগণের যুগে নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে 'পীর' বা 'শাইখ' হিসেবে গ্রহণ করার কোনো প্রচলন ছিল না। তাঁরা সকল নেককার মানুষকে আল্লাহর জন্য ভালবাসতেন, কিছু মানুষকে বিশেষভাবে ভালবাসতেন এবং তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করতে সর্বদা চেষ্টা করতেন। কিন্তু কখনোই একজনকে নির্দিষ্ট করতেন না। সাহচর্য গ্রহণের নামে 'বাইয়াত' গ্রহণ করার কোনোরূপ প্রচলন তাঁদের মধ্যে ছিল না। তাঁরা উন্মুক্ত সাহচর্য গ্রহণ করতেন। আবূ নুআইম ইসপাহানীর হিলইয়াতুল আওলিয়া ও ৪র্থ শতকের তাসাউফ বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে উমার ইবন আব্দুল আযীয, হাসান বসরী, ইবন সিরীন, সুফইয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, ইবরাহীম ইবনুল আদহাম, বিশর আল-হাফী, যুন্নুন মিসরী, হারিস মুহাসিবী, জুনাইদ বাগদাদী ও 'সূফী' হিসেবে প্রসিদ্ধ অন্যান্যদের জীবনী অধ্যয়ন করলেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন। ৪র্থ-৫ম হিজরী শতক থেকে একজন নির্দিষ্ট নেককার মানুষের সাহচর্য গ্রহণের প্রবণতা বাড়তে থাকে। তবে তখনও 'বাইয়াত' পদ্ধতি ছিল না। আরো কয়েক শত বৎসর পরে বাইয়াতের মাধ্যমে পীর-মুরীদি পদ্ধতির প্রচলন হয়।

**(গ)** উপরের বইগুলো পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, মুজাদ্দিদ আলফ সানী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলবী-সহ ভারতের ও বিশ্বের প্রসিদ্ধ সূফীগণ একমত যে, 'পীরের মুরীদ হওয়া' ইবাদত নয়; উপকরণ মাত্র। ঈমান ও তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে বেলায়াত লাভের জন্য এটি সহায়ক উপকরণ। মুমিনের বেলায়াত নির্ভর করবে তার ঈমান ও তাকওয়ার গভীরতার উপরে, মুরীদ হওয়ার উপরে নয়। মুরীদ হয়ে বা না হয়ে, নির্দিষ্ট একজনের সাহচর্য নিয়ে বা বিভিন্ন মানুষের সাহচর্য নিয়ে মুমিন বেলায়াত অর্জন করতে পারেন। বিষয়টি অনেকটা মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার মতই। মাদরাসায় ভর্তি হওয়া কোনো ইবাদত নয়; ইলম শিক্ষা করা ইবাদত। মাদরাসায় ভর্তি না হয়ে বিভিন্ন আলিমের মজলিসে যেয়ে, বাড়িতে বইপত্র পড়ে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে ইলম শিক্ষা করলেও মুমিন একইরূপ সাওয়াব লাভ করবেন। মাদরাসায় ভর্তি হওয়াকে ইবাদত বা ইবাদতের অংশ মনে করলে তা বিদআতে পরিণত হয়। অর্থাৎ কেউ যদি মনে করেন যে, ইলম শিক্ষা করি বা না করি মাদরাসায় ভর্তি হলেই ইবাদত পালন হয়ে গেল, অথবা মাদরাসায় ভর্তি না হয়ে বিভিন্ন আলিমের বাড়িতে বা দরসে যেয়ে বা অন্যভাবে যতই ইলম অর্জন করুক ইলম শিক্ষার ইবাদত এতে পালিত হবে না তবে তিনি বিদআতে লিপ্ত।

**(ঘ)** "যার শাইখ নেই তার শাইখ শয়তান" কথা দ্বারা অনেকে দাবি করেন আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে কোনো মানুষের মধ্যস্থতা প্রয়োজন। কোনো একজন মানুষের মধ্যস্থতা ছাড়া আল্লাহর রহমত, বরকত বা বেলায়াত লাভ সম্ভব নয়। এরূপ বিশ্বাস সন্দেহাতীতভাবেই শিরক।

### ২০. শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কালি উত্তম

ইলেমের ফযীলতে বানানো একটি জাল হাদীস:

مِدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ

"শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কালি উত্তম।" সাখাবী, যারকানী, মোল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস জানিয়েছেন যে, কথাটি খুব সুন্দর শোনালেও তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয়। যারকাশী বলেছেন: বাক্যটি আসলে তাবিয়ী হাসান বসরীর (রাহ) উক্তি।[৬২৩]

### ২১. আমার উম্মতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত

আলিম ও ধার্মিকদের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি বাক্য:

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرائِيْلَ

"আমার উম্মতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয়, বরং তাঁর নামে প্রচালিত একটি ভিত্তিহীন, সনদহীন মিথ্যা, বানোয়াট ও জাল কথা।[৬২৪] অনেক ওয়ায়িয এ মিথ্যা হাদীসকে কেন্দ্র করে বানোয়াট গল্প বলেন যে, মূসা (আ)-এর সাথে নাকি রাসূলুলাহ ﷺ-এর এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল! নাউযু বিল্লাহ! কি জঘন্য বানোয়াট কথা!!

এখানে উল্লেখ্য যে, আলিমদের ফযীলতে বর্ণিত একটি হাসান হাদীস:

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ

"আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।"

তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটি সংকলন করেছেন। আমাদের উচিত বানোয়াট কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলে গোনাহগার না হয়ে এ সকল গ্রহণযোগ্য হাদীস আলোচনা করা।

**২২. আলিমের চেহারার দিকে তাকানো**

আলিমদের ফযীলতে বানানো অন্য একটি জাল হাদীস:

نَظْرَةٌ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً صِيَاماً وَقِيَاماً

"আলিমের চেহারার দিকে তাকানো আল্লাহর কাছে ৬০ বছরের সিয়াম (রোযা) ও কিয়াম (তাহাজ্জুদের) ইবাদতের চেয়ে অধিক প্রিয়।"

অন্য জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

النَظَرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ

"আলিমের চেহারার দিকে তাকানো একটি এবাদত।"

এ দুটি বাক্যের কোনটিই হাদীস নয়। মুহাদ্দিসগণ বাক্য দুটিকে মিথ্যা বা বানোয়াট হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।[৬২৫]

**২৩. আলিমের ঘুম ইবাদত**

এ ধরনের আরেকটি জাল 'হাদীস':

نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادة

"আলিমের ঘুম ইবাদত।" মোল্লা আলী কারী বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা (মারফূ হাদীস) হিসেবে এ বাক্যটির কোন অস্তিত্ব নেই।"[৬২৬]

**২৪. মুর্খের ইবাদতের চেয়ে আলিমের ঘুম উত্তম**

অনুরূপ আরেকটি ভিত্তিহীন জাল কথা:

نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ/أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ

"মুর্খের ইবাদতের চেয়ে আলিমের ঘুম উত্তম।"

দুটি বাক্যই জাল। সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ কোনো সনদেই এ কথা দুটির কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে কাছাকাছি অর্থে একটি যয়ীফ হাদীস আছে:

نَوْمٌ عَلَى عِلْمٍ خَيْر مِن صَلاة عَلَى جَهْلٍ

"ইলম-সহ নিদ্রা যাওয়া মুর্খতা-সহ সালাত আদায় করা থেকে উত্তম।"[৬২৭]

**২৫. আলিমের সাহচর্য হাজার রাকআত সালাতের চেয়ে উত্তম**

এ বিষয়ে অন্য একটি বানোয়াট হাদীস:

حُضُور مَجْلِسِ عَالِمٍ أَفْضَلُ من صلاة ألفِ ركعةٍ

"একজন আলিমের মাজলিসে উপস্থিত হওয়া এক হাজার রাক'আত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।"

মুহাদ্দিসগণ বাক্যটিকে মিথ্যা হাদীস বলে গণ্য করেছেন।[৬২৮] এ জাল হাদীসটির উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আরেকটি কথা তৈরি করা হয়েছে: 'ওলীদের সাহচর্যে এক মুহূর্ত থাকা একশত বৎসর রিয়াহীন নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।" সৎ ও নেককার

মানুষদের সাহচর্যে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কিন্তু সাহচর্যের এ ফযীলত বানোয়াট।

**২৬. আসরের পরে লেখাপড়া না করা**

আমাদের দেশে অনেক আলিম ও তালিবুল ইলমদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, আসরের পরে লেখাপড়া করলে চোখের ক্ষতি হয়। একটি বানোয়াট হাদীস থেকে ধারণাটির উৎপত্তি। উক্ত বানোয়াট হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ أَحَبَّ كَرِيْمَتَيْهِ فلا يَكْتُبَنَّ بَعْدَ الْعَصْرِ

"যে ব্যক্তি তার চক্ষুদ্বয়কে ভালবাসে সে যেন আসরের পরে না লেখে।"

কথাটি হাদীস নয়। এর কোন ভিত্তি নেই। কম আলোতে, অন্ধকারে বা আলো-আঁধারিতে লেখাপড়া করলে চোখের ক্ষতি হতে পারে। ডাক্তারগণ এ বিষয়ে অনেক কিছু বলতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন হাদীসে নেই।[৬২৯]

**২৭. চীনদেশে হলেও জ্ঞান সন্ধান কর**

আমাদের দেশের বহুল পরিচিত একটি কথা:

اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ

"চীনদেশে হলেও জ্ঞান সন্ধান কর।"

অধিকাংশ মুহাদ্দিস একে জাল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ একে অত্যন্ত দুর্বল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। সনদ বিচারে দেখা যায় দু'জন অত্যন্ত দুর্বল রাবী, যারা মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করতেন শুধুমাত্র তারাই হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসাবে প্রচার করেছেন।[৬৩০]

**২৮. রাতের কিছু সময় ইলম চর্চা সারা রাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম**

একজন লেখক বলেন: "বোখারী শরীফের আরও একটি হাদীসে আছে:

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا

অর্থাৎ: হযরত (দ:) বলিয়াছেন, রাত্রির এক ঘন্টা পরিমাণ (দ্বীনী) ইলেম শিক্ষা করা সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকিয়া ইবাদত করার চেয়েও ভাল।"[৬৩১]

এ কথাটি সহীহ বুখারী তো দূরের কথা অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থেই রাসূলুল্লাহর ﷺ বাণী হিসাবে সংকলিত হয় নি। সুনান দারিমীতে অত্যন্ত দুর্বল সনদে ইবনু আব্বাসের (রা) বাণী হিসাবে কথাটি সংকলিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে এ অর্থে যা কিছু বলা হয়েছে সবই জাল ও বানোয়াট।[৬৩২]

**২৯. ইলম, আমল ও ইখলাসের ফযীলত**

ইলম, আমল ও ইখলাসের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। পাশাপাশি কিছু জাল হাদীস সমাজে প্রচলিত। যেমন:

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ مَوْتَى/هَلْكَى إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَلْكَى إِلاَّ الْعَامِلُوْنَ وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ غَرْقَى إِلاَّ الْمُخْلِصُوْنَ وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيْمٍ

"সকল মানুষ মৃত/ ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত, শুধু আলিমগণ ছাড়া। আলিমগণ সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত শুধু আমলকারীগণ ছাড়া। আমলকারীগণ সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত/ডুবন্ত শুধু মুখলিসগণ ছাড়া। মুখলিসগণ কঠিন ভয়ের মধ্যে।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ কথাগুলো জাল। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ সনদেও তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয় নি। দরবেশ হূত বলেন: "সামারকানদী তার 'তানবীহুল গাফিলীন' পুস্তকে এ 'হাদীস'টি উল্লেখ করেছে। আর ওয়াযিযগণ তা নিয়ে মাতামাতি করেন। এ পুস্তকটিতে অনেক মিথ্যা ও মাউযূ হাদীস রয়েছে। এজন্য পুস্তকটির উপর নির্ভর করা যায় না।"[৬৩৩]

**৩০. ইল্‌ম সন্ধান করা পূর্বের পাপের মার্জনা**

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে নিম্নের হাদীসটি সংকলন করেছেন:

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى

"যদি কোনো ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করে, তবে তা তার পূর্ববর্তী পাপের জন্য ক্ষতিপূরণ (বা পাপমোচনকারী) হবে।"[৬৩৪]

ইমাম তিরমিযী ছাড়াও দারিমী, তাবারানী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটি সংকলন করেছেন। সকলেই 'অন্ধ আবূ দাঊদ' নুফাই ইবনুল হারিস-এর মাধ্যমে হাদীসটি সংকলন করেছেন। তিনি ১৫০ হিজরীর দিকে ইন্তিকাল করেন। সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, এ ব্যক্তি হাদীসের নামে মিথ্যা বলতেন।

সমসাময়িক প্রসিদ্ধ তাবিয়ী কাতাদা ইবনু দি'আমা (১১৭ হি) তাকে মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, প্রসিদ্ধ তাবে-তাবিয়ী হাম্মাম ইবনু ইয়াহইয়া (১৬৫ হি) বলেন, 'অন্ধ আবূ দাউদ' আমাদের কাছে এসে হাদীস বলতে থাকেন। তিনি সাহাবী বারা ইবনু আযিব (৭৩ হি), সাহাবী যাইদ ইবনু আরকাম (৬৮ হি) প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস শুনেছেন বলে দাবি করেন। তিনি দাবি করেন যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ১৮ জন সাহাবী থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা করেছেন। তখন আমরা প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস কাতাদার কাছে তার বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেন লোকটি মিথ্যা বলছে। সে এ সকল সাহাবীকে দেখে নি বা তাদের থেকে কোনো কিছু শুনে নি। কারণ কয়েক বছর আগে মহামারীর সময়েও তাকে আমরা দেখেছি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াতে।[৬৩৫]

ইমাম বুখারী, আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আবু হাতিম রাযী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। এই ব্যক্তিটি ছাড়া অন্য কেউ কোনো সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। এ ব্যক্তি দাবি করেন যে, তাকে আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ নামক এক ব্যক্তি বলেছেন, তাকে তার পিতা সাখবারাহ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ কথাটি বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ নামক ব্যক্তিটিও অপরিচিত। অন্ধ আবূ দাউদ ছাড়া আর কেউ তার নাম উল্লেখ করেন নি বা তাকে চিনেন বলে উল্লেখ করেন নি। অনুরূপভাবে এ 'সাখবারাহ' নামক সাহাবীর কথাও এ 'অন্ধ আব্দুল্লাহ' ছাড়া কেউ কখনো উল্লেখ করেন নি। এ নামে কোনো সাহাবী ছিলেন বলে অন্য কোনো সূত্র থেকে জানা যায় না।[৬৩৬]

হাদীসটি উল্লেখ করে উপরের বিষয়গুলোর দিকে ইঙ্গিত করে ইমাম তিরমিযী বলেন: "এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। আবূ দাঊদ দুর্বল। আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ এবং তার পিতার বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এ অন্ধ আবূ দাঊদের বিষয়ে কাতাদা এবং অন্যান্য আলিম কথা বলেছেন।"[৬৩৭]

ইমাম তিরমিযী এখানে হাদীসটির সনদ দুর্বল বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। দুর্বলতার পর্যায় উল্লেখ করেন নি। আমরা জানি যে, দুর্বল বা যয়ীফ হাদীসের এক প্রকার 'জাল' হাদীস। যে দুর্বল হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত সে দুর্বল হাদীসকে জাল হাদীস বলে গণ্য করা হয়। এ কারণে পরবর্তী কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে 'জাল' বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী এই হাদীস উল্লেখ করে বলেন:

فِيْهِ أَبُوْ دَاوُدَ الأَعْمَى وَهُوَ كَذَّابٌ

"এর সনদে অন্ধ আবূ দাউদ রয়েছেন যিনি একজন প্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদী।"[৬৩৮]

**৩১. খালি পায়ে ভাল কাজে বা ইলম শিখতে যাওয়া**

ইলম শিক্ষার জন্য বা কোনো ভাল কাজে পথ চলার জন্য খালি পায়ে চললে বেশি সাওয়াব হবে বলে কিছু কথা প্রচলিত আছে। এগুলো সবই বাতিল কথা ও জাল হাদীস।[৬৩৯]

**৩২. ইলম যাহির ও ইলম বাতিন**

আলামা ইবনু হাজার আসকালানী, সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, ইলমুল বাতিন বা বাতিনী ইলমকে যাহেরী ইলম থেকে পৃথক বা গোপন কোন বিষয় হিসাবে বর্ণনা করে যে সকল হাদীস প্রচলিত সেগুলো সবই বানোয়াট ও মিথ্যা।[৬৪০]

আমাদের সমাজে এ বিষয়ে সত্য ও মিথ্যা অনেক সময় মিশ্রিত হয়েছে এবং অনেক সহীহ বা হাসান হাদীসকে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা জানি যে, মানুষের জ্ঞানের দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় হলো কোনো কিছু 'জানা'। দ্বিতীয় পর্যায় হলো, এ 'জানা' মনের গভীরে বা অবচেতনে বিশ্বাসে পরিণত হওয়া। যেমন, একজন মানুষ জানেন যে, 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর', অথবা 'ধূমপানে বিষপান'। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ধূমপান করেন। কিন্তু তিনি কখনই বিষপান করেন না। কারণ তার এ জ্ঞান সুগভীর বিশ্বাসে পরিণত হয়

নি। যখন তা বিশ্বাসে পরিণত হবে তখন তিনি আর ধূমপান করতে পারবেন না, যেমন তিনি বিষপান করতে পারেন না।

ধর্মীয় বিধিবিধানের বিষয়েও জ্ঞানের এরূপ দু'টি পর্যায় রয়েছে। একজন মানুষ জানেন যে প্রজ্জ্বলিত আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিলে তিনি পুড়ে যাবেন। একারণে তিনি কখনোই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিবেন না। তাকে ধাক্কা দিয়ে আগুনে ফেলতে গেলেও তিনি প্রাণপণে বাধা দিবেন। আবার এ মানুষটিই 'জানেন' ও 'বিশ্বাস করেন' যে, 'নামায কাযা করলে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে পুড়তে হবে', কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি 'নামায কাযা' করেন। কারণ তার এ 'জ্ঞান' ও 'বিশ্বাস' প্রকৃত পক্ষে মনের গভীরে বা অবচেতন মনের গভীর বিশ্বাসের জ্ঞানে পরিণত হয় নি। যখন এ জ্ঞানটি তার গভীর বিশ্বাসের জ্ঞানে পরিণত হবে তখন তিনি কোনো অবস্থাতেই নামায কাযা করতে পারবেন না, যেমনভাবে তিনি কোনো অবস্থাতেই আগুনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না। তিনি জাহান্নামের আগুন হৃদয় দিয়ে অবলোকন ও অনুভব করতে পারবেন।

এজন্য আমরা জানি যে, একজন সাধারণ ধার্মিক মুসলিম, যিনি সাধারণভাবে ফজরের নামায জামাআতে আদায় করেন, তিনি যদি রাতে দেরি করে ঘুমাতে যান তাহলে হয়ত ফজরের জামাতের জন্য তার ঘুম ভাঙ্গবে না। কিন্তু এ ব্যক্তিরই যদি ভোর ৪টায় ট্রেন বা গাড়ি থাকে তাহলে কয়েকবার রাতে ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কারণ গাড়ি ফেল করলে কিছু অসুবিধা হবে বা ক্ষতি হবে এই জ্ঞানটি তার অবচেতন মনের বা 'কালবের' জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু নামাযের জামাআত ফেল করলে কিছু ক্ষতি হবে এ জ্ঞানটি সে প্রকারের গভীর জ্ঞানে পরিণত হয় নি। যখন তা এরূপ গভীর জ্ঞানে বা 'কালবেরর জ্ঞানে' পরিণত হবে তখন ফজরের জামাআতের জন্যও তার বারবার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

প্রথম পর্যায়ের জ্ঞানের পালন ও আচরণই জ্ঞানকে দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে যায়। সকল ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। 'ধূমপানে বিষপান' এ জ্ঞানটিকে যদি কারো মনে বারংবার উপস্থিত করা হয়, সে তা পালন করে, ধূমপানের অপকারিতার দিকগুলো বিস্তারিত পাঠ করে, এ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা ইত্যাদিতে উপস্থিত হয়, তবে এক পর্যায়ে এ জ্ঞান তার গভীর জ্ঞানে পরিণত হবে এবং তিনি ধূমপান পরিত্যাগ করবেন। অনুরূপভাবে 'গীবত জাহান্নামের পথ' এ জ্ঞানটি যদি কেউ বারংবার আলোচনা করেন, এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলো বারংবার পাঠ করেন, আখিরাতের গভীর বিশ্বাসে তিনি এর শাস্তি মন দিয়ে অনুভব করেন... তবে এক পর্যায়ে তিনি 'গীবত' পরিত্যাগ করবেন। তার মনই তাকে 'গীবত' করতে বাধা দিবে।

আমরা জানি, দু পর্যায়ের জ্ঞানই জ্ঞান। প্রথম পর্যায়ের জ্ঞানের আলোকে আল্লাহ বান্দাদের হিসাব নিবেন। যে ব্যক্তি জেনেছে যে, নামায কাযা করা হারাম, কিন্তু তার পরও সে তা কাযা করেছে, তার জন্য তার কর্মের শাস্তি পাওনা হবে। আর জ্ঞান যখন দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন তা মানুষের জন্য আল্লাহর পথে চলা অতি সহজ ও আনন্দদায়ক করে তোলে। হাদীসে জ্ঞানকে এ দিক থেকে দু পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এ অর্থে ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন,

إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِى الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ

"অনেক মানুষ কুরআন পাঠ করে; কিন্তু তা তাদের গলার নিচে নামে না (হৃদয়ে গভীর জ্ঞানে পরিণত হয় না)। কিন্তু যখন তা অন্তরে পৌঁছে যায় এবং গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তা তার কল্যাণ করে।"[৬৪১]

প্রখ্যাত তাবিয়ী হাসান বসরী (১১০ হি) বলেছেন:

الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَتِلْكَ (فَذَلِكَ) حُجَّةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ (ابْنِ آدَمَ)، وَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ.

"ইলম বা জ্ঞান দুই প্রকারের: (১) জিহ্বার জ্ঞান, যা আদম সন্তানের বিরুদ্ধে আল্লাহর প্রমাণ ও (২) অন্তরের জ্ঞান। এ জ্ঞানই উপকারী জ্ঞান।"[৬৪২]

হাসান বসরীর এ উক্তিটির সনদ নির্ভরযোগ্য। তবে অন্য সনদে এ 'উক্তিটি' হাসান বসরীর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বর্ণিত হয়েছে। এক সনদে পরবর্তী এক রাবী দাবি করেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উপরের বাক্যটি বলেছেন। অন্য সনদে পরবর্তী রাবী দাবি করেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, জাবির (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উপরের বাক্যটি বলেছেন। এ দুটি সনদকে কোনো কোনো আলিম দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে আল্লামা মুনযিরী হাদীসটির সনদ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৪৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, এক হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেছেন:

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ

"আমি রাসূলুলাহ (ﷺ) থেকে ইলম-এর দুটি পাত্র সংরক্ষণ করেছি। একটি পাত্র প্রচার করেছি। অন্য পাত্রটি যদি প্রচার করি

তবে আমার গলা কাটা যাবে।"[৬৪৪]

এ হাদীসটিকে কেউ কেউ ইলমুল বাতিন-এর প্রতি ইঙ্গিত বলে বুঝাতে চেয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে এখানে আবূ হুরাইরা (রা) উমাইয়া যুগের যালিম শাসকদের বিষয়ে ইঙ্গিত করছেন। খিলাফতে রাশিদার পরে যালিম শাসকদের আগমন, দ্বীনি বিষয়ে অবহেলা ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এবং ইয়াযীদ ও অন্যান্য যালিম শাসকের নামও বলেছিলেন। আবূ হুরাইরা এবং অন্যান্য অনেক সাহাবী উমাইয়া যুগে এ বিষয়ক হাদীসগুলো বলার ক্ষেত্রে এ ধরনের কথা বলতেন।[৬৪৫]

এভাবে মুহাদ্দিসগণ একমত করেছেন যে, 'ইলমুল বাতিন' শব্দ কোনো সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি। এছাড়া ইলম যাহির ও ইলম বাতিনের বিভাজনও কোনো হাদীসে করা হয় নি। "ইলম যাহির" ও "ইলম বাতিন" পরিভাষায় দুটির উদ্ভাবন ও বিভাজন বিষয়ক সকল কথাই শিয়াদের জালিয়াতি ও অপপ্রচার। তবে পরবর্তী যুগের অনেক সুন্নী আলিম ও বুজুর্গ "ইলম যাহির" ও "ইলম বাতিন" পরিভাষাদ্বয় ব্যবহার করেছেন। তারা উপরের হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞান 'ইলমুল ক্বাল্ব' বা অন্তরের জ্ঞানকে অনেক সময় 'ইলমুল বাতিন' বলে অভিহিত করেছেন। এ জ্ঞান কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান বা শরীয়তের জ্ঞান থেকে ভিন্ন কিছু নয়। বরং এ জ্ঞান হলো কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের প্রকৃত ও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়। কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান অবিরত চর্চা, পালন ও অনুশীলনের মাধ্যমে যখন অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে এবং অবচেতন মন থেকে মানুষের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাকে 'ইলুমুল ক্বালব' বা 'ইলমুল বাতিন' বলা হয়।

উভয় ক্ষেত্রেই "ইলম" বা জ্ঞান একই, তা হলো, কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞান। এ জ্ঞান যদি "যাহির" অর্থাৎ মানুষের প্রকাশ্য অঙ্গ জিহ্বায়, মুখে বা কথায় অবস্থান করে তবে তাকে "ইলমুলয যাহির" বা প্রকাশ্য অঙ্গের ইলম" বলা হয়। আর যদি তা আভ্যন্ত রীণ অঙ্গ বা "কালব"-এ অবস্থান করে তবে তাকে "ইলমুল বাতিন" বা লুক্কায়িত অঙ্গের ইলম বলা হয়। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে "যাহির" ও "বাতিন" শব্দদ্বয় ইলমের বিশেষণ নয়, বরং ইলমের ইযাফত বা অবস্থান বুঝায়। কিন্তু শিয়াদের প্রচারণা ও সাধারণ আলিম ও বুজুর্গগণের অসতর্কতায় যাহির ও বাতিন শব্দদ্বয়কে ইলমের বিশেষণ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। ধারণা করা হয়েছে যে, ইলমই দু প্রকারের এক প্রকারের ইলম যাহির বা প্রকাশ্য যা কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি পাঠে জানা যায়। আরেক প্রকারের ইলম বাতিন বা লুক্কায়িত, এ ইলম বই পত্র পড়ে জানা যায় না, বরং অন্য কোনোভাবে জানতে হয়। আর এ ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং সকল বিভ্রান্তির দরজা উন্মোচন করে।

এভাবে ইলম যাহির ও ইলম বাতিন নামে অনেক প্রকারের ইসলাম বিরোধী কুসংস্কার মুসলিম সমাজে ছড়ানো হয়েছে। ইলম বাতিনকে গোপন কিছু বিষয় বা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের বাইরে অর্জনীয় কোনো বিষয় বলে দাবি করা হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু হাদীসও জালিয়াতগণ তৈরি করেছে। 'ইলম বাতিন ইলম যাহির থেকে পৃথক বা গোপন কোনো ইলম' এ অর্থে প্রচলিত সকল কথাই জাল। এ জাতীয় কয়েকটি জাল হাদীস উল্লেখ করছি:

**৩৩. বাতিনী ইলম গুপ্ত রহস্য নবী-ফিরিশতাগণও জানে না!**

জালিয়াতগণ হাসান বসরী পর্যন্ত জাল সনদ তৈরি করে বলেছে, হাসান বসরী (২২-১০৯হি) বলেছেন, আমি সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানকে (৩৬ হি) জিজ্ঞাসা করলাম, ইলম বাতিন কী? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলম বাতিন কী? তিনি বলেন, আমি জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলম বাতিন কী? তিনি বলেন, আমি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলম বাতিন কী? আল্লাহ বলেন,

يَا جِبْرِيْلُ، هُوَ سِرٌّ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَحِبَّائِيْ وَأَوْلِيَائِيْ وَأَصْفِيَائِيْ أُوْدِعُهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

"হে জিবরীল, তা হলো, আমার ও আমার প্রিয়পাত্র ও ওলীগণের মধ্যকার গোপন বিষয়। আমি তা তাদের অন্তরের মধ্যে প্রদান করি। কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা বা কোনো নবী-রাসূলও তা জানতে পারেন না।"

৫ম-৬ষ্ঠ হিজরী শতকের আলিম শীরাওয়াইহি ইবনু শাহরদার দাইলামী (৫০৯ হি) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-ফিরদাউস'-এ এ কথাটিকে হাদীস হিসাবে সংকলিত করেছেন। কিন্তু আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনু আর্‌রাক কিনানী, মোল্লা আলী কারী প্রমুখ প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস হাদীসটির জালিয়াতি উদ্ঘাটন করেছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ মিথ্যাবাদী ও হাদীস জালিয়াতি করতেন বলে প্রমাণিত। শুধু তাই নয়। জালিয়াতগণের কাজে কিছু ভুল থেকে যায়। এখানে তারা বলেছে, হাসান বসরী হুযাইফাকে (রা) প্রশ্ন করেছিলেন। অথচ প্রকৃত পক্ষে হাসান বসরী জীবনে হুযাইফাকে দেখেনও নি, তার কাছ থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা।[৬৪৬]

**৩৪. বাতিনী ইলম গুপ্ত রহস্য আল্লাহ ইচ্ছামত নিক্ষেপ করেন**

এ জাতীয় আরেকটি জাল ও বাতিল কথা হলো:

عِلْمُ الْبَاطِنِ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ، يَقْذِفُهُ فِيْ قُلُوْبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

"বাতিনের ইল্ম আল্লাহর গুপ্ত রহস্যগুলোর একটি এবং আল্লাহর বিধানাবলির একটি। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার অন্তরে চান তা নিক্ষেপ করেন।"

এ বাতিল কথাটি কেউ কেউ অন্যভাবে বলেছেন:

عِلْمُ الْبَاطِنِ سِرٌّ مِنْ سِرِّيْ أَجْعَلُهُ فِيْ قَلْبِ عِبَادِيْ وَلاَ يَقِفُ عَلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرِيْ

"বাতিনের ইল্ম আমার গুপ্ত রহস্যসমূহের একটি আমি আমার বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করি। আর আমি ছাড়া কেউ তা জানে না।"[৬৪৭]

হাদীসটির একটি সনদ আছে। সনদটি অজ্ঞাত পরিচয় রাবীগণের সমষ্টি। আল্লামা যাহাবী, সুয়ূতী, ইবনু আর্‌রাক প্রমুখ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মজার ব্যাপার হলো, আল্লামা সুয়ূতী নিজে হাদীসটিকে জাল হিসাবে চিহ্নিত করে তার 'যাইলুল লাআলী' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর 'আল-জামিউস সাগীর' গ্রন্থে হাদীসটি 'যয়ীফ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি দাবি করেছেন যে, 'জামি সাগীর' পুস্তকে তিনি কোনো জাল হাদীস উল্লেখ করবেন না। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সকল প্রাজ্ঞ আলেমেরই ভুল হতে পারে এবং কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না।[৬৪৮]

**৩৫. মানুষই আলাহর গুপ্ত রহস্য**

একটি জাল 'হাদীসে কুদসী'-তে বলা হয়েছে:

اَلإِنْسَانُ سِرِّيْ وَأَنَا سِرُّهُ

"মানুষ আমার গুপ্ত রহস্য এবং আমি মানুষের গুপ্ত রহস্য।"

কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন, সনদবিহীন বানোয়াট কথা।[৬৪৯]

**৩৬. বাতিনী ইলম লুক্কায়িত রহস্য শুধু আলাহওয়ালারাই জানেন**

এ অর্থে আরেকটি অত্যন্ত দুর্বল, অনির্ভরযোগ্য বা জাল কথা:

إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُوْنِ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ الْعُلَمَاءُ بِاللهِ فَإِذَا نَطَقُوْا بِهِ لاَ يُنْكِرُهُ إِلاَّ أَهْلُ الْغِرَّةِ بِاللهِ

"ইলমের মধ্যে এমন এক ইলম রয়েছে যা গোপনীয় বস্তুর মত। যে ইলম আল্লাহওয়ালা আলিমগণ ছাড়া কেউ জানে না। তাঁরা যখন তা উচ্চারণ করেন তখন আল্লাহর সম্পর্কে ধোকাগ্রস্ত ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করে না।"

দাইলামী ও অন্যান্য আলিম এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাঁরা তাঁদের সনদে নাসর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হারিস নামক এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির সূত্রে বলেছেন, এ ব্যক্তি বলেছেন, তাকে আব্দুস সালাম ইবনু সালিহ আবুস সালত হারাবী বলেছেন, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা থেকে, ইবনু জুরাইজ থেকে, আতা থেকে, আবূ হুরাইরা থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন...।

হাদীসটির রাবী নাসর ইবনু মুহাম্মাদ অজ্ঞাত পরিচয়। তার উস্তাদ হিসাবে উল্লিখিত আব্দুস সালাম ইবনু সালিহ অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। মিথ্যার প্রকারভেদ অনুচ্ছেদে আমরা তার বিষয়ে আলোচনা করেছি। একমাত্র এ মিথ্যাবাদী ছাড়া অন্য কারো সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয় নি।[৬৫০]

**৩৭. মি'রাজের রাতে ত্রিশ হাজার বাতিনী ইলম গ্রহণ**

আমরা আগেই বলেছি যে, বুজুর্গগণের নামে জাল গ্রন্থ রচনা বা তাদের গ্রন্থের মধ্যে জাল হাদীস ঢুকানো জালিয়াতগণের প্রিয় কর্ম। শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ)-এর নামে প্রচলিত 'সিররুল আসরার' নামক পুস্তকে নিম্নরূপে লেখা হয়েছে: "এ একান্ত গুপ্ত ত্রিশ হাজার এলম মেরাজ শরীফের রাতে আল্লাহ তাআলা হুযুর (ﷺ)-এর কলব মোবারকে আমানত রাখেন। হুযুর (ﷺ) তাঁর অত্যাধিক প্রিয় সাহাবা এবং আসহাবে সুফ্ফাগণ ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ লোকের কাছে সে পবিত্র আমানত ব্যক্ত করেন নি।..."[৬৫১]

যারা শাইখ আব্দুল কাদির (রাহ)–এর নামে এ জাল কথা প্রচার করেছে সে জালিয়াতগণকে আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রদান করবেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে কী জঘন্য ডাহা মিথ্য কথা! রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন প্রিয় সাহাবী বা একজন সুফ্ফাবাসী থেকেও এইরূপ কোনো কথা সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয় নি।

**৩৮. রাসূলুলাহর (ﷺ) বিশেষ বাতিনী ইলম**

জালিয়াতদের বানানো একটি কথা যা হাদীস বলে প্রচলিত:

لِيْ مَعَ اللهِ وَقْتٌ لاَ يَسَعُ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

"আল্লাহর সাথে আমার এমন একটি সময় আছে, যেখানে কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা বা প্রেরিত নবীর স্থান সংকুলান হয় না।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কথাটি ভিত্তিহীন সনদহীন একটি জাল কথা, যদিও সুফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে তা প্রচলন পেয়েছে। সূফী-দরবেশগণ সরল মনে যা শুনতেন তাই বিশ্বাস করতেন। ফলে জালিয়াতগণ তাদের মধ্যে জাল কথা ছড়াতে বেশি সক্ষম হতো।[৬৫২]

**৩৯. আলিম বা তালিব ইমলের জন্য ৪০ দিন কবর আযাব মাফ**

প্রচলিত একটি সনদবিহীন জাল হাদীস:

إِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ إِذَا مَرَّا بِقَرْيَةٍ فَإِنَّ اللهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً

"কোনো আলিম বা তালিব ইলম কোনো গ্রাম দিয়ে গমন করলে মহান আল্লাহ ৪০ দিনের জন্য সে গ্রামের গোরস্থানের আযাব উঠিয়ে নেন।"

কথাটি বানোয়াট ও মিথ্যা।[৬৫৩]

**৪০. আলিমের সাথে সাক্ষাতে রাসূলুলাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত**

প্রচলিত একটি জাল হাদীস:

مَنْ زَارَ عَالِماً/ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا (فَكَمَنْ) زَارَنِيْ وَمَنْ صَافَحَ عَالِماً/ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا (فَكَمَنْ) صَافَحَنِيْ وَمَنْ جَالَسَ عَالِماً/ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا (فَكَمَنْ) جَالَسَنِيْ وَمَنْ جَالَسَنِيْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا أَجْلَسَهُ اللهُ تَعَالَى مَعِيْ غَداً فِيْ الْجَنَّةِ/ أَجْلَسَهُ رَبِّيْ مَعِيْ فِيْ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أُجْلِسَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

"যে ব্যক্তি কোনো একজন আলিম/আলিমগণের সাথে সাক্ষাৎ করল, সে যেন আমার সাথেই সাক্ষাৎ করল, যে ব্যক্তি কোনো একজন আলিম/ আলিমগণের সাথে মুসাফাহা করল, সে যেন আমার সাথেই মুসাফাহা করল, যে ব্যক্তি কোনো একজন আলিম/আলিমগণের মাজলিসে বসল, সে যেন আমার মাজলিসেই বসল। আর যে দুনিয়াতে আমার মাজলিসে বসেছে মহান আল্লাহ তাকে আগামীকাল (কিয়ামতের দিন) আমার সাথে জান্নাতে বসাবেন।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে কথাটি জাল ও মিথ্যা।[৬৫৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে: (১) ইলম শিক্ষা করা, (২) নেককার মানুষদের সাহচর্যে থাকা এবং (৩) নেককার মানুষেদের আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা ও তাঁদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা। এ তিনটি ইবাদত মুমিনের নাজাতের অন্যতম উপকরণ। আলিমগণের সাহচর্য থেকেই এ তিনটি ইবাদত পালন করা যায়।

আলিমের নিজস্ব কোনো ফযীলত নেই। তাঁর ফযীলত নির্ভর করবে তিনি কুরআন ও হাদীস থেকে যতটুক ইলম ও আমল গ্রহণ করবেন তার উপর। অর্থাৎ আলিমের ফযীলত দুটি: ইলম ও আমল। নেককার আলিমের সাহচর্যের গুরুত্ব তিনটি: নেককার মানুষের সাহচর্যের সাধারণ মর্যাদা, নেককার মানুষের মহব্বতের সাধারণ মর্যাদা ও ইলম শিক্ষার সুযোগ...। এছাড়া আলিমের পিছনে সালাত আদায়, মাজলিসে বসা, সাক্ষাত করা, মুসাফাহা করা ইত্যাদির বিশেষ ফযীলতে যা কিছু বলা হয় সবই ভিত্তিহীন ও জাল কথা।

**৪১. যে দিন আমি নতুন কিছু শিখি নি সে দিন বরকতহীন**

প্রচলিত একটি বাতিল কথা যা হাদীস নামে প্রচলিত:

إِذَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ لاَ أَزْدَادُ فِيْهِ عِلْماً يُقَرِّبُنِيْ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَلاَ بُوْرِكَ لِيْ فِيْ طُلُوْعِ شَمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

"যদি আমার জীবনে এমন একটি দিন আসে যে দিনে আমি আল্লাহর নৈকট্য প্রদানকারী কোনো ইলম বৃদ্ধি করতে পারি নি, সে দিনের সূর্যোদয়ে আমার জন্য কোনো বরকত না হোক্।"

হাদীসটি আবূ নু'আইম ইসপাহানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাকাম ইবনু আব্দুল্লাহ নামক দ্বিতীয় শতকের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাকাম বলেন ইবনু শিহাব যুহরী তাকে এ হাদীসটি বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে আয়েশা থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে। আবূ নু'আইম বলেন: "এ হাদীসটি একমাত্র হাকাম ছাড়া কেউ বর্ণনা করে নি।"[৬৫৫]

হাকাম নামক এ ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, লোকটি একজন জালিয়াত ও জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিল। ইমাম আবূ

হাতিম রাযী বলেন, লোকটি জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিল। ইমাম দারাকুতনী, ইবনু আদী প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেন, এ লোকটি কঠিন জালিয়াত ছিল। সে একটি জাল পাণ্ডুলিপি বানিয়ে তাতে ৫০টিরও অধিক জাল হাদীস লিখে সেগুলো ইমাম যুহরীর নামে সাঈদ ইবনু মুসাইয়িবের সূত্রে প্রচার করে। এগুলো সবই জাল ও ভিত্তিহীন। এছাড়া আরো অনেক জাল সনদ তৈরি করে সে অনেক জাল হাদীস প্রচার করেছে। সকল মুহাদ্দিস একমত যে লোকটি পরিত্যক্ত, মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত।[৬৫৬]

হাকামের বানানো এ জাল হাদীসটির আরেকটি বর্ণনা:

إِذَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ لَمْ أَزْدَدْ فِيْهِ خَيْراً يُقَرِّبُنِيْ إِلَى اللهِ فَلاَ بُوْرِكَ لِيْ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ

"যদি আমার জীবনে এমন একটি দিন আসে যে দিনে আমি আল্লাহর নিকটবর্তী করার মত কোনো একটি ভাল কর্ম বৃদ্ধি করতে পারি নি, সে দিনে আমার জন্য কোনো বরকত না হোক্।"[৬৫৭]

**৪২. কুরআন দিয়ে হাদীস বিচার**

ইসলামী ইলম-এর মূল উৎস দু'টি: কুরআন ও হাদীস। আমরা দেখেছি যে, হাদীসের জ্ঞান কুরআনের জ্ঞানের অতিরিক্ত। তা কুরআনের ব্যাখ্যা হতে পারে বা কুরআনের সংযোজন হতে পারে। প্রথম পর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, এ মূলনীতির ভিত্তিতেই সাহাবীগণের যুগ থেকে সকল যুগে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা, সূত্র, উৎস, অর্থ ইত্যাদি বিচার করেছেন। এ ক্ষেত্রেও জালিয়াতগণ বিভিন্ন রকমের জালিয়াতি করেছে। এ সকল জালিয়াতির উদ্দেশ্য হলো, 'ডকুমেন্টারী' নিরীক্ষা না করে 'ইচ্ছামাফিক' 'অর্থ' বিচার করে হাদীস 'গ্রহণ' বা বর্জন করা। কেউ 'কুরআন দিয়ে হাদীস বিচার' করার পক্ষে জাল হাদীস বানিয়েছে। কেউ 'ভাল-মন্দ' অর্থ দেখে হাদীস বিচারের জন্য জাল হাদীস বানিয়েছে। কেউ নির্বিচারে 'ভক্তিভরে' হাদীস গ্রহণ করার জন্য জাল হাদীস বানিয়েছে। এ জাতীয় একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

إِذَا رُوِيَ عَنِّيْ حَدِيْثٌ (إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّيْ حَدِيْثاً) فَاعْرِضُوْهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَإِذَا وَافَقَهُ فَاقْبَلُوْهُ، وَإِنْ خَالَفَهُ فَرُدُّوْهُ

"যখন তোমাদেরকে আমার থেকে কোনো হাদীস বলা হবে, তখন তোমরা তা আল্লাহর কিতাবের উপরে পেশ করবে (কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখবে।) যদি তা আল্লাহর কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তা গ্রহণ করবে। আর যদি তা তার বিরোধী হয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করবে।"

এ 'হাদীস'টি এবং এ অর্থে বর্ণিত বিভিন্ন 'বাক্য' সবই ভিত্তিহীন। এ অর্থের অধিকাংশ বক্তব্যই সনদবিহীন মিথ্যা কথা। দু একটি বাক্য এ অর্থে সনদসহও বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর সনদে মাতরূক, মুনকার বা 'পরিত্যক্ত' ও মিথ্যায় অভিযুক্ত রাবী বিদ্যমান। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে ইসলামের গোপন শত্রু যিনদীকগণ এ সকল হাদীস তৈরি করে প্রচার করে।

স্বভাবতই কোনো হাদীসই কুরআন 'বিরোধী' হয় না। তবে 'ডকুমেন্টারী' প্রমাণ ছাড়া যদি 'কুরআন' দিয়ে হাদীস বিচার করা হয় তবে প্রত্যেকেই তার নিজ 'মর্জি' দিয়ে হাদীস বিচার করবে। একজন সহজেই বলতে পারবে যে, কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা নেই অতএব পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হাদীসগুলো কুরআন বিরোধী, কাজেই তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। অন্য ব্যক্তি বলবে, বৎসরপূর্তির পরে 'যাকাত' প্রদানের বিধান কুরআন বিরোধী। আরেকজন সহজেই বলতে পারবে, 'উকাশার প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী' কুরআনের ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কাজেই তা সহীহ। অথবা কুরআনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বলা হয়েছে, কাজেই 'আপনি না হলে বিশ্ব সৃষ্টি করতাম না' হাদীসটি সহীহ। অথবা কুরআনে সাহাবীদের প্রশংসা করা হয়েছে, কাজেই 'আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য' হাদীসটি সহীহ। এভাবে প্রত্যেকেই নিজের মর্জি মত দাবি দাওয়া করতে থাকত এবং মুসলিম উম্মাহ অন্তহীন বিভ্রান্তির আবর্তে পড়তেন। এ উদ্দেশ্যেই যিনদীকগণ এ হাদীসগুলো বানিয়েছিল। তবে মুহাদ্দিসগণের সনদ নিরীক্ষার ফলে তাদের জালিয়াতি ধরা পড়েছে।[৬৫৮]

**৪৩. 'ভাল' অর্থ দেখে হাদীস বিচার**

দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীসগুলোর মধ্যে রয়েছে:

مَا جَاءَكُمْ عَنِّيْ مِنْ خَيْرٍ قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ فَأَنَا أَقُوْلُهُ وَمَا أَتَاكُمْ مِنْ شَرٍّ فَإِنِّيْ لاَ أَقُوْلُ الشَّرَّ

"আমার পক্ষ থেকে কোনো 'কল্যাণ' বা 'ভালো' তোমাদের কাছে পৌঁছালে আমি বলি অথবা না-ই বলি, আমি তা বলি (তোমরা তা গ্রহণ করবে)। আর তোমাদের কাছে কোনো 'খারাপ' বা 'অকল্যাণ' পৌঁছালে (তা গ্রহণ করবে না); কারণ আমি 'খারাপ' বলি না।"

এ অর্থের অন্য একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ:

إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُوَافِقُ الْحَقَّ فَصَدِّقُوْهُ وَخُذُوْا بِهِ حَدَّثْتُ بِهِ أَوْ لَمْ أُحَدِّثْ

"যখন আমার পক্ষ থেকে কোনো হাদীস তোমাদেরকে বলা হবে যা 'হক্ক' বা সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন তোমরা তা গ্রহণ করবে- আমি তা বলি অথবা নাই বলি।"

এরূপ 'ভালমন্দ' অর্থ বিচার করে হাদীস গ্রহণের বিষয়ে আরো কয়েকটি 'হাদীস' বর্ণিত হয়েছে। এ অর্থে বর্ণিত কিছু হাদীস সন্দেহাতীতভাবে জাল ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত। এগুলোর সনদে সুপরিচিত মিথ্যাবাদী রাবী বিদ্যমান। আর কিছু হাদীস অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত, যেগুলোকে কেউ 'যয়ীফ' বলেছেন এবং কেউ 'মাউযূ' বলেছেন।

আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণের যুগ থেকেই হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে 'অর্থ' বিচার করা হয়। তবে যে কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে সর্ব-প্রথম বিচার্য হলো, কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন বলে প্রমাণিত কিনা। তিনি বলুন অথবা না বলুন, হক্ক, সত্য বা ভালর সাথে মিল হলেই তা 'নির্বিচারে' 'হাদীস' বলে গ্রহণ করার অর্থই হলো তিনি যা বলেন নি তা তাঁর নামে বলার পথ প্রশস্ত করা। আর অগণিত হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ক 'দুর্বল' হাদীসগুলোকেও অর্থগতভাবে বাতিল বলে গণ্য করেছেন। অনেক দুর্বল রাবী ভুল বশত এক হাদীসের সনদ অন্য হাদীসে জুড়ে দেন, মতন পাল্টে ফেলেন। এজন্য কখনো কখনো দুর্বল বা অজ্ঞাত পরিচয় রাবীর হাদীসও অর্থ বিচারে মাউযূ বা বাতিল বলে গণ্য করা হয়।[৬৫৯]

**৪৪. ভক্তিতেই মুক্তি!**

সাধারণ মানুষ যাতে 'নির্বিচারে' জাল হাদীসগুলো গ্রহণ করে, এজন্য জালিয়াতগণ 'ভক্তিতেই মুক্তি' মর্মে অনেক হাদীস বানিয়েছে। যেমন:

مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ شَيْءٌ فِيْهِ فَضِيْلَةٌ فَأَخَذَ بِهِ إِيْمَاناً بِهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللهُ ثَوَابَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ/ وَإِنْ كَانَ الَّذِيْ حَدَّثَهُ كَاذِباً

"যদি কারো কাছে কোনো 'ফযীলতের' বা সাওয়াবের কথা পৌঁছে এবং সে তা বিশ্বাস করে এবং সাওয়াবের আশায় তা গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ তাকে সে সাওয়াব দান করবেন; যদিও প্রকৃত পক্ষে তা সঠিক না হয়। অথবা তাকে যে কথাটি বলেছে সে যদি মিথ্যাবাদীও হয়।"

অনুরূপ আরেকটি মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস:

مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَضِيْلَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا لَمْ يَنَلْهَا

"যদি কারো কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফযীলত বা সাওয়াবের কথা পৌঁছে, কিন্তু সে তা সত্য বলে মেনে না নেয়, তবে সে ব্যক্তি সেই ফযীলতটি লাভ করবে না।"

দাজ্জালদের বানানো আরেকটি বানোয়াট কথা:

لَوْ حَسَّنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللهُ بِهِ

"যদি তোমাদের কেউ কোনো পাথরের ব্যাপারেও ভাল ধারণা পোষণ করে, তবে সে পাথর দ্বারাও আল্লাহ তার উপকার করবেন।"

এ কথাগুলো এবং এ অর্থে বর্ণিত সকল কথাই জঘন্য মিথ্যা, যা মিথ্যাবাদী দাজ্জাদলগণ বানিয়েছে এবং এগুলোর জন্য সনদও বানিয়েছে। তবে সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনার জন্য সনদ বলার অপরিহার্যতার রীতি প্রচলনের ফলে মুসলিম উম্মাহ এদের জালিয়াতি থেকে আত্মরক্ষার পথ পেয়েছেন। মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, এ সকল হাদীসের প্রত্যেকটির সনদেই মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বিদ্যমান। এজন্য তাঁরা এ সকল হাদীস জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। আর একাধিক সনদের কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস এগুলোকে 'অত্যন্ত দুর্বল' বলে উল্লেখ করে এগুলোর সহীহ হাদীস সম্মত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।[৬৬০]

**৪৫. কিছু সময় চিন্তা-ফিকর হাজার বৎসর ইবাদত থেকে উত্তম**

ইলমের ফযীলতে বানানো আরেকটি জাল হাদীস:

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ /سَبْعِيْنَ سَنَةً /أَلْفِ عَامٍ

"এক মুহূর্ত বা কিছু সময় চিন্তা-ফিক্র করা এক বছর ইবাদত করা থেকে উত্তম"। কেউ বলেছেন: ৭০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম। আর কেউ আরেকটু বাড়িয়ে বলেছেন: হাজার বৎসরের ইবাদত থেকে উত্তম।

মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি জাল বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসাবে তা মিথ্যা। কথাটি পূর্ববর্তী কোনো আলিমের উক্তি মাত্র।[৬৬১]

### ৪৬. চিন্তা-ফিক্‌র, মুরাকাবা ও ধ্যান

উপরের হাদীসটি জাল হলেও ইসলামে জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি হিসেবে চিন্তা-গবেষণাকে উৎসাহ দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। কুরআন ও হাদীসে 'তাফাক্কুর' ও 'তাদাব্বুর'-কে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কুরআনের আয়াতসমূহ নিয়ে, পূর্ববর্তী জাতিগুলোর পরিণতি নিয়ে, মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টি, প্রাণী, গ্রহ, নক্ষত্র, মানবীয় প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে তাফাক্কুর বা চিন্তা-ভাবনা করতে কুরআনে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৬৬২] তবে প্রচলিত অর্থে ধ্যান করতে কুরআন হাদীসে কোথাও নির্দেশ দেওয়া হয় নি।

এছাড়া পরবর্তী যুগের সূফীগণের মধ্যে প্রচলিত 'মুরাকাবা' শব্দটিকে এক্ষেত্রে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়। মুরাকাবা অর্থ ধ্যান নয়। মুরাকাবা অর্থ পর্যবেক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ (supervision/control)। ইমাম গাযালীর এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ও তাসাউফ বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, তাসাউফের পরিভাষায় 'মুরাকাবা' অর্থ আত্ম-পর্যবেক্ষণ বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ সর্বদা নিজের কর্মকাণ্ড নিজেই পর্যবেক্ষণ করা এবং নিজের আমলের উন্নতি-অবনতির বিষয়ে আত্ম-সমালোচনা ও আত্ম-পর্যবেক্ষণ।

'ধ্যান' (meditation) বলতে বর্তমানে এক ধরনের মিথ্যা কল্পনার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা বুঝানো হয়। এরূপ মিথ্যা কল্পনার মধ্যে ডুবে থেকে কিছু সময়ের জন্য নিজের মনকে বাস্তব দুশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি থেকে বিমুক্ত রাখা হয়। আত্ম-উন্নয়ন, মনোসংযোগ বৃদ্ধি, হতাশা-মুক্তি ইত্যাদির জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

**(ক)** এরূপ মিথ্যা কল্পনায় নিমগ্ন থাকাকে ইসলামী তাফাক্কুর অথবা 'মুরাকাবা' বলে আখ্যায়িত করা ইসলামের নামে মিথ্যাচার।

**(খ)** আত্মউন্নয়ন, মনোসংযোগ এবং দুশ্চিন্তা-হতাশা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর যিকর ও দুআ অনেক বেশি কার্যকর। জোর করে মনকে মিথ্যা কল্পনায় নিমগ্ন না রেখে যথাসম্ভব মনোযোগ সহকারে সামান্য সময় আল্লাহর যিকর ও দুআ করলে অনেক বেশি জাগতিক-মানসিক ফল পাওয়া যায়। পাশাপাশি সাওয়াব ও আত্মিক উন্নতি তো অপরিসীম।

### ৪৭. মারিফতের প্রাবল্যে আত্মবিলুপ্তি

যাহিরী ইলম, বাতিনী ইলম, মারিফাত, ফানা ইত্যাদি বিষয়ক দাজ্জাল জালিয়াতদের বানানো একটি গল্প একজন সরলপ্রাণ সুফীর বই থেকে উদ্ধৃত করছি: "হজরত (রাসূলুল্লাহ ﷺ) ঐশী উন্মাদনার মধ্যে এরূপ আত্ম-বিলুপ্ত হইতেন যে, প্রিয় সহধর্ম্মিনী আয়েশাকেও চিনিতে পারিতেন না। একদা আঁ-হজরত স্বীয় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: 'মান আন্তে' (তুমি কে)? হজরত আয়েশা বলিলেন, 'আনা আয়েশাতো' (আমি আয়েশা)। পুনরায় আঁ-হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মান আয়েশাতো' (আয়েশা কে)? তিনি বলিলেন, 'বিন্‌-তুচ্ছ ছিদ্দীক' (প্রথম খলিফা ছিদ্দিক কন্যা)। পুনরায় আঁ-হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, ছিদ্দিক কে? উত্তরে তিনি বলিলেন- 'মুহাম্মদের শ্বশুর'। যখন পুনরায় আঁ-হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মুহাম্মদ কে?' তখন হজরত আয়েশা স্বামীর অবস্থান্তর বুঝিতে পারিয়া নির্ব্বাক রহিলেন।"[৬৬৩]

মহান আল্লাহ্‌ জালিয়াতদেরকে লাঞ্ছিত করুন, জালিয়াতির অপবিত্রতা থেকে তাঁর প্রিয়তম মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পবিত্র আঙ্গিনাকে মুক্ত করুন, জালিয়াতদের বানানো "জাল ইসলাম" থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে রক্ষা করুন এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতের সকলকে তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন কারীম ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে জীবন গঠনের তাওফীক প্রদান করুন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ:
## সালাত ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ

### (ক) পবিত্রতা বিষয়ক

#### ১. 'কুলুখ' ব্যবহার না করলে গোর আযাব হওয়া

প্রচলিত একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে: "হাদীসে আছে, যাহারা বাহ্য-প্রস্রাবের পর কুলুখ ব্যবহার না করিবে তাহাদের ন্যায় কঠিন গোর আযাব কাহারও হইবে না"[৬৬৪]

কথাটি এভাবে ঠিক নয়। এভাবে একে হাদীস বললে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নামে মিথ্যা বলা হবে। সম্ভবত এখানে একটি সহীহ হাদীসের অনুবাদ বিকৃত ভাবে করা হয়েছে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, পেশাব থেকে ভালভাবে পবিত্র না হওয়া কবর আযাবের অন্যতম কারণ। একটি হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ

"কবরের অধিকাংশ শাস্তি পেশাব থেকে।"[৬৬৫]

উপরের কথাটি সম্ভবত এ হাদীসের বিকৃত অনুবাদ। এ হাদীস এবং এ অর্থের অন্য সকল হাদীসে পেশাব থেকে ভালভাবে পবিত্র হতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কোনো হাদীসেই বলা হয় নি যে, 'কুলুখ' ব্যবহার না করলে কোনো অন্যায় হবে বা শাস্তি হবে।

মলমূত্র ত্যাগের পর পরিপূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া ইসলামের অন্যতম বিধান। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ ইস্‌তিন্‌জার সময় কখনো শুধু পাথর বা ঢিলা ব্যবহার করতেন। শুধু পাথর বা কুলুখ ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করলে মূল ওয়াজিব আদায় হবে এবং কোনোরূপ অপরাধ বা গোনাহ হবে না। তবে পানি ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় উত্তম। বিভিন্ন হাদীসে পানি দ্বারা ইসতিনজা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণভাবে পানি দ্বারা ইসতিনজা করতেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[৬৬৬]

কুলুখ ও পানি উভয়ের ব্যবহার, অর্থাৎ প্রথমে পাথর বা কুলুখ ব্যবহারের পরে পানি ব্যবহারের কথা দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। ফকীহগণ এভাবে কুলুখ ও পানি উভয়ের ব্যবহার উত্তম বলে উল্লেখ করেছেন।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। মলমুত্র পরিত্যাগের পরে পবিত্র হওয়ার দুটি পর্যায় রয়েছে: **(ক)** পবিত্রতা। অর্থাৎ মলমুত্র ত্যাগের পরে বসা অবস্থাতেই পানি বা পাথর দ্বারা ময়লা স্থানকে পরিষ্কার করা। একে আরবীতে ইসতিনজা বা ইসতিজমার বলা হয়। (খ) সতর্কতা। এর অর্থ ইসতিনজার পরেও উঠে দাঁড়ালে বা হাঁটতে গেলে দু এক ফোটা পেশাব বেরিয়ে আসতে পারে বলে ভয় পেলে গলা খাঁকারি দিয়ে বা কয়েক পা হাঁটাচলা করে সন্দেহ থেকে মুক্ত হওয়া। আরবীতে একে 'ইসতিবরা' বলা হয়।

হাদীস শরীফে প্রথম পর্যায়ে ইসতিনজার জন্য পানি বা পাথর ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। একটি যয়ীফ হাদীসে পেশাবের পরে বসা অবস্থাতেই তিনবার পুরুষাঙ্গ টান দেয়ার কথা বলা হয়েছে।[৬৬৭] এ ছাড়া আর কোনো বিষয় হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ ইসতিনজার সময় পাথর বা 'কুলুখ' ব্যবহার করতে গিয়ে কখনো উঠে দাঁড়ান নি, হাঁটাচলা, লাফালাফি, গলাখাকারি ইত্যাদি কিছুই করেন নি। পেশাব ও পায়খানা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা স্বাভাবিকভাবে বসা অবস্থাতেই পাথর বা পানি ব্যবহার করে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেছেন।

পরবর্তী যুগের আলিমগণ সন্দেহের ক্ষেত্রে সতর্কতার জন্য এরূপ হাঁটা চলার বিধান দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, মানুষের তবিয়ত বিভিন্ন প্রকারের। যদি কারো একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে উঠে দাঁড়িয়ে বা দুই এক পা হেঁটে, গলাখাকারি দিয়ে বা এধরনের কোনো কাজের মাধ্যমে তারা 'পেশাব একদম শেষ হয়েছে' –এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে। আর যার মনে হবে যে, বসা অবস্থাতেই সে পরিপূর্ণ পাক হয়ে গিয়েছে তার জন্য সুন্নাতের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।[৬৬৮]

কাজেই কুলুখ করা বলতে যদি আমরা 'কুলুখ নিয়ে হাঁটাচলা করা' বুঝি, অথবা দাবি করি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ হাঁটাচলা করেছেন বা করতে বলেছেন তাহলে তাঁর নামে মিথ্যা দাবি করা হবে।

**২. বেলালের ফযীলতে কুলুখের উল্লেখ**

প্রচলিত একটি বইয়ে রয়েছে: "হযরত (ﷺ) একদিন বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে বিলাল! আমি মিরাজের রাত্রিতে বেহেস্তের মধ্যে তোমার পায়ের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি। বলত এরূপ পুণ্যের কোন্ কাজ তোমার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে? তদুত্তোরে বিলাল (রা) বলিলেন, **আমি বাহ্য-প্রসাবের পর কুলুখ ব্যবহার করি,** পবিত্রতার দিকে লক্ষ রাখি ও সদা সর্বদা অজুর সহিত থাকি। হুজুর ﷺ বলিলেন ইহাই তো সকল নেক কাজের মূল।"[৬৬৯]

বিভিন্ন হাদীসে বেলালের এ মর্যাদা প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় বর্ণিত: ওযু করলেই দু রাক'আত সালাত আদায় করা, আযান দিলেই দু রাক'আত সালাত আদায় করা এবং ওযু ভাঙ্গলেই ওযু করা। প্রথম বিষয়টি বুখারী ও মুসলিম সংকলিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়টি ইবনু খুযাইমা, হাকিম প্রমুখ মুহাদ্দিস কর্তৃক সংকলিত।[৬৭০] কুলুখের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যায় না। লক্ষণীয় যে, সাহাবীগণ মল-মূত্র পরিত্যাগের পরে কুলুখ ব্যবহার করতেন। এজন্য বিভিন্ন হাদীসে পানি ব্যবহার করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

**৩. খোলা স্থানে মলমুত্র ত্যাগ করা**

প্রচলিত একটি পুস্তকে রয়েছে: "হাদীসে আছে যারা খোলা জায়গায় বসিয়া বাহ্য-প্রসাব করিবে, ফেরেস্তাগণ তাহাদিগকে বদদোয়া করিতে থাকিবেন"।[৬৭১]

কথাটি এভাবে সঠিক নয়। খোলা বলতে মাথার উপরে খোলা বা চারিপাশে খোলা কোনো স্থানে মলমুত্র পরিত্যাগ করলে এরূপ বদদোয়ার কথা কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে বলে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও জানতে পারি নি। মলমুত্র ত্যাগের সময় সতর অন্য মানুষের দৃষ্টি থেকে আবৃত রাখা জরুরী। অন্য মানুষকে সতর দেখিয়ে মলমুত্র ত্যাগ করতে, মলমুত্র ত্যাগের সময় কথা বলতে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। এ ছাড়া মানুষের রাস্তায়, মানুষের পানির ঘাটে বা পুকুরে এবং মানুষের ব্যবহারের ছায়ায়

মলত্যাগকে হাদীস শরীফে অভিশাপের বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৭২]

**৪. ফরয গোসলে দেরি করা**

গোসল ফরয হলে তা দেরি করলে পাপ হবে বা সে অবস্থায় মাটির উপর হাঁটলে মাটি অভিশাপ দিবে ইত্যাদি সকল কথা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। গোসল ফরয হলে তা যথাসম্ভব দ্রুত সেরে নেয়া উত্তম। তবে গোসলের মূল প্রয়োজন সালাত আদায় বা কুরআন পাঠের জন্য। এছাড়া মুমিন গোসল ফরয থাকা অবস্থায় সকল কর্ম, যিক্‌র ও দোয়া করতে পারেন। কাজেই নামাযের ক্ষতি না হলে গোসল দেরি করলে গোনাহ হয় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক সময় প্রথম রাত্রিতে গোসল ফরয হলেও গোসল না করে শুয়ে পড়তেন এবং শেষ রাত্রিতে গোসল করতেন বলে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৬৭৩]

**৫. শবে বরাত বা শবে কদরের গোসল**

এ দু রাতে গোসল করার বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তা সবই বানোয়াট। এ দু রাত্রিতে গোসলের ফযীলতে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। পরর্বতীতে এ বিষয়ক জাল হাদীসগুলো উল্লেখ করার আশা রাখি।

**৬. ওযু, গোসল ইত্যাদির নিয়্যাত**

নিয়্যাত নামে 'নাওয়াইতু আন...' বলে যা কিছু প্রচলিত আছে সবই পরবর্তী যুগের আলিমদের বানানো কথা। এগুলোকে হাদীস মনে করলে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ নিয়্যাত পাঠ করেছেন বা এভাবে নিয়্যত করতে বলেছেন বলে মনে করলে বা দাবি করলে তা ভিত্তিহীন মিথ্যা দাবি হবে।

নিয়্যাত অর্থ উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা (inteneion)। উদ্দেশ্যের উপরেই ইবাদতের সাওয়াব নির্ভর করে। নিয়্যাত মানুষের অন্তরের আভ্যন্তরীণ সংকল্প বা ইচ্ছা, যা মানুষকে উক্ত কর্মে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করেছে। নিয়্যাত করতে হয়, বলতে বা পড়তে হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো জীবনে একটিবারের জন্যও ওযু, গোসল, নামায, রোযা ইত্যাদি কোনো ইবাদতের জন্য কোনো প্রকার নিয়্যাত মুখে বলেন নি। তাঁর সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-সহ চার ইমাম বা অন্য কোনো ইমাম ও ফকীহ কখনো কোনো ইবাদতের নিয়্যাত মুখে বলেন নি বা বলতে কাউকে নির্দেশ দেন নি।

পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম এগুলো বানিয়েছেন। তাঁরাও বলেছেন যে, মনের মধ্যে উপস্থিত নিয়্যাতই মূল, তবে এগুলো মুখে উচ্চারণ করলে মনের নিয়্যাত একটু দৃঢ় হয়। এজন্য এগুলো বলা ভালো। তাঁদের এ ভালোকে অনেকেই স্বীকার করেন নি। মুজাদ্দিদে আলফে সানী ওযু, নামায, রোযা ইত্যাদি যে কোনো ইবাদতের জন্য মুখে নিয়্যাত করাকে খারাপ বিদ'আত হিসাবে নিন্দা করেছেন এবং কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করেছেন। আমি **"এহ্ইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৬৭৪]

**৭. ওযুর আগের দোয়া**

ওযূর পূর্বে পাঠের জন্য প্রচলিত একটি দুআ[৬৭৫]:

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى دِيْنِ الإِسْلاَمِ، الإِسْلاَمُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ وَالإِسْلاَمُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ

এ দোয়াটি বানোয়াট। বিভিন্ন হাদীসে ওযুর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একটি হাদীসে 'বিসমিলাহ ওয়া আল-হামদু লিল্লাহ' (আল্লাহর নামে ও প্রশংসা আল্লাহ নিমিত্ত) বলার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তবে উপরের দোয়াটির কথা কোনো হাদীসে আছে বলে জানা যায় না।

**৮. ওযুর ভিতরের দোয়া**

বিভিন্ন পুস্তকে ওযুর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় পাঠের জন্য বিশেষ দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাত ধোয়ার দোয়া, কুল্লি করার দোয়া, নাক পরিষ্কার করার দোয়া ... ইত্যাদি। এ দোয়ার ভিত্তি যে হাদীসটির উপরে সে হাদীসটি বানোয়াট। ইমাম দারাকুতনী, ইমাম নাবাবী, ইমাম সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সকলেই হাদীসটিকে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৭৬]

**৯. ওযুর সময়ে কথা না বলা**

ওযুর সময়ে কথা বলা যাবে না, বা কথা বললে কোনোরূপ অন্যায় হবে এ মর্মে কোনো হাদীস নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তা কোনো কোনো আলিমের কথা মাত্র।

**১০. ওযুর পরে সূরা 'কাদ্‌র' পাঠ করা**

সহীহ হাদীসে ওযুর পরে পাঠ করার জন্য একাধিক দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। **'রাহে বেলায়াত'** গ্রন্থে আমি দোয়াগুলো সনদ সহ আলোচনা করেছি। আমাদের দেশে অনেক পুস্তকে এ সকল সহীহ দোয়ার বদলে কিছু বানোয়াট কথা লেখা হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থে

লেখা আছে: "অজু করিবার পর ছুরা ক্বদর পাঠ করিলে সিদ্দীকের দরজা হাছিল হইবে। (হাদীছ)"[৬৭৭]। 'আলীর প্রতি রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর ওসীয়ত' নামক জাল হাদীসটিতে এরূপ কিছু কথার উল্লেখ আছে। ওসীয়তটির বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

**(খ) মসজিদ ও আযান বিষয়ক**

**১. মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা**

মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য সালাত আদায়, আল্লাহর যিকির, দীনের আলোচনা ইত্যাদি। মসজিদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

"এগুলো শুধু আল্লাহর যিক্র, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য"[৬৭৮]

মসজিদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং হারানো বা পলাতক কিছু খোঁজ করতে, উচ্চস্বরে কথা বলতে বা চিৎকার করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।[৬৭৯] এ ছাড়া সাধারণ জাগতিক কথাবার্তা বলার কোনো সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয় নি। সাহাবীগণ মসজিদের মধ্যেই কবিতা পাঠ করতেন, জাহিলী যুগের গল্প-কাহিনী আলোচনা করতেন। জাবির (রা) বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيَتَحَدَّثُ أَصْحَابُهُ وَيَذْكُرُونَ حَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيُنْشِدُونَ الشِّعْرَ وَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ ﷺ.

"রাসূলুলাহ ﷺ যে স্থানে ফজরের সালাত আদায় করতেন সেখানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। সূর্যোদয়ের পরে তিনি উঠতেন। তাঁর বসা অবস্থায় সাহাবীগণ কথাবার্তা বলতেন, জাহেলী যুগের কথা আলোচনা করতেন, কবিতা পাঠ করতেন এবং হাসতেন। আর তিনি শুধু মুচকি হাসতেন।"[৬৮০]

আমাদের দেশে প্রচলিত কয়েকটি জাল হাদীসে মসজিদের মধ্যে 'দুনিয়ার কথা' বলার কঠিন নিন্দা করা হয়েছে। একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ:

مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلاَمِ الدُّنْيَا فِيْ الْمَسْجِدِ أَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً

"যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে 'দুনিয়াবী কথা' বলবে, আল্লাহ তার চল্লিশ বছরের আমল বাতিল বা বরবাদ করে দিবেন।"

আলামা সাগানী, তাহির পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আজলূনী প্রমুখ মুহাদ্দিস একবাক্যে হাদীসটিকে জাল বলেছেন। মোল্লা কারী বলেন: "এ কথাটি যেমন সনদগতভাবে বাতিল, তেমনি এর অর্থও বাতিল।"[৬৮১]

অনুরূপ আরেকটি জাল ও বানোয়াট কথা:

اَلْحَدِيْثُ فِيْ الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيْمَةُ الْحَشِيْشَ

"মসজিদে কথাবার্তা নেক আমল খায়, যেরূপ পশু ঘাস-খড় খায়।"

একই অর্থে আরেকটি জাল ও ভিত্তিহীন কথা

اَلْكَلاَمُ فِيْ الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

"মসজিদে কথাবার্তা নেক আমল খায়, যেরূপ আগুন কাঠ খায়।"

কোনো কোনো প্রসিদ্ধ আলিম জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে এ বাক্যটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইরাকী, ফাইরোযআবাদী, তাহির পাটনী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস একমত যে, এ বাক্যটি বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও সনদহীন একটি কথা যা রাসূলুলাহ (ﷺ) এর নামে বলা হয়েছে।[৬৮২]

**২. মসজিদে বাতি জ্বালানো ও ঝাড়ু দেয়া**

মসজিদ পরিষ্কার করা, ঝাড়ু দেয়া, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি সাধারণভাবে নেক কর্ম। কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ের মত এ বিষয়েও বিশেষ পুরস্কারের নামে কিছু জাল হাদীস বানানো হয়েছে। মসজিদে বাতি জ্বালালে এত এত সাওয়াব, বা এত হাজার ফিরিশতা তার জন্য দোয়া করবে, এত হজ্জ বা এত উমরার সাওয়াব মিলবে... ইত্যাদি সকল কথা বানোয়াট।[৬৮৩]

**৩. আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি চোখে বুলানো**

আমাদের দেশে অনেক ধার্মিক মুসলিম আযানের সময় "আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বাক্যটি শুনলে দুই হাতের আঙুলে চুমু খেয়ে তা দিয়ে চোখ মুছেন। এ মর্মে একটি বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীসকে সত্য মনে করেই তাঁরা এ কাজ করেন। এ বানোয়াট হাদীসটি বিভিন্ন ভাবে প্রচারিত। এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আযানের এ বাক্যটি শুনে নিজে মুখে বলবে:

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসাবে গ্রহণ করে", আর এ কথা বলার সাথে দু হাতের শাহাদত আঙ্গুলের ভিতরের দিক দিয়ে তার দু চক্ষু মুছবে তার জন্য শাফায়াত পাওনা হবে।

কেউ কেউ বলেন: আযানের এ বাক্যটি শুনলে মুখে বলবে:

مَرْحَباً بِحَبِيْبِيْ وَقُرَّةِ عَيْنِيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

"মারহাবা! আমার প্রিয়তম ও আমার চোখের শান্তি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহকে", এরপর তার বৃদ্ধাঙ্গলিদ্বয়কে চুমু খাবে এবং উভয়কে তার দু চোখের উপর রাখবে। যদি কেউ এরূপ করে তবে কখনো তার চোখ উঠবে না বা চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হবে না।

এ জাতীয় সকল কথাই বানোয়াট। কেউ কেউ এ সকল কথা আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। মোল্লা আলী কারী বলেন, "আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণনা প্রমাণিত হলে তা আমল করার জন্য যথেষ্ট হবে।" তবে হাদীসটি আবু বাকর (রা) থেকেও প্রমাণিত নয়। ইমাম সাখাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মোল্লা আলী কারীর বক্তব্যের টীকায় বর্তমান যুগের অন্যতম হানাফী ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সুফী আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ লিখেছেন, তাঁর উস্তাদ ও প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ যাহিদ কাওসারীর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মোল্লা আলী কারী এ বিষয়ে ইমাম সাখাবীর বিস্তারিত আলোচনা জানতে পারেন নি। ফলে তার মনে দ্বিধা ছিল। প্রকৃত বিষয় হলো, আবু বাকর (রা) বা অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটির কোনো প্রকার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় নি। মুহাদ্দিসগণ একমত হয়েছেন যে, এ বিষয়ক সকল বর্ণনা বানোয়াট।[৬৮৪]

**এখানে তিনটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:**

(১) রোগমুক্তি, সুস্থতা ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন 'আমল' অনেক সময় অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রহণ করা হয়। এজন্য এ প্রকারের 'আমল' করে ফল পাওয়ার অর্থ এটাই নয় যে, এগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কেউ রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে কোনো শরীয়ত সম্মত আমল করতে পারেন। তবে বিশুদ্ধ সনদ ছাড়া এরূপ 'আমল'-কে হাদীস বলা যায় না।

(২) রাসূলুলাহ (ﷺ)-কে মহব্বত করা ঈমানের অংশ ও অত্যন্ত বড় নেককর্ম। যদি কেউ এ জাল হাদীসটির জালিয়াতি অবগত না হওয়ার কারণে এর উপর আমল করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম শুনে হৃদয়ে মহব্বত ও ভালবাসা নিয়ে এভাবে আঙুলে চুমু খান, তবে তিনি এ জাল হাদীসে বর্ণিত সাওয়াব না পেলেও, মূল মহব্বতের সাওয়াব পাবেন, ইনশা আল্লাহ। তবে জেনেশুনে জাল হাদীসের উপর আমল করা জায়েয নয়।

(৩) এ জাল হাদীসের পরিবর্তে মুমিন একটি সহীহ হাদীসের উপর আমল করতে পারেন। দু হাতের আঙ্গুল দিয়ে চোখ মুছার বিষয়টি বানোয়াট হলেও উপরের বাক্যগুলো মুখে বলার বিষয়ে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যদি কেউ মুআযযিনকে শুনে বলে:

أَشْهَدُ (وَأَنَا أَشْهَدُ) أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا

"এবং আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি তুষ্ট ও সন্তুষ্ট আছি আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবী হিসেবে।"

রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেন, যদি কেউ এভাবে উপরের বাক্যগুলো বলে, তবে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে।"[৬৮৫]

**৪. আযানের জাওয়াবে 'সাদাকতা ও বারিরতা'**

ফজরের আযানে 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' শুনলে উত্তরে বলা হয়: "সাদাকতা ও বারিরতা (বারারতা)'। এ কথাটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "মুয়াযযিনকে যখন আযান দিতে শুনবে তখন মুয়াযযিন যা যা বলবে তোমরা তাই বলবে।"[৬৮৬] অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ছিলাম। তখন বিলাল দাঁড়িয়ে

আযান দিলেন। বিলাল আযান শেষ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "এ ব্যক্তি (মুয়াযযিন) যা বলল, তা যদি কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৬৮৭]

উপরের হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, মুয়াযযিন যা বলবেন, আযান শ্রবণকারী তাই বলবেন। কোনো ব্যতিক্রম বলতে বলা হয় নি। তবে মুসলিম সংকলিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো, মুয়াযযিন 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বললে, শ্রোতা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবেন। এ হাদীসে তিনি বলেছেন : "এভাবে যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের সাথে সাথে আযানের বাক্যগুলো অন্তর থেকে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৬৮৮]

তাহলে, উপরের দুটি বাক্য ছাড়া বাকি সকল বাক্য মুয়ায্যিন যেভাবে বলবেন, 'জওয়াব দানকারীও' ঠিক সেভাবেই বলবেন। 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' বাক্যটিও এর ব্যতিক্রম নয়। এর জওয়াবেও এ বাক্যটিই বলতে হবে। এ বাক্যটির জন্য ব্যতিক্রম কিছু বলতে হবে তা কোনো হাদীসে বলা হয় নি। এজন্য মোল্লা আলী কারী "সাদাকতা ওয়া বারিরতা" বাক্যটিকে জাল হাদীসের তালিকাভুক্ত করে বলেছেন: "শাফিয়ী মাযহাবের লোকেরা এ বাক্যটি বলা মুস্তাহাব বলেছেন, তবে হাদীসে এর কোন অস্তিত্ব নেই।"[৬৮৯]

**৫. আযানের দোয়ার মধ্যে 'ওয়াদ দারাজাতার রাফীয়াহ'**

রাসূলুলাহ ﷺ বলেন: "যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যেরূপ বলে তদ্রূপ বলবে। এরপর আমার উপর সালাত পাঠ করবে ; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ তাঁকে দশবার সালাত (রহমত) প্রদান করবেন। এরপর আমার জন্য 'ওসীলা' চাইবে ; কারণ 'ওসীলা' হলো জান্নাতের এমন একটি মর্যাদা যা আল্লাহর একজন মাত্র বান্দাই লাভ করবেন এবং আমি আশা করি আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে, তাঁর জন্য শাফায়াত প্রাপ্য হয়ে যাবে।"[৬৯০]

অন্যান্য হাদীসে তিনি 'ওসীলা' প্রার্থনার নিম্নরূপ পদ্ধতি শিখিয়েছেন:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً (الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ) الَّذِي وَعَدْتَهُ

"হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং আসন্ন সালাতের প্রতিপালক, আপনি প্রদান করুন মুহাম্মাদকে (ﷺ) ওসীলা এবং মহামর্যাদা এবং তাঁকে উঠান সম্মানিত অবস্থানে, যা আপনি তাঁকে ওয়াদা করেছেন।"

তিনি বলেছেন, "মুয়াযযিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি উপরের বাক্যগুলো বলবে, তাঁর জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত পাওনা হয়ে যাবে।"[৬৯১]

ইমাম বুখারীসহ সকল মুহাদ্দিস এভাবেই দোয়াটি সংকলন করেছেন। আমাদের দেশে প্রচলিত আযানের দোয়ার মধ্যে দুটি বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে, যা উপরের দোয়াটিতে নেই। প্রথম বাক্যটিতে (والفضيلة : ওয়াল ফাদীলাতা)-র পরে 'والدرجة الرفيعة'(এবং সুউচ্চ মর্যাদা) বলা এবং দ্বিতীয় বাক্যটি দোয়ার শেষে : 'إنك لا تخلف الميعاد' (নিশ্চয় আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না) বলা। দ্বিতীয় বাক্যটি একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৬৯২] আর প্রথম বাক্যটি (ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'আহ) একেবারেই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা হাদীস নির্ভর। ইবনু হাজার, সাখাবী, যারকানী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এই বাক্যটি (ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'য়াহ) বানোয়াট।[৬৯৩]

**৬. আযানের দুআয়: "ওয়ারযুকনা শাফাআতাহু"**

কেউ কেউ আযানের দুআর মধ্যে আরেকটি বাক্য সংযোজন করে বলেন: (وارزقنا شفاعته): "এবং আমাদেরকে তাঁর শাফাআত রিযক দান করুন/ প্রদান করুন"। এ বাক্যটিও ভিত্তিহীন। কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে আযানের দুআর মধ্যে এ বাক্যটি বর্ণিত হয় নি। আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শাফাআতের রিযক লাভের জন্য দুআ করার মধ্যে কোনো দোষ নেই। তবে দুটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়:

**প্রথম:** মাসনূন দুআর মধ্যে অতিরিক্ত কোনো শব্দ বা বাক্য সংযোজন বা পরিবর্তন হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে এবং সাহাবীগণ এরূপ কর্মের প্রতিবাদ করতেন। **"এহইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত কখন কোন্ দুআ করলে আল্লাহ সবচেয়ে খুশি হন এবং মুমিনের সবচেয়ে বেশি লাভ হয় তা সবচেয়ে ভাল জানতেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। কাজেই তাঁর শেখানো কোনো দুআর মধ্যে পরিবর্তন বা সংযোজনের অর্থ হলো তাঁর দুআটিকে অসম্পূর্ণ বলে ধারণা করা বা মাসনূন দুআতে পরিপূর্ণ ফযীলত, বরকত বা কামালাত লাভ হলো না বলে কল্পনা করা। এতে সুন্নাতকে অপছন্দ করা হয় ও বিদআতের উৎপত্তি

হয়। রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেছেন: (مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيْ): যে আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই (সে আমার উম্মাত নয়)।"[৬৯৪]

**দ্বিতীয়:** আযানের দুআয় শাফাআত প্রার্থনা সংযোজন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতিশ্রুতিতে অনাস্থা প্রমাণ করে। কারণ তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর শেখানো বাক্যে তাঁর জন্য "ওয়াসীলা" প্রার্থনা করবে তাঁর শাফাআত তার জন্য ওয়াজিব হবে। কাজেই মুমিন দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মাসনূন দুআ পাঠ করে দৃঢ় আশা করবেন যে, তাঁর জন্য শাফাআত পাওনা হলো।

**৭. আযানের সময় কথা বলার ভয়াবহ পরিণতি!**

আযানের সময় কথা বলার নিষেধাজ্ঞা বুঝাতে এ 'হাদীসটি' বলা হয়:

مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَ الأَذَانِ خِيْفَ عَلَيْهِ زَوَالُ الإِيْمَانِ

"যে ব্যক্তি আযানের সময় কথা বলবে, তার ঈমান বিনষ্ট হওয়ার ভয় আছে।" আলামা সাগানী, আজলূনী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, বাক্যটি হাদীসের নামে বানানো ভিত্তিহীন জাল কথা। আযানের সময় কথা বলা যাবে না মর্মে কোনো নির্দেশনা হাদীসে বর্ণিত হয় নি।[৬৯৫]

## (গ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বিষয়ক

**১. সালাতের ৫ প্রকার ফযীলত ও ১৫ প্রকার শাস্তি**

কুরআন-হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ৫ ওয়াক্ত ফরয সালাত যথাসময়ে আদায় করা মুমিনের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। সালাতই মুমিনের পরিচয় এবং ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য। সালাত পরিত্যাগকারী 'কাফিরদের দলভুক্ত' বলে গণ্য হবে। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতেরই হিসাব গ্রহণ করা হবে। এভাবে অগণিত সহীহ হাদীস থেকে আমার ফরয সালাতের গুরুত্ব ও সালাতে অবহেলার ভয়াবহ পরিণতি জানতে পারি।

কিন্তু সাধারণ মানুষদের অবাক করার জন্য জালিয়াতগণ এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বানিয়ে সমাজে প্রচার করেছে। দুঃখজনক বিষয় হলো, সমাজে প্রচলিত অনেক গ্রন্থেই কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসের পরিবর্তে এ সকল বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথাগুলো লেখা হয়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকারের ক্যালেন্ডার, পোস্টার ইত্যাদিতেও এ সকল বানোয়াট কথাগুলি লিখে প্রচার করা হয়। এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ জাল হাদীস আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত। এ জাল হাদীসটির সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

যে ব্যক্তি যথারীতি ও গুরুত্ব সহকারে নামায আদায় করবে আল্লাহ পাক তাকে পাঁচ প্রকারে সম্মানিত করবেন: রুজী রোজগার ও জীবনের সংকীর্ণতা হতে তাকে মুক্ত করবেন, তার উপর হতে কবরের আযাব উঠিয়ে দিবেন, কিয়ামতের দিন তার আমলনামা ডান হাতে দান করবেন, সে ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দিয়ে বিদ্যুতের মত পার হয়ে যাবে এবং বিনা হিসাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে অলসতা করে তাকে পনের প্রকারের শাস্তি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার দুনিয়াতে, তিন প্রকার মৃত্যুর সময় তিন প্রকার কবরে এবং তিন প্রকার কবর হতে বের হওয়ার পর। এ পনের বা চৌদ্দ প্রকারের শাস্তির বিস্তারিত বিবরণ প্রায় সকল প্রচলিত নামায শিক্ষা, আমলিয়াত ইত্যাদি বইয়ে পাওয়া যায়। এজন্য এ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাগুলো লিখে বইয়ের কলেবর বাড়াচ্ছি না।

এ দীর্ঘ হাদীসটি পুরোটিই ভিত্তিহীন ও জাল। কোনো হাদীসগ্রন্থে এ হাদীসটি পাওয়া যায় না। পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম তাদের ওয়ায নসীহত মূলক গ্রন্থে অন্য সকল প্রচলিত কথার সাথে এই কথাগুলোও হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের ইমামগণ সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, এই কথাগুলো বাতিল ও জাল কথা। কোন্ ব্যক্তি এ জালিয়াতি করেছে তাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী, সয়ূতী, ইবনু আর্‌রাক প্রমুখ মুহাদ্দিস এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৬৯৬]

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী (রাহ) তাঁর 'ফাযায়েলে নামায' গ্রন্থে এ জাল হাদীসটি আরবী ইবারত-সহ পুরোপুরি উল্লেখ করেছেন। তিনি হাদীসটি উল্লেখ করার আগে বলেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, এ কথাটি নাকি হাদীসে আছে.... । হাদীসটি উল্লেখ করার পরে তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, ইমাম যাহাবী, ইমাম সুয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটি জাল ও বাতিল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। এর সনদের জালিয়াতদের পরিচয়ও তাঁরা তুলে ধরেছেন।[৬৯৭]

এভাবে আল্লামা যাকারিয়া (রাহ) হাদীসটির জালিয়াতির বিষয়টি উল্লেখ করে তাঁর আমানত আদায় করেছেন। কিন্তু অনুবাদে এ আমানত রক্ষা করা হয় নি। আলামা যাকারিয়া (রাহ) -এর এ আলোচনা অনুবাদে উল্লেখ করা হয় নি। অনুবাদের শুরুতে বলা হয়েছে: "এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে.."। শেষে শুধুমাত্র লেখা হয়েছে 'যাওয়াজির ইবন হাজার মাক্কী (রাহ)'। এতে সাধারণ পাঠক একে নির্ভরযোগ্য হাদীস বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (ﷺ)-এর কথা বলেই বিশ্বাস করছেন। অথচ মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কোনো জাল হাদীসকে 'জাল' বলে উল্লেখ না করে 'হাদীস' বলে বর্ণনা করা কঠিন হারাম। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

**২. সালাত মুমিনদের মি'রাজ**

একটি অতি প্রচলিত ভিত্তিহীন সনদহীন জাল হাদীস

اَلصَّلاَةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"নামায মুমিনদের মিরাজ।"[৬৯৮]

এখানে লক্ষণীয় যে, এ অর্থের কাছাকাছি অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। মুমিন সালাতের মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করেন, সালাতে দাঁড়ালে আল্লাহ মুমিনের দিকে তাকিয়ে থাকেন... ইত্যাদি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এগুলোর পরিবর্তে অনেকে এ ভিত্তিহীন কথাটিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলে তাঁর নামে মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী হয়ে যান।

**৩. ৮০ হুক্বা বা ১ হুকবা শাস্তি**

"মাজালিসুল আবরার নামক কেতাবে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরমাইয়াছেন, যেই লোক সময়মত নামায পড়িল না, নামাযের ওয়াক্ত শেষ হইবার পরে কাযা পড়িল, সেই লোকও জাহান্নামে ৮০ হুকবা শাস্তি ভোগ করিবে। ৮০ বছরে এক হুকবা আর ৩৬০ দিনে এক বৎসর। ৩৬০ * ৮০ = ২৮,৮০০ দিন। অতএব তাকে ২৮,৮০০ দিন এক ওয়াক্ত নামায না পড়িবার জন্য দোজখের আগুনে জ্বলিতে হইবে। আর আখেরাতের দিন হইবে দুনিয়ার এক সহস্র বৎসরের তুল্য। এই হিসাবে এক ওয়াক্ত নামায তরককারীকে দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বৎসর জাহান্নামের আগুনে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"[৬৯৯]

শাইখুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া কান্ধালভী (রাহ) এ হাদীসটিকে তার 'ফাযায়েলে নামায' গ্রন্থে নিম্নরূপে উদ্ধৃত করেছেন:

مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ حَتَّى مَضَى وَقْتُهَا ثُمَّ قَضَى عُذِّبَ فِيْ النَّارِ حُقْباً، وَالْحُقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً، وَالسَّنَةُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْماً، كُلُّ يَوْمٍ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ.

"যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করল না, এবং এরপর সে কাযা করল, তাকে জাহান্নামে এক হুক্বা শাস্তি প্রদান করা হবে। এক হুকবা ৮০ বছর এবং এক বৎসর ৩৬০ দিন এবং প্রত্যেক দিনের পরিমাণ এক হাজার বৎসরের সমান।" হাদীসটি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন:

كذا في مجالس الأبرار. قلت: لم أجده فيما عندي من كتب الحديث

"মাজালিসুল আবরার নামক গ্রন্থে এভাবে লিখা হয়েছে। আমার বক্তব্য হলো, আমার নিকটে যত হাদীসের পুস্তক রয়েছে সেগুলোর কোনো পুস্তকেই আমি এ হাদীসটি দেখতে পাই নি।..."[৭০০]

আর তাঁর মত একজন মুহাদ্দিস যে হাদীস কোনো হাদীসের গ্রন্থে খুঁজে পান নি সে হাদীসের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বস্তুত, হাদীসটি ভিত্তিহীন ও সনদহীন একটি বানোয়াট কথামাত্র। কোথাও কোনো প্রকার সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট সনদেও এ কথাটি সংকলিত হয় নি। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে শেষ যুগের কোনো কোনো আলিম তা নিজ গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে সংকলন করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ কথাটি যে কোনো হাদীসের গ্রন্থে নেই এবং 'মাজালিসুল আবরার'-এর লেখক সনদবিহীনভাবে তা উল্লেখ করেছেন, তা জানা সত্ত্বেও অনেক ভাল আলিম ওয়ায়ে-আলোচনায় এবং লিখনিতে এ 'হাদীস' ও অনুরূপ অনেক জাল ও দুর্বল হাদীস উল্লেখ করেন। মানুষের হেদায়েতের আগ্রহেই তাঁরা তা করেন। মনে হয়, তাঁরা চিন্তা করেন, কুরআন কারীমের হাজার হাজার আয়াত এবং প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত হাজার হাজার সহীহ হাদীস মানুষদের হেদায়াত করতে আর সক্ষম নয়। কাজেই এগুলোর পাশাপাশি কিছু দুর্বল (!) হাদীসও আমাদের না বলে উপায় নেই!! অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, জাল বলে সন্দেহকৃত হাদীস উল্লেখ করাও হাদীস জালিয়াতির মতই কঠিনতম পাপ। আমরা কি অন্যের হেদায়তের আগ্রহে নিজেদের জন্য জাহান্নাম ক্রয় করব?!

**৪. জামাআতে সালাত আদায়ে নবীগণের সাথে হজ্জ**

জামাআতে সালাত আদায় করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। কুরআনে মুমিনগণকে একত্রে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অগণিত সহীহ হাদীসে জামাআতে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জামাআত ছেড়ে একা সালাত আদায়কারীকে মুনাফিক বলা হয়েছে। আযান শোনার পরেও যে ব্যক্তি অসুস্থতা বা ভয়ের ওযর ছাড়া জামাআতে না এসে একা সালাত আদায় করবে তার সালাত কবুল হবে না বলে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে।

'জামাতে সালাত আদায়ের' বিধান সম্পর্কে ফিকহী পরিভাষাগত মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, কেউ বলেছেন ওয়াজিব ও কেউ বলেছেন ফরয। এ মতভেদ একান্তই পরিভাষাগত। কারণ সকলেই একমত যে, পুরুষের জন্য ওযর ছাড়া ফরয সালাত একা আদায় করলে কঠিন গোনাহ হবে। সালাত হবে কি না সে বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে।

এ সকল সহীহ হাদীসের পাশাপাশি জালিয়াতগণ এ বিষয়ে অনেক জাল হাদীস তৈরি করেছে। আর এ বিষয়েও সহীহ হাদীসগুলো

বাদ দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সব জাল হাদীসই বই পুস্তকে লেখা হয় ও ওয়াযে বলা হয়। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইশা ও ফজরের সালাত জামাতে আদায় করলে সারারাত্র তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের সাওয়াব হবে, ফজরের সালাত জামাতে আদায় করলে আল্লাহর দায়িত্বে থাকা যাবে ... ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল 'সামান্য' সাওয়াবের কথায় মন না ভরায় জালিয়াতগন বানিয়েছে:

مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فِيْ الْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا حَجَّ مَعَ آدَمَ خَمْسِيْنَ حَجَّةً..

"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করল সে যেন আদম (আ) এর সাথে ৭০ বার হজ্জ করল ...।" এভাবে প্রত্যেক ওয়াক্তের সাথে একজন নবীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে...।[৭০১]

অনুরূপ বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে: যে ব্যক্তি ফজর ও ইশার সালাত জামাতে আদায় করল, সে যেন আদমের (আ) পিছনে সালাত আদায় করল...। এভাবে এক এক সালাতের জন্য এক এক নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে...।[৭০২]

**৫. মুত্তাকী আলিমের পিছনে সালাত নবীর পিছনে সালাত**

জামাআতে সালাত আদায়ের কারণে সাওয়াব বৃদ্ধির কথা সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। বিভিন্ন হাদীসে কুরআনের তিলাওয়াত ও জ্ঞানে পারদর্শী, হাদীসের জ্ঞানে পারদর্শী, হিজরত ও অন্যান্য নেক আমলে অগ্রবর্তী ব্যক্তিগণকে ইমামতি প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে ইমামের 'তাকওয়া' বা 'ইলমের' কারণে মুক্তাদিগণের 'সাওয়াব' বা 'বরকত' বেশি হবে, এরূপ অর্থে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। এ অর্থে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই অত্যন্ত যয়ীফ অথবা বানোয়াট। এইরূপ একটি ভিত্তিহীন কথা:

مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ

"যে ব্যক্তি কোনো মুত্তাকি আলিমের পিছনে সালাত আদায় করল, সে যেন একজন নবীর পিছনে সালাত আদায় করল।"

ফিক্হের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হেদায়া'-র প্রণেতা আল্লামা আলী ইবনু আবী বাক্‌র মারগীনানী (৫৯২ হি) জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে এ কথাটিকে হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এ কথাটি কোনো হাদীস নয়। কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে তা কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। এজন্য আল্লমা যাইলায়ী, ইরাকী, ইবনু হাজার, সুয়ূতী, সাখাবী, তাহির পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আজলূনী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ কথাটিকে জাল হাদীস হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছেন।[৭০৩]

**৬. আলিমের পিছনে সালাত ৪৪৪০ গুণ সাওয়াব**

এই জাতীয় আরেকটি বানোয়াট কথা হলো,

اَلصَّلاَةُ خَلْفَ الْعَالِمِ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ صَلاَةً

'আলিমের পিছনে সালাতে ৪৪৪০ গুণ সাওয়াব।'[৭০৪]

**৭. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাক'আত সংখ্যার কারণ**

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাক'আত সংখ্যা ১৭ হলো কেন, ফজর ২ রাক'আত, যুহর ৪ রাক'আত, আসর ৪ রাক'আত, মাগরিব ৩ রাক'আত ও ইশা ৪ রাক'আত হলো কেন, বিত্‌র ৩ রাক'আত হলো কেন, ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত সকল কথাই ভিত্তিহীন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ওয়াক্তের সালাতকে বিভিন্ন নবীর আদায় করা বা প্রতিষ্ঠিত বলে যে সকল গল্প বলা হয় সবই ভিত্তিহীন। এ জাতীয় অনেক ভিত্তিহীন কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত। এখানে একটি গল্প উল্লেখ করছি।

আমাদের দেশে অতি প্রসিদ্ধ কোনো কোনো পুস্তকে লেখা হয়েছে: "বেতের নামায ওয়াজিব হইবার কারণ এই যে, এরশাদুত্বালেবীন কিতাবে লিখিত আছে হযরত (ﷺ) মেরাজ শরীফে যাইবার সময়ে যখন বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত তাশরীফ নিয়াছিলেন তখন সমস্ত পয়গম্বরের রুহ মোবারক হযরত (ﷺ)-এর সাক্ষাত ও আশীর্বাদের জন্য আসিলে জিব্রাইল (আ) এর আদেশানুযায়ী হযরত (ﷺ) ইমাম হইয়া এক রাকাত নামায পড়িলেন। তার পর মিকাইল (আ) ৭০ হাজার ফেরেশতা লইয়া হযরত (ﷺ)-এর মোলাকাত ও দোয়ার প্রত্যাশী হইলে জিব্রাইল (আ)-এর আদেশ অনুযায়ী রাসূল (ﷺ) পূনরায় আরও এক রাকাত নামায পড়িলেন। ইহার পর ইস্রাফীল (আ) ৭০ হাজার ফেরেশতা লইয়া হযরত (ﷺ)-এর দোওয়ার প্রত্যাশী হইলে জিব্রাইল (আ)-এর হুকুম অনুযায়ী আবার হযরত (ﷺ) তাহাদিগকে মুক্তাদি করিয়া এক রাকাত নামায পড়িলেন। অতঃপর আজরাঈল (আ) বহু ফেরেশতা লইয়া এরূপ বাসনা করিয়া উপস্থিত হইলে জিব্রাইল (আ) বলিলেন, হে প্রিয় পয়গম্বর আপনি ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া দোওয়া কুনুত পাঠ করান। হযরত (ﷺ) তাহাই করিলেন সুতারং ঐ তিন রাকাত নামাযই আমাদের উপর ওয়াজিব হইয়াছে এবং বেতের নামাযে দোওয়া কুনূত পড়াও ওয়াজেব হইয়াছে।"[৭০৫]

কোনো কোনো জালিয়াত ঘুরিয়ে বলেছে যে, তিনি মি'রাজের রাত্রিতে মূসা (আ) এর জন্য এক রাক'আত, তাঁর নিজের জন্য আরেক রাক'আত এবং শেষে আল্লাহর নির্দেশে তৃতীয় রাক'আত সালাত আদায় করেন।...[৭০৬]

**৮. উমরী কাযা**

সালাত মুমিনের জীবনের এমন একটি ফরয ইবাদত যার কোনো বিকল্প নেই বা কাফ্ফারা নেই। যতক্ষণ হুশ বা চেতনা থাকবে সালাত আদায় করতেই হবে। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, দৌড়িয়ে, হেঁটে, ইশারায় বা যেভাবে সম্ভব সালাত আদায় করতে হবে। চেতনা রহিত হলে সালাত মাফ হয়ে যাবে।

কোনো বিশেষ কারণে একান্ত বাধ্য হয়ে দুই এক ওয়াক্ত সালাত ছুটে গেলে কাযা করতে হবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক ওয়াক্তের সালাতের কাযা করার কোনোরূপ বিধান হাদীস শরীফে দেয়া হয় নি। কারণ, কোনো মুসলিম সালাত পরিত্যাগ করতে পারে, এরূপ চিন্তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের যুগে ছিল না। সাহাবীগণ বলতেন, একজন মুসলিম অনেক পাপ করতে পারে, কিন্তু মুসলিম কখনো সালাত পরিত্যাগ করতে পারে না।

পরবর্তী যুগের মুসলিম ফকীহগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করলে সে ব্যক্তি কাফির বা অমুসলিমে পরিণত হবে। কেউ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি 'সালাতের' গুরুত্ব পুরোপুরি স্বীকার করেন, কিন্তু অলসতা হেতু সালাত ত্যাগ করেছেন, তিনি 'কাফিরের মত' কঠিন পাপী বলে গণ্য হবেন, কিন্তু 'কাফির' বা অমুসলিম বলে গণ্য হবেন না। আর যদি কেউ মনে করেন যে, ৫ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত আদায় না করেও তিনি নামাযী মুসলমানদের মতই মুসলমান, তাহলে সে ব্যক্তি সালাতের গুরুত্ব অস্বীকার করার কারণে প্রকৃত কাফির বলে গণ্য হবেন।

সর্বাবস্থায় সকলেই একমত যে, ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ সময়ের সালাত পরিত্যাগ করলে পরে সে সালাতের 'কাযা' করার বিষয়ে হাদীসে কোনোরূপ বিধান দেয়া হয় নি। তবে জালিয়াতগণ এ বিষয়ে কিছু জাল হাদীস তৈরি করেছে। এছাড়া সমাজে কিছু প্রচলিত ভিত্তিহীন কথাবার্তাও এ বিষয়ে প্রচলিত আছে। দু'টি ক্ষেত্রে তা ঘটেছে। প্রথমত, উমরী কাযা ও দ্বিতীয়ত, কাফ্ফারা বা এস্কাত। এ বিষয়ে জালিয়াতদের বানানো একটি হাদীস:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ تَرَكْتُ الصَّلاَةَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَاقْضِ مَا تَرَكْتَ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ أَقْضِيْ؟ فَقَالَ: صَلِّ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ صَلاَةً مِثْلَهَا، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَبْلُ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لاَ بَلْ قَبْلُ

"এক ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমি সালাত পরিত্যাগ করেছি। তিনি বলেন, তুমি যা পরিত্যাগ করেছ তা 'কাযা' কর। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কিভাবে তা 'কাযা' করব? তিনি বলেন, প্রত্যেক ওয়াক্তের সালাতের সাথে অনুরূপ সালাত আদায় কর। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আগে, না পরে? তিনি বলেন, না, বরং আগে।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ হাদীসটি জাল, ভিত্তিহীন ও বাতিল।[৭০৭] যদি কোনো মুসলিম দীর্ঘদিন সালাতে অবহেলার পরে অনুতপ্ত হয়ে নিয়মিত সালাত শুরু করেন, তখন তার প্রধান দায়িত্ব হবে বিগত দিনগুলোর পরিত্যক্ত সালাতের জন্য বেশি বেশি করে কাঁদাকাটি ও তাওবা করা। এর পাশাপাশি, অনেক ফকীহ বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি পরিত্যক্ত সালাতগুলো নির্ধারণ করে তা 'কাযা' করবেন। এভাবে 'উমরী কাযা' করার কোনো নির্ধারিত বিধান কুরআন বা হাদীসে নেই। এ হলো সাবধানতামূলক কর্ম। আশা করা যায় যে, তাওবা ও কাযার মাধ্যমে আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করবেন।

**৯. কাফ্ফারা ও এস্কাত**

ইসলামে সিয়াম বা রোযার জন্য কাফ্ফারার বিধান রয়েছে। কোনো মুসলিম অপারগতার কারণে সিয়াম পালন করতে না পারলে এবং কাযার ক্ষমতাও না থাকলে তিনি তার প্রতিটি ফরয সিয়ামের পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে প্রতিটি সিয়ামের পরিবর্তে একটি ফিত্‌রার পরিমাণ খাদ্য প্রদানের বিধান দিয়েছেন ফকীহগণ।

কিন্তু সালাতের জন্য এরূপ কোনো কাফ্ফারার বিধান হাদীসে নেই। কারণ সিয়ামের ক্ষেত্রে যে অপারগতার সম্ভাবনা রয়েছে, সালাতের ক্ষেত্রে তা নেই। যতক্ষণ চেতনা আছে, ততক্ষণ মুমিন ইশারা-ইঙ্গিতে যেভাবে পারবেন সেভাবেই তার সাধ্যানুসারে সালাত আদায় করবেন। কাজেই অপারগতার কোনো ভয় নেই। আর দীর্ঘস্থায়ীভাবে চেতনা রহিত হলে সালাতও রহিত হবে।

তবুও পরবর্তী যুগের কোনো কোনো ফকীহ সাবধানতামূলকভাবে সালাতের জন্যও কাফফারার বিধান দিয়েছেন। নিয়মিত সালাত আদায়কারী কোনো মুমিন যদি মৃত্যুর আগে অসুস্থতার কারণে কিছু সালাত আদায় করতে না পারেন, তবে মৃত্যুর পরে তার জন্য সিয়ামের মত প্রত্যেক সালাতের বদলে একটি করে 'ফিতরা' প্রদানের বিধান দিয়েছেন।

কেউ কেউ এ বিধানকে আবার আজীবন সালাত পরিত্যাগকারী ও সালাতকে অবজ্ঞা ও উপহাসকারীর জন্যও প্রয়োগ করেছেন। এরপর খাদ্যের বদলে কুরআন প্রদানের এক উদ্ভট বিধান দিয়েছেন। প্রচলিত একটি পুস্তকে এ বিষয়ে লিখা হয়েছে: "এস্কাত করিবার নিয়ম এই যে, প্রথমত মুর্দার বয়স হিসাব করিবে। তম্মধ্য হইতে পুরুষের বার বছর ও স্ত্রী লোকের ৯ বছর (নাবালেগী) বয়স বাদ দিয়া বাকী বয়সের প্রত্যেক বৎসর ৮০ তোলা সেরের ওজনের ১০ মন ও ১০ সের ময়দার মূল্য ধরিয়া । ঐ মূল্যের পরিবর্তে নিজে এক জেলদ কোরআন শরীফ সকলের সম্মুখে কোন গরীব মিছকীনের নিকট হাদিয়া করিয়া দিবে। এবং সকলের মোকাবেলা বলিবে যে, অমুকের উপরোক্ত হুকুকের জন্য খোদায়ী পাওনা এত হাজার, এত শত, এত মণ ময়দার পরিবর্তে এই কালামুল্লাহ তোমার নিকট হাদীয়া করিলাম। ঐ গরীব বা মিছকীন দুইজন সাক্ষীর মোকাবিলা উহা কবুল করিলে ঐ কালামুল্লাহ তাহারই হইয়া গেল এবং ময়দা আদায় করা তাহার

উপর ওয়াজিব হইয়া গেল।"[৭০৮]

এ উদ্ভট নিয়মটি শুধু বানোয়াটই নয়, আল্লাহর দীনের সাথে চরম উপহাস! এর চেয়ে বড় উপহাস আর কি হতে পারে!! আজীবন সালাত অবমাননা করে, সালাতকে নিয়ে অবজ্ঞা উপহাস করে, মরার পরে এক জিলদ 'কুরআন' ফকীরকে দিয়েই মাফ!!!

**(ঘ) সুন্নাত-নফল সালাত বিষয়ক**

ফরয সালাত যেমন মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত, তেমনি নফল সালাতও সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। ফরযের অতিরিক্ত কর্মকে "নফল" বলা হয়। কিছু সময়ে কিছু পরিমাণ "নফল" সালাত পালন করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন, বা তিনি নিজে তা পালন করেছেন। এগুলোকে 'সুন্নাত'ও বলা হয়। যে সকল নফল সালাতের বিষয়ে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলোকে "সন্নাতে মুয়াক্কাদাহ" বলা হয়। এ ধরনের কিছু সুন্নাত সালাত সম্পর্কে হাদীসে বেশি গুরুত্ব প্রদানের ফলে কোন ফকীহ তাকে ওয়াজিব বলেছেন।

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে সাধারণভাবে যত বেশি পারা যায় নফল সালাত আদায়ের উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এক সাহাবী প্রশ্ন করেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কর্ম কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "তুমি আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সাজদা করবে (বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবে); কারণ তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সাজদা কর, তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করেন।"[৭০৯]

অন্য এক যুবক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবেদন করেন যে, তিনি জান্নাতে তাঁর সাহচর্য চান। তিনি বলেন: "তাহলে বেশি বেশি সাজদা করে (নফল সালাত পড়ে) তুমি আমাকে তোমার বিষয়ে সাহায্য কর।"[৭১০]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, কাজেই যার পক্ষে সম্ভব হবে সে যেন যত বেশি পারে সালাত আদায় করে।" হাদীসটি হাসান।[৭১১]

সাধারণভাবে নফল সালাত ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বা স্থানে বিশেষ সালাতের বিশেষ ফযীলতের কথাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে আল্লামা মাওসিলীর আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি যে, সহীহ হাদীস থেকে নিম্নলিখিত বিশেষ সুন্নাত-নফল সালাতের কথা জানা যায়: ফরয সালাতের আগে পরে সুন্নাত সালাত, তারাবীহ, দোহা বা চাশত, রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, তাহিয়্যাতুল ওযু, ইসতিখারার সালাত, কুসূফের সালাত, ইসতিসকার সালাত ও সালাতুত তাসবীহ। এছাড়া পাপ করে ফেললে দু রাক'আত সালাত আদায় করে তাওবা করার কথাও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। একটি যয়ীফ হাদীসে 'সালাতুল হাজাত' বর্ণিত হয়েছে।

সুন্নাত-নফল সালাতের বিষয়ে এত সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও জালিয়াতগণ এ বিষয়ে অনেক জাল হাদীস প্রচার করেছে। অন্যান্য জাল হাদীসের মতই এগুলোতে অনেক আকর্ষণীয় অবান্তর সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। জালিয়াতগণ দুটি ক্ষেত্রে কাজ করেছে। প্রথম, সহীহ হাদীসে উল্লিখিত সুন্নাত-নফল সালাতগুলোর জন্য বানোয়াট ফযীলত, সূরা বা পদ্ধতি তৈরি করেছে। দ্বিতীয়, বিভিন্ন সময়, স্থান বা কারণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির সালাতের উদ্ভাবন করে সেগুলোর কাল্পনিক সাওয়াব, ফযীলত বা আসরের কাহিনী বানিয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত এ বিষয়ক কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তা বা জাল হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

সহীহ হাদীসে প্রমাণিত সুন্নাত-নফল সালাত বিষয়ক জাল হাদীসগুলো বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছি না। শুধুমাত্র এ সকল সালাত বিষয়ক মনগড়া পদ্ধতিগুলো আলোচনা করব। এরপর জালিয়াতগণ মনগড়াভাবে যে সকল সালাত ও তার ফযীলতের কাহিনী বানিয়েছে সেগুলো উলেখ করব।

**১. বিভিন্ন সালাতের জন্য নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াত নির্ধারণ করা**

সহীহ হাদীসে প্রমাণিত এ সকল সালাতের কোনো সালাতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াত নির্ধারণ করে দেয়া হয় নি। এ সকল সালাতের জন্য নির্ধারিত সূরা পাঠের বিষয়ে, বা অমুক রাকআতে অমুক সূরা বা অমুক আয়াত এতবার পাঠ করতে হবে বলে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই বানোয়াট কথা। কাজেই ইসতিখারার সালাতের প্রথম রাক'আতে অমুক সূরা, দ্বিতীয় রাক'আতে অমুক সূরা, তাহাজ্জুদের সালাতে প্রথম রাকআতে অমুক সূরা, দ্বিতীয় রাক'আতে অমুক সূরা বা আয়াত, চাশতের সালাতে প্রথম বা দ্বিতীয় রাক'আতে অমুক সূরা বা আয়াত ... শবে কদরের রাতের সালাতে অমুক অমুক সূরা বা আয়াত পড়তে হবে.... ইত্যাদি সকল কথাই বানোয়াট।

যে কোনো সূরা বা আয়াত দিয়ে এ সকল সালাত আদায় করা যাবে। কোনো নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াতের কারণে এ সকল সালাতের সাওয়াব বা বরকতের কোনো হেরফের হবে না। সূরা বা আয়াতের দৈর্ঘ্য, মনোযোগ, আবেগ ইত্যাদির কারণে সাওয়াবের কমবেশি হয়।

**২. তারাবীহের সালাতের দোয়া ও মুনাজাত**

রামাদানের কিয়ামুল্লাইলকে 'সালাতুত তারাবীহ' বা 'বিশ্রামের সালাত' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে তিনি নিজে ও

সাহাবীগণ রামাদান ও অন্যান্য সকল মাসেই মধ্যরাত থেকে শেষ রাত পর্যন্ত ৪/৫ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একাকি কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্ আদায় করতেন। উমার (রা) এর সময় থেকে মুসলিমগণ জামাআতে তারাবীহ্ আদায় করতেন। সাধারণত ইশার পর থেকে শেষরাত্র বা সাহরীর পূর্ব সময় পর্যন্ত ৫/৬ ঘণ্টা যাবৎ তাঁরা একটানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারাবীহের সালাত আদায় করতেন।

যেহেতু এভাবে একটানা কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা খুবই কষ্টকর, সেহেতু পরবর্তী সময়ে প্রতি ৪ রাক'আত সালাত আদায়ের পরে প্রায় ৪ রাক'আত সালাতের সম পরিমাণ সময় বিশ্রাম নেয়ার রীতি প্রচলিত হয়। এজন্যই পরবর্তীকালে এ সালাত 'সালাতুত তারাবীহ' বলে প্রসিদ্ধ হয়।

এ 'বিশ্রাম' সালাতের বা ইবাদতের কোনো অংশ নয়। বিশ্রাম না করলে সাওয়াব কম হবে বা বিশ্রামের কমবেশির কারণে সাওয়াব কমবেশি হবে এরূপ কোনো বিষয় নয়। বিশ্রাম মূলত ভালভাবে সালাত আদায়ের উপকরণ মাত্র। বিশ্রামের সময়ে মুসল্লী যে কোনো কাজ করতে পারেন, বসে বা শুয়ে থাকতে পারেন, অন্য নামায আদায় করতে পারেন, কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন বা দোয়া বা যিকর-এ রত থাকতে পারেন। এ বিষয়ে কোনো নির্ধারিত কিছুই নেই।

গত কয়েক শতাব্দী যাবত কোনো কোনো দেশে প্রতি চার রাক'আত পরে একটি নির্ধারিত দোয়া পাঠ করা হয় এবং একটি নির্ধরিত মুনাজাত করা হয়। অনেক সময় দোয়াটি প্রতি ৪ রাক'আত অন্তে পাঠ করা হয় এবং মুনাজাতটি ২০ রাক'আত অন্তে পাঠ করা হয়। দোয়াটি নিম্নরূপঃ

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ (وَالْهَيْبَةِ) وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لا يَنَامُ وَ) لا يَمُوتُ (أَبَداً أَبَداً)، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ (رَبُّنَا وَ) رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ، (لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، نَسْأَلُك الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِك مِنْ النَّارِ)

মুনাজাতটি নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

এ দোয়া ও মুনাজাতের কথাগুলো ভাল, তবে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) শেখানো বা আচরিত নয়। তারাবীহের বিশ্রামের সময়ে এগুলো পড়লে কোনে বিশেষ সাওয়াব হবে বলে কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল হাদীসেও বলা হয় নি। এমনকি অন্য কোনো সময়ে তিনি এ বাক্যগুলো এভাবে বলেছেন বা বলতে শিখিয়েছেন বলে বর্ণিত হয় নি। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বা অন্য কোনো ইমাম তারাবীহে এ দুআ-মুনাজাত পড়তে বলেন নি। ১০০০ হিজরী পর্যন্ত রচিত হানাফী ফিকহের কোনো গ্রন্থে এ দুআ ও মুনাজাতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ফিরিশতাদের তাসবীহ হিসেবে এ দুআর কয়েকটি বাক্য বণিত। একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর কিছু ফিরিশতা একটি নূরের সমুদ্রে এ দোয়াটি পাঠ করেন... যে ব্যক্তি কোনো দিবসে, মাসে বা বছরে এ দোয়াটি পাঠ করবে সে এত এত পুরস্কার লাভ করবে। তবে কিয়ামুল্লাইল বা তারাবীহের সাথে এ দুআকে জড়ানো একেবারেই ভিত্তিহীন।[৭১২]

আমাদের উচিত এ সকল বানোয়াট দোয়া না পড়ে এ সময়ে দরুদ পাঠ করা। অথবা কুরআন তিলাওয়াত বা মাসনূন যিক্‌র-এ মশগুল থাকা।

কোনো কোনো প্রচলিত পুস্তকে তারাবীহের দু রাকআত অন্তে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করতে বলা হয়েছে[৭১৩]:

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ يَا كَرِيْمَ الْمَعْرُوْفِ يَا قَدِيْمَ الإِحْسَانِ أَحْسِنْ إِلَيْنَا بِإِحْسَانِكَ الْقَدِيْمِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلَى دِيْنِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

এ দোয়াটিও ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

**৩. সালাতুল আওয়াবীন**

রাসূলুলাহ্ (ﷺ) নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হুযাইফা (রা) বলেন, "আমি নবীজী (ﷺ)-র কাছে এসে তাঁর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। তিনি মাগরিবের পরে ইশা'র সালাত পর্যন্ত নফল সালাতে রত থাকলেন।" হাদীসটি সহীহ।[৭১৪]

অন্য হাদীসে আনাস (রা) বলেন, "সাহাবায়ে কেরাম মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ে সজাগ থেকে অপেক্ষা করতেন এবং নফল সালাত আদায় করতেন।" হাদীসটি সহীহ। তাবিয়ী হাসান বসরী বলতেন, মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ের নামাযও রাতের নামায বা তাহাজ্জুদ বলে গণ্য হবে।[৭১৫]

বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো কোনো সাহাবী তাবিয়ীগণকে এ সময়ে সালাত আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন।[৭১৬]

এ সকল হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে মুমিন কিছু নফল সালাত আদায় করবেন। যিনি যত বেশি সালাত আদায় করবেন তিনি তত বেশি সাওয়াব লাভ করবেন। এ সময়ের সালাতের রাক'আত সংখ্যা বা বিশেষ ফযীলতে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি।

কিছু জাল বা অত্যন্ত যয়ীফ সনদের হাদীসে এ সময়ে ৪ রাক'আত, ৬ রাক'আত, ১০ বা ২০ রাক'আত সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি এ সময়ে ৪ রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে এক যুদ্ধের পর আরেক যুদ্ধে জিহাদ করার সাওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে কোনো কথা বলার আগে ৬ রাক'আত সালাত আদায় করবে তাঁর ৫০ বছরের গোনাহ ক্ষমা করা হবে। অথবা তাঁর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে। যে ব্যক্তি এ সময়ে ১০ রাক'আত সালাত আদায় করবে, তাঁর জন্য জান্নাতে বাড়ি তৈরি করা হবে। যে ব্যক্তি এ সময়ে ২০ রাক'আত সালাত আদায় করবে, তাঁর জন্য আল্লাহ জান্নাতে বাড়ি তৈরি করবেন। এসকল হাদীস সবই বানোয়াট বা অত্যন্ত যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এ সময়ে ৬ রাক'আত নামায আদায় করলে ১২ বছরের সাওয়াব পাওয়ার হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন।[৭১৭]

আমাদের দেশে এ ৬ রাক'আতে সূরা ফাতিহার পরে কোন্ সূরা পাঠ করতে হবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা।

দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ী বলেছেন, সালাতুল মাগরিবের পর থেকে সালাতুল ইশা পর্যন্ত যে নফল সালাত আদায় করা হয় তা 'সালাতুল আওয়াবীন' অর্থাৎ 'বেশি বেশি তাওবাকারীগণের সালাত'।[৭১৮] বিভিন্ন সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চাশতের নামাযকে 'সালাতুল আওয়াবীন' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৭১৯]

**৪. সালাতুল হাজাত**

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে 'সালাতুল হাজাত' বা 'প্রয়োজনের সালাত' বিষয়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে বা কোনো মানুষের কাছে কারো কোনো প্রয়োজন থাকলে সে ওযু করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং এর পর একটি দোয়া পাঠ করে আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রার্থনা করবে।

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারী ফাইদ ইবনু আব্দুর রাহমান দুর্বল রাবী। এজন্য হাদীসটি দুর্বল। এ ব্যক্তিকে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস মুনকার, মাতরূক ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন।[৭২০]

আমাদের দেশে 'সালাতুল হাজাত' নামে আরো অনেক বানোয়াট পদ্ধতি প্রচলিত। যেমন: "হাজতের (খেজের আ.)-এর নামাজ। এ নামাজ ২ রাকাত। ... মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য খেজের (আ) জনৈক বোজর্গ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফেরুন দশবার.... ইত্যাদি।" এগুলো সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা।[৭২১]

**৫. সালাতুল ইসতিখারা**

ইস্তিখারার জন্য সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওযু করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বি 'ইলমিকা...' দোয়াটি পাঠ করতে হবে।[৭২২] কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত কোনো কোনো গ্রন্থে এ বিষয়ে বিভিন্ন বানোয়াট পদ্ধতি ও দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। একটি বানোয়াট পদ্ধতি নিম্নরূপ: 'কোনো জিনিসের ভাল মন্দ জানিতে হইলে এশার নামাজের পর এস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া নিয়া পরে কয়েক মর্তবা দুরূদ শরীফ পাঠ করিয়া 'ছুবহানাক লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ...' ১০০ বার পাঠ করিয়া আবার ২১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া পাক ছাপ বিছানায় শুইয়া থাকিবে...।[৭২৩]

অন্য পুস্তকে বলা হয়েছে: "হযরত আলী (কার্রা) বলিয়াছেন যে, স্বপ্নে কোন বিষয়ের ভালমন্দ জানিতে হইলে নিম্নোক্ত নিয়মে

রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে দুই রাকাত করিয়া ছয় রাকাত নামায পড়িবে। প্রথম রাকতে সূরা ফাতেহার পরে সূরা ওয়াশ্‌শামছে ৭ বার ....।"[৭২৪] এটিও ভিত্তিহীন কথা।

**৬. হালকী নফল**

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের পরে বিত্‌র আদায় করতেন। এরপর দুই রাক'আত নফল সালাত আদায় করতেন। একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিত্‌র-এর পরে দু রাক'আত নফল সালাত আদায় করলে 'তাহাজ্জুদ' বা কিয়ামুল্লাইলের সাওয়াব পাওয়া যায়।[৭২৫]

হাদীস দ্বারা এতটুকুই প্রমাণিত। এ বিষয়ক প্রচলিত জাল ও ভিত্তিহীন কথার মধ্যে রয়েছে: "বেতের নামাজ পড়ার পর দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করিলে একশত রাকাত নামাজ পড়ার ছওয়াব হাসিল হয়। প্রতি রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সূরা একলাছ ৩ বার করিয়া পাঠ করিয়া নামাজ আদায় করিতে হয়...। এগুলি সবই ভিত্তিহীন কথা বলে প্রতীয়মান হয়।[৭২৬]

**৭. আরো কিছু বানোয়াট 'নামায'**

বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মনগড়া ও ভিত্তিহীন ফযীলতের বর্ণনা দিয়ে আরো কিছু 'নামায' প্রচলিত রয়েছে সমাজে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হেফজুল ঈমান নামাজ, কাফফারা নামাজ, বুজুর্গী নামাজ, দৌলত লাভের নামাজ, শোকরের নামাজ, পিতামাতর হকের নামাজ, ইত্যাদি ইত্যাদি।[৭২৭]

**৮. সপ্তাহের ৭ দিনের সালাত**

সপ্তাহের ৭ দিনের দিবসে বা রাতে নির্ধারিত নফল সালাত ও তার ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীসই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা। মুমিন নিয়মিত তাহাজ্জুদ, চাশত ইত্যাদি সালাত আদায় করবেন। এছাড়া যথাসাধ্য বেশি বেশি নফল সালাত তিনি আদায় করবেন। এগুলোর জন্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত সাওয়াবের আশা করবেন। কিন্তু জালিয়াতগণ কাল্পনিক সাওয়াব ও ফযীলতের কাহিনী দিয়ে অনেক হাদীস বানিয়েছে, যাতে সপ্তাহের প্রত্যেক দিনে ও রাতে বিশেষ বিশেষ সালাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। শুক্রবার রাত্রির নফল নামায, শুক্রবার দিবসের নফল নামায, শনিবার রাত্রির নফল নামায, শনিবার দিনের নামায .... ইত্যাদি নামে প্রচলিত সবই বানোয়াট কথা।

যেমন, আনাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবীর নামে হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবারের রাত্রিতে এত রাক'আত সালাত আদায় করবে.... এতে জান্নাতে বালাখানা, ইত্যাদি অপরিমেয় সাওয়াব লাভ করবে। শুক্রবার দিবসে অমুক সময়ে অমুক পদ্ধতিতে এত রাক'আত সালাত আদায় করবে... এতে এত এত পুরস্কার লাভ করবে...। শনিবার রাত্রিতে যে ব্যক্তি এত রাক'আত সালাত অমুক পদ্ধতিতে আদায় করবে সে অমুক অমুক পুরস্কার লাভ করবে। শনিবার দিবসে অমুক সময়ে অমুক পদ্ধতিতে এত রাক'আত সালাত আদায় করলে অমুক অমুক ফল পাওয়া যাবে ....।

এ ভাবে সপ্তাহের ৭ দিনের দিবসে ও রাত্রিতে বিভিন্ন পরিমাণে ও পদ্ধতিতে, বিভিন্ন সূরা বা দোয়া সহকারে যত প্রকারের সালাতের কথা বলা হয়েছে সবই বানোয়াট ও জাল কথা।

আমাদের দেশে প্রচলিত বার চাঁদের ফযীলত, নেক আমল, ওযীফা ইত্যাদি সকল পুস্তকেই এই সব মিথ্যা কথাগুলো হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ মুহাদ্দিসগণ সকলেই এগুলোর জালিয়াতির বিষয়ে একমত।

অনেক সময় অনেক বড় আলিমও জনশ্রুতির উপরে অনেক কথা লিখে ফেলেন। সবার জন্য সব কথা 'তাহকীক' বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। সপ্তাহের ৭ দিন বা রাতের নামাযও কোনো কোনো বড় আলিম উল্লেখ করেছেন। তবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগের মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ অর্থে বর্ণিত সকল হাদীসই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার, জূযকানী, ইবনুল জাওযী, সুয়ূতী, মুহাম্মাদ তাহির পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আব্দুল হাই লাখনবী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আজলূনী, শাওকানী প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।[৭২৮]

সালাত বা নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। মুমিন যত বেশি পারবেন তত বেশি নফল সালাত আদায় করতে চেষ্টা করবেন। তবে এর সাথে কোনো মনগড়া পদ্ধতি যোগ করা বা মনগড়া ফযীলতের বর্ণনা দেয়া বৈধ নয়।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ:

# বার চাঁদের সালাত ও ফযীলত

বছরের বার মাসে ও বিভিন্ন মাসের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির সালাত ও সেগুলোর নামে আজগুবি ও উদ্ভট সব ফযীলতের বর্ণনা দিয়ে হাদীস বানিয়েছে জালিয়াতগণ। প্রচলিত 'বার চাঁদের ফযীলত' জাতীয় গ্রন্থগুলো এ সব বাতিল কথায় ভরা। পাঠকদের সুবিধার্থে আমি আরবী মাসগুলোর উল্লেখ করে, সে বিষয়ক সহীহ ও বানোয়াট সালাত, সিয়াম, অন্যান্য আমল ও ফযীলতের কথা উল্লেখ করব। আল্লাহর তাওফীক চাই।

## ১. মুহাররাম মাস

### (ক) সহীহ হাদীসের আলোকে মুহার্‌রাম মাস

আরবী পঞ্জিকার প্রথম মাস মুহাররাম। সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা এ মাসের ফযীলত সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলো জানতে পারি:

(১) বৎসরের চারটি 'হারাম' মাস: মুহার্‌রাম, রজব, যিলকাদ ও যুলহাজ্জ মাস। এ মাসগুলো ইসলামী শরীয়তে বিশেষভাবে সম্মানিত। এগুলোতে ঝগড়াঝাটি বা যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেছেন: "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এ নিষিদ্ধ মাসগুলোর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না...।"[৭২৯]

(২) এ মাসকে সহীহ হাদীসে 'আল্লাহর মাস' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এ মাসের নফল সিয়াম সর্বোত্তম নফল সিয়াম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ

"রামাদানের পরে সর্বোত্তম সিয়াম হলো আল্লাহর মাস মুহার্‌রাম মাস।"[৭৩০]

(৩) এ মাসের ১০ তারিখ 'আশূরা'র দিনে সিয়াম পালনের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। আশূরার সিয়াম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

"এ দিনের সিয়াম গত এক বছরের পাপ মার্জনা করে।"[৭৩১]

এ দিনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে সিয়াম পালন করতেন, তাঁর উম্মাতকে সিয়াম পালনে উৎসাহ দিয়েছেন এবং ১০ তারিখের সাথে সাথে ৯ বা ১১ তারিখেও সিয়াম পালন করতে উৎসাহ দিয়েছেন।[৭৩২]

(৪) সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এ দিনে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল মূসা (আ) ও তাঁর সঙ্গী বনী ইসরাঈলকে ফির্‌আউনের হাত থেকে উদ্ধার করেন এবং ফির'আউন ও তার সঙ্গীদেরকে ডুবিয়ে মারেন।[৭৩৩]

### (খ) অত্যন্ত দুর্বল হাদীস ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্য

সহীহ হাদীস থেকে মুহার্‌রাম মাস ও আশুরা সম্পর্কে শুধু এতটুকুই জানা যায়। পরবর্তীকালে অনেক বানোয়াট ও মিথ্যা কাহিনী এক্ষেত্রে প্রচলিত হয়েছে। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়:

**প্রথম বিষয়:** এ দিনটিকে ইহূদীগণ সম্মান করত। এ কারণে ইহূদীদের মধ্যে এ দিনটি সম্পর্কে অনেক ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী প্রচলিত ছিল। পরবর্তী যুগে ইসরাঈলী রেওয়ায়াত হিসাবে সেগুলো মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। প্রথম যুগে মুসলিমগণ এগুলো সত্য বা মিথ্যা বলে বিশ্বাস না করে ইসরাঈলী কাহিনী হিসাবেই বলেছেন। পরবর্তী যুগে তা 'হাদীসে' পরিণত হয়েছে।

**দ্বিতীয় বিষয়:** রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের অর্ধ শতাব্দী পরে ৬১ হিজরীর মুহার্‌রাম মাসের ১০ তারিখে আশূরার দিনে তাঁর প্রিয়তম নাতি হুসাইন (রা) কারবালার প্রান্তরে শহীদ হন। এ ঘটনা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। হুসাইন (রা)-এর পক্ষের ও বিপক্ষের অনেক বিবেকহীন দুর্বল ঈমান মানুষ 'আশূরার' বিষয়ে অনেক 'হাদীস' বানিয়েছে। কেউ দিনটিকে 'শোক দিবস' হিসেবে এবং কেউ দিনটিকে 'বিজয় দিবস' হিসেবে পালনের জন্য নানা প্রকারের কথা বানিয়েছেন। তবে মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা পদ্ধতিতে এ সকল জালিয়াতি ধরা খুবই সহজ ছিল।

মুহার্‌রাম ও আশূরা সম্পর্কে এজাতীয় প্রচলিত কথাবার্তাকে আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি: (১) যে সকল 'হাদীস' কোনো কোনো মুহাদ্দিস জাল বা বানোয়াট বলে উল্লেখ করলেও, কেউ কেউ তা দুর্বল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং যে সকল 'হাদীস' অত্যন্ত

দুর্বল সনদে কোনো কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যত ইসরাঈলী বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁরা এগুলি বলেছেন। (২) সকল মুহাদ্দিস যে সকল হাদীসকে 'জাল' ও ভিত্তিহীন বলে একমত পোষণ করেছেন। এখানে আমরা প্রথম পর্যায়ের কিছু হাদীস ও মতামত উল্লেখ করছি:

১. অত্যন্ত দুর্বল সূত্রে কোনো কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ দিনে আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-এর তাওবা কবুল করেন।
২. অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এ দিনে নূহ (আ) এর নৌকা জূদী পর্বতের উপর থামে।
৩. অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এ দিনে ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন।
৪. মুহার্‌রাম মাসে বা আশূরার দিনে দান-সাদকার বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এ বিষয়ে কিছুই বর্ণিত হয় নি। তবে অত্যন্ত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য সূত্রে একজন সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আশুরার দিনে সিয়াম পালন করলে যেহেতু এক বছরের সাওয়াব পাওয়া যায়, সেহেতু এ দিনে দান করলেও এক বছরের দানের সাওয়াব পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া এ দিনে দানের বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল ও ভিত্তিহীন কথা।[৭৩৪]
৫. আশুরার দিনে ভাল খাওয়া-পরা। একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ سَنَتِهِ كُلِّهَا

"যে ব্যক্তি আশূরার দিনে তার পরিবারের জন্য প্রশস্তভাবে খরচ করবে, আল্লাহ সারা বছরই সে ব্যক্তিকে প্রশস্ত রিয্ক প্রদান করবেন।"

হাদীসটি কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সনদই অত্যন্ত দুর্বল। বিভিন্ন সনদের কারণে বাইহাকী, ইরাকী, সুয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে 'জাল' হিসেবে গণ্য না করে 'দুর্বল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু হাজার হাদীসটিকে 'অত্যন্ত আপত্তিকর ও খুবই দুর্বল' বলেছেন। অপরদিকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইবনু তাইমিয়া প্রমুখ মুহাদ্দিস একে জাল ও বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন যে, প্রত্যেক সনদই অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার ফলে একাধিক সনদে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় না। এছাড়া হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিরোধী। সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহূদীরা আশুররা দিনে উৎসব- আনন্দ করে- তোমরা তাদের বিরোধিতা করবে, এ দিনে সিয়াম পালন করবে এবং উৎসব বা আনন্দ করবে না।[৭৩৫]

৬. আশূরার দিনে সুরমা ব্যবহার। একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ بِالإِثْمِدِ، لَمْ تَرْمُدْ عَيْنُهُ أَبَداً

"যে ব্যক্তি আশূরার দিনে চোখে 'ইসমিদ' সুরমা ব্যবহার করবে কখনোই তার চোখ উঠবে না।"

উপরের হাদীসটির মতই এ হাদীসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক সনদেই অত্যন্ত দুর্বল বা মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস একাধিক সনদের কারণে হাদীসটিকে 'দুর্বল' হিসাবে গণ্য করলেও অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল ও বানোয়াট হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন, ইমাম হুসাইনের হত্যাকারীগণ আশুরার দিনে সুরমা মাখার বিদ'আতটি চালু করেন। এ কথাটি তাদেরই বানানো। কোনো দুর্বল রাবী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করেছেন।[৭৩৬]

**(গ) মুহাররাম মাস বিষয়ক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা**

উপরের কথাগুলো কোনো কোনো মুহাদ্দিস জাল বলে গণ্য করলেও কেউ কেউ তা 'দুর্বল' বলে গণ্য করেছেন। নিচের কথাগুলো সকল মুহাদ্দিস একবাক্যে জাল বলে স্বীকার করেছেন। এগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি: প্রথম, মুহার্‌রাম বা আশুরার সিয়ামের ফযীলতের বিষয়ে জাল কথা, দ্বিতীয়, আশুরার দিনের বা রাতের জন্য বা মুহাররম মাসের জন্য বিশেষ সালাত ও তার ফযীলতের বিষয়ে জাল কথা এবং তৃতীয়, আশুরার দিনে অতীত ও ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে বা ঘটবে বলে জাল কথা।

**১. মুহার্‌রাম বা আশূরার সিয়াম**

আশুরার সিয়াম পূর্ববর্তী এক বছরের গোনাহের কাফ্ফারা হবে বলে সহীহ হাদীসে আমরা দেখতে পেয়েছি। জালিয়াতগণ আরো অনেক কথা এ সম্পর্কে বানিয়েছে। প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি:

"হাদীসে আছে- যে ব্যক্তি মহররমের মাসে রোযা রাখিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ৩০ দিন রোযা রাখার সমান ছওয়াব দিবেন। আরও হাদীছে আছে- যে ব্যক্তি আশুরার দিন একটি রোযা রাখিবে সে দশ হাজার ফেরেশতার, দশ হাজার শহীদের ও দশ হাজার হাজীর ছওয়াব পাইবে। আরও হাদীছে আছে- যে ব্যক্তি আশুরার তারিখে স্নেহ-পরবশ হইয়া কোন

এতীমের মাথায় হাত ঘুরাইবে, আল্লাহতাআলা ঐ এতীমের মাথার প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে তাহাকে বেহেশতের এক একটি 'দরজা' প্রদান করিবেন। আর যে ব্যক্তি উক্ত তারিখের সন্ধ্যায় রোযাদারকে খানা খাওয়াইবে বা ইফতার করাইবে, সে ব্যক্তি সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদীকে খানা খাওয়াইবার ও ইফতার করাইবার ন্যায় ছওয়াব পাইবে।

হযরত (ﷺ) আরও বলিলেন, যে ব্যক্তি আশুরার তারিখে রোযা রাখিবে, সে ৬০ বৎসর রোযা নামায করার সমতুল্য ছওয়াব পাইবে। যে ব্যক্তি ঐ তারিখে বিমার পোরছী করিবে, সে সমস্ত আওলাদে আদমের বিমার-পোরছী করার সমতুল্য ছওয়াব পাইবে।... তাহার পরিবারের ফারাগতি অবস্থা হইবে। ৪০ বৎসরের গুনাহর কাফ্ফারা হইয়া যাইবে।... (হাদীস)"[৭৩৭]

অনুরূপ আরেকটি মিথ্যা কথা: "হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মহররম মাসের প্রথম ১০ দিন রোজা রাখিবে, সে ব্যক্তি যেন ১০ হাজার বৎসর যাবত দিনের বেলা রোজা রাখিল এবং রাত্রিবেলা ইবাদতে জাগরিত থাকিল। ... মহররম মাসে ইবাদতকারী ব্যক্তি যেন ক্বদরের রাত্রির ইবাদতের ফযীলত লাভ করিল।... তোমরা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় মাস মহররমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিও। যেই ব্যক্তি মহররম মাসের সম্মান করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে জান্নাতের মধ্যে সম্মানিত করিবেন এবং জাহান্নামের আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন... মহররমের ১০ তারিখে রোজা রাখা আদম (আ) ও অন্যান্য নবীদের উপর ফরজ ছিল। এই দিবসে ২০০০ নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ২০০০ নবীর দোয়া কবুল করা হইয়াছে ...।"[৭৩৮]

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এগুলো সবই বানোয়াট কথা ও জাল হাদীস।[৭৩৯]

**২. মুহার্‌রাম মাসের সালাত**

মুহার্‌রাম মাসের কোনো দিবসে বা রাত্রে এবং আশুরার দিবসে বা রাত্রে কোনো বিশেষ সালাত আদায়ের কোনো প্রকার নির্দেশনা বা উৎসাহ কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ক সকল কথাই বানোয়াট। আমাদের দেশে প্রচলিত কোনো কোনো পুস্তকে মুহার্‌রাম মাসের ১ম তারিখে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে বিশেষ দোয়া পাঠের বিশেষ ফযীলতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এগুলো সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।[৭৪০]

**৩. আশুরার দিনে বা রাতে বিশেষ সালাত**

আশুরার সিয়ামের উৎসাহ দেয়া হলেও, হাদীসে আশুরার দিনে বা রাত্রে কোনো বিশেষ সালাত আদায়ের বিধান দেওয়া হয় নি। তবে জালিয়াতগণ অনেক কথা বানিয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি আশুরার দিবসে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ... অথবা আশুরার রাত্রিতে এত রাকআত সালাত অমুক অমুক সূরা এতবার পাঠ করে আদায় করবে ... সে এত পুরস্কার লাভ করবে। সরলপ্রাণ মুসলিমদের মন জয় করার জন্য জালিয়াতগণ এ সকল কথা বানিয়েছে, যা অনেক সময় সরলপ্রাণ আলিম ও বুযুর্গকেও ধোঁকা দিয়েছে।[৭৪১]

**৪. আশুরায় অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনাবলির বানোয়াট ফিরিস্তি**

মিথ্যাবাদীরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে জালিয়াতি করে বলেছে:

১. আশুরার দিনে আল্লাহ আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন।
২. এ দিনে তিনি পাহাড়, পর্বত, নদনদী.... সৃষ্টি করেছেন।
৩. এ দিনে তিনি কলম সৃষ্টি করেছেন।
৪. এ দিনে তিনি লাওহে মাহফূয সৃষ্টি করেছেন।
৫. এ দিনে তিনি আরশ সৃষ্টি করেছেন।
৬. এ দিনে তিনি আরশের উপরে সমাসীন হয়েছেন।
৭. এ দিনে তিনি কুরসী সৃষ্টি করেছেন।
৮. এ দিনে তিনি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন।
৯. এ দিনে তিনি জিবরাঈলকে (আ) সৃষ্টি করেছেন।
১০. এ দিনে তিনি ফিরিশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন।
১১. এ দিনে তিনি আদমকে (আ) সৃষ্টি করেছেন।
১২. এ দিনে তিনি আদমকে (আ) জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।
১৩. এ দিনে তিনি ইদরীসকে (আ) আসমানে উঠিয়ে নেন।
১৪. এ দিনে তিনি নূহ (আ)-কে নৌকা থেকে বের করেন।
১৫. এ দিনে তিনি দায়ূদের (আ) তাওবা কবুল করেছেন।

১৬. এ দিনে তিনি সুলাইমান (আ)-কে রাজত্ব প্রদান করেছেন।
১৭. এ দিনে তিনি আইউব (আ)-এর বিপদ-মসিবত দূর করেন।
১৮. এ দিনে তিনি তাওরাত নাযিল করেন।
১৯. এ দিনে ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন... খলীল উপাধি লাভ করেন।
২০. এ দিনে ইবরাহীম (আ) নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা পান।
২১. এ দিনে ইসমাঈল (আ) কে কুরবানী করা হয়েছিল।
২২. এ দিনে ইউনূস (আ) মাছের পেট থেকে বাহির হন।
২৩. এ দিনে আল্লাহ ইউসূফকে (আ) জেলখানা থেকে বের করেন।
২৪. এ দিনে ইয়াকুব (আ) দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান।
২৫. এ দিনে ইয়াকূব (আ) ইউসূফের (আ) সাথে সম্মিলিত হন।
২৬. এ দিনে মুহাম্মাদ (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেছেন।
২৭. এ দিনে কেয়ামত সংঘঠিত হবে....।

কেউ কেউ বানিয়েছে: মুহার্‌রামের ২ তারিখে নূহ (আ) প্লাবন হতে মুক্তি পেয়েছেন, ৩ তারিখে ইদরীসকে (আ) আসমানে উঠানো হয়েছে, ৪ তারিখে ইবরাহীমকে (আ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরূপ অগণিত ঘটনা এ মাসে বা এ দিনে ঘটেছে এবং ঘটবে বলে উল্লেখ করেছে জালিয়াতরা তাদের এ সকল কল্প কাহিনীতে। মোট কথা হলো, আশুরার দিনে মূসা (আ) ও তাঁর সাথীদের মুক্তি পাওয়া ছাড়া আর কোনো ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আদমের (আ) এর তাওবা কবুল, নূহ (আ) এর নৌকা জূদী পর্বতের উপর থামা ও ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করার কথা অনির্ভরযোগ্য সূত্রে কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ী থেকে বর্ণিত। আশুরা বা মুহার্‌রাম সম্পর্কে আর যা কিছু বলা হয় সবই মিথ্যা ও বাতিল কথা। দুঃখজনক হলো, আমাদের সমাজে মুহার্‌রাম বা আশূরা বিষয়ক বই পুস্তকে, আলোচনা ও ওয়াযে এ সমস্ত ভিত্তিহীন কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়।[৭৪২]

## ২. সফর মাস

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, মুহার্‌রাম মাসের জন্য কোনো বিশেষ সালাত নেই, তবে এ মাসে বিশেষ সিয়ামের কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে এবং এ জন্য বিশেষ সাওয়াব ও ফযীলত রয়েছে। পক্ষান্তরে সফর মাসের জন্য কোনো বিশেষ সালাতও নেই, সিয়ামও নেই। এ মাসের কোনো দিবসে বা রাত্রে কোনো প্রকারের সালাত আদায়ের বিশেষ সাওয়াব বা ফযীলতে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। অনুরূপভাবে এ মাসের কোনো দিনে সিয়াম পালনেরও কোনো বিশেষ ফযীলত কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা।

এ মাসকে কেন্দ্র করেও অনেক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে। এগুলোকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম, সফর মাসের 'অশুভত্ব' ও 'বালা-মুসিবত' বিষয়ক, দ্বিতীয়, সফর মাসের প্রথম তারিখে বা অন্য সময়ে বিশেষ সালাত ও তৃতীয়, আখেরী চাহার শোম্বা বা সফর মাসের শেষ বুধবার বিষয়ক।

### (ক) সফর মাসের অশুভত্ব ও এ মাসের বালা-মুসিবত

কোনো স্থান, সময়, বস্তু বা কর্মকে অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গলময় বলে মনে করা ইসলামী বিশ্বাসের ঘোর পরিপন্থী একটি কুসংস্কার। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। এখানে লক্ষণীয় যে, আরবের মানুষেরা জাহেলী যুগ থেকে 'সফর' মাসকে অশুভ ও বিপদাপদের মাস বলে বিশ্বাস করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এ কুসংস্কারের প্রতিবাদ করে বলেন:

لاَ طِيَرَةَ ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ

"...কোনো অশুভ-অযাত্রা নেই, কোনো ভুত-প্রেত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই এবং সফর মাসের অশুভত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই।..."[৭৪৩]

অথচ এর পরেও মুসলিম সমাজে অনেকের মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের এ সকল কুসংস্কার থেকে যায়। এ সকল কুসংস্কারকে উস্কে দেয়ার জন্য অনেক বানোয়াট কথা হাদীসের নামে বানিয়ে সমাজে প্রচার করেছে জালিয়াতগণ। এ সকল জাল কথার মধ্যে রয়েছে: এ মাস বালা মুসিবতরে মাস। এ মাসে এত লক্ষ এত হাজার... বালা নাযিল হয়।.. এ মাসেই আদম ফল খেয়েছিলেন। এমাসেই হাবীল নিহত হন। এ মাসেই নূহের কাওম ধ্বংস হয়। এ মাসেই ইবরাহীমকে (আ) আগুনে ফেলা হয়। .... এ মাসের আগমনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ব্যথিত হতেন। এ মাস চলে গেলে খুশি হতেন....। তিনি বলতেন:

مَنْ بَشَّرَنِيْ بِخُرُوْجِ صَفَرٍ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ (بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ)

"যে ব্যক্তি আমাকে সফর মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদ প্রদান করব।" .... ইত্যাদি অনেক কথা তারা বানিয়েছে। আর অনেক সরলপ্রাণ বুযুর্গও তাদের এ সকল জালিয়াতি বিশ্বাস করে ফেলেছেন। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, সফর মাসের অশুভত্ব ও বালা-মুসিবত বিষয়ক সকল কথাই ভিত্তিহীন মিথ্যা।[৭৪৪]

**(খ) সফর মাসের ১ম রাতের সালাত**

উপরের মিথ্যা কথাগুলোর ভিত্তিতেই একটি ভিত্তিহীন 'সালাতের' উদ্ভাবন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ যদি সফর মাসের ১ম রাত্রিতে মাগরিবের পরে ... বা ইশার পরে.. চার রাক'আত সালাত আদায় করে, অমুক অমুক সূরা বা আয়াত এতবার পাঠ করে .... তবে সে বিপদ থেকে রক্ষা পাবে, এত পুরস্কার পাবে... ইত্যাদি। এগুলো সবই ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা, যদিও অনেক সরলপ্রাণ আলিম ও বুযুর্গ এগুলো বিশ্বাস করেছেন বা তাদের বইয়ে বা ওয়াযে উল্লেখ করেছেন।[৭৪৫]

**(গ) সফর মাসের শেষ বুধবার**

বিভিন্ন জাল হাদীসে বলা হয়েছে, বুধবার অশুভ এবং যে কোনো মাসের শেষ বুধবার সবচেয়ে অশুভ দিন। আর সফর মাস যেহেতু অশুভ, সেহেতু সফর মাসের শেষ বুধবার বছরের সবচেয়ে বেশি অশুভ দিন এবং এ দিনে সবচেয়ে বেশি বালা মুসিবত নাযিল হয়। এ সব ভিত্তিহীন কথাবার্তা অনেক সরলপ্রাণ বুযুর্গ বিশ্বাস করেছেন। যেমন: "সফর মাসে একলাখ বিশ হাজার 'বালা' নাজিল হয় এবং সবদিনের চেয়ে 'আখেরী চাহার শুম্বা-'তে (সফর মাসে শেষ বুধবার) নাজিল হয় সবচেয়ে বেশী। সুতরাং ঐ দিনে যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত নিয়মে চার রাকাত নামাজ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ঐ বালা থেকে রক্ষা করবেন এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত তাকে হেফাজতে রাখবেন... ।"[৭৪৬]

এগুলো সবই ভিত্তিহীন কথা। তবে আমাদের দেশে 'আখেরী চাহার শুম্বা'-র প্রসিদ্ধি এ কারণে নয়, অন্য কারণে। প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূলুলাহ (ﷺ) সফর মাসের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি সফর মাসের শেষ বুধবারে কিছুটা সুস্থ হন এবং গোসল করেন। এরপর তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অসুস্থতাতেই তিনি পরের মাসে ইন্তিকাল করেন। এজন্য মুসলিমগণ এ দিনে তাঁর সর্বশেষ সুস্থতা ও গোসলের স্মৃতি উদযাপন করেন।

এ বিষয়ক প্রচলিত কাহিনীর সার-সংক্ষেপ প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি: "হযরত নবী করীম (ﷺ) দুনিয়া হইতে বিদায় নিবার পূর্ববর্তী সফর মাসের শেষ সপ্তাহে ভীষণভাবে রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। অতঃপর তিনি এই মাসের শেষ বুধবার দিন সুস্থ হইয়া গোসল করতঃ কিছু খানা খাইয়া মসজিদে নববীতে হাযির হইয়া নামাযের ইমামতী করিয়াছিলেন। ইহাতে উপস্থিত সাহাবীগণ অত্যধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন। আর খুশীর কারণে অনেকে অনেক দান খয়রাত করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর (রা) খুশীতে ৭ সহস্র দীনার এবং হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) ৫ সহস্র দীনার, হযরত ওসমান (রা) ১০ সহস্র দীনার, হযরত আলী (রা) ৩ সহস্র দীনার এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) ১০০ উট ও ১০০ ঘোড়া আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিয়াছিলেন। তৎপর হইতে মুসলমানগণ সাহাবীগণের নীতি অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। হযরত নবী করীম (ﷺ) এর এই দিনের গোসলই জীবনের শেষ গোসল ছিল। ইহার পর আর তিনি জীবিতকালে গোসল করেন নাই। তাই সকল মুসলমানের জন্য এই দিবসে ওজু-গোসল করতঃ ইবাদৎ বান্দেগী করা উচিৎ এবং হযরত নবী করীম (ﷺ) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ সাওয়াব রেছানী করা কর্তব্য... ।"[৭৪৭]

উপরের এ কাহিনীটিই কমবেশি সমাজে প্রচলিত ও বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা রয়েছে। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেও কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে এ ঘটনার কোনো প্রকারের উল্লেখ পাই নি। হাদীস তো দূরের কথা কোনো ইতিহাস বা জীবনী গ্রন্থেও আমি এ ঘটনার কোনো উল্লেখ পাই নি। ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম সমাজে 'সফর মাসের শেষ বুধবার' পালনের রেওয়াজ বা এ কাহিনী প্রচলিত আছে বলে আমার জানা নেই।

**১. রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর সর্বশেষ অসুস্থতা**

রাসূলুলাহ (ﷺ) সফর বা রবিউল আউয়াল মাসের কত তারিখ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে হাদীস শরীফে কোনোরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। অগণিত হাদীসে তাঁর অসুস্থতা, অসুস্থতা- কালীন অবস্থা, কর্ম, উপদেশ, তাঁর ইন্তিকাল ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনো ভাবে কোনো দিন-তারিখ বলা হয় নি।

২য় হিজরী শতক থেকে আলিমগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনের ঘটনাবলি ঐতিহাসিক দিন-তারিখ সহকারে সাজাতে চেষ্টা করেন। তাঁর অসুস্থতার শুরু সম্পর্কে অনেক মত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (১৫১ হি/৭৬৮ খৃ) বলেন:

أُبْتُدِئَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَكْوَاهُ الَّذِيْ قَبَضَهُ اللهُ فِيْهِ ... فِيْ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ صَفَرٍ، أَوْ فِيْ أَوَّلِ شَهْرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেন, সে অসুস্থতার শুরু হয়েছিল সফর মাসের শেষে কয়েক রাত থাকতে, অথবা রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে।"[৭৪৮]

কি বার থেকে তাঁর অসুস্থতার শুরু হয়েছিল, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন শনিবার, কেউ বলেছেন বুধবার এবং কেউ বলেছেন সোমবার তার অসুস্থতার শুরু হয়।[৭৪৯] কয়দিনের অসুস্থতার পরে তিনি ইন্তিকাল করেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, ১০ দিন, কেউ বলেছেন, ১২ দিন, কেউ বলেছেন ১৩ দিন, কেউ বলেছেন, ১৪ দিন অসুস্থ থাকার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন।[৭৫০]

পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাব যে, তিনি কোন তারিখে ইন্তিকাল করেছিলেন, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ১লা রবিউল আউয়াল, কেউ বলেছেন, ২রা রবিউল আউয়াল এবং কেউ বলেছেন, ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি ইন্তি কাল করেন।

সর্বাবস্থায়, কেউ কোনোভাবে বলছেন না যে, অসুস্থতা শুরু হওয়ার পরে মাঝে কোনো দিন তিনি সুস্থ হয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেই, ইন্তিকালের কয়েকদিন আগে তিনি গোসল করেছিলেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী সংকলিত হাদীসে আয়েশা (রা) বলেনঃ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ بَيْتِي وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ ... لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ (لَعَلِّى أَسْتَرِيحُ فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ) ... ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ ، فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার উপরে ৭ মশক পানি ঢাল...; যেন আমি আরাম বোধ করে লোকদের নির্দেশনা দিতে পারি। তখন আমরা এভাবে তাঁর দেহে পানি ঢাললাম...। এরপর তিনি মানুষদের কাছে বেরিয়ে যেয়ে তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তাদেরকে খুতবা প্রদান করলেন বা ওয়ায করলেন।"[৭৫১]

এখানে সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর অসুস্থতার মধ্যেই অসুস্থতা ও জ্বরের প্রকোপ কমানোর জন্য এভাবে গোসল করেন, যেন কিছুটা আরাম বোধ করেন এবং মসজিদে যেয়ে সবাইকে প্রয়োজনীয় নসীহত করতে পারেন।

এ গোসল করার ঘটনাটি কত তারিখে বা কী বারে ঘটেছিল তা হাদীসের কোনো বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। তবে আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্যান্য হাদীসের সাথে এ হাদীসের সমন্বয় করে উল্লেখ করেছেন যে, এ গোসলের ঘটনাটি ঘটেছিল ইন্তিকালের আগের বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ ইন্তেকালের ৫ দিন আগে।[৭৫২] ১২ই রবিউল আউয়াল ইন্তিকাল হলে তা ঘটেছিল ৮ই রবিউল আউয়াল।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সফর মাসের শেষ বুধবারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুস্থ হওয়া, গোসল করা এবং এজন্য সাহাবীগণের আনন্দিত হওয়া ও দান-সাদকা করার এ সকল কাহিনীর কোনোরূপ ভিত্তি নেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

যেহেতু মূল ঘটনাটিই প্রমাণিত নয়, সেহেতু সে ঘটনা উদযাপন করা বা পালন করার প্রশ্ন ওঠে না। এরপরেও আমাদের বুঝতে হবে যে, কোনো আনন্দের বা দুঃখের ঘটনায় আনন্দিত বা দুঃখিত হওয়া এক কথা, আর প্রতি বছর সে দিনে আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করা বা 'আনন্দ দিবস' বা 'শোক দিবস' উদযাপন করা সম্পূর্ণ অন্য কথা। উভয়ের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য।

রাসূলুল্লাহর (ﷺ) জীবনে অনেক আনন্দের দিন বা মুহূর্ত এসেছে, যখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন, শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য আল্লাহর দরবারে সাজদা করেছেন। কোনো কোনো ঘটনায় তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণও আনন্দিত হয়েছেন ও বিভিন্নভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পরের বছর বা পরবর্তী কোনো সময়ে সে দিন বা মুহূর্তকে তারা বাৎসরিক 'আনন্দ দিবস' হিসেবে উদযাপন করেন নি। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ বা সাহাবীদের কর্ম ছাড়া এরূপ কোনো দিন বা মুহূর্ত পালন করা বা এগুলোতে বিশেষ ইবাদত বিশেষ সাওয়াবের কারণ বলে মনে করার সুযোগ নেই।

**২. আখেরী চাহার শোম্বার নামায**

উপরের আলোচনা থেকে আমার জানতে পেরেছি যে, সফর মাসের শেষ বুধবারের কোনো প্রকার বিশেষত্ব হাদীস দ্বারা

প্রমাণিত নয়। এ দিনে কোনোরূপ ইবাদত, সালাত, সিয়াম, যিকির, দোয়া, দান, সদকা ইত্যাদি পালন করলে অন্য কোনো দিনের চেয়ে বেশি বা বিশেষ কোনো সাওয়াব বা বরকত লাভ করা যাবে বলে ধারণা করা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। এজন্য আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী লিখেছেন যে, সফর মাসের শেষ বুধবারে যে বিশেষ নফল সালাত বিশেষ কিছু সুরা, আয়াত ও দোয়া পাঠের মাধ্যমে আদায় করা হয়, তা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।[৭৫৩]

### ৩. রবিউল আউয়াল মাস

মহানবী মুহাম্মাদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ও ওফাতের মাস হিসাবে রবিউল আউয়াল মাস মুসলিম মানসে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। এ মাসের ফযীলত, ও আমল বিষয়ক হাদীস আলোচনা করার আগে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম ও ইন্তিকাল সম্পর্কে হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক চাই।

**(ক) রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর জন্ম দিবস**

রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর জন্ম বার, জন্ম দিন, জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ বিষয়ক হাদীস ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে। এখানে সংক্ষেপে কিছু বিষয় আলোচনা করছি।

সহীহ হাদীস থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন।[৭৫৪] হাদীসে নাবাবী থেকে তাঁর জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না। পরবর্তী যুগের আলিম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি মত রয়েছে। ইবন হিশাম, ইবন সা'দ, ইবন কাসীর, কাসতালানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেন :

(১). কারো মতে তাঁর জন্মতারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায় নি এবং জানা সম্ভব নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে আলোচনা তারা অবান্তর মনে করেন।

(২). কারো কারো মতে তিনি মুহাররাম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৩). অন্য মতে তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৪). কারো মতে তিনি রবিউল আউআল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক মুহাদ্দিস আবু মা'শার নাজীহ বিন আব্দুর রাহমান আস-সিনদী (১৭০হি) এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

(৫). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা কাসতালানী ও যারকানীর বর্ণনায় এ মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এ মতটি দু'জন সাহাবী ইবনু আব্বাস ও জুবাইর বিন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞ এ মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত তাবিয়ী ইমাম মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব আয-যুহরী (১২৫ হি.) তাঁর উস্তাদ প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নসববিদ ঐতিহাসিক তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবন জুবাইর ইবন মুতয়িম (১০০ হি.) থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছেন। কাসতালানী বলেন : "মুহাম্মাদ ইবন জুবাইর আরবদের বংশ পরিচিতি ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মতারিখ সম্পর্কিত এ মতটি তিনি তাঁর পিতা সাহাবী জুবাইর বিন মুতয়িম থেকে গ্রহণ করেছেন। স্পেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ আলী ইবন আহমাদ ইবন হাযম (৪৫৬ হি) ও মুহাম্মাদ ইবন ফাতুহ আল-হুমাইদী (৪৮৮ হি) এ মতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসূফ ইবন আব্দুলাহ্ ইবন আব্দুল বার (৪৬৩ হি) উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকগণ এ মতটিই সঠিক বলে মনে করেন। মীলাদের উপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবন দেহিয়া (৬৩৩ হি) ঈদে মীলাদুন্নবীর উপর লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ "আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাযীর" -এ এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন।

(৬). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ ১০ রবিউল আউয়াল। এ মতটি ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবন আলী আল বাকির (১১৪ হি) থেকে বর্ণিত। ১ম-২য় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আমির ইবন শারাহিল শাবী (১০৪ হি.) থেকেও মতটি বর্ণিত। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবন উমর আল-ওয়াকিদী (২০৭ হি) এ মত গ্রহণ করেছেন। ইবন সা'দ তার বিখ্যাত "আত-তাবাকাতুল কুবরা"-য় শুধু দু'টি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ।[৭৫৫]

(৭). কারো মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মতারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এ মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (১৫১ হি) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতির বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।"[৭৫৬] এখানে লক্ষণীয় যে, ইবন ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণত সনদসহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এ তথ্যটির জন্য কোনো সনদ উল্লেখ করেন নি। কোথা থেকে তিনি এ তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানান নি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেন নি। এ জন্য অনেক গবেষক এ মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ

করেছেন[৭৫৭]। তা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগে এ মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইবন কাসীর উল্লেখ করেছেন যে ২ জন সাহাবী জাবির ইবন আব্দুলাহ্ (রা) ও আব্দুলাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে এ মতটি বর্ণিত।

**(৮).** অন্য মতে রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্ম তারিখ ১৭-ই রবিউল আউয়াল।

**(৯).** অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২-শে রবিউল আউয়াল।

**(১০).** অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

**(১১).** অন্য মতে তিনি রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। ।

**(১২).** অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। ৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবন বাক্কার (২৫৬ হি.) থেকে এ মতটি বর্ণিত। তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নুবুওয়াত পেয়েছেন। তিনি ৪০ বছর পূর্তিতে নবুয়্যত পেয়েছেন। তাহলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে। এছাড়া কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের পবিত্র দিনগুলোতে মাতৃগর্ভে আসেন। সেক্ষেত্রেও তাঁর জন্ম রমযানেই হওয়া উচিত। এ মতের সমর্থনে আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা) থেকে একটি বর্ণনা আছে বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।[৭৫৮]

**(খ) রাসূলুলাহ্ (ﷺ)-এর ওফাত দিবস**

বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুলাহ্ (ﷺ) সোমবার ইন্তিকাল করেন।[৭৫৯] কিন্তু এ সোমবারটি কোন্ মাসের কোন্ তারিখ ছিল তা কোনো হাদীসে বলা হয় নি। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রামাদান মাসের ১১ তারিখে ইন্তিকাল করেন।[৭৬০] এ একক বর্ণনাটি ছাড়া মুসলিম উম্মাহর সকল ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস একমত যে, রাসূলুলাহ্ (ﷺ) রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু কোন্ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেছেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

বুখারী-মুসলিম সংকলিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিদায় হজ্জে ৯ই যুলহাজ্জ ছিল শুক্রবার।[৭৬১] এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে বছর যুলহাজ্জ মাসের ১ তারিখ ছিল বৃহস্পতিবার। আমরা জানি যে, বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে তিনি যুলহাজ্জ মাসের বাকি দিনগুলি এবং মুহার্‌রাম ও সফর মাস মদীনায় অবস্থান করেন এবং রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বিদায় হজ্জের এ দিনের পরে ৮০ বা ৮১ দিন জীবিত ছিলেন। এরপর রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৭৬২]

ওফাতের তারিখ সম্পর্কে দ্বিতীয় হিজরীর তাবিয়ী ঐতিহাসিকগণ এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের ৪টি মত রয়েছে: ১ রবিউল আউয়াল, ২ রবিউল আউয়াল, ১২ রবিউল আউয়াল ও ১৩ রাবিউল আউয়াল।[৭৬৩]

সাধারণভাবে পরবর্তী কালে ১২ তারিখের মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু এখানে একটি কঠিন সমস্যা রয়েছে। আমরা জানি যে, আরবী মাস ৩০ বা ২৯ দিন হয় এবং সাধারণত কখনোই পরপর তিনটি মাস ৩০ বা ২৯ দিনের হয় না। উপরের হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, যুলহাজ্জ মাস শুরু হয়েছিল বৃহস্পতিবার। আর বৃহস্পতিবার ১ যুলহাজ্জ হলে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ কোনোভাবেই সোমবার হতে পারে না।

যুলহাজ্জ, মুহার্‌রাম ও সফর তিনটি মাসই ৩০ দিনে ধরলে ১ রবিউল আউয়াল হয় বুধবার। দু'টি ৩০ ও একটি ২৯ ধরলে ১ রবিউল আউয়াল হয় মঙ্গলবার। দু'টি ২৯ ও একটি ৩০ ধরলে হয় ১ রবিউল আউয়াল হয় সোমবার। আর তিনটি মাসই ২৯ দিন ধরলে ১ রবিউল আউয়াল হয় রবিবার। আর কোনো হিসাবেই ১২ তারিখ সোমবার হয় না।

এ সমস্যা থেকে বের হওয়ার জন্য কেউ কেউ ১৩ তারিখের কথা বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনটি মাসই ৩০ দিনের ছিল এবং মদীনায় একদিন পরে চাঁদ দেখা গিয়েছিল। দুটি ব্যখ্যাই দূরবর্তী।[৭৬৪]

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আলামা সুলাইমান ইবনু তারখান আত-তাইমী (৪৬-১৪৩ হি) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অসুস্থতার শুরু হয় ২২ সফর শনিবার। ১০ দিন অসুস্থতার পর ২ রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি ইন্তি কাল করেন।"[৭৬৫]

তাঁর এ মতঅনুসারে সে বছরে যুলহাজ্জ, মুহার্‌রাম ও সফর তিনটি মাসই ২৯ দিন ছিল, যা সাধারণত খুবই কম ঘটে। এ জন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক ও গবেষক ১লা রবিউল আউয়ালের মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে আল্লামা সুহাইলী,

ইবনু হাজার প্রমুখ গবেষক মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ২ তারিখের মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। তিনটি কারণে তাঁরা এ মতটি গ্রহণ করেছেন। প্রথম, তাবিয়ীগণের যুগ থেকে সহীহ সনদে কথাটি পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়, এ মতটি বিদায় হজ্জের পরে তাঁর ৮০ বা ৮১ দিন জীবিত থাকার বর্ণনাটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তৃতীয়, যারা ১২ বলেছেন তাদের কথার একটি দূরবর্তী ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে, আরবীতে (ثاني شهر) কে (ثاني عشر) বা 'মাসের দুই'-কে 'দশের দুই' (১২) পড়ার একটি সম্ভাবনা থাকে। কেউ হয়ত ২-কে ১২ পড়েছিলেন ও লিখেছিলেন এবং অন্যরা তার অনুসরণ করেছেন।[৭৬৬]

**(গ) রবিউল আউয়াল বিষয়ক ভিত্তিহীন কথাবার্তা**

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর জন্ম বা ওফাতের মাস হিসাবে রবিউল আউয়াল মাসের কোনো উল্লেখ হাদীস শরীফে নেই। এ মাসের কোনো বিশেষ ফযীলত বা বিশেষ আমল কোনো কিছুই হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

এ বিষয়ক মিথ্যা গল্প কাহিনীর মধ্যে রয়েছে: "এ মাসের ১২ তারিখে বুজুর্গ তাবিয়ী'গণ হযরত রাসূলে কারীম (ﷺ) এর রূহের মাগফিরাতের জন্য ২০ রাকয়া'ত নফল নামায পড়িতেন। এ নামায দুই দুই রাকয়া'তের নিয়তে আদায় করিতেন এবং প্রত্যেক রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে ১১ বার করিয়া সূরা ইখলাছ পড়িতেন। নামায শেষে আল্লাহর হাবীবের প্রতি সাওয়াব রেছানী করিতেন। তাহারা ইহার বরকতে খাবের মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দর্শন লাভ করিতেন এবং দোজাহানের খায়ের ও বরকত লাভ করিতেন। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, কোন মু'মিন ব্যক্তি নিম্নের দরূদ শরীফ এ মাসের যে কোন তারিখে এশার নামাযের পরে ১১২৫ বার পাঠ করিলে আল্লাহর রহমতে সে ব্যক্তি হযরত নবী করীম (ﷺ) কে স্বপ্নে দর্শন লাভ করিবে।..."[৭৬৭]

এরূপ আরো অনেক ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা প্রচলিত বিভিন্ন পুস্তকে দেখা যায়।[৭৬৮] এগুলো সবই বানোয়াট কথা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইন্তিকালের পরবর্তী তিন যুগ, সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের মধ্যে এ মাসটির কোনো পরিচিতিই ছিল না। এ মাসটি যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্ম মাস সে কথাটিই তখনো প্রসিদ্ধি লাভ করে নি।

৪০০ হিজরীর দিকে সর্বপ্রথম মিসরের ফাতেমীয় শিয়া শাসকগণ এ মাসে 'মীলাদ' বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্ম দিবস পালনের প্রচলন করে। ৬০০ হিজরীতে ইরাকের ইরবিল শহরে ৮ ও ১২ রবিউল আউয়াল 'মীলাদ' বা 'ঈদ মীলাদুন্নবী' নামে রাসূলুলাহ ﷺ-এর জন্ম উদযাপন শুরু হয়। অপরদিকে ভারত ও অন্যান্য দেশে ১২ রবিউল আউয়ালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাত উপলক্ষ্যে 'ফাতেহা' বা 'ফাতেহায়ে দোয়াজদহম' উদযাপন শুরু হয়। এ বিষয়ক সকল তথ্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'এহইয়াউস সুনান'** গ্রন্থে।

### ৪. রবিউস সানী মাস

রবিউস সানী বা রবিউল আখির মাসের কোনোরূপ বৈশিষ্ট্য, ফযীলত বা এ মাসের কোনো বিশেষ সালাত, সিয়াম, দোয়া, যিক্‌র বা বিশেষ কোনো আমল হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় নি।

রাসূলুলাহ (ﷺ) এর ইন্তিকালের প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর পরে, ৫৬১ হিজরী সালের রবিউস সানী মাসের ১০ তারিখে আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) ইন্তিকাল করেন। আমাদের দেশে অনেকে এ উপলক্ষ্যে ১১ রবিউস সানী গেয়ারভী শরীফ বা ফাতেহায়ে ইয়াযদহম উদযাপন করেন।

স্বভাবতই এর সাথে হাদীসের কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। এমনকি জন্ম বা মৃত্যু উদযাপন করা বা জন্ম তারিখ বা মৃত্যু তারিখ উপলক্ষ্যে দোয়া খায়ের বা সাওয়াব রেসানী করার কোনো নির্দেশনা, প্রচলন বা উৎসাহ কোনো হাদীসে নেই। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় তাঁর ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী অনেক আত্মীয় ও অনেক সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন, যারা সকলেই আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম ওলীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি কখনো কারো মৃত্যুর পরের বছরে, বা পরবর্তী কোনো সময়ে মৃত্যুর দিনে বা অন্য কোনো সময়ে কোনো ফাতেহা বা কোনো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ওফাতের পরে তাঁর কন্যা ফাতিমা, জামাতা আলী, দৌহিত্র হাসান-হুসাইন, উম্মুল মুমিনীনগণ, খলীফায়ে রাশিদগণ, অন্যান্য সাহাবীগণ, তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণ কেউ কখনো তাঁর ওফাতের দিনে বা অন্য কোনো সময়ে কোনোরূপ ফাতেহা, দোয়া বা কোনো অনুষ্ঠান করেন নি। অনুরূপভাবে কোনো সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী, চার ইমাম, তাদের ছাত্রগণ কেউ কখনো এরূপ ফাতিহা বা অনুষ্ঠান করেন নি।

রবিউস সানী মাসের ফযীলত, আমল ইত্যাদি নামে যা কিছু প্রচলিত রয়েছে সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। যেমন "রবিউস-সানী মাসের প্রথম তারিখে রাত্রিবেলা চার রাকয়া'ত নফল নামায আদায় করিতে হয়। উহার প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা ইখলাছ পড়িতে হয়। এই নামায আদায়কারীর আমল নামায় ৯০ হাজার বৎসরের সাওয়াব লিখা হইবে এবং ৯০ হাজার বৎসরের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"[৭৬৯] এরূপ আরো অনেক আজগুবি মিথ্যা কথা প্রচলিত বিভিন্ন পুস্তকে দেখা যায়।[৭৭০]

### ৫. জমাদিউল আউয়াল মাস

জমাদিউল আউয়াল (জুমাদা আল-উলা) মাসের কোনোরূপ বৈশিষ্ট্য, ফযীলত বা এ মাসের কোনো বিশেষ সালাত, সিয়াম, দোয়া, যিক্‌র বা বিশেষ কোনো আমল হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। যেমন: "রাসূলে করীম (ﷺ) এর সাহাবীগণ এ মাসের প্রথম তারিখে দুই রাকয়াতের নিয়তে মোট ২০ রাকয়া'ত নামায আদায় করিতেন এবং ইহার প্রত্যেক রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে একবার করিয়া সূরা ইখলাছ পাঠ করিতেন। নামাযের পরে নিম্নের দরূদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করিতেন। এই নামাযীর আমল নামায় অসংখ্য নেকী লিখা হইবে এবং তাহার সমস্ত নেক নিয়ত পূর্ণ করা হইবে। ...কোন ব্যক্তি এই মাসের প্রথম তারিখে দিনের বেলা দুই রাকয়া'তের নিয়তে মোট ৮ রাকয়া'ত নামায আদায় করিলে এবং উহার প্রত্যেক রাকয়া'তে ১১ বার করিয়া সূরা ইখলাস পাঠ করিলে.. ।"[৭৭১] এ জাতীয় অনেক আজগুবি, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা আমাদের দেশে প্রচলিত 'বার চাঁদের ফযীলত' ও এই ধরনের পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়।

**৬. জমাদিউস সানী মাস**

জমাদিউস সানী বা জমাদিউল আখির (জুমাদা আল-আখেরা) মাসের কোনোরূপ বৈশিষ্ট্য, ফযীলত বা এই মাসের কোনো বিশেষ সালাত, সিয়াম, দোয়া, যিক্‌র বা বিশেষ কোনো আমল হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। যেমন, "জমাদিউস সানী মাসের পহেলা তারিখে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ দুই রাকয়াতের নিয়তে মোট ১২ রাকয়া'ত নামায আদায় করিতেন। ইহার প্রত্যেক রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে ১১ বার করিয়া সুরা ইখলাছ পড়িতেন। আবার কেহ কেহ সূরা ইখলাছের পরে ৩ বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করিতেন। এই নামাযে অসংখ্য নেকী লাভ হয়।..."[৭৭২]

এ সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা।

**৭. রজব মাস**

রজব মাসকে নিয়ে যত বেশি মিথ্যা হাদীস তৈরি করা হয়েছে, তত বেশি আর কোনো মাসকে নিয়ে করা হয় নি। সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানী, জমাদিউল আউয়াল ও জমাদিউস সানী এ ৫ মাসের ফযীলত বা খাস ইবাদত বিষয়ক যা কিছু বানোয়াট কথাবার্তা তা মূলত গত কয়েক শত বছর যাবত ভারতীয় উপমহাদেশেই প্রচলিত হয়েছে। ৫ম/৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত মাউযূ হাদীস বা ফযীলতের বইগুলোতেও এ সকল মাসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ সকল যুগে যে সকল নেককার সরলপ্রাণ বুযুর্গ ফযীলত ও আমলের বিষয়ে সত্য-মিথ্যা সকল কথাই জমা করে লিখতেন তাদের বই-পুস্তকেও এ মাসগুলোর কোনো প্রকারের উল্লেখ নেই। তাঁরা মূলত রজব মাস দিয়েই তাদের আলোচনা শুরু করতেন এবং মুহার্‌রাম মাস দিয়ে শেষ করতেন।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, রজব মাস ইসলামী শরীয়তের 'হারাম' অর্থাৎ 'নিষিদ্ধ' বা 'সম্মানিত' মাসগুলির অন্যতম। জাহিলী যুগ থেকেই আরবরা 'ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়ত' অনুসারে এ মাসগুলোর সম্মান করত। তবে ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ প্রবেশ করে। জাহিলী যুগে আরবরা এ মাসকে বিশেষ ভাবে সম্মান করত। এ মাসে তারা 'আতীরাহ' নামে এক প্রকারের 'কুরবানী' করত এবং উৎসব করত। হাদীস শরীফে তা নিষেধ করা হয়েছে।[৭৭৩]

'হারাম' মাস হিসাবে সাধারণ মর্যাদা ছাড়া 'রজব' মাসের মর্যাদায় কোনো সহীহ হাদীসে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয় নি। এ মাসের কোনোরূপ মর্যাদা, এ মাসের কোনা দিনে বা রাতে কোনো বিশেষ সালাত, সিয়াম, যিক্‌র, দোয়া, তিলাওয়াত বা কোনো বিশেষ ইবাদতের বিশেষ কোনো ফযীলত আছে এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনোরূপ কোনো হাদীস সহীহ বা গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। পরবর্তী যুগের তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ীগণ থেকে সামান্য কিছু কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে অনেক জাল কথা প্রচলিত। যেহেতু আমাদের দেশে সাধারণভাবে ২৭ রজব ছাড়া অন্য কোনো দিবস বা রাত্রি কেন্দ্রিক জাল হাদীসগুলো তেমন প্রসিদ্ধ নয়, সেহেতু ২৭ রজবের বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা ও বাকি বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনার ইচ্ছা করছি। মহান আল্লাহর দরবারে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

**(ক) সাধারণভাবে রজব মাসের মর্যাদা**

সাধারণভাবে 'রজব' মাসের মর্যাদা, এ মাসে কী কী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে এবং এ মাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোনো সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের সালাত, সিয়াম, দান, দোয়া ইত্যাদি ইবাদত করলে কী অকল্পনীয় পরিমাণে সাওয়াব বা পুরস্কার পাওয়া যাবে তার বর্ণনায় অনেক জাল হাদীস বানানো হয়েছে। আমাদের দেশের প্রচলিত 'বার চাঁদের ফযীলত' ও আমল-ওযীফা বিষয়ক বইগুলোতে এগুলোর সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

যেমন, অন্য মাসের উপর রজবের মর্যাদা তেমনি, যেমন সাধারণ মানুষের কথার উপরে কুরআনের মর্যাদা... । এ মাসে নূহ (আ) ও তাঁর সহযাত্রীগণ নৌকায় আরোহণ করেন... । এ মাসেই নৌকা পানিতে ভেসেছিল ... । এ মাসেই রক্ষা পেয়েছিল। এ

মাসেই আদমের তাওবা কবুল হয়। ইউনূস (আ)-এর জাতির তাওবা কবুল করা হয়। এ মাসেই ইবরাহীম (আ) ও ঈসা (আ) এর জন্ম। এ মাসেই মূসার জন্য সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হয়। ....

এ মাসের প্রথম তারিখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেন। এ মাসের ২৭ তারিখে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন।... এ মাসের ২৭ তারিখে তিনি মি'রাজে গমন করেন। ... এ মাসে সালাত, সিয়াম, দান-সাদকা, যিক্র, দরুদ, দোয়া ইত্যাদি নেক আমল করলে তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায় বা বহুগুণ বেড়ে যায়... । ইত্যাদি সবই ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা ও জাল হাদীস।[৭৭৪]

পূর্ববর্তী অনেক বুযুর্গের আমল ও ফাযাইল বিষয়ক গ্রন্থে এগুলোর সমাবেশ রয়েছে। তবে আমাদের সমাজের সাধারণ ধার্মিক মুসলিমদের মধ্যে এগুলোর প্রচলন কম। এজন্য এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা বর্জন করছি।

**(খ) রজব মাসের সালাত**

রজব মাসে সাধারণভাবে এবং রজব মাসের ১ তারিখ, ১ম শুক্রবার, ৩, ৪, ৫ তারিখ, ১৫ তারিখ, ২৭ তারিখ, শেষ দিন ও অন্যান্য বিশেষ দিনে বা রাতে বিশেষ সালাত আদায়ের বিশেষ পদ্ধতি ও সেগুলোর অভাবনীয় পুরস্কারের ফিরিস্তি দিয়ে অনেক জাল হাদীস প্রচারিত হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের আমল, ওযীফা ও ফাযাইল বিষয়ক পুস্তকাদিতে এবং আমাদের দেশের বার চান্দের ফযীলত, আমল-ওযীফা ও অন্যান্য পুস্তকে এগুলোর কিছু কথা পাওয়া যায়। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এগুলোর প্রচলন কম। এজন্য এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করছি না। মুহাদ্দিসগণ এক্ষেত্রে যে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন তা বলেই শেষ করছি। আল্লামা ইবনু রাজাব, ইবনু হাজার, সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস একবাক্যে বলেছেন, রজব মাসে বিশেষ কোনো সালাত বা রজব মাসের কোনো দিনে বা রাতে কোনো সময়ে কোনো সালাত আদায় করলে বিশেষ সাওয়াব পাওয়া যাবে এ মর্মে একটি হাদীসও গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল ও বানোয়াট।[৭৭৫]

**(গ) রজব মাসের দান, যিকর ইত্যাদি**

রজব মাসের দান, যিক্র, দরূদ, দোয়া ইত্যাদি নেক আমলের বিশেষ কোনো সাওয়াব হবে বা সাধারণ সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে এ মর্মে যা কিছু বর্ণিত ও প্রচলিত হয়েছে সবই বাতিল ও ভিত্তিহীন।[৭৭৬]

**(ঘ) রজব মাসের সিয়াম**

সবচেয়ে বেশি জাল হাদীস প্রচলিত হয়েছে রজব মাসের সিয়াম পালনের বিষয়ে। বিভিন্নভাবে এ মাসে সিয়াম পালনের উৎসাহ দিয়ে জালিয়াতগণ হাদীস জাল করেছে। কোনো কোনো জাল হাদীসে সাধারণভাবে রজব মাসে সিয়াম পালন করলে কত অভাবনীয় সাওয়াব তা বলা হয়েছে। কোনোটিতে রজব মাসের নির্ধারিত কিছু দিনের সিয়াম পালনের বিভিন্ন বানোয়াট সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। কোনোটিতে রজব মাসে ১ টি সিয়ামের কি সাওয়াব, ২টি সিয়ামের কি সাওয়াব, ৩টির কি সাওয়াব.... ৩০টি সিয়ামের কত সাওয়াব ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, রজব মাসের সিয়ামের বিশেষ সাওয়াব বা রজব মাসের বিশেষ কোনো দিনে সিয়াম পালনের উৎসাহ জ্ঞাপক সকল হাদীসই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো কথাই নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি।[৭৭৭]

**(ঙ) লাইলাতুর রাগাইব**

রজব মাস বিষয়ক জাল হাদীসের মধ্যে অন্যতম হলো 'লাইলাতুর রাগাইব' ও সে রাত্রির বিশেষ সালাত বিষয়ক জাল হাদীস। মুহাদ্দিসগণ একমত যে এ রাত্রির নামকরণ, ফযীলত, এ রাত্রির সালাতের ফযীলত, রাক'আত সংখ্যা, সূরা কিরাআত, পদ্ধতি সব কিছুই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা। কিন্তু বিষয়টি অনেক মুসলিম দেশে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে।

প্রথমে কিছু জালিয়াত এ রাত্রিটির নামকরণ ও এ বিষয়ক কিছু আজগুবি গল্প বানায়। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি আকর্ষণীয় ওয়াযে পরিণত হয়। জাল হাদীসের একটি বৈশিষ্ট্য, তা সাধারণ মানুষের চিত্তাকর্ষক হয় এবং কোনো একটি জাল হাদীস একবার 'বাজার পেলে' তখন অন্যান্য জালিয়াতও বিভিন্ন সনদ বানিয়ে তা বলতে থাকে। এভাবে অনেক জাল হাদীস সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। সালাতুর রাগাইব বিষয়ক হাদীসগুলোও সেরূপ। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পরে এই জাল হাদীসগুলো প্রচারিত ও প্রসিদ্ধি লাভ করলে সাধারণ মুসল্লীগণ অনেক দেশে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ঘটা করে সালাতুর রাগাইব পালন করতে শুরু করেন। এ সকল সমাজে 'লাইলাতুর রাগাইব' আমাদের দেশের 'লাইলাতুল বারাত'-এর মতই উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

এ বানোয়াট সালাতটি আমাদের দেশে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। এজন্য এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। এর সার সংক্ষেপ হলো, রজব মাসের প্রথম শুক্রবারের রাত্রি হলো 'লাইলাতুর রাগাইব' বা 'আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের রাত'। রজবের

প্রথম বৃহস্পতিবারে সিয়াম পালন করে, বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবারের রাত্রিতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ১২ রাক'আত সালাত নির্ধারিত সূরা, আয়াত ও দোয়া-দরূদ দিয়ে আদায় করবে। .... তাহলে এ ব্যক্তি এত এত.... পুরস্কার লাভ করবে।... এর সাথে আরো অনেক কল্প কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে এ সকল জাল হাদীসে।

এ সকল হাদীসের প্রচলন শুরু হওয়ার পর থেকে মুহাদ্দিসগণ সেগুলির সূত্র ও উৎস নিরীক্ষা করে এর জালিয়াতির বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর সকল মুহাদ্দিস একমত যে, 'লাইলাতুর রাগাইব' ও 'সালাতুর রাগাইব' বিষয়ক সকল কথা মিথ্যা, জাল ও বানোয়াট।[৭৭৮]

**(চ) রজব মাসের ২৭ তারিখ**

বর্তমানে আমাদের সমাজে ২৭শে রজব মি'রাজ-এর রাত বলেই প্রসিদ্ধ। সে হিসেবেই আমাদের দেশের মুসলিমগণ এ দিনটি উদযাপন করে থাকেন। কিন্তু এ প্রসিদ্ধির আগেও রজব মাসের ২৭ তারিখ বিষয়ক আরো অনেক কথা প্রচলিত হয়েছিল এবং এই তারিখের দিবসে ও রাতে ইবাদত বন্দেগির বিষয়ে অনেক জাল কথা প্রচলিত হয়েছিল। প্রথমে আমরা 'লাইলাতুল মি'রাজ' সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। এরপর এ দিন সম্পর্কে প্রচলিত বানোয়াট ও জাল হাদীসগুলো আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

**১. লাইলাতুল মি'রাজ**

ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা বিভিন্নভাবে কুরআন কারীমে ও অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে প্রায় অর্ধশত সাহাবী থেকে মি'রাজের ঘটনার বিভিন্ন দিক ছোট বা বড় আকারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে একটি কথাও বর্ণিত হয় নি। সাহাবীগণ কখনো তাঁকে তারিখ সম্পর্কে প্রশ্নও করেছেন বলে জানা যায় না। পরবর্তী যুগের তাবিয়ীদেরও একই অবস্থা ; তাঁরা এ সকল হাদীস সাহাবীদের থেকে শিখছেন, কিন্তু তাঁরা তারিখ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করছেন না। কারণ, তাঁদের কাছে তারিখের বিষয়টির কোনো মূল্য ছিল না, এসকল হাদীসের শিক্ষা গ্রহণই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। ফলে তারিখের বিষয়ে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মি'রাজ একবার না একাধিকবার সংঘঠিত হয়েছে, কোন্ বছর হয়েছে, কোন্ মাসে হয়েছে, কোন্ তারিখে হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে এবং প্রায় ২০টি মত রয়েছে। মাসের ক্ষেত্রে অনেকেই বলেছেন রবিউল আউয়াল মাসের ২৭ তারিখ। কেউ বলেছেন রবিউস সানী মাসে, কেউ বলেছেন রজব মাসে, কেউ বলেছেন, রমযান মাসে, কেউ বলেছেন শাওয়াল মাসে, কেউ বলেছেন যিলকাদ মাসে এবং কেউ বলেছেন, যুলহাজ্জ মাসে। তারিখের বিষয়ে আরো অনেক মতবিরোধ আছে।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে তাবিয়ী ঐতিহাসিকগণ মি'রাজের ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করতে পারেন নি। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ মি'রাজের তারিখ বিষয়ক মতভেদ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি.), ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.), আহমাদ বিন মুহাম্মাদ কাসতালানী (৯২৩হি.), মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ শামী (৯৪২ হি.), আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি) ও অন্যান্যরা এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।[৭৭৯]

এত মতবিরোধের কারণ হাদীস শরীফে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয় নি এবং সাহাবীগণও কিছু বলেন নি। তাবি-তাবিয়ীদের যুগে তারিখ নিয়ে কথা শুরু হয়, কিন্তু কেউই সঠিক সমাধান না দিতে পারায় তাঁদের যুগ ও পরবর্তী যুগে এত মতবিরোধ হয়। এ মতবিরোধ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কয়েক শতক আগেও 'শবে মি'রাজ' বলতে নির্দিষ্ট কোনো রাত নির্দিষ্ট ছিল না।

এভাবে আমরা দেখছি যে, রজব মাসের ২৭ তারিখে মি'রাজ হয়েছিল, বা এ তারিখটি 'লাইলাতুল মি'রাজ', এই কথাটি তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকগণের অনেক মতের একটি মত মাত্র। এ কথাটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এ তারিখে মি'রাজ হওয়া সম্পর্কে কোনো কিছুই সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই ঐতিহাসিকগণের মতামত অথবা বানোয়াট কথাবার্তা।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কোনো কোনো জাল হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, রজব মাসের ২৭ তারিখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেন, নবুয়ত লাভ করেন ... ইত্যাদি। এগুলোও বাতিল ও মিথ্যা কথা।

**২. ২৭ রজবের ইবাদত**

মি'রাজের রাত্রিতে ইবাদত বন্দেগি করলে বিশেষ কোনো সাওয়াব হবে এ বিষয়ে একটিও সহীহ বা যয়ীফ হাদীস নেই। মি'রাজের রাত কোন্‌টি তাই হাদীসে বলা হয়নি, সেখানে রাত পালনের কথা কী-ভাবে আসে। তবে ২৭ রজবের দিনে এবং রাতে ইবাদত বন্দেগির ফযীলতের বিষয়ে কিছু জাল হাদীস প্রচলিত আছে। এ সকল জাল হাদীসে মি'রাজের রাত হিসেবে নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির দিবস হিসেবে বা একটি ফযীলতের দিন হিসেবে '২৭ রজব'-কে বিশেষ মর্যাদাময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরূপ একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

إِنَّ فِيْ رَجَبٍ يَوْماً وَلَيْلَةً مَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَقَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ كَمَنْ صَامَ مِائَةَ سَنَةٍ وَقَامَ لَيَالِيَهَا وَهِيَ

لِثَلاَثَةٍ بَقِيْنَ مِنْ رَجَبٍ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْهِ مُحَمَّدٌﷺ، وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ نَزَلَ فِيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَى مُحَمَّدٍﷺ.

"রজব মাসের মধ্যে একটি দিন আছে, কেউ যদি সে দিনে সিয়াম পালন করে এবং সে দিনের রাত দাঁড়িয়ে (সালাতে) থাকে তাহলে সে ১০০ বছর সিয়াম পালন করার ও রাত জেগে সালাত আদায়ের সাওয়াব লাভ করবে। সে দিনটি রজব মাসের ২৭ তারিখ। এ দিনেই মুহাম্মাদ (ﷺ) নবুয়ত লাভ করেন, এ দিনেই সর্বপ্রথম জিবরাঈল মুহাম্মাদ (ﷺ) উপর অবতরণ করেন।"[৭৮০]

অন্য একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ:

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِماً حَطَّ اللهُ عَنْهُ ذُنُوْبَ سِتِّيْنَ سَنَةً وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ بُعِثَ فِيْهَا مُحَمَّدٌ ﷺ.

"যদি কেউ রজব মাসের ২৭ তারিখে রাত্রিতে ১২ রাক'আত সালাত আদায় করে, প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে, সালাত শেষ হলে সে বসা অবস্থাতেই ৭ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে এবং এরপর ৪ বার 'সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইলাল্লাহু, ওয়ালাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম' বলে, অতঃপর সকালে সিয়াম শুরু করে, তবে আল্লাহ তার ৬০ বছরের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। এ রাতেই মুহাম্মাদ (ﷺ) নবুয়ত পেয়েছিলেন।"[৭৮১]

অন্য একটি জাল হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ:

بُعِثْتُ نَبِيًّا فِيْ السَّابِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَفَّارَةَ سِتِّيْنَ شَهْراً

"রজব মাসের ২৭ তারিখে আমি নবুয়ত পেয়েছি। কাজেই যে ব্যক্তি এই দিনে সিয়াম পালন করবে তার ৬০ মাসের গোনাহের কাফফারা হবে।"[৭৮২]

আরেকটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে, "ইবনু আব্বাস (রা) ২৭শে রজবের সকাল থেকে ইতিকাফ শুরু করতেন। যোহর পর্যন্ত সালাতে রত থাকতেন। যোহরের পরে অমুক অমুক সূরা দিয়ে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন... এবং আসর পর্যন্ত দোয়ায় রত থাকতেন...। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ করতেন।"[৭৮৩] এগুলো সবই জঘন্য মিথ্যা কথা।

২৭ রজবের ফযীলতে এবং এ দিনে ও রাতে সালাত, সিয়াম, দোয়া ইত্যাদি ইবাদতের ফযীলতে অনুরূপ আরো অনেক মিথ্যা কথা জালিয়াতগণ প্রচার করেছে। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, ২৭ রজব সম্পর্কে হাদীস নামে যা কিছু প্রচলিত সবই ভিত্তিহীন, বাতিল ও জাল। রজব মাস এবং এ মাসের কোনো দিন বা রাতের বিশেষ ফযীলতের বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীসই ভিত্তিহীন। ২৭ রজব বিষয়ক হাদীসগুলোও এ সকল বাতিলের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু হাজার আসকালানী, মোল্লা আলী কারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আজলূনী, আব্দুল হাই লাখনবী, দরবেশ হূত প্রমুখ মুহাদ্দিস বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ২৭ রজবের ফযীলত, এ তারিখের রাত্রে ইবাদত বা দিনের সিয়াম পালনের বিষয়ে বর্ণিত সকল কথাই বানোয়াট, জাল ও ভিত্তিহীন।[৭৮৪]

### ৮. শাবান মাস

#### (ক) সহীহ হাদীসের আলোকে শাবান মাস

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, সফর থেকে রজব পর্যন্ত ৬ মাসের কোনো বিশেষ ফযীলত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। শা'বান মাস তদ্রূপ নয়। সহীহ হাদীসে শাবান মাসের নিম্নলিখিত ফযীলতগুলো প্রমাণিত:

১. এ মাসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেশি বেশি সিয়াম পালন করতে ভালবাসতেন। তিনি সাধারণত এ মাসের অধিকাংশ দিন একটানা সিয়াম পালন করতেন বলে বুখারী ও মুসলিম সংকলিত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি বুখারী ও মুসলিমের কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি শা'বান মাস পুরোটাই নফল সিয়ামে কাটাতেন। তিনি এ মাসে কিছু সিয়াম পালন করতে সাহাবীগণকে উৎসাহ প্রদান করতেন।[৭৮৫]

২. আহমাদ, নাসাঈ প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলিত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বা হাসান পর্যায়ের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শা'বান মাসে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়; এজন্য এই মাসে বেশি বেশি নফল সিয়াম পালন করা উচিত।[৭৮৬]

৩. শা'বান মাসের মধ্যম রজনী বা ১৫ই শা'বানের রাতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এ সকল সহীহ ও হাসান হাদীসের পাশাপাশি এ মাসের ফযীলত ও ইবাদতের বিষয়ে অনেক জাল হাদীস প্রচলিত। এ জাল হাদীসগুলোকে আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি: ১ সাধারণভাবে শাবান মাস বিষয়ক ও ২. শাবান মাসের মধ্যম রজনী বা 'শবে বরাত' বিষয়ক। আমাদের দেশে দ্বিতীয় বিষয়টিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এজন্য প্রথম বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে আমরা দ্বিতীয় বিষয়ে বিস্ত ারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

**(খ) শাবান মাস বিষয়ক জাল ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা**

'বার চান্দের ফযীলত' জাতীয় কোনো কোনো পুস্তকে শা'বান মাসের প্রথম রজনীতে বিশেষ সূরা বা আয়াত দিয়ে কয়েক রাক'আত সালাত আদায়ের কথা, ফাতিমার (রা) জন্য বখশিশ করার কথা, শা'বান মাসে নির্ধারিত পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠের বিশেষ ফযীলতের কথা, শাবান মাসের যে কোনো জুমুআর দিবসে বিশেষ সূরা দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েক রাক'আত সালাত আদায়ের কথা এবং সেগুলোর কাল্পনিক সাওয়াবের কথা লিখা হয়েছে।[৭৮৭] এগুলো সবই ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। শা'বান মাসে নফল সিয়াম পালন ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারের বিশেষ ইবাদতের কথা কোনো হাদীসে বলা হয় নি।

**(গ) শবে বরাত বিষয়ক সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীস**

'মধ্য শাবানের রজনী' বা 'শবে বারাত' বিষয়ক সকল সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীস সনদ-সহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি **"কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল"** নামক গ্রন্থে। এখানে আমি এ বিষয়ক জাল হাদীসগুলো আলোচনা করতে চাই। প্রসঙ্গত এ বিষয়ক সহীহ ও যয়ীফ হাদীসগুলোর বিষয়েও কিছু কথা আসবে।

**১. মধ্য শাবানের রাত্রির বিশেষ মাগফিরাত**

এ বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"মহান আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।"

এ অর্থের হাদীস কাছাকাছি শব্দে ৮ জন সাহাবী: আবূ মূসা আশআরী, আউফ ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, মুয়ায ইবনু জাবাল, আবু সা'লাবা আল-খুশানী, আবূ হুরাইরা, আয়েশা ও আবূ বাকর সিদ্দীক (ﷺ) থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৭৮৮] এ সকল হাদীসের সনদ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা উপর্যুক্ত গ্রন্থে করেছি। এগুলোর মধ্যে কিছু সনদ দুর্বল ও কিছু সনদ 'হাসান' পর্যায়ের। সামগ্রিক বিচারে হাদীসটি সহীহ। শাইখ আলবানী বলেন, "হাদীসটি সহীহ। তা অনেক সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা একটি অন্যটিকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করে।..."[৭৮৯]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রিটি একটি বরকতময় রাত এবং এ রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন। কিন্তু এ ক্ষমা অর্জনের জন্য শিরক ও বিদ্বেষ বর্জন ব্যতীত অন্য কোনো আমল করার প্রয়োজন আছে কি না তা এই হাদীসে উল্লেখ নেই।

**২. মধ্য শাবানের রাত্রিতে ভাগ্য লিখন**

কিছু কিছু হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ রাত্রিতে ভাগ্য অনুলিপি করা হয় বা পরবর্তী বছরের জন্য হায়াত-মউত ও রিযক ইত্যাদির অনুলিপি করা হয়। হাদীসগুলোর সনদ বিস্তারিত আলোচনা করেছি উপর্যুক্ত পুস্তকটিতে। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলো অত্যন্ত দুর্বল অথবা বানোয়াট। এ অর্থে কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয় নি।

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

"আমি তো তা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে এবং আমি তো সতর্ককারী। এ রজনীতে প্রত্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।"[৭৯০]

এ বাণীর ব্যাখ্যায় তাবিয়ী ইকরিমাহ, বলেন, এখানে 'মুবারক রজনী' বলতে 'মধ্য শা'বানের রাতকে' বুঝানো হয়েছে। ইকরিমাহ বলেন, এ রাতে গোটা বছরের সকল বিষয়ে ফয়সালা করা হয়।[৭৯১]

মুফাস্সিরগণ ইকরিমার এ মত গ্রহণ করেন নি। ইমাম তাবারী বিভিন্ন সনদে ইকরিমার এ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করার পরে তার প্রতিবাদ

করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইকরিমার এ মত ভিত্তিহীন। তিনি বলেন যে, সঠিক মত হলো, এখানে 'মুবারক রজনী' বলতে 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র'-কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ যে রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন সে রাত্রিকে এক স্থানে লাইলাতুল কাদ্‌র: 'তাকদীরের রাত' বা 'মর্যাদার রাত' বলে অভিহিত করেছেন[১৯২]। অন্যত্র এ রাত্রিকেই 'লাইলাতুম মুবারাকা' বা 'বরকতময় রজনী' বলে অভিহিত করেছেন। এবং এ রাত্রিটি নিঃসন্দেহে রামাদান মাসের মধ্যে; কারণ অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন।[১৯৩] এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মুবারক রজনী রামাদান মাসে, শাবান মাসে নয়।[১৯৪]

পরবর্তী মুফাস্‌সিরগণ ইমাম তাবারীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, 'মুবারক রজনী' বলতে এখানে 'মহিমান্বিত রজনী' বা 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে 'লাইলাতুম মুবারাকা' এবং 'লাইলাতুল কাদ্‌র' একই রাতের দুটি উপাধি। দুটি কারণে মুফাস্‌সিরগণ ইকরিমার তাফসীরকে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন:

**(ক)** ইকরিমার মতটি কুরআনের সুস্পষ্ট বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন। অন্যত্র বলেছেন যে, একটি মুবারক রাত্রিতে ও একটি মহিমান্বিত রাত্রিতে তিনি কুরআন নাযিল করেছেন। এ সকল আয়াতের সমন্বিত সুস্পষ্ট অর্থ হলো, আল্লাহ রামাদান মাসের এক রাত্রিতে কুরআন নাযিল করেছেন এবং সে রাতটি বরকতময় ও মহিমান্বিত। মুবারক রজনীকে শবে বরাত বলে দাবী করলে এ আয়াতগুলোর স্পষ্ট অর্থ বিভিন্ন অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করতে হয়।

**(খ)** বিভিন্ন সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা 'মুবারক রজনী'-র ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ রাতটি হলো 'লাইলাতুল কাদ্‌র' বা 'মহিমান্বিত রজনী'। সাহাবীগণের মধ্য থেকে ইবনু আব্বাস (রা) ও ইবনু উমার (রা) থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তাবিয়ীগণের মধ্যে থেকে আবু আব্দুর রহমান আল-সুলামী (৭৪ হি), মুজাহিদ বিন জাব্‌র (১০২ হি), হাসান বসরী (১১০ হি), ক্বাতাদা ইবনু দি'আমা (১১৭ হি) ও আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম মাদানী (১৮২ হি) বিশেষ ভাবে উলেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকাহ অর্থ লাইলাতুল কাদ্‌র।[১৯৫]

### ৩. মধ্য-শাবানের রাত্রিতে দোয়া-মুনাজাত

মধ্য শাবানের রজনীর ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত তৃতীয় প্রকারের হাদীসগুলোতে এ রাত্রিতে সাধারণভাবে দোয়া করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ রাতে দোয়া করা, আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আকুতি জানানো এবং জীবিত ও মৃতদের পাপরাশি ক্ষমালাভের জন্য প্রার্থনার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থে কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস নেই। এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে কিছু হাদীস দুর্বল এবং কিছু হাদীস জাল।

### ৪. অনির্ধারিত সালাত ও দোয়া

মধ্য শাবানের রাত্রি সম্পর্কে বর্ণিত কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে সালাত আদায় ও দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস এ রাত্রির সালাতের জন্য কোনো নির্ধারিত রাক'আত, নির্ধারিত সূরা বা নির্ধারিত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয় নি। শুধু সাধারণভাবে এ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ আদায় ও দোয়া করার বিষয়টি এ সকল হাদীস থেকে জানা যায়। এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলো প্রায় সবই বানোয়াট। দু-একটি হাদীস দুর্বল হলেও বানোয়াট নয়।

### ৫. নির্ধারিত রাক'আত, সূরা ও পদ্ধতিতে সালাত

শবে বরাত বিষয়ক অন্য কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে বিশেষ পদ্ধতিতে, বিশেষ সুরা পাঠের মাধ্যমে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রাকআত সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এই অর্থে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট। হিজরী চতুর্থ শতকের পরে রাসুলুলাহ (ﷺ) -এর নামে বানিয়ে এগুলো প্রচার করা হয়েছে। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি জাল ও বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করছি।

### ৬. ৩০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ৩০ বার সূরা ইখলাস

"যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে প্রত্যেক রাকআতে ৩০বার সুরা ইখলাস পাঠের মাধ্যমে ৩০০ রাকআত সালাত আদায় করবে জাহান্নামের আগুন অবধারিত এমন ১০ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" হাদীসটি ইবনুল ক্বাইয়িম বাতিল বা ভিত্তিহীন হাদীস সমূহের মধ্যে উলেখ করেছেন।[১৯৬]

### ৭. ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার সুরা ইখলাস

মধ্য শাবানের রজনীতে এ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন হিজরী চতুর্থ শতকের পরে মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, ৪৪৮ হি. সনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথম এ রাত্রিতে এ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন শুরু হয়।[৭৯৭] এ সময়ে বিভিন্ন মিথ্যাবাদী গল্পকার ওয়ায়িয এ অর্থে কিছু হাদীস বানিয়ে বলেন। এ অর্থে ৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার প্রত্যেকটিই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

এর প্রথমটি আলী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচারিত: যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহা ও ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে সে উক্ত রাতে যত প্রয়োজনের কথা বলবে আল্লাহ তায়ালা তার সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন। লাওহে মাহফুযে তাকে দুর্ভাগা লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরির্বতন করে সৌভাগ্যবান হিসেবে তার নিয়তি নির্ধারণ করা হবে, আল্লাহ তায়ালা তার কাছে ৭০ হাজার ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা তার পাপরাশি মুছে দেবে, বছরের শেষ পর্যন্ত তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন রাখবে, এছাড়াও আলাহ্‌ তায়ালা 'আদন' জান্নাতে ৭০ হাজার বা ৭ লাখ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা জান্নাতের মধ্যে তার জন্য শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করবে এবং তার জন্য বৃক্ষরাজি রোপন করবে... । যে ব্যক্তি এ নামায আদায় করবে এবং পরকালের শান্তি কামনা করবে মহান আলাহ্‌ তার জন্য তার অংশ প্রদান করবেন।

হাদীসটি সর্বসম্মতভাবে বানোয়াট ও জাল। এর বর্ণনাকারীগণ কেউ অজ্ঞাত পরিচয় এবং কেউ মিথ্যাবাদী জালিয়াত হিসেবে পরিচিত।[৭৯৮]

এ বিষয়ক দ্বিতীয় জাল হাদীসটিতে জালিয়াতগণ ইবনু উমার (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলেছে: "যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে এক শত রাকআত সালাতে এক হাজার বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা তার কাছে ১০০ জন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন, তন্মধ্যে ত্রিশজন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে, ত্রিশজন তাকে জাহান্নমের আগুন থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ প্রদান করবে, ত্রিশজন তাকে ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং দশজন তার শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জবাব দেবে।"

এ হাদীসটিও বানোয়াট। সনদের অধিকাংশ রাবী অজ্ঞাতপরিচয়। বাকীরা মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।[৭৯৯]

এ বিষয়ক তৃতীয় জাল হাদীসটিতে মিথ্যাবাদীগণ বিশিষ্ট তাবিয়ী ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ আল বাকির (১১৫ হি) থেকে রাসূলুলাহ্‌ ﷺ-এর বরাতে বর্ণনা করেছে: "যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকআত সালাতে ১০০০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বেই মহান আলাহ্‌ তার কাছে ১০০ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন। ৩০ জন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে, ৩০ জন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবে, ৩০ জন তার ভুল সংশোধন করবে এবং ১০ জন তার শত্রুদের নাম লিপিবদ্ধ করবে।"

এ হাদীসটিও বানোয়াট। সনদের কিছু রাবী অজ্ঞাতপরিচয় এবং কিছু রাবী মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।।[৮০০]

১০০ রাকআত সংক্রান্ত এ বিশেষ পদ্ধতিটি হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন গল্পকার ওয়ায়িযদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং যুগে যুগে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে ভারতীয় ওয়ায়িযগণ এ সালাতের পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেক দু রাকআতের পরে "তাসবীহুত তারাবীহ"র প্রচলন করেন এবং ১০০ রাকআত পূর্ণ হওয়ার পর কতিপয় সাজদা, সাজদার ভিতরে ও বাহিরে কতিপয় দোয়া সংযুক্ত করেছেন।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৬ হি) বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস সমুহের মধ্যে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হলো, মধ্য শাবানের রাতে পঞ্চাশ সালামে ১০০ রাকআত সালাত আদায় করতে হবে। প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করতে হবে। প্রত্যেক দুই রাকআত পর 'তাসবীহুত তারাবীহ' পাঠ করবে, এর পর সাজদা করবে। সাজদার মধ্যে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর সাজদা থেকে মাথা তুলবে এবং নবী (ﷺ) এর উপর দুরূদ পাঠ করবে ও কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করবে এবং তাতে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে।[৮০১]

**৮. ৫০ রাক'আত**

ইমাম যাহাবী এ হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট হাদীস হিসেবে হাদীসটির বর্ণনাকারী অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আলমীলী আত তাবারীর জীবনীতে উলেখ করেছেন। উক্ত মুহাম্মাাদ বিন সাঈদ এ হাদীসটি তার মতই অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মদ বিন আমর আল বাজালী এর সনদে আনাস (রা) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ৫০ রাকআত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে যত প্রকার প্রয়োজনের কথা বলবে তার সবটুকুই পূরণ করে দেয়া হবে। এমনকি লাওহে মাহফুযে তাকে দুর্ভাগ্যবান হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরিবর্তন করে তাকে সৌভাগ্যবান করা হবে। এবং আল্লাহ তা'আলা তার কাছে ৭ লাখ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার নেকী লিপিবদ্ধ করবে, অপর ৭ লাখ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা

তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মাণ করবে ..... এবং ৭০ হাজার একত্ববাদীর জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে... ।

ইমাম যাহাবী এ মিথ্যা হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি এ হাদীসটি বানোয়াট করেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্চিত করুন ।[৮০২]

**৯. ১৪ রাক'আত**

ইমাম বায়হাকী তাঁর সনদে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুলাহ্ ﷺ-কে মধ্য শাবানের রাতে ১৪ রাকআত সালাত আদায় করতে দেখেছি। সালাত শেষে বসে তিনি ১৪ বার সূরা ফাতিহা, ১৪ বার সূরা ইখলাস, ১৪ বার সূরা ফালাক, ১৪ বার সূরা নাস, ১ বার আয়াতুল কুরসী এবং সূরা তাওবার শেষ দু আয়াত তিলাওয়াত করেন, এ সব কাজের সমাপ্তির পর আমি তাঁকে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তুমি আমাকে যে ভাবে করতে দেখেছ এভাবে যে করবে তার আমলনামায় ২০টি কবুল হজ্জের সাওয়াব লেখা হবে এবং ২০ বছরের কবুল সিয়ামের সাওয়াব লিখা হবে। পরদিন যদি সে সিয়াম পালন করে তবে দু বছরের সিয়ামের সাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হবে।

হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইমাম বায়হাকী বলেন: ইমাম আহমাদ বলেছেন যে, এ হাদীসটি আপত্তিকর, পরিত্যক্ত, জাল ও বানোয়াট বলে প্রতীয়মান। হাদীসটির সনদে অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারীগণ রয়েছে।[৮০৩]

অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার বিষয়ে ইমাম বাইহাকীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী ও ইমাম সুয়ূতী বলেন: হাদীসটি বানোয়াট, এর সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। .... সনদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন মুহাজির রয়েছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন: মুহাম্মদ বিন মুহাজির হাদীস বানোয়াট-কারী।[৮০৪]

**১০. ১২ রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে ৩০ বার সূরা ইখলাস**

জালিয়াতগণ আবু হুরাইরা (রা) পর্যন্ত একটি জাল সনদ তৈরী করে তাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছে: "যে ব্যক্তি মধ্য শা'বানের রাতে ১২ রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকাতে ৩০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই বেহেশতের মধ্যে তার অবস্থান সে অবলোকন করবে এবং তার পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছে এমন দশ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"

এ হাদীসের সনদের অধিকাংশ বর্ণনাকারীই অজ্ঞাত। এছাড়াও সনদের মধ্যে কতিপয় দুর্বল ও পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী রয়েছে।[৮০৫]

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, মধ্য শা'বানের রাতে নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্ট সূরার মাধ্যমে নির্দ্দিষ্ট রাকআত সালাত আদায় সংক্রান্ত হাদীস সমূহ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু কতিপয় নেককার ও সরলপ্রাণ ফকীহ ও মুফাস্‌সির তাঁদের রচনাবলিতে এগুলোর জালিয়াতি ও অসারতা উল্লেখ ছাড়াই এসকল ভিত্তিহীন হাদীস স্থান দিয়েছেন। এমনকি কেউ কেউ এগুলোর উপর ভিত্তি করে ফতোয়া প্রদান করেছেন ও তদনুযায়ী আমল করেছেন, যা পরবর্তীতে এ রীতি প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

মোল্লা আলী ক্বারী (১০১৪ হি) মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায়ের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসগুলোর অসারতা উল্লেখপূর্বক বলেন, সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, যারা সুন্নাতের ইলমের সন্ধান পেয়েছেন তারা এগুলো দ্বারা প্রতারিত হন কি করে! এ সালাত চতুর্থ হিজরী শতকের পর ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে যার উৎপত্তি হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে। এব্যাপারে অসংখ্য জাল হাদীস তৈরী করা হয়েছে যার একটিও সঠিক বা নির্ভরযোগ্য নয়।[৮০৬] তিনি আরো বলেন, হে পাঠক, এ সকল ভিত্তিহীন মিথ্যা হাদীস 'কুতুল কুলুব', 'এহয়িয়াউ উলুমিদ্দীন' ও ইমাম সা'লাবীর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ থাকার কারণে আপনারা প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হবেন না।[৮০৭] ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ আজলুনীও (১১৬২ হি) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৮০৮]

আল্লামা শাওকানী (১২৫০ হি) শবে বরাতের রাত্রিতে আদায়কৃত এ সালাত সংক্রান্ত হাদীসের ভিত্তিহীনতা উল্লেখ পূর্বক বলেন, এ সকল হাদীস দ্বারা এক দল ফকীহ প্রতারিত হয়েছেন। যেমন 'এহয়িয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থকার ইমাম গাযালী ও অন্যান্যরা। এমনিভাবে কতিপয় মুফাস্‌সিরও প্রতারিত হয়েছেন। এ সালাতের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের জাল হাদীস রচিত হয়েছে। এ সকল হাদীস মাউযূ বা বানোয়াট হওয়ার অর্থ হলো, এই রাত্রিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত রাক'আত সালাত আদায়ের প্রচলন বাতিল ও ভিত্তিহীন। তবে কোনো নির্ধারিত রাক'আত, সূরা বা পদ্ধতি ব্যতিরেকে সাধারণ ভাবে এ রাত্রিতে ইবাদত বা দোয়া করার বিষয়ে দুই একটি যয়ীফ হাদীস রয়েছে।"[৮০৯]

**(ঘ) আরো কিছু জাল বা অনির্ভরযোগ্য হাদীস**

**১. মধ্য শাবানের রাতে কিয়াম ও দিনে সিয়াম**

আলী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ- থেকে বর্ণিত একটি হাদীস নিম্নরূপ:

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلا كَذَا أَلا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

"যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাতে (সালাতে- দোয়ায়) দণ্ডায়মান থাক এবং দিবসে সিয়াম পালন কর। কারণ ঐ দিন সুর্যাস্তের পর মহান আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোন রিয্‌ক অনুসন্ধানকারী আছে কি? আমি তাকে রিয্‌ক প্রদান করব। কোন দুর্দাশাগ্রস্থ ব্যক্তি আছে কি? আমি তাকে মুক্ত করব। এভাবে সুবহ সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে।"

এ হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ তাঁর উস্তাদ হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল থেকে, তিনি আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি ইবনু আবি সাব্‌রাহ থেকে, তিনি ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি মুয়াবিয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন জাফর থেকে, তিনি তাঁর পিতা আব্দুলাহ বিন জাফর থেকে, তিনি আলী ইবনু আবী তালিব (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৮১০]

ইবনু মাজাহ কর্তৃক সংকলিত হওয়ার কারণে হাদীসটি আমাদের সমাজে বহুল পরিচিত, প্রচারিত ও আলোচিত। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল পর্যায়ের বলে চিহ্নিত করেছেন।

এ হাদীসটি একমাত্র ইবনু আবি সাব্‌রাহ ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেন নি। এ হাদীস আলী ইবনু আবি তালিব থেকে তাঁর কোন ছাত্র বর্ণনা করেন নি। আব্দুলাহ বিন জাফর বিন আবি তালিব থেকেও তাঁর কোন ছাত্র হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। এমনকি মুয়াবিয়া ও ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ থেকেও তাঁদের কোনো ছাত্র হাদীসটি বর্ণনা করেননি। শুধু ইবন আবি সাব্‌রাহ দাবী করেছেন যে, তিনি ইবরাহীম থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে আব্দুর রাজ্জাক ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবি সাব্‌রাহ (১৬২ হি) -এর পূর্ণনাম আবু বাকর বিন আব্দুলাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি সাব্‌রাহ। তিনি মদীনার একজন বড় আলিম ও ফক্বীহ ছিলেন। কিন্তু তুলনামূলক নিরীক্ষা ও বিচারের মাধ্যমে হাদীসের ইমামগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নিতেন। অসংখ্য ইমাম তাঁকে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আহমাদ, ইয়াহইয়া বিন মায়ীন, আলী ইবনুল মাদীনী, বুখারী, ইবনু আদী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম নাইসাপূরী অন্যতম।[৮১১]

এরই আলোকে আল্লামা শিহাব উদ্দীন আহমাদ বিন আবি বকর আল-বুসীরী (৮৪০ হি) বলেন, ইবনু আবি সাব্‌রাহর দুর্বলতার কারণে এ সনদটি দুর্বল। ইমাম আহমাদ ও ইবনু মাঈন তাঁকে হাদীস বানোয়াটকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।[৮১২] শাইখ আলবানী বলেছেন, অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট। তিনি আরো বলেন, সনদটি বানোয়াট।[৮১৩]

**২. দুই ঈদ ও মধ্য-শাবানের রাত্রিভর ইবাদত**

একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ

যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত ও মধ্য শাবানের রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকবে তার অন্তরের মৃত্যু হবেনা যে দিন সকল অন্তর মরে যাবে।[৮১৪]

এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী উপর্যুক্ত ঈসা ইবনু ইবরাহীম ইবনু তাহমান বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে সুপরিচিত। ইমাম বুখারী, নাসাঈ, ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন ও আবু হাতিম রাযি ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস একবাক্যে তাকে পরিত্যক্ত বা মিথ্যাবাদী রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ঈসা ইবনু ইবরাহীম নামক এই ব্যক্তি তার উস্তাদ হিসেবে যার নাম উল্লেখ করেছেন সে 'সালামা বিন সুলাইমান' দুর্বল রাবী বলে পরিচিত। আর তার উস্তাদ হিসেবে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে সে 'মারওয়ান বিন সালিম' মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত।[৮১৫] এভাবে আমরা দেখছি যে, এ হাদীসটির সনদের রাবীগণ অধিকাংশই মিথ্যাবাদী বা অত্যন্ত দুর্বল। এরা ছাড়া কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেন নি। কাজেই হাদীসটি বানোয়াট পর্যায়ের।

এখানে উল্লেখ্য যে, আবূ উমামা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে একাধিক দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকবে তার অন্তরের মৃত্যু হবে না যে দিন সকল অন্তর মরে যাবে।' এ সকল বর্ণনায় দুই ঈদের রাতের সাথে মধ্য শাবানের রাতকে কেউ যুক্ত করেন নি।[৮১৬]

**৩. পাঁচ রাত্রি ইবাদতে জাগ্রত থাকা**

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে,

مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِيَ الْخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ وَلَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

"যে ব্যক্তি পাঁচ রাত (ইবাদতে) জাগ্রত থাকবে তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হবে: যুলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখের রাত্রি, আরাফার রাত্রি, ঈদুল আযহার রাত্রি, ঈদুল ফিতরের রাত্রি ও মধ্য শাবানের রাত্রি।"

হাদীসটি ইস্পাহানী 'তারগীব' গ্রন্থে সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ-এর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। সুওয়াইদ, আব্দুর রাহীম ইবনু যাইদ আল'আম্মী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ওয়াহ্‌ব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে, তিনি মুয়ায ইবনু জাবাল থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুর রাহীম ইবনু যাইদ আল-'আম্মী (১৮৪হি) নামক ব্যক্তি মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণনাকারী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইমাম বুখারী, নাসাঈ, ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন, আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আবূ হাতিম রাযী, আবূ দাঊদ ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস এ ব্যক্তির মিথ্যাবাদিতার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এজন্য এ হাদীসটি মাওযূ বা জাল হাদীস বলে গণ্য। ইবনুল জাওযী, ইবনু হাজার আসকালানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৮১৭]

**৪. এ রাত্রিতে রহমতের দরজাগুলো খোলা হয়**

আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আর্‌রাক (৯৬৩ হি) তাঁর মাউযূ বা জাল হাদীস সংকলনের গ্রন্থে ইবনু আসাকির-এর বরাত দিয়ে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস হিসেবে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। উবাই ইবনু কা'ব (রা) এর সূত্রে কথিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

"মধ্য শাবানের রাতে জিবরাঈল (আ) আমার কাছে আগমন করে বলেন, আপনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ুন এবং আপনার মাথা ও হস্তদ্বয় উপরে উঠান। আমি বললাম, হে জিবরাঈল, এটি কোন্ রাত? তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ, এ রাতে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং রহমতের ৩০০ দরজা খুলে দেওয়া হয়। ... তখন রাসূলুলাহ (ﷺ) বাকী গোরস্তানে গমন করেন। তিনি যখন সেখানে সাজদারত অবস্থায় দোয়া করছিলেন, তখন জিবরাঈল সেখানে অবতরণ করে বলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি আকাশের দিকে মাথা তুলুন। তিনি তখন তাঁর মস্তক উত্তোলন করে দেখেন যে, রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক দরজায় একজন ফিরিশতা ডেকে বলছেন, এ রাত্রিতে যে সাজদা করে তার জন্য মহা সুসংবাদ... ।"

হাদীসটি উদ্ধৃত করে ইবনু আর্‌রাক উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীস একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে সূত্রের রাবীগণ সকলেই অজ্ঞাতপরিচয় এবং হাদীসটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হিসেবে বিবেচিত।[৮১৮]

**৫. পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না**

আবূ উমামার (রা) সূত্রে, রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামে কথিত আছে,

خَمْسُ لَيَالٍ لاَ تُرَدُّ فِيْهِنَّ الدَّعْوَةُ: أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ

"পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না: রজব মাসের প্রথম রাত, মধ্য শাবানের রাত, জুমুআর রাত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত।"

এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম ইবনু আসাকির (৫৭১ হি) তার 'তারীখ দিমাশক' গ্রন্থে আবু সাঈদ বুনদার বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ রূইয়ানির সূত্রে, তিনি ইবরাহীম বিন আবি ইয়াহয়িয়া থেকে, তিনি আবু কা'নাব থেকে, তিনি আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতী তাঁর "আল জামে আল সাগীর" গ্রন্থে ইবন আসাকিরের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীসটি যয়ীফ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৮১৯] নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে বানোয়াট হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৮২০] কারণ এ হাদীসের মূল ভিত্তি হলো ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহইয়া (১৮৪ হি) নামক একজন মুহাদ্দিস। ইমাম মালিক, আহমাদ, বুখারী, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, নাসাঈ, দারাকুতনী, যাহাবী, ইবনু হিব্বান ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে রাফিযী শিয়া, মুতাযিলী ও ক্বাদরিয়া আক্বীদায় বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করেছেন এবং মিথ্যাবাদী ও অপবিত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম শাফিয়ী প্রথম বয়সে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিধায় কোনো কোনো শাফিয়ী মুহাদ্দিস তাঁর দুর্বলতা কিছুটা হাল্কা করার চেষ্টা করেন। তবে শাফিয়ী মাযহাবের অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ এবং অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস এক কথায় তাকে মিথ্যাবাদী ও পরিত্যক্ত বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ইমাম শাফিয়ী নিজেও তাঁর এ শিক্ষকের দুর্বলতা ও অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি পরবর্তী জীবনে তার সূত্রে কোনো হাদীস বললে তার নাম উল্লেখ না করে বলতেন, আমাকে বলা হয়েছে, বা শুনেছি বা অনুরূপ কোনো বাক্য ব্যবহার করতেন।[৮২১] এ হাদীসটির ক্ষেত্রেও ইমাম শাফিয়ী বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, আগের যুগে বলা হতো, পাঁচ রাতে দোয়া করা মুস্তাহাব.... । ইমাম শাফিয়ী বলেন, এ সকল রাতে যে সব আমলের কথা বলা হয়েছে সেগুলোকে আমি মুসতাহাব মনে করি।[৮২২]

এছাড়া সনদের অন্য রাবী আবু সাঈদ বুনদার বিন উমরও মিথ্যাবাদী ও হাদীস জালকারী বলে পরিচিত।[৮২৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, হাফিয আব্দুর রায্যাক সান'আনী এ হাদীসটি অন্য একটি সনদে ইবনু উমারের (রা) নিজস্ব বক্তব্য হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন।[৮২৪] আব্দুর রায্যাক সান'আনী বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন, তিনি বায়লামানীকে বলতে শুনেছেন, তার পিতা বলেছেন, ইবনু উমার বলেছেন, পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না। ...."

এ সনদে আব্দুর রায্যাককে যিনি হাদীসটি বলেছেন, তিনি অজ্ঞাত পরিচয়। পরবর্তী রাবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রাহমান বিন বায়লামানী হাদীস-জালিয়াত হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৮২৫] উক্ত মুহাম্মাদের পিতা, সনদের পরবর্তী রাবী আব্দুর রাহমান বিন বায়লামানীও দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য রাবী।[৮২৬]

**৬. শবে বরাতের গোসল**

শবে বরাত বিষয়ক প্রচলিত মিথ্যা কথাগুলোর অন্যতম হলো এ রাতে গোসল করার ফযীলত। বিষয়টি যদিও সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও জঘন্য বানোয়াট কথা, তবুও আমাদের সমাজে তা অত্যন্ত প্রচলিত। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রায় সকল পুস্তকেই এ জাল কথাটি লিখা হয় এবং ওয়াযে আলোচনায় বলা হয়। প্রচলিত একটি বই থেকে উদ্ধৃত করছি: "একটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি উক্ত রাত্রিতে এবাদতের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় গোসল করিবে, সে ব্যক্তির গোসলের প্রত্যেকটি বিন্দু পানির পরিবর্তে তাহার আমল নামায় ৭০০ (সাতশত) রাকাত নফল নামাযের ছওয়াব লিখা যাইবে। গোসল করিয়া দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল অজুর নামায পড়িবে।..."[৮২৭]

এ মিথ্যা কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কঠিন শীতের দিনেও অনেকে গোসল করেন। উপরন্তু ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ার আশায় শরীর ও মাথা ভাল করে মোছেন না। এর ফলে অনেকে, বিশেষত, মহিলারা বড় চুলের কারণে ঠাণ্ডা-সর্দিতে আক্রান্ত হন। আর এ কষ্ট শরীয়াতের দৃষ্টিতে পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, সুন্নাতের আলোকে এই রাতে গোসল করে ইবাদত করা আর ওযু করে ইবাদত করার মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে এ রাতে গোসল করা এবং অন্য কোনো রাতে গোসল করার মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই।

**৭. এ রাতে নেক আমলের সুসংবাদ**

এ বিষয়ে আমাদের দেশের প্রচলিত একটি কথা:

طُوْبَى لِمَنْ يَعْمَلُ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ خَيْراً

"মহা সুসংবাদ তার জন্য সে শাবান মাসের মধ্যম রজনীতে নেক আমল করে... ।" এ কথাটি উপরে উল্লিখিত উবাই ইবনু কা'ব (রা) এর নামে প্রচারিত জাল হাদীসটি থেকে গ্রহণ করা।

**৮. এ রাতে হালুয়া-রুটি বা মিষ্টান্ন বিতরণ**

এ রত্রিতে হালুয়া-রুটি তৈরি করা, খাওয়া, বিতরণ করা, মিষ্টান্ন বিতরণ করা ইত্যাদি সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কর্ম। এ রাতে এ সকল ইবাদত করলে কোনো বিশেষ সাওয়াব বা অতিরিক্ত সাওয়াব পাওয়া যাবে এ মর্মে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি।

**৯. ১৫ শা'বানের দিনে সিয়াম পালন**

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শাবান মাসের বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন, এমনকি প্রায় সারা মাসই সিয়ামরত থাকতেন। আমরা আরো দেখেছি যে, শা'বান মাসের মধ্যম রজনীর ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এই রাত্রিতে সাধারণভাবে দোয়া-ইসতিগফার বা সালাত আদায়ের উৎসাহ জ্ঞাপক কিছু যয়ীফ বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীস রয়েছে। কিন্তু পরদিন সিয়াম পালনের বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীস পাওয়া যায় না। ইবনু মাজাহ সংকলিত আলী (রা)-এর নামে বর্ণিত হাদীসটিতে সিয়াম পালনের কথা বলা হয়েছে। তবে হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। শবে বরাতের রাতে ১৪ রাক'আত সালাত আদায় বিষয়ক হাদীসেও

পরদিন সিয়াম পালনের ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসটি জাল। এ বিষয়ক আরেকটি জাল হাদীস আমাদের সমাজে প্রচলিত:

مَنْ صَامَ يَوْمَ خَامِسَ عَشَرَ شَعْبَانَ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ أَبَداً

"যে ব্যক্তি শাবান মাসের ১৫ তারিখে সিয়াম পালন করবে, জাহান্নামের আগুন কখনোই তাকে স্পর্শ করবে না।"[৮২৮]

**১০. প্রচলিত কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তার নমুনা**

আমাদের দেশে প্রচলিত পুস্তকাদিতে অনেক সময় লেখকগণ বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধকে একসাথে মিশ্রিত করেন। অনেক সময় সহীহ হাদীসের অনুবাদে অনেক বিষয় প্রবেশ করান যা হাদীসের নামে মিথ্যায় পরিণত হয়। অনেক সময় নিজেদের খেয়াল-খুশি মত বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থের নাম ব্যবহার করেন। এগুলোর বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের লেখকগণের পরিশ্রম কবুল করুন, তাদের ভুলক্রটি ক্ষমা করুন এবং আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক প্রদান করুন। শবে বরাত বিষয়ক কিছু ভিত্তিহীন কথা আমাদের দেশে প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি। প্রায় সকল পুস্তকেই এ কথাগুলো কম বেশি লিখা হয়েছে।

"হাদীসে আছে, যাহারা এই রাত্রিতে এবাদত করিবে আল্লাহ তাআলা আপন খাছ রহমত ও স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা তাহাদের শরীরকে দোজখের অগ্নির উপর হারাম করিয়া দিবেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে কখনও দোজখে নিক্ষেপ করিবেন না। হযরত (ﷺ) আরও বলেন- আমি জিবরাইল (আঃ) এর নিকট শুনিয়াছি, যাহারা শা'বানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে জাগিয়া এবাদত বন্দেগী করিবে, তাহারা শবে ক্বদরের এবাদতের সমতুল্য ছওয়াব পাইবে।

আরও একটি হাদীসে আছে, হযরত (ﷺ) বলিয়াছেন, শাবানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে এবাদতকারী আলেম, ফাজেল, অলী, গাউছ, কুতুব, ফকীর, দরবেশ ছিদ্দীক, শহীদ, পাপী ও নিষ্পাপ সমস্তকে আল্লাহ তা'আলা মার্জনা করিবেন। কিন্তু যাদুকর, গণক, বখীল, শরাবখোর, যেনাকার, নেশাখোর, ও পিতা-মাতাকে কষ্টদাতা- এই কয়জনকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করিবেন না। আরও একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা শাবানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে ৩০০ খাছ রহমতের দরজা খুলিয়া দেন ও তাঁহার বান্দাদের উপর বে-শুমার রহমত বর্ষণ করিতে থাকেন।

কালইউবী কিতাবে লিখিত আছে,- একদিন হযরত ঈসা (আ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন হে খোদাতাআলা! এ যামানায় আমার চেয়ে বুযর্গ আর কেহ আছে কি? তদুত্তরে আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয়ই। সম্মুখে একটু গিয়াই দেখ। ইহা শুনিয়া ঈসা (আ) সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিলেন ..... তখন বৃদ্ধ বলিলেন, আমি এতদ্দেশীয় একজন লোক ছিলাম। আমার মাতার দোওয়ায় আল্লাহ তাআলা আমাকে এই বুযুর্গী দিয়াছেন। সুতরাং আজ ৪০০ বৎসর ধরিয়া আমি এই পাথরের ভিতরে বসিয়া খোদা তাআলার এবাদত করিতেছি এবং প্রত্যহ আমার আহারের জন্য খোদা তাআলা বেহেশত হইতে একটি ফল পাঠাইয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া হযরত ঈসা (আঃ) ছেজদায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ... তখন আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে ঈসা (আ)! জানিয়া রাখ যে, শেষ যমানার নবীর উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি শাবানের চাঁদের পনরই তারিখের রাত্রে জাগিয়া এবাদত বন্দেগী করিবে ও সেদিন রোযা রাখিবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আমার নিকট এই বৃদ্ধের চেয়েও বেশী বুযুর্গ এবং প্রিয় হইতে পারিবে। তখন ঈসা (আ) কাঁদিয়া বলিলেন, হে খোদা তাআলা! তুমি আমাকে যদি নবী না করিয়া আখেরী যমানার নবীর উম্মত করিতে তাহা হইলে আমার কতই না সৌভাগ্য হইত! যেহেতু তাঁহার উম্মত হইয়া এক রাত্রিতে এত ছওয়াব কামাই করিতে পারিতাম। ... হাদীসে আছে, শাবানের চাঁদের চৌদ্দই তারিখের সূর্য অস্ত যাইবার সময় নিম্নলিখিত দোওয়া ৪০ বার পাঠ করিলে ৪০ বৎসরের ছগীরা গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

... দুই দুই রাকাত করিয়া চারি রাকাত নামায পড়িবে ... সূরা ফাতেহার পর প্রত্যেক রাকাতেই সূরা এখলাছ দশবার করিয়া পাঠ করিবে ও এই নিয়মেই নামায শেষ করিবে। হাদীসে শরীফে আছে,- যাহারা এই নামায পড়িবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাদের চারিটি হাজত পুরা করিয়া দিবেন ও তাহাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

তৎপর ঐ রাতে দুই দুই রাকাত করিয়া আরও চারি রাকাত নফল নামায পড়িবে। ... প্রত্যেক রাকাতে সূরা ক্বদর একবার ও সূরা এখলাছ পঁচিশবার পাঠ করিবে এবং এই নিয়মে নামায শেষ করিবে।

হাদীস শরীফে আছে,- মাতৃগর্ভ হইতে লোক যেরূপ নিষ্পাপ হইয়া ভুমিষ্ট হয়, উল্লিখিত ৪ রাকাত নামায পড়িলেও সেইরূপ নিষ্পাপ হইয়া যাইবে। (মেশকাত) হাদীস শরীফে আছে,- যাহারা এই নামায পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাদের পঞ্চাশ বৎসরের গুনাহ মার্জনা করিয়ো দিবেন। (তিরমিজী) আরও হাদীসে আছে,- যাহারা উক্ত রাত্রে বা দিনে ১০০ হইতে ৩০০ মরতবা দরূদ শরীফ হযরত (ﷺ) এর উপর পাঠ করিবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর দোজখ হারাম করিবেন। হযরত (দঃ)ও সুপারিশ করিয়া তাহাদিগকে বেহেশতে লইবেন। (সহীহ বোখারী) আর যাহারা উক্ত রাত্রিতে সূরা দোখান সাতবার ও সূরা ইয়াসীন তিনবার পাঠ করিবে, আল্লাহ তাহাদের তিনটি মকছুদ পুরা করিবেন। যথাঃ- (১) হায়াত বৃদ্ধি করিবেন। (২) রুজি-রেজক বৃদ্ধি করিবেন। (৩) সমস্ত পাপ

মার্জনা করেবেন।"[৮২৯]

উপরের কথাগুলো সবই বানোয়াট। সবচেয়ে দুঃখজনক কথা যে, গ্রন্থকার এখানে মেশকাত, তিরমিযী ও বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভিত্তিহীন কিছু কথার জন্য, যে কথাগুলো এ গ্রন্থগুলো তো দূরের কথা কোনো হাদীসের গ্রন্থেই নেই। এভাবে প্রতারিত হচ্ছেন সরলপ্রাণ বাঙালি পাঠক।

### ৯. রামাদান মাস

রামাদান বা রমযান মাসের ফযীলত, ইবাদত, লাইলাতুল কাদরের গুরুত্ব, ইবাদত ইত্যাদি কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে এক্ষেত্রেও জালিয়াতগণ তাদের মেধা ব্যয় করেছেন। সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক জাল হাদীস তারা বানিয়েছেন। সহীহ হাদীসের মধ্যে কিছু জাল কথা ঢুকিয়েও তারা প্রচার করেছেন। যেহেতু মূল ফযীলত প্রমাণিত, সেহেতু এ সকল জাল হাদীসের বিস্ত ারিত আলোচনা করছি না। প্রচলিত কয়েকটি ভিত্তিহীন কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে রামাদান প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই।

#### ১. আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি ও আযাব-মুক্তি

রামাদান, সিয়াম, সাহরী খাওয়া, ইফতার করা ইত্যাদির গুরুত্ব, মর্যাদা, সাওয়াব ও বরকতের বিষয়ে অগণিত সহীহ হাদীস রয়েছে। তা সত্ত্বেও এগুলোর বদলে অনেক আজগুবি বাতিল, ভিত্তিহীন ও জাল হাদীস আমাদের সমাজে প্রচলিত। একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ الصُّيَّامِ، وَإِذَا نَظَرَ إِلَى عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ

"যখন রমজান মাসের প্রথম রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা মাখলুকাতের (তাঁর সিয়াম পালনকারী সৃষ্টির) প্রতি রহমতের দৃষ্টিপাত করেন, আর আল্লাহ তা'আলার রহমতের দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হয়, সে কোন সময় শাস্তি ভোগ করিবে না।"[৮৩০]

মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি জাল।[৮৩১]

#### ২. সাহরীর ফযীলত ও সাহরী ত্যাগের পরিণাম

সাহরী খাওয়ার উৎসাহ প্রদান করে একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অন্তত এক চুমুক পানি পান করে হলেও সাহরী খেতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। সাহরীকে বরকতময় আহার বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইহূদী ও খৃস্টানদের সিয়ামের সাথে আমাদের সিয়ামের পার্থক্য সাহরী।

কিন্তু এ সকল সহীহ বা হাসান হাদীসের পাশাপাশি কিছু অতিরঞ্জিত বানোয়াট হাদীসও প্রচলিত হয়েছে। যেমন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমাইয়াছেন .. ছেহেরীর আহারের প্রতি লোকমার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা এক বৎসরের ইবাদতের সাওয়াব দান করিবেন।... যে সেহরী খাইয়া রোজা রাখিবে সে ইহূদীদের সংখ্যানুপাতে সাওয়াব লাভ করিবে।... তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি সেহরী খাওয়া হইতে বিরত থাকিবে, তাহার স্বভাব চরিত্র ইহূদীদের ন্যায় হইয়া যাইবে।..."[৮৩২] এ সকল কথা সবই বানোয়াট কথা বলে প্রতীয়মান।

#### ৩. লাইলাতুল কাদ্‌র বনাম ২৭ রমযান

কুরআন-হাদীসে 'লাইলাতুল কাদরের' মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'লাইলাতুল কাদ্‌র'কে নির্দিষ্ট করে দেন নি। রামাদান মাসের শেষ দশ রাত এবং বিশেষ করে শেষ দশ রাতের মধ্যে বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল কাদ্‌র সন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণের কেউ কেউ ২৭ রামাদান লাইলাতুল কাদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বর্ণিত হয় নি। কাজেই '২৭ রমযানের' ফযীলতে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট বা বিকৃত।

এরূপ কিছু বাতিল কথা: "হাদীসে আছে,- যে ব্যক্তি রমযানের ২৭ তারিখের রাত্রিতে জাগিয়া এবাদত বন্দেগী করিবে। আল্লাহ তাআলা তাহার আমল নামায় এক হাজার বৎসরের এবাদতের ছওয়াব লিখিয়া দিবেন। আর বেহেশতে তাহার জন্য অসংখ্য ঘর নির্মাণ করাইবেন। ... আবূ বকর ছিদ্দীকের প্রশ্নের উত্তরে রাছূল ﷺ বলিয়াছিলেন: রমযানের ২৭ তারিখেই শবে কদর জানিও।...রমযান মাসের ২৭ তারিখের সূর্যাস্ত যাইবার সময় নিম্নলিখিত দোওয়া ৪০ বার পাঠ করলে ৪০ বৎসরের ছগীরা গুনাহ মার্জিত হইবে।"[৮৩৩]

অনুরূপ বানোয়াট কথা: "হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি রমজান মসের ২৭ তারিখের রজনীকে জীবিত রাখিবে, তাহার আমলনামায় আল্লাহ ২৭ হাজার বৎসরের ইবাদতের তুল্য সাওয়াব প্রদান করিবেন এবং বেহেশতের মধ্যে অসংখ্য মনোরম বালাখানা নির্মাণ করিবেন যাহার সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেহই অবগত নন।[৮৩৪]

#### ৪. লাইলাতুল কাদ্‌রের গোসল

শবে বরাতের ন্যায় কাদ্‌রের রাত্রিতেও গোসল করার বিষয়ে জাল হাদীস আমাদের সমাজে প্রচলিত। যেমন: "যাহারা শবে-

ক্বদরের এবাদতের নিয়্যতে সন্ধ্যায় গোসল করিবে তাহাদের পা ধৌত করা শেষ না হইতেই পূর্বের পাপ মার্জিত হইয়া যাইবে।"[৮৩৫]

লাইলাতুল কাদ্‌র-এ গোসলের ফযীলতে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। তবে যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রামাদান মাসের শেষ ১০ রাতের প্রত্যেক রাতে মাগরিব ও ইশার সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করতেন। এরূপ গোসলের ফযীলতে আর কোনো কিছু জানা যায় না।[৮৩৬]

**৫. লাইলাতুল কাদ্‌রের সালাতের নিয়্যাত**

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, 'নাওয়াইতু আন...' বলে যত প্রকারের নিয়্যাত আছে সবই বানোয়াট। এখানে আরো লক্ষণীয় যে, আমাদের দেশে শবে বারাত, শবে কাদ্‌র ইত্যাদি রাতে বা কোনো মর্যাদাময় দিনে নফল সালাত আদায়ের জন্য বিভিন্ন বানোয়াট নিয়্যাত প্রচলিত আছে। কোনো নফল সালাতের জন্যই কোনো পৃথক 'নিয়্যাত' নেই। লাইলাতুল কাদ্‌র বা যে কোনো রাতের সালাতের নিয়্যাত হবে 'সালাতুল লাইল' বা 'কিয়ামুল্লাইল'-এর। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মুমিন দুই দুই রাক'আত করে নফল সালাতের নিয়্যাত বা উদ্দেশ্য মনে নিয়ে যত রাক'আত পারেন সালাত আদায় করবেন। যদি রাতটি সত্যই আল্লাহর কাছে 'লাইলাতুল কাদ্‌র' বলে গণ্য হয় তাহলে বান্দা লাইলাতুল কাদ্‌রের সাওয়াব লাভ করবে। মুখে 'আমি লাইলাতুল কাদ্‌রের নামায পড়ছি...' ইত্যাদি কথা বলা অর্থহীন ও ভিত্তিহীন।

**৬. লাইলাতুল কাদ্‌রের সালাতের পরিমাণ ও পদ্ধতি**

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে লাইলাতুল কাদরে 'কিয়াম' বা 'কিয়ামুল্লাইল' করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কিয়ামুল্লাইল অর্থ রাত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করা। এর জন্য কোনো বিশেষ রাক'আত সংখ্যা, সূরা, আয়াত, দোয়া বা পদ্ধতি নেই। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজে সুদীর্ঘ কিরাআতে এবং সুদীর্ঘ রুকু ও সাজদার মাধ্যমে কিয়ামুল্লাইল করতেন। এজন্য সম্ভব হলে দীর্ঘ কিরাআত ও দীর্ঘ রুকু-সাজদা সহকারে সালাত আদায় করা উত্তম। না পারলে ছোট কিরাআতে রাক'আত সংখ্যা বাড়াবেন। মুমিন তার নিজের সাধ্য অনুসারে সূরা, তাসবীহ, দোয়া ইত্যাদি পাঠ করবেন। প্রত্যেকে তার কর্ম অনুসারে সাওয়াব পাবেন।

কাজেই 'লাইলাতুল কাদরের সালাতের রাক'আত সংখ্যা, সূরার নাম, সালাতের পদ্ধতি, সালাতের মধ্যে বা পরে বিশেষ দোয়া ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই মনগড়া এবং বাতিল কথা।[৮৩৭] অনেক প্রকারের মনগড়া কথা 'বাজারে' প্রচলিত। একটি মনগড়া পদ্ধতি ও তৎসংশিষ্ট কিছু জাল হাদীস একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি।

"শবে-ক্বদরের নামাজ পড়িবার নিয়মঃ এই রাত্রিতে পড়িবার জন্য নির্দিষ্ট ১২ রাকাত নফল নামায আছে। ঐ রাত্রিতে দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে প্রথমে নিয়্যত করিবে, যথাঃ- "আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ক্বেবলারোখ দাঁড়াইয়া শবে-ক্বদরের দুই রাকাত নামায পড়িতেছি।" নিয়্যত ও তাকবীরে-তাহরীমা অন্তে-ছুবহানাকা, আউজুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ ও 'ছুরা ফাতেহার' পর প্রত্যেক রাকাতে 'ছুরা ক্বদর' একবার, 'ছুরা এখলাছ' তিনবার পাঠ করিবে এবং এইরূপে নামায শেষ করিবে।

হাদীছে আছে, যাহারা এই নামায পড়িবে, আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে সমস্ত শবে-ক্বদরের ছওয়াব বখশিশ করিবেন এবং হযরত ইদ্রীস, হযরত শোয়াইব, হযরত আইয়ুব, হযরত ইউছুফ, হযরত দাউদ ও হযরত নূহ আলাইহিচ্ছালাম এর সমস্ত পুণ্যের ছওয়াব তাহাদের আমলনামায় লিখিয়া দিবেন ও তাহাদের দোওয়া মকবুল হইবে এবং তাহাদিগকে বেহেশতের মধ্যে এই পৃথিবীর সমতুল্য একটি শহর দান করিবেন।

অতঃপর দুই দুই রাকাত করিয়া চারি রাকাত নফল নামায পড়িবে। প্রথমতঃ নিয়্যত করিবে। নিয়্যত ও তাকবীরের তাহরীমা পাঠান্তে প্রত্যেক রাকাতে 'ছুরা ফাতেহার' পর 'ছুরা ক্বদর' একবার ও 'ছুরা এখলাছ' ২৭ বার পড়িবে। ইহাও খেয়াল রাখিবে যে, প্রথমতঃ নিয়্যত করিয়া প্রথম রাকাতে 'ছুরা ফাতেহার' পূর্বে ছুবহানাকা, আউজুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ পড়িতে হয়। কিন্তু তৎপর যত রাকাতই হউক না কেন প্রত্যেক রাকাতে ছুরা ফাতেহার পূর্বে কেবল মাত্র বিছমিল্লাহ পড়িতে হইবে এবং উল্লিখিত নিয়মেই পড়িয়া নামায শেষ করিবে।

হাদীসে আছে, যাহারা এই নামায পড়িবে, আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে এইরূপ নিষ্পাপ করিয়া দিবেন, যেমন অদ্যই মাতৃগর্ভ হইতে ভুমিষ্ঠ হইয়াছে। আর বেহেশতে তাহাদের জন্য হাজার বালাখানা তৈয়ার হইবে। - (মেশকাত) তৎপর দুই দুই রাকাত করিয়া চারি রাকাত নামায পড়িবে। প্রথমতঃ নিয়্যত করিবে, নিয়্যত ও তাকবীরে-তাহরীমার পাঠান্তে ছোবহানাকা, আউজুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ ও ছুরা ফাতেহার পরে প্রত্যেক রাকাতে, ছুরা ক্বদর তিনবার ও ছুরা এখলাছ ৫০ বার পড়িবে এবং এইরূপে নামায শেষ করিয়া ছেজদায় গিয়া ঐ দোওয়া একবার পড়িবে- যাহা সূর্যাস্ত যাইবার কালে পড়িবার জন্য লিখা হইয়াছে। হাদীছে আছে, যাহারা এই নামায পড়িবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাহাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন ও তাহাদের দোওয়া খোদা তাআলার দরবারে মকবুল হইবে।"[৮৩৮]

এগুলো সবই ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। 'মেশকাত' তো দূরের কথা কোনো হাদীস-গ্রন্থেই এ সকল কথা পাওয়া যায় না।

**৭. লাইলাতুল কাদ্‌রের কারণে কদর বৃদ্ধি**

আমাদের দেশে প্রচলিত একটি পুস্তকে নিম্নের হাদীসটি লিখা হয়েছে:

مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ رَفَعَ اللهُ قَدْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদ্‌র পাবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার কদর বা মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন।"[৮৩৯] কথাটি ভিত্তিহীন বলে প্রতীয়মান হয়।

**৮. জুমু'আতুল বিদা বিষয়ক জাল কথা**

সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, জুমু'আর দিন 'সাইয়েদুল আইয়াম' বা সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। সূর্যের নিচে এর চেয়ে উত্তম দিবস আর নেই।[৮৪০] অনুরূপভাবে 'রামাদান' শ্রেষ্ঠ মাস।[৮৪১] কাজেই রামাদান মাসের জুমু'আর দিনটির মর্যাদা সহজেই অনুমেয়। মুমিন স্বভাবতই প্রত্যেক জুমু'আর দিনে সুন্নাত সম্মত নেক আমলগুলি বেশি বেশি পালনের চেষ্টা করেন। একইভাবে রামাদানের প্রত্যেক দিনেই মুমিন সাধ্যমত নেক কর্মের চেষ্টা করেন। আর রামাদানের জুমু'আর দিনে উভয় প্রকারের চেষ্টা একত্রিত হয়। রামাদান মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফযীলত পূর্ণ দিন হলো শেষ দশ দিন। এ ছাড়া রামাদানের শেষে রামাদান চলে যাচ্ছে বলে মুমিনের কিছু অতিরিক্ত আগ্রহ বাড়াই স্বাভাবিক।

এ ছাড়া রামাদান মাসের শেষ জুমু'আর বা অন্য কোনো জুমা'আর দিনের কোনো বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস বর্নিত হয় নি। তবে জালিয়াতগণ রামাদানের শেষ জুমু'আর দিনের বা 'বিদায়ী জুমু'আর' বিশেষ কিছু ফযীলত বানিয়ে সমাজে প্রচার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে এ দিনে কাযা সালাত বা উমরী কাযা আদায়ের ফযীলত ও এ দিনের বিশেষ দোয়া বিষয়ক কিছু জাল ও বানোয়াট কথা। যেমন:

مَنْ قَضَى صَلاَةً مِنَ الْفَرَائِضِ (الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوْضَةَ) فِيْ آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذَلِكَ جَابِراً لِكُلِّ صَلاَةٍ فَاتَتْهُ فِيْ عُمُرِهِ إِلَى سَبْعِيْنَ سَنَةً

"যদি কোনো ব্যক্তি রামাদান মাসের শেষ জুমু'আর দিনে এক ওয়াক্ত (অন্য জাল বর্ণনায় ৫ ওয়াক্ত) কাযা সালাত আদায় করে তবে ৭০ বৎসর পর্যন্ত তার সকল কাযা সালাতের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ কথাটি জাল ও মিথ্যা কথা।[৮৪২]

বাহ্যত এ জাল হাদীসটির প্রচলন ঘটেছে বেশ দেরি করে। ফলে ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে যারা জাল হাদীস সংকলন করেছেন তারা তা উল্লেখ করেন নি। ১০ হিজরী শতক থেকে মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এর জালিয়াতির বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আল্লামা শাওকানী (১২৫০হি) বলেন: "এ কথাটি যে বাতিল তাতে কেনো সন্দেহ নেই। আমি কোনো মাউদূ হাদীসের গ্রন্থেও এ হাদীসটি পাই নি। কিন্তু আমাদের যুগে আমাদের সানআ (ইয়ামানের রাজধানী) শহরে অনেক ফকীহ ও ফিক্হ অধ্যয়নকারীর মধ্যে তা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এদের অনেকেই এর উপর আমল করে। জানি না কে এ জাল কথাটি বানিয়েছে। আল্লাহ মিথ্যাবাদীদের অপমানিত করুন।"[৮৪৩]

কোনো কোনো আলিম জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে এ জাল ও ভিত্তিহীন কথাটি তাদের গ্রন্থে লিখেছেন। ৭ম-৮ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা হুসামুদ্দীন হুসাইন ইবনু আলী সাগনাকী (৭১০ হি) হেদায়া'-র ব্যাখ্যা 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে এ কথাটিকে 'হাদীস' হিসেবে উল্লেখ করছেন। 'আন-নিহায়া' হেদায়ার অন্যতম ব্যাখ্যাগ্রন্থ। পরবর্তী ব্যাখ্যাকারগণ এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন। ফলে হেদায়ার পরবর্তী অনেক ব্যাখ্যাকার এ জাল কথাটি 'হাদীস' হিসেবে লিখেছেন। অনেক সময় বড় আলিমদের প্রতি মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাদের সকল কথা নির্বিচারে গ্রহণ করার প্রবণতা তৈরি করে। তাঁদের গ্রন্থে এ হাদীস উদ্ধৃত থাকাতে অনেক সাধারণ মানুষ এ জাল কথাটিকে সঠিক বলে মনে করতে পারেন; এজন্য মোল্লা আলী কারী বলেন:

بَاطِلٌ قَطْعاً لأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ لاَ يَقُوْمُ مَقَامَ فَائِتَةٍ سَنَوَاتٍ ثُمَّ لاَ عِبْرَةَ بِنَقْلِ النِّهَايَةِ وَلاَ شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوْا مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَلاَ أَسْنَدُوْا الْحَدِيْثَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُخَرِّجِيْنَ

"এ কথাটি নিঃসন্দেহে বাতিল। কারণ এ কথাটি মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যের বিরোধী। মুসলিম উম্মাহ একমত যে, কোনো একটি ইবাদত কখনোই অনেক বছরের পরিত্যক্ত ইবাদতের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না বা ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। এরপর 'নেহায়া'-র রচয়িতা এবং হেদায়ার অন্যান্য ব্যাখ্যাকারের উদ্ধৃতির কোনো মূল্য নেই; কারণ তাঁরা মুহাদ্দিস ছিলেন না এবং তারা কোনো হাদীস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েও এ হাদীসটি উল্লেখ করেন নি।"[৮৪৪]

আল্লামা কারী হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র আঙিনাকে মিথ্যার নাপাকি থেকে পবিত্র রাখা বিষয়ে তিনি আপোষহীন। মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম ও আলিমদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাঁকে আপোষের পথে পরিচালিত করতে পারি নি। অনেক আপোষকামী আলিমের মত তিনি বলতে পারতেন: হয়ত কোনো হাদীসের বইয়ে হাদীসটি ছিল... এত বড় আলিম যখন বলেছেন, হয়ত এর কোনো সূত্র ছিল। এরূপ বিভিন্ন "হয়ত" দিয়ে তিনি কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কারণ, আলিমদের ভুল হতে পারে এবং তা স্বীকার করার মধ্যে কোনো অবমাননা বা অভক্তি নেই। কিন্তু কোনো হাদীসের সনদ নেই জানার পরেও তার জন্য অযুহাত খোঁজা জালিয়াতির মহাপাপের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর এজন্যই মোল্লা আলী কারীর এ কথার টীকায় বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ বলেন:

أَحْسَنْتَ، أَحْسَنْتَ، جَزَاكَ اللهُ خَيْراً عَنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"অত্যন্ত ভাল কথা বলেছেন! অত্যন্ত ভাল কথা বলেছেন!! রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীসে পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।"[৮৪৫]

**৯. প্রচলিত কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তার নমুনা**

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আমাদের দেশে প্রচলিত পুস্তকাদিতে অনেক সময় লেখকগণ সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে যয়ীফ ও জাল হাদীসের উপর নির্ভর করা ছাড়াও বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধকে একসাথে এমনভাবে সংমিশ্রণ করেন যে, পূরা কথাটি রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামে মিথ্যায় পরিণত হয়। হাদীস-গ্রন্থের উদ্ধৃতিও অনেক সময় মনগড়াভাবে দেয়া হয়। একটি পুস্তকে বলা হয়েছে:

"হযরত (ﷺ) বলিয়াছেন, যাহারা শবে-ক্বদরে বন্দেগী করিবে তাহারা শত বৎসরের নেকীর ছওয়াব পাইবে। হযরত (ﷺ) আরও বলিয়াছেন, যাহারা শবে-ক্বদরে এবাদত করিয়াছে দোজখের আগুন তাহাদের উপর হারাম হইবে। আর একটি হাদীসে আছে- যদি তোমরা তোমাদের গোরকে আলোকময় পাইতে চাও, তবে শবে-ক্বদরে জাগরিত থাকিয়া এবাদত কর। আরও হাদীসে আছে- যাহারা শবে-ক্বদরে জাগিয়া এবাদত করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাদের ছগীরা, কবীরা সমস্ত পাপই মার্জনা করিবেন ও কেয়ামতের দিন তাহাদিগকে কিছুতেই নিরাশ করিবেন না। আর একটি হাদীসে আছে,- যে ব্যক্তি শবে-ক্বদর পাইবে নিশ্চয়ই আমি তাহাকে বেহেশতে লইবার জন্য জামিন হইব। ....."

"হাদীসে আছে: একদিন হযরত মূছা (আ) আল্লাহ তায়ালাকে প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা তুমি উম্মতে মোহাম্মদীকে উৎকৃষ্ট কোন জিনিস দান করিয়াছ? তদুত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমি হযরত মোহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতকে উৎকৃষ্ট রমযান মাস দান করিয়াছি। মূছা (আ) বলিলেন, প্রভু, সেই মাসের কি ফযীলত ও মরতবা তাহা আমাকে শুনাও। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, হে মূছা! রমযান মাসের ফযীলত ও মরতবার কথা কতই শুনাইব তবে সামান্য এতটুকুতেই বুঝিতে পারিবে যে, উহার মর্যাদা কি পরিমাণ! তোমাদের সাধারণের মধ্যে আমার মর্যাদা ও সম্মান যেরূপ অতুলনীয়, অন্যান্য মাস হইতে রমযান মাসের মর্যাদাও তেমনি অতুলনীয় জানিবে। (তিরমিযি)" ....হযরত (ﷺ) বলেছেন, যাহারা নিজের পরিবার পরিজনসহ সন্তোষের সহিত রমজান মাসের ৩০টি রোযা রাখিয়াছে, হালাল জিনিস দ্বারা ইফতার করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ঐ প্রকার ছওয়াব দিবেন, যেমন তাহারা মক্কা শরীফে ও মদীনা শরীফে রোযা রাখিয়াছে। হাদীসে আছে, যাহারা উক্ত স্থানসমূহে রোযা রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ৭০ হাজার হজ্জের, ৭০ হাজার ওমরার ও ৭০ হাজার রমযান মাসের ছওয়াব দিবেন ও পৃথিবীতে যত ঈমানদার বান্দা আছেন, সমস্তের নেকীর ছওয়াব দিবেন আর ঐ পরিমান পাপও তাহাদের আমলনামা হইতে কাটিয়া দিবেন। আর সপ্ত-আকাশে যত ফেরেস্তা আছে, তাহাদের সমস্তের পূণ্যের ছওয়াব তাহাদের আমলনামায় লিখিয়া দিবেন। (তিরমিজী)"[৮৪৬]

এ সকল কথা এভাবে সুনান তিরমিযী তো দূরের কথা, অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে বলে জানতে পারি নি। শুধুমাত্র মক্কা মুকাররামায় রামাদান পালনের বিষয়ে দু একটি যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত গ্রন্থকার এখানে ইবনু মাজাহ সংকলিত নিম্নের হাদীসটির 'ইচ্ছামত' অনুবাদ করেছেন:

ইবনু মাজাহ বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু আবী উমার বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুর রাহীম ইবনু যাইদ আল-আম্মী বলেছেন, তার পিতা থেকে, সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلَانَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً

"যে ব্যক্তি মক্কায় রামাদান মাস পাবে, সিয়াম পালন করবে এবং যতটুকু তার জন্য সহজসাধ্য হবে ততটুকু কিয়ামুল্লাইল পালন করবে, আল্লাহ তার জন্য অন্যত্র এক লক্ষ রামাদান মাসের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। এবং আল্লাহ তার জন্য প্রতি দিবসের পরিবর্তে একটি দাসমুক্তি এবং প্রতি রাতের পরিবর্তে একটি দাসমুক্তি, এবং প্রতি দিনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য

ঘোড়াসাওয়ার পাঠানো এবং প্রতি দিনের জন্য একটি নেকি এবং প্রতি রাতের জন্য একটি নেকি লিপিবদ্ধ করবেন।"[৮৪৭]

এ হাদীসটি একমাত্র আব্দুর রাহীম ইবনু যাইদ আল-আম্মী (১৮৪ হি) নামক এ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বর্ণনা করে নি। এ আব্দুর রাহীম একজন মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত রাবী বলে প্রসিদ্ধ। ইমাম বুখারী, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী, জালিয়াত ও পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন।[৮৪৮]

**১০. শাওয়াল মাস**

**(ক) সহীহ হাদীসের আলোকে শাওয়াল মাস**

শাওয়াল মাস হজ্জের মাসগুলোর প্রথম মাস। এ মাস থেকে হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয়। এছাড়া সহীহ হাদীস দ্বারা এ মাসের একটি ফযীলত প্রমাণিত। রাসূলুলাহ ﷺ বলেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"যে ব্যক্তি রামাদান মাসের সিয়াম পালন করবে। এরপর সে শাওয়াল মাসে ৬টি সিয়াম পালন করবে, তার সারা বছর সিয়াম পালনের মত হবে।"[৮৪৯]

কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে পুরো শাওয়াল মাস সিয়াম পালনের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। একটি যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি রামাদান এবং শাওয়াল মাস এবং (সপ্তাহে) বুধবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৮৫০]

এ ছাড়া শাওয়াল মাসের আর কোনো ফযীলত প্রমাণিত নয়। মুমিন এ মাসে তার তাহাজ্জুদ, চাশত, যিক্‌র ওযীফা ইত্যাদি সাধারণ ইবাদত নিয়মিত পালন করবেন। সাপ্তাহিক ও মাসিক নফল সিয়াম নিয়মিত পালন করবেন। অতিরিক্ত এই ছয়টি সিয়াম পালন করবেন। এছাড়া এ মাসের জন্য বিশেষ সালাত, সিয়াম, যিক্‌র, দোয়া, দান বা অন্য কোনো নেক আমল, অথবা এ মাসে কোনো নেক আমল করলে বিশেষ সাওয়াবের বিষয়ে যা কিছু প্রচলিত বা কথিত সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। এগুলোর অনেক কথা সাধারণভাবে শাওয়াল মাসের ফযীলত ও ছয় রোযার বিষয়ে বানানো হয়েছে। আর কিছু কথা শাওয়াল মাসের প্রথম দিন বা ঈদুল ফিতরের দিনের বিশেষ নামায বা আমলের বিষয়ে বানানো হয়েছে।

**(খ) শাওয়াল মাস বিষয়ক কিছু জাল হাদীস**

**১. ৬ রোযা ও অন্যান্য ফযীলত**

এ সকল বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে: "হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরমাইয়াছেন : যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসে নিজেকে গুনাহের কার্য হইতে বিরত রাখিতে সক্ষম হইবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বেহেশতের মধ্যে মনোরম বালাখানা দান করিবেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসের প্রথম রাত্রিতে বা দিনে দুই রাকয়াতের নিয়তে চার রাকয়াত নামায আদায় করিবে এবং উহার প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পর ২১ বার করিয়া সূরা ইখলাছ পাঠ করিবে; করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জাহান্নামের ৭টি দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন এবং জান্নাতের ৮টি দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। আর মৃত্যুর পূর্বে সে তাহার বেহেশতের নির্দিষ্ট স্থান দর্শন করিয়া লইবে।... অন্য আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুলাহ (ﷺ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করিবে সে ব্যক্তি শহীদানের মর্যাদায় ভূষিত হইবে।..."[৮৫১]

এ সবই হাদীসের নামে কথিত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা।

শাওয়াল মাসে ৬টি সিয়ামের ফযীলত সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা জেনেছি। এ বিষয়ে অতিরঞ্জিত অনেক জাল কথাও প্রচলন করা হয়েছে। যেমন: "হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরমাইয়াছেন, যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শাস্তির শৃংখল ও কঠোর জিঞ্জিরের আবেষ্টনী হইতে নাজাত দিবেন.. অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরমাইয়াছেন, যেই ব্যক্তি শাউয়াল মাসের ৬টি রোজা রাখিবে, তাহার আমলনামায় প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে সহস্র রোজার সাওয়াব লিখা হইবে।"... "রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ...যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে রোজা রাখেন আল্লাহ পাক তার জন্য দোজখের আগুন হারাম করে দেন।...যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখে, আল্লা-তায়ালা তার আমল নামায় সমস্ত মুহাম্মদী নেককার লোকের সাওয়াব লিখেন এবং সে হযরত সিদ্দিক আকবার (রা)-এর সঙ্গে বেহেস্তে স্থান পাবে।...যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে রোজা রাখে আল্লাহ তায়ালা তাকে লাল-ইয়াকুত পাথরের বাড়ী দান করবেন এবং প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে দুধ ও মধুর নহর প্রবাহিত হতে থাকবে। ফেরেশতারা তাকে আসমান হতে ডেকে বলবেন, হে আল্লাহর খাস-বান্দা, আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন। শাওয়াল মাসে লূতের (আ) কওম ধ্বংস হয়েছিল,

নূহের (আ)কওম ডুবেছিল, হুদের (আ) কওম ধ্বংস হয়েছিল...."[৮৫২]

এরূপ অসংখ্য মিথ্যা কথা দুঃসাহসের সাথে নিঃসঙ্কোচে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলা হয়েছে। আমাদের সম্মানিত লেখকগণ একটুও চিন্তা ও যাচাই না করেই সেগুলো তাঁদের পুস্তকে লিখেন। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

**২. ঈদুল ফিতরের দিনের বা রাতের বিশেষ সালাত**

শাওয়ালের ১ম তারিখ ঈদুল ফিতর। একাধিক যয়ীফ হাদীসে ঈদুল ফিতরের রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ইবাদতের কোনো নির্ধারিত পদ্ধতি, রাক'আত, সূরা ইত্যাদি বলা হয় নি। ঈদের দিনে সালাতুল ঈদ ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ নফল সালাতের কোনো নির্দেশনা কোনো সহীহ হাদীসে নেই।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও জালিয়াতগণ এ বিষয়ে কিছু হাদীস রচনা করেছে। শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখের দিনের বা রাতের ৪ রাক'আত সালাত বিষয়ক একটি জাল হাদীস পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। এ বিষয়ক আরো একটি প্রচলিত জাল হাদীস উল্লেখ করছি: "যিনি আমাকে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, জিবরাঈল আমাকে ঈসরাফীলের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের রাত্রে ১০০ রাক'আত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাক'আতে ১ বার সূরা ফাতিহা এবং ১১ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, এরপর রুকতে এবং সাজদায় ... অমুক দোয়া ১০ বার পাঠ করবে, এরপর সালাত শেষে ১০০ বার ইসতিগফার পাঠ করবে। এরপর সাজদায় যেয়ে বলবে.... । যদি কেউ এইরূপ করে তাহলে সাজদা থেকে ওঠার আগেই তার পাপ ক্ষমা করা হবে, রামাদানের সিয়াম কবুল করা হবে.... ইত্যাদি ইত্যাদি।"[৮৫৩]

**৩. ঈদুল ফিতরের পরে ৪ রাক'আত সালাত**

ঈদুল ফিতরের দিনে কোনো বিশেষ সালাতের বিশেষ সাওয়াব বা বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু জালিয়াতগণ সালাতুল ঈদ আদায়ের পরে ৪ রাক'আত সালাতের বিশেষ ফযীলতের কাল্পনিক কাহিনী বানিয়েছে। যেমন: "যদি কেউ সালাতুল ঈদ আদায় করার পরে ৪ রাক'আত সালাত আদায় করে, প্রত্যেক রাকা'আতে অমুক অমুক সূরা পাঠ করে, তবে সে যেন আল্লাহর নাযিল করা সকল কিতাব পাঠ করল, সকল এতিমকে পেটভরে খাওয়াল, তেল মাখালো, পরিষ্কার করল। তার ৫০ বছরের পাপ ক্ষমা করা হবে, তাকে এত এত পুরস্কার দেওয়া হবে... ।"[৮৫৪]

**১১. যুলকাদ মাস**

যুলকা'দা মাসের সাধারণ দুটি মর্যাদা রয়েছে: (ক) তা ৪টি হারাম মাসের একটি এবং (খ) তা হজ্জের মাসগুলির দ্বিতীয় মাস। এ ছাড়া এ মাসের বিশেষ কোনো ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তবে জালিয়াতগণ এ বিষয়ে কিছু মিথ্যা ও বানোয়াট কথা প্রচার করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

"রাসূলুলাহ (ﷺ) ফরমান, তোমরা যিলক্বদ মাসকে সম্মান করিবে, যেহেতু ইহা মর্যাদাবান মাসসমূহের মধ্যে প্রথম মাস। ... যেই ব্যক্তি যিলক্বদ মাসের ভিতরে একদিন রোজা রাখিবে, আল্লাহ তা'আলা উহার প্রতি ঘন্টার পরিবর্তে একটি হজ্জের সাওয়াব তাহাকে দান করিবেন।... যেই ব্যক্তি এই মাসের যে কোন জুমুয়ার দিবসে দুই দুই রাকয়া'তের নিয়তে চার রাকয়া'ত নামায আদায় করিবে, যাহার প্রতি রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে ১০ বার করিয়া সূরা ইখলাছ পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে একটি হজ্জ ও একটি ওমরার সাওয়াব দান করিবেন। ... যেই ব্যক্তি যিলক্বদ মাসের প্রত্যেক রজনীতে দুই রাকয়া'ত করিয়া নামায আদায় করিবে এবং ইহার প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাছ তিনবার করিয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির আমলনামায় একজন হাজী ও একজন শহীদের পূণ্যের তুল্য সাওয়াব দান করিবেন এবং রোজ কেয়ামতে সেই ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করিবে।..." "... এই মাসের রোজাদারের প্রত্যেক নিঃশ্বাসে একটি গোলাম আজাদ করবার সাওয়াব প্রদান করেন। ... এই মাসকে গনীমত মনে করবে। যেহেতু যে ব্যক্তি এই মাসে একদিন এবাদত করে উহা হাজার বৎসর হতেও উৎকৃষ্ঠ। ... যিলক্বদ মাসের সোমবারের রোজা হাজার বৎসরের এবাদত হতেও উৎকৃষ্ঠ। ... এই চাঁদে যে একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ পাক তার জন্য প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে এক একটি মকবুল হজ্জের সাওয়াব দান করবেন। ... ইত্যাদি ইত্যাদি.... ।"[৮৫৫]

এগুলো সবই দুঃসাহসিক নির্লজ্জ জালিয়াতগণের কথা। তারা এগুলো রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নামে বানিয়ে প্রচার করেছে এবং জাহান্নামে নিজেদের আবাসস্থল তৈরি করেছে। দুঃখজনক হলো, অনেক আলিম বা লেখক যাচাই না করেই এ সমস্ত আজগুবি মিথ্যা কথাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বলে উল্লেখ করছেন। অন্তত কোন্ গ্রন্থে হাদীসটি সংকলিত তা যাচাই করলেও এগুলোর জালিয়াতি ধরা পড়ে যেত। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

### ১২. যুলহাজ্জ মাস

#### (ক) সহীহ হাদীসের আলোকে যুলহাজ্জ মাস

যুলহাজ্জ বা যিলহাজ্জ মাস ৪টি হারাম মাসের অন্যতম। এ মাসেই হজ্জ আদায় করা হয় এবং এ মাসেই ঈদুল আযহা উদযাপিত হয়। এ মাসের প্রথম ১০ দিনে বেশি বেশি নেক কর্ম করতে সহীহ হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন: "যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করা আল্লাহর কাছে যত বেশি প্রিয় আর কোনো দিনের আমল তাঁর কাছে তত প্রিয় নয়।"[৮৫৬] যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এ দশ দিনের প্রতি দিনের সিয়াম এক বছরের সিয়ামের তুল্য এবং প্রত্যেক রাত লাইলাতুল কাদ্‌রের তুল্য।[৮৫৭] অন্য একটি দুর্বল হাদীসে বলা হয়েছে, এ দশ দিনের নেক আমলের ৭০০ গুণ সাওয়াব প্রদান করা হয়।[৮৫৮] অন্য একটি যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেছেন, কথিত আছে যে, যুলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন এক হাজার দিনের সমান এবং বিশেষত আরাফার দিন ১০ হাজার দিনের সমান।[৮৫৯]

৯ যুলহাজ্জ হাজীগণ আরাফার মাঠে অবস্থান করেন। যারা হজ্জ করছেন না তাদের জন্য এ দিনে সিয়াম পালনের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আরাফাত দিবস বা ৯ যুলহাজ্জের সিয়ামের বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তা বিগত বছর ও পরবর্তী বছরের পাপ মার্জনা করে।"[৮৬০]

#### (খ) যুলহাজ্জ মাস বিষয়ক কিছু বানোয়াট কথা

এ সকল সহীহ ও যয়ীফ হাদীসের পাশাপাশি এই মাসের ফযীলতে অনেক জাল হাদীস সমাজে প্রচালিত রয়েছে। এ সকল জাল হাদীসে এ মাসের জন্য বিশেষ বিশেষ সালাত ও সিয়ামের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এ মাসের ১ম দশ দিনের ফযীলতের বিষয়েও অনেক জাল কথা তারা বানিয়েছে।

#### ১. যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দিন

যুলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের অংশ হিসেবে এ দিনটির ফযীলত রয়েছে। কিন্তু জালিয়াতগণ অন্য ফযীলত প্রচার করেছে:

وُلِدَ إِبْرَاهِيْمُ فِيْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِيْ الْحِجَّةِ فَصَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَصَوْمِ سَبْعِيْنَ سَنَةً (فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَفَّارَةَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً)

"যুলহাজ্জ মাসের প্রথম তারিখে ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই যে ব্যক্তি এ দিনে সিয়াম পালন করবে সে ৭০ বছর সিয়াম পালনের সাওয়াব পাবে... তার ৮০ বছরের পাপের মার্জনা হবে...।"[৮৬১]

#### ২. যুলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ, ইয়াওমুত তারবিয়া

যুলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখকে 'ইয়াওমুত তারবিয়া' বলা হয়। এ দিনে হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয়। হাজীগণ এ দিনে হজ্জের জন্য মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। হাজী ছাড়া অন্যদের জন্য এ দিনের বিশেষ কোনো আমল নেই। যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের অংশ হিসেবে এর মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু জালিয়াতগণ এ তারিখের দিনের ও রাতের জন্য বিশেষ সালাত ও সিয়ামের কাহিনী রচনা করেছে। ইতোপূর্বে শবে বরাত বিষয়ক জাল হাদীস আলোচনার সময় 'তারবিয়ার' রাত বা যুলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখের রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকার বিষয়ে কয়েকটি জাল বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীস আমরা দেখতে পেয়েছি। আরেকটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ ثَوَابِ أَيُّوْبَ عَلَى بَلاَئِهِ

"যে ব্যক্তি তারবিয়ার দিনে (যিলহাজ্জের ৮ তারিখে) সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তাকে সে পরিমাণ সাওয়াব প্রদান করবেন, যে পরিমাণ সাওয়াব আইয়ূব (আ) তার বালা-মুসিবতের কারণে লাভ করেছিলেন।"[৮৬২]

#### ৩. যুলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখ: আরাফার দিন

আরাফার দিনে সিয়াম পালনের ফযীলত আমরা জানতে পেরেছি। হাজীগণ ব্যতীত অন্য মুসলিমের জন্য এ তারিখের দিনে বা রাতে আর কোনো বিশেষ সালাত, দোয়া, যিকির বা অন্য কোনো নেক আমলের নির্ধারিত বিধান বা পদ্ধতি কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। জালিয়াতগণ এ দিনের সালাত, যিক্‌র, দোয়া ইত্যাদির বিষয়েও অনেক জাল কথা প্রচার করেছে।

#### ৪. যুলহাজ্জ মাসের বানোয়াট সালাত

আমরা দেখেছি যে, যুলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন ও রাত অত্যন্ত গুরুত্ব পুর্ণ। এ সময়ে নফল সালাত, সিয়াম, যিক্‌র,

দোয়া, দান ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদত বন্দেগি যথাসাধ্য বেশি বেশি করে পালন করা দরকার। যে যতটুকু করতে পারবেন ততটুকুর সাওয়াব পাবেন। এসকল দিনে বা যুলহাজ্জ মাসের কোনো দিন বা রাতের জন্য কোনোরূপ বিশেষ সালাত বা সালাতের বিশেষ পদ্ধতি কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট। যেমন:

১. যুলহাজ্জ মাসের প্রথম রাত্রির সালাত: ২ রাক'আত বা বেশি রাক'আত ... সালাত, অমুক অমুক সূরা দ্বারা ... ইত্যাদি।
২. যুলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ 'ইয়াওমুত তারবিয়ার' রাতের সালাত: ২/৪ ... ইত্যাদি রাক'আত সালাত, অমুক অমুক সূরা দিয়ে...।
৩. যুলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ 'ইয়াওমুত তারবিয়ার' দিনের সালাত: ৬/৮ ...ইত্যাদি রাক'আত সালাত, অমুক অমুক সূরা দিয়ে...।
৪. আরাফার রাতের সালাত, ১০০ রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে অমুক সূরা... অত বার ... ইত্যাদি।
৫. আরাফার দিনের সালাত, ২/৪... ইত্যাদি রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে অমুক সূরা... অত বার ... ইত্যাদি।
৬. ঈদুল আযহার বা কুরবানীর দিনের রাতের সালাত, ১২/... ইত্যাদি রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে অমুক সূরা অত বার....।
৭. কুরবানীর দিন বা ঈদুল আযহার দিনের সালাত, ঈদুল আযহার পরে ২ রাক'আত সালাত, প্রত্যেক রাক'আতে অমুক সূরা অত বার...।
৮. যুলহাজ্জ মাসের শেষ দিনের সালাত, দুই রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে অমুক সূরা ও অমুক আয়াত অত বার ...।

এ সকল বানোয়াট সালাতের মধ্যে বা শেষে কিছু দোয়া বা যিক্র-এর কথাও উল্লেখ করেছে জালিয়াতগণ। তারা এ সকল সালাতের জন্য আকর্ষণীয় ও আজগুবি অনেক সাওয়াব ও ফলাফলের কথা উল্লেখ করেছে।[৮৬৩]

**৫. যুলহাজ্জ মাসের বানোয়াট সিয়াম**

যুলহাজ্জ মাসের প্রথম ৯ দিন এবং বিশেষত আরাফার দিনে সিয়াম পালনের বিশেষ সাওয়াব ও মর্যাদার কথা সহীহ ও যয়ীফ হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু জালিয়াতগণ ভাবে যে, এ সকল সাওয়াবে মুসলমানদের তৃপ্তি হবে না, এজন্য উদ্ভট সব ফযীলতের বর্ণনা দিয়ে এ সকল দিনে ও অন্যান্য দিনে সিয়াম পালনের বিষয়ে অনেক জাল হাদীস বানিয়েছে।

**৬. যুলহাজ্জের শেষ দিন ও মুহার্‌রামের প্রথম দিনের সিয়াম**

একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ صَامَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ ذِيْ الْحِجَّةِ وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ فَقَدْ خَتَمَ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ بِصَوْمٍ وَافْتَتَحَ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ بِصَوْمٍ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُ كَفَّارَةَ خَمْسِيْنَ سَنَةً

"যে ব্যক্তি যুলহাজ্জ মাসের শেষ দিন এবং মুহার্‌রাম মাসের প্রথম দিন সিয়াম পালন করল, সে ব্যক্তি তার বিগত বছরকে সিয়াম দ্বারা সমাপ্ত করলো এবং আগত বছরকে সিয়াম দ্বারা স্বাগত জানালো। কাজেই আল্লাহ তার ৫০ বছরের কাফফারা বা পাপ মার্জনা করবেন।"[৮৬৪]

এরূপ আরো অনেক আজগুবি সনদহীন বানোয়াট ও মিথ্যা কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।[৮৬৫]

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, জালিয়াতদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি দেখানোর একটি বড় ক্ষেত্র হলো সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক বিভিন্ন প্রকারের নেক আমলের ফযীলতের বিষয়ে জাল হাদীস তৈরি করা। এর বড় কারণ হলো, এ ধরনের জাল কথা সহজেই সরলপ্রাণ মুসলমানদের মন আকৃষ্ট করে এবং এগুলো দিয়ে সহজেই সরলপ্রাণ বুযুর্গ ও লেখকগণকে ধোকা দেওয়া যায়। তাঁরা আমল ভালবাসেন এবং আমলের ফযীলত বিষয়ক হাদীসগুলো সরল মনে গ্রহণ করেন।

এ জাতীয় জাল কথা প্রচলিত হওয়ার কারণও এটাই। অন্যান্য জাল কথার চেয়ে আমলের ফযীলত বিষয়ক জাল কথা প্রসিদ্ধি লাভের কারণ হলো, অনেক বুযুর্গ ওয়ায়িয, দরবেশ বা লেখক এগুলোর মধ্যে ফযীলতের আধিক্য দেখে সরল মনে এগুলোকে গ্রহণ করেছেন এবং সাধারণ মানুষদের আকৃষ্ট করার জন্য এগুলি মুখে বলেছেন বা বইয়ে লিখেছেন। আর, একবার একজন লিখলে সাধারণত পরবর্তী লেখকগণ সেগুলো থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করতে থাকেন। অনেকেই যাচাই বাছাই করার সময় পান না। অনেকে ভাবেন, যাই হোক, এর দ্বারা তো কিছু মানুষ আমল করছে। ভালই তো!!

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, অনেক বুযুর্গ এগুলোর উপর আমল করেছেন, অনেকে ফল ও প্রভাব লাভ করেছেন। অনেকে এগুলো তাদের ওয়াযে বলেছেন বা বইয়ে লিখেছেন- তাঁরা কি সবাই গোনাহগার হবেন?

এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, এ সকল জাল হাদীসে সাধারণত, সালাত, সিয়াম, যিক্র, দোয়া, দান ইত্যাদি শরীয়ত সম্মত নেক আমলের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মুমিনের দায়িত্ব হলো, নফল সালাত, সিয়াম, যিক্র, দোয়া ইত্যাদি সকল প্রকার দৈনন্দিন,

সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক নেক আমল নিয়মিত পালন করা। এ হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি তাবিয়ী ও বুযুর্গগণের রীতি ও তরী'কা। এরপর সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত মর্যাদাময় দিন ও রাতগুলিতে অতিরিক্ত ইবাদতের চেষ্টা করা। এ সকল মিথ্যা ও জাল হাদীস সাধারণত মুমিনকে সহীহ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত ইবাদত থেকে দূরে নিয়ে যায়, অকারণ পরিশ্রম ও কষ্টের মধ্যে নিপতিত করে এবং সুন্নাত বিরোধী বিভিন্ন রীতি পদ্ধতির মধ্যে নিমজ্জিত করে। এ ছাড়া যে কোনো কথা শুনে বা পড়েই তাকে হাদীস বলে মেনে নেয়া, হাদীসের কোন্ গ্রন্থে সংকলিত আছে তা অন্তত যাচাই করার চেষ্টা না করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দেশনার বিরোধী ও দীনের বিষয়ে অবহেলার শামিল। এরপরও যারা অসাবধানতা, সরলতা বা অজ্ঞতা বশত এগুলোকে সঠিক মনে করে এগুলোর উপর আমল করেছেন, তারা এ সকল জাল হাদীসে বর্ণিত জাল ও বানোয়াট সাওয়াব পাবেন না, তবে মূল নেক আমালের সাধারণ সাওয়াব লাভ করবেন বলে আশা করা যায়।

কিন্তু যদি কেউ এগুলোকে জাল বলে জানার বা শোনার পরেও এগুলো বলেন, লিখেন বা পালন করেন, এ বিষয়ে কোনো তাহকীক বা যাচাই করতে আগ্রহী না হন, তবে অবশ্যই তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী হবেন।

# একাদশ পরিচ্ছেদ:

# শুভাশুভ, সাজসজ্জা, পানাহার ও বিবিধ

## (ক) শুভ, অশুভ, উন্নতি, অবনতি ইত্যাদি

### শুভাশুভ ও উন্নতি-অবনতি বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা

বিভিন্ন প্রচলিত ইসলামী গ্রন্থে এবং আমাদের সমাজের সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, অমুক দিন, বার, তিথি, সময় বা মাস অশুভ, অযাত্রা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মনে করা হয়, বিভিন্ন কাজের অশুভ ফল রয়েছে এবং এ সকল কাজের কারণে মানুষ দরিদ্র হয় বা মানুষের ক্ষতি হয়। এ বিশ্বাস বা ধারণা শুধু ইসলাম বিরোধী কুসংস্কারই নয়; উপরন্তু এরূপ বিশ্বাসের ফলে ঈমান নষ্ট হয় বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে।

রাসূলুলাহ (ﷺ) অশুভ, অযাত্রা, অমঙ্গল ইত্যাদি বিশ্বাস করতে এবং যে কোনো বিষয়ে আগাম হতাশা এবং নৈরাশ্যবাদ (pessimism) অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। পক্ষান্তরে তিনি সকল কাজে সকল অবস্থাতে শুভ চিন্তা, মঙ্গল-ধারণা ও ভাল আশা করা পছন্দ করতেন।[৮৬৬] শুভ চিন্তা ও ভাল আশার অর্থ হলো আল্লাহর রহমতের আশা অব্যাহত রাখা। আর অশুভ ও অমঙ্গল চিন্তার অর্থ হলো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ

"অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক।[৮৬৭]

এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন তাই অমঙ্গলের কারণ। বান্দার জন্য অমঙ্গল বলেই তো আল্লাহ বান্দার জন্য তা নিষিদ্ধ করেছেন। এ সকল কর্মে লিপ্ত হলে মানুষ আল্লাহর রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহর নিষিদ্ধ হারাম দুই প্রকারের: (১) হক্কুল্লাহ বা আলাহর হক্ক সম্পর্কিত হারাম ও (২) হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টির অধিকার সম্পর্কিত হারাম। দ্বিতীয় প্রকারের হারামের জন্য মানুষকে আখেরাতের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়াতে পার্থিব ক্ষতির মাধ্যমে শাস্তি পেতে হবে বলে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে জানা যায়। জুলুম করা, কারো সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে চাঁদাবাজি, যৌতুক বা অন্য কোনো মাধ্যমে গ্রহণ করা, ওজন, পরিমাপ বা মাপে কম দেওয়া, পিতামাতা, স্ত্রী, প্রতিবেশী, দরিদ্র, অনাথ, আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কোনো মানুষের অধিকার নষ্ট করা, কাউকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা, আল্লাহর কোনো সৃষ্টির বা মানুষের ক্ষতি করা বা সাধারণ ভাবে 'হক্কুল ইবাদ' নষ্ট করা পার্থিব অবনতির কারণ।

কিন্তু আল্লাহর কোনো সৃষ্টির মধ্যে, কোনো বার, তারিখ, তিথি, দিক ইত্যাদির মধ্যে অথবা কোনো মোবাহ কর্মের মধ্যে কোনো অশুভ প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করা কঠিন অন্যায় ও ঈমান বিরোধী। আমাদের সমাজে এ জাতীয় অনেক কথা প্রচলিত আছে। এগুলোকে সবসময় হাদীস বলে বলা হয় না। কিন্তু পাঠক সাধারণভাবে মনে করেন যে, এগুলো নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ কথা। তা না হলে কিভাবে আমরা জানলাম যে, এতে মঙ্গল হয় এবং এতে অমঙ্গল হয়? এগুলো বিশ্বাস করা ঈমান বিরোধী। আর এগুলোকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের ﷺ বাণী মনে করা অতিরিক্ত আরেকটি কঠিন অন্যায়।

### শুভ, অশুভ. উন্নতি, অবনতি ইত্যাদি বিষয়ক ভিত্তিহীন কথাবার্তা

#### ১. শনি, মঙ্গল, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ইত্যাদি

শনিবার, মঙ্গলবার, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, কোনো তিথি, স্থান বা সময়কে অমঙ্গল অযাত্রা বা অশুভ বলে বিশ্বাস করা জঘন্য মিথ্যা ও ঘোরতর ইসলাম বিরোধী বিশ্বাস। অমুক দিনে বাঁশ কাঁটা যাবে না, চুল কাটা যাবে না, অমুক দিনে অমুক কাজ করতে নেই...ইত্যাদি সবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কুসংস্কার। এগুলো বিশ্বাস করলে শির্কের গোনাহ হবে।

#### ২. চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, রংধনু, ধুমকেতু ইত্যাদি

চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, রংধনু, ধুমকেতু ইত্যাদি প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলি বিশেষ কোনো ভাল বা খারাপ প্রভাব রেখে যায় বলে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও মিথ্যা কথা। অমুক চাঁদে গ্রহণ হলে অমুক হয়, বা অমুক সময়ে রঙধনু দেখা দিলে অমুক ফল হয়, এ ধরনের কথাগুলো বানোয়াট।[৮৬৮]

#### ৩. বুধবার বা মাসের শেষ বুধবার

বুধবারকে বা মাসের শেষ বুধবারকে অমঙ্গল, অশুভ, অযাত্রা বা খারাপ বলে বা বুধবারের নিন্দায় কয়েকটি বানোয়াট হাদীস প্রচলিত আছে। এগুলো সবই মিথ্যা। আল্লাহর সৃষ্টি দিন, মাস, তিথি সবই ভাল। এর মধ্যে কোন কোন দিন বা সময় বেশি ভাল। যেমন

শুক্রবার, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেশি বরকতময়। তবে অমঙ্গল, অশুভ বা অযাত্রা বলে কিছু নেই।[৮৬৯]

**৪. অবনতির কারণ বিষয়ক ভিত্তিহীন কথাবার্তা**

বিভিন্ন প্রচলিত পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিম্নের কাজগুলোকে অশুভ, খারাপ ফলদায়ক বা দারিদ্র আনয়নকারী:

১. হাঁটতে হাঁটতে ও অযু ব্যতীত দরুদ শরীফ পাঠ করা।

২. বিনা ওযুতে কুরআন কিংবা কুরআনের কোনো আয়াত পাঠ করা।
এ কথা দুটি একদিকে যেমন বানোয়াট কথা, অপরদিকে এ কথা দ্বারা মুমিনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত থেকে বিরত রাখা হয়। গোসল ফরয থাকলে কুরআন পাঠ করা যায় না। ওযু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত জায়েয। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ ওযু ছাড়াও মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ওযু অবস্থায় যিক্‌র, দোয়া, দরুদ-সালাম ইত্যাদি পাঠ করা ভাল। তবে আল্লাহর যিক্‌র, দোয়া ও দরুদ-সালাম পাঠের জন্য ওযু বা গোসল জরুরী নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের সুন্নাত হলো, হাঁটতে, চলতে, বসে, শুয়ে ওযুসহ ও ওযু ছাড়া পাক-নাপাক সর্বাবস্থায় নিজের মুখ ও মনকে আল্লাহর যিক্‌র, দোয়া ও দরুদ পাঠে রত রাখা।

৩. বসে মাথায় পাগড়ি পরিধান করা।

৪. দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করা।

৫. কাপড়ের আস্তিন ও আঁচল দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা।

৬. ভাঙ্গা বাসনে বা গ্লাসে পানাহার করা।

৭. রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খাওয়া।

৮. খালি মাথায় পায়খানায় যাওয়া বা খালি মাথায় আহার করা।

৯. পরিধানে কাপড় রেখে সেলাই করা।

১০. লুঙ্গি-গামছা চেপার সময় পায়ে পানি ফেলা

১১. ফুঁক দিয়ে প্রদীপ নেভানো।

১২. ভাঙ্গা চিরুনী ব্যবহার করা বা ভাঙ্গা কলম ব্যবহার করা।

১৩. দাঁত দ্বারা নখ কাটা।

১৪. রাত্রিকালে ঘর ঝাড়ু দেওয়া।

১৫. কাপড় দ্বারা ঘর ঝাড়ু দেওয়া।

১৬. ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখা বা রাত্রে আয়নায় মুখ দেখা।

১৭. হাঁটতে হাঁটতে দাত খেলাল করা।

১৮. কাপড় দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা।

১৯. ঘরের ঝুলকালি বা মাকড়াসার বাসা পরিষ্কার না করা.......।

এরূপ আরো অনেক কথা প্রচলিত। সবই বানোয়াট কথা। কোনো জায়েয কাজের জন্য কোনোরূপ ক্ষতি বা কুপ্রভাব হতে পারে বলে বিশ্বাস করা কঠিন অন্যায়। আর এগুলোকে হাদীস বলে মনে করা কঠিনতর অন্যায়।

**৫. উন্নতির কারণ বিষয়ক ভিত্তিহীন কথাবার্তা**

মহান আল্লাহ বান্দাকে যে সকল কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন সবই তার জন্য পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ, উন্নতি ও মঙ্গল বয়ে আনে। সকল প্রকার ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল-মুস্তাহাব কর্ম মানুষের জন্য আখিরাতের সাওয়াবের পাশাপাশি জাগতিক বরকত বয়ে আনে। আল্লাহ বলেন:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

"যদি জনপদবাসিগণ ঈমান এবং তাকওয়া অর্জন করতো (আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করতো ও নির্দেশিত কাজ পালন করতো) তবে তাদের জন্য আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বরকত-কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।"[৮৭০]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান ও তাকওয়ার কর্মই বরকত আনয়ন করে। তবে সৃষ্টির সেবা ও মানবকল্যাণমূলক কর্মে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন এবং এরূপ কাজের জন্য মানুষকে আখিরাতের সাওয়াব ছাড়াও পৃথিবীতে বিশেষ বরকত প্রদান করেন বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অনেক বানোয়াট কথাও বলা হয়। যেমন বলা হয় যে, নিম্নের কাজগুলি করলে মানুষ ধনী ও সৌভাগ্যশালী হতে পারে:

১. আকীক পাথরের আংটি পরিধান করা।
২. বৃহস্পতিবারে নখ কাটা।
৩. সর্বদা জুতা বা খড়ম ব্যবহার করা।
৪. ঘরে সিরকা রাখা।
৫. হলদে রঙের জুতা পরা।
৬. যে ব্যক্তি জমরুদ পাথরের বা আকীক পাথরের আংটি পরবে বা সাথে রাখবে সে কখনো দরিদ্র হবে না এবং সর্বদা প্রফুল্ল থাকবে।

অনুরূপভাবে অমুক কাজে মানুষ স্বাস্থ্যবান ও সবল হয়, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, অমুক কাজে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বা স্মরণশক্তি নষ্ট হয়, অমুক কাজে দৃষ্টি শক্তি বাড়ে, অমুক কাজে দৃষ্টিশক্তি কমে, অমুক কাজে বার্ধক্য আনে, অমুক কাজে শরীর মোটা হয়, অমুক কাজে শরীর দুর্বল হয় ইত্যাদি সকল কথাই বানোয়াট।

### (খ) সাজসজ্জা, পোশাক ও পানাহার বিষয়ক

**'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক'** ও **'পোশাক-পর্দা ও দেহসজ্জা'** নামক গ্রন্থদ্বয়ে পোশাক বিষয়ক সহীহ, যয়ীফ ও মাউদূ হাদীসগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে এ বিষয়ক কিছু মাউযূ বা জাল হাদীস উল্লেখ করছি। এছাড়া পানাহার বিষয়ক কিছু জাল হাদীসও এ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করছি।

#### ১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটিমাত্র জামা ছিল

আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

لم يكن لرسول الله ﷺ إلا قميص واحد

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটিমাত্র কামিস ছাড়া অন্য কোনো কামিস ছিল না।"[৮৭১]

হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনু মাইসারাহ মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলতেন বলে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন।[৮৭২]

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে মনে হয়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন প্রকারের জামা পরিধান করতেন। কোনোটির ঝুল ছিল টাখনু পর্যন্ত। কোনোটি কিছুটা খাট হাটুর নিম্ন পর্যন্ত ছিল। কোনোটির হাতা ছিল হাতের আঙ্গুলগুলোর মাথা পর্যন্ত। কোনোটির হাতা কিছুটা ছোট এবং কব্জি পর্যন্ত ছিল।

#### ২. জামার বোতাম ছিল না

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জামার বোতাম ছিল, তবে তিনি সাধারণত বোতাম লাগাতেন না। বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে, **'তাঁর জামার বোতামগুলো'** খোলা ছিল। এ থেকে মনে হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জামার তিন বা ততোধিক বোতাম ছিল। তিনি সাধারণত এ সকল বোতামের কোনো বোতামই লাগাতেন না।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর জামার বোতাম ছিল না বা বোতামের স্থলে কাপড়ের তৈরি ঘুন্টি ছিল। এ বিষয়ক কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইমাম গাযালী (৫০৫হি) লিখেছেন:

وَكَانَ قَمِيْصُهُ مَشْدُوْدَ الأَزْرَارِ، وَرُبَّمَا حَلَّ الأَزْرَارَ فِيْ الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا

"তাঁর কামিস বা জামার বোতামগুলো লাগানো থাকত। কখনো কখনো তিনি সালাতে ও সালাতের বাইরে বোতামগুলো খুলে রাখতেন।"[৮৭৩]

#### ৩. দাঁড়িয়ে বা বসে পাজামা পরিধান

কোনো কোনো গ্রন্থে 'বসে পাজামা পরিধান করা' সুন্নাত বা আদব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস আমার নজরে পড়ে নি। বিষয়টি পরবর্তী যুগের আলিমদের মতামত বলেই মনে হয়।[৮৭৪]

#### ৪. টুপির উপর পাগড়ী মুসলিমের চিহ্ন

আবু দাউদ ও তিরমিযী উভয়ে তাঁদের উস্তাদ কুতাইবা ইবনু সাঈদের সূত্রে একটি হাদীস সংকলিত করেছেন। তাঁরা উভয়েই বলেন: কুতাইবা আমাদেরকে বলেছেন, তাকে মুহাম্মাদ ইবনু রাবীয়াহ হাদীসটি আবুল হাসান আসকালানী নামক এক ব্যক্তি থেকে, তিনি আবু জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু রুকানাহ নামাক এক ব্যক্তি থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বলেছেন, রুকানার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুস্তি লড়েন এবং তিনি রুকানাকে পরাস্ত করেন। রুকানা আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ

"আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য টুপির উপরে পাগড়ী।"[৮৭৫]

তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখ করে এর সনদটি যে মোটেও নির্ভরযোগ্য নয় তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী আবুল হাসান আসকালানী। এ ব্যক্তিটির পরিচয় কেউ জানে না। শুধু তাই নয়। তিনি দাবী করেছেন যে, তিনি রুকানার পুত্র থেকে হাদীসটি শুনেছেন। রুকানার কোনো পুত্র ছিল কিনা, তিনি কে ছিলেন, কিরূপ মানুষ ছিলেন তা কিছুই জানা যায় না। এজন্য হাদীসটির সনদ মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ, ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারীও তাঁর "আত-তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে এ হাদীসটির দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হাদীসটির সনদ অজ্ঞাত অপরিচিত মানুষদের সমন্বয়। এছাড়া এদের কেউ কারো থেকে কোন হাদীস শুনেছে বলেও জানা যায় না।[৮৭৬] ইমাম যাহাবী, আজলূনী প্রমুখ একে মাউযূ বা বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন।[৮৭৭]

এছাড়া আব্দুর রাউফ মুনাবী, মোল্লা আলী কারী, আব্দুর রাহমান মুবারাকপুরী, শামছুল হক আযীমাবাদী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস আলোচনা করেছেন যে, এ হাদীসের অর্থ বাস্তবতার বিপরীত।[৮৭৮] হাদীসটির দুইটি অর্থ হতে পারে: এক- মুশরিকগণ শুধু টুপি পরিধান করে আর আমরা পাগড়ী সহ টুপি পরিধান করি। দুই- মুশরিকগণ শুধু পাগড়ী পরিধান করে আর আমরা টুপির উপরে পাগড়ী পরিধান করি। উভয় অর্থই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মের বিপরীত। কারণ বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা কখনো শুধু টুপি পরতেন এবং কখনো শুধু পাগড়ী পরতেন।

ইমাম গাযালী (৫০৫হি) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো পাগড়ীর নিচে টুপি পরিধান করতেন। কখনো পাগড়ী ছাড়া শুধু টুপি পরতেন। কখনো কখনো তিনি মাথা থেকে টুপি খুলে নিজের সামনে টুপিটিকে সুতরা বা আড়াল হিসাবে রেখে সেদিকে মুখ করে নামায আদায় করেছেন।"[৮৭৯]

শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়িম (৭৫১হি:) বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ পাগড়ী পরিধান করতেন এবং তার নিচে টুপি পরতেন। তিনি পাগড়ী ছাড়া শুধু টুপিও পরতেন। আবার টুপি ছাড়া শুধু পাগড়ীও পরতেন।"[৮৮০]

**৫. রাসুলুলাহ (ﷺ)-এর পাঁচকলি-টুপি**

আবু হুরাইরা (রা)-এর নামে বর্ণিত:

رَأَيْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَلَنْسُوَةً خُمَاسِيَّةً طَوِيْلَةً

"আমি রাসূলুলাহ ﷺ-এর মাথায় একটি লম্বা পাঁচভাগে বিভক্ত টুপি দেখেছি।"

হাদীসটি আলামা আবু নুআইম ইসপাহানী তাঁর সংকলন 'মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফা' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর ও আবু আহমাদ জুরজানী বলেছেন, আমাদেরকে আহমাদ ইবনু আব্দুলাহ ইবনু ইউসূফ বলেছেন, আমাদেরকে আবু উসামাহ বলেছেন, আমাদেরকে দাহহাক ইবনু হাজার বলেছেন, আমাদেরকে আবু কাতাদাহ হাররানী বলেছেন যে, আমাদেরকে আবু হানীফা বলেছেন, তাঁকে আতা' আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ হাদীস বলেছেন।[৮৮১]

এ হাদীসটি জাল। ইমাম আবু হানীফা থেকে শুধুমাত্র আবু কাতাদাহ হাররানী (মৃ: ২০৭হি:) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাররানী ছাড়া অন্য কেউ এ শব্দ বলেন নি। ইমাম আবু হানীফার (রাহ) অগণিত ছাত্রের কেউ এ হাদীসটি এ শব্দে বলেন নি। বরং তাঁরা এর বিপরীত শব্দ বলছেন। অন্যান্য ছাত্রদের বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, তাঁকে আতা' আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাদা শামি টুপি ছিল।[৮৮২]

তাহলে আমরা দেখছি যে, অন্যান্যদের বর্ণনা মতে হাদীসটি (قلنسوة شامية) বা 'শামী টুপি' এবং আবু কাতাদার বর্ণনায় (قلنسوة خماسية) বা 'খুমাসী টুপি'। এথেকে আমরা বুঝতে পরি যে, আবু হানীফা বলেছিলেন শামী টুপি, যা তাঁর সকল ছাত্র বলেছেন, আবু কাতাদাহ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ভুল বলেছে। অথবা সে (شامية) শব্দটিকে বিকৃতভাবে (خماسية) রূপে পড়েছে।

সর্বোপরি আবূ কাতাদা পরিত্যক্ত রাবী। ইমাম বুখারী বলেছেন, আবু কাতাদাহ হাররানী 'মুনকারুল হাদীস'। ইমাম বুখারী কাউকে "মুনকারুল হাদীস" বা "আপত্তিকর বর্ণনাকারী" বলার অর্থ সে লোকটি মিথ্যাবাদী বলে তিনি জেনেছেন। তবে তিনি কাউকে সরাসরি মিথ্যাবাদী না বলে তাকে "মুনকারুল হাদীস" বা অনুরূপ শব্দাবলি ব্যবহার করতেন।

এছাড়া হাদীসটি আবু কাতাদাহ হাররানীর থেকে শুধুমাত্র দাহহাক ইবনু হুজর বর্ণনা করেছেন। দাহহাক ইবনু হুজরের কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ মানবিজী। তিনিও অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি মিথ্যা হাদীস বানাতেন বলে ইমাম দারাকুতনী ও

অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন।[৮৮৩]

এজন্য আল্লামা আবু নু'আইম ইসপাহানী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন "এ হাদীসটি শুধুমাত্র দাহহাক আবু কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর কেউই আবু হানীফা থেকে বা আবু কাতাদাহ থেকে তা বর্ণনা করেন নি।"[৮৮৪]

**৬. পাগড়ীর দৈর্ঘ্য**

পাগড়ী কত হাত লম্বা হবে বা পাগড়ীর দৈর্ঘ্যের বিষয়ে সুন্নাত কী? এ বিষয়ে অনেক কথা প্রচলিত আছে। সবই ভিত্তিহীন বা আন্দায কথা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পাগড়ীর দৈর্ঘ্য কত ছিল তা কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি।[৮৮৫]

**৭. দাঁড়িয়ে পাগড়ী পরিধান করা**

কোনো কোনো গ্রন্থে 'দাঁড়িয়ে পাগড়ী পরিধান করা' সুন্নাত বা আদব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস আমার নযরে পড়ে নি। বিষয়টি পরবর্তী যুগের আলিমদের মতামত বলেই মনে হয়।[৮৮৬]

**৮. পাগড়ীর রঙঃ সাদা ও সবুজ পাগড়ী**

রাসূলুলাহ্ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম অধিকাংশ সময় কাল রঙের পাগড়ী পরেছেন। হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি মদীনায়, সফরে, যুদ্ধে সর্বত্র কাল পাগড়ী ব্যবহার করতেন।

৮/৯ম হিজরী শতকের কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় থাকা অবস্থায় কাল পাগড়ী পরতেন এবং সফর অবস্থায় সাদা পাগড়ী ব্যবহার করতেন। এ দাবীর পক্ষে কোনো প্রমাণ বা হাদীস তারা পেশ করেন নি। এজন্য হিজরী ৯ম শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম সাখাবী (৯০২ হি) এ কথাকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৮৭]

আমরা জানি 'পাগড়ী' পোশাক বা জাগতিক বিষয়। এ জন্য সাধারণ ভাবে হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ব্যতিরেকে কোনো রঙকে আমরা নাজায়েয বলতে পারব না। তবে কোনো রঙ সুন্নাত কিনা তা বলতে প্রমাণের প্রয়োজন। বিভিন্ন হাদীসে সাধারণ ভাবে সবুজ পোশাক পরিধানে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো পাগড়ীর ক্ষেত্রে সবুজ রঙ ব্যবহার করেছেন বলে জানতে পারি নি। ফিরিশতাগণের পাগড়ীর বিষয়েও তাঁরা কখনো সবুজ পাগড়ী পরিধান করেছেন বলে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস আমি দেখতে পাই নি। অনুরূপভাবে তিনি কখনো সাদা রঙের পাগড়ী পরিধান করেছেন বলেও জানতে পারি নি। কোন কোন সনদহীন ইসরাঈলীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাবিয়ী কা'ব আহবার বলেছেনঃ ঈসা (আঃ) যখন পৃথীবিতে নেমে আসবেন তখন তাঁর মাথায় সবুজ পাগড়ী থাকবে।[৮৮৮]

**৯. পাগড়ীর ফযীলত**

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ পাগড়ী ব্যবহার করতেন। কিন্তু পাগড়ী ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান মূলক কোনো সহীহ হাদীস নেই। এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত ও প্রচারিত সবই ভিত্তিহীন, বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল। এ বিষয়ক হাদীসগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যায়: **(ক)** সাধারণ পোশাক হিসাবে পাগড়ী পরিধানের উৎসাহ প্রদান বিষয়ক হাদীস। **(খ)** পাগড়ী পরিধান করে নামায আদায়ের উৎসাহ প্রদান বিষয়ক হাদীস। উভয় অর্থে বর্ণিত সকল হাদীসই অত্যন্ত দুর্বল ও বানোয়াট পর্যায়ের। বিশেষত দ্বিতীয় অথে বর্ণিত সকল হাদীস সন্দেহাতীতভাবে জাল ও বানোয়াট।

এখানে উল্লেখ্য যে, 'রাসূলুল্লাহর (ﷺ) পোশাক' ও 'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক পর্দা ও দেহসজ্জা' গ্রন্থদ্বয়ে এ সকল হাদীসের সনদের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রত্যেক সনদের মিথ্যাবাদী জালিয়াতের পরিচয়ও তুলে ধরেছি। এখানে সংক্ষেপে হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। আগ্রহী পাঠক উপর্যুক্ত গ্রন্থদ্বয় থেকে বাকি আলোচনা জানতে পারবেন।

**প্রথমতঃ সৌন্দয্য ও মর্যাদার জন্য পাগড়ী**

সৌন্দর্য্য ও মর্যাদার প্রতীক হিসাবে পাগড়ী পরিধানের উৎসাহ দিয়ে বর্ণিত জাল বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীসগুলোর মধ্যে রয়েছে:

**১০. পাগড়ীতে ধৈর্যশীলতা বৃদ্ধি ও পাগড়ী আরবদের তাজ**

একটি বানোয়াট হাদীসে বলা হয়েছে:

اِعْتَمُّوْا تَزْدَادُوْا حُلْماً، وَالْعَمَائِمُ تِيْجَانُ الْعَرَبِ

"তোমরা পাগড়ী পরিধান করবে, এতে তোমাদের ধৈর্যশীলতা বৃদ্ধি পাবে। আর পাগড়ী হলো আরবদের তাজ বা রাজকীয় মুকুট।"[৮৮৯]

**১১. পাগড়ী আরবদের তাজ পাগড়ী খুললেই পরাজয়**

অন্য একটি বানোয়াট হাদীসে বলা হয়েছে:

اَلْعَمَائِمُ تِيْجَانُ الْعَرَبِ فَإِذَا وَضَعُوْا الْعَمَائِمَ وَضَعُوْا عِزَّهُمْ، أَوْ وَضَعَ اللهُ عِزَّهُمْ

"পাগড়ী আরব জাতির মুকুট। তারা যখন পাগড়ী ফেলে দেবে তখন তাদের মর্যাদাও চলে যাবে বা আল্লাহ তাদের মর্যাদা নষ্ট করে দেবেন।"[৮৯০]

**১২. পাগড়ী মুসলিমের মুকুট, মসজিদে যাও পাগড়ী পরে ও খালি মাথায়**

আরেকটি বানোয়াট হাদীসে বলা হয়েছে:

ايتوا المساجد حسرا ومقنعين [معصبين] فان العمائم تيجان المسلمين

"তোমরা মসজিদে একেবারে খালি মাথায় আসবে এবং পাগড়ী, পট্টি বা রুমাল মাথায় আসবে (অর্থাৎ সুযোগ ও সুবিধা থাকলে খালি মাথায় না এসে পাগড়ী মাথায় মসজিদে আসবে); কারণ পাগড়ী মুসলিমগণের মুকুট।"[৮৯১]

**১৩. পাগড়ী মুমিনের গাম্ভীর্য ও আরবের মর্যাদা**

অন্য একটি অত্যন্ত দুর্বল বা জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

اَلْعَمَائِمُ وَقَارُ الْمُؤْمِنِ وَعِزُّ الْعَرَبِ، فَإِذَا وَضَعَتِ الْعَرَبُ عَمَائِمَهَا فَقَدْ خَلَعَتْ عِزَّهَا

"পাগড়ী মুমিনের গাম্ভীর্য ও আরবের মর্যাদা। যখন আরবগণ পাগড়ী ছেড়ে দেবে তখন তাদের মর্যাদা নষ্ট হবে।"[৮৯২]

**১৪. পাগড়ী আরবদের তাজ ও জড়িয়ে বসা তাদের প্রাচীর**

অন্য একটি বানোয়াট হাদীস:

اَلْعَمَائِمُ تِيْجَانُ الْعَرَبِ، وَالإِحْتِبَاءُ حِيْطَانُهَا.

"পাগড়ী আরবদের মুকুট, দুইপা ও পিঠ একটি কাপড় দ্বারা পেচিয়ে বসা তাদের প্রাচীর।"[৮৯৩]

**১৫. পাগড়ীর প্রতি প্যাঁচে কেয়ামতে নূর**

আরেকটি বানোয়াট হাদীস:

اَلْعِمَامَةُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ فَصْلُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ، يُعْطَي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكُلِّ كَوْرَةٍ يُدَوِّرُهَا عَلَى رَأْسِهِ نُوْراً

"মুশরিকগণ এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপরে পাগড়ী। কেয়ামতের দিন মাথার উপরে পাগড়ীর প্রতিটি আবর্তনের বা পেঁচের জন্য নূর প্রদান করা হবে।"[৮৯৪]

**১৬. পাগড়ী পরে পূর্ববর্তী উম্মাতদের বিরোধিতা কর**

আরেকটি যয়ীফ বা বানোয়াট হাদীস:

اِعْتَمُّوْا خَالِفُوْا عَلَى الأُمَمِ قَبْلَكُمْ

"তোমরা পাগড়ী পরিধান করবে, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের বিরোধিতা করবে।"[৮৯৫]

**১৭. পাগড়ী আর পতাকায় সম্মান**

আরেকটি যয়ীফ বা বানোয়াট হাদীস:

أَكْرَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الأُمَّةَ بِالْعَمَائِمِ وَالأَلْوِيَةِ

"আলাহ তা'লা এ উম্মাতকে পাগড়ী ও পতাকা বা ঝান্ডা দিয়ে সম্মানিত করেছেন।"[৮৯৬]

**১৮. পাগড়ী ফিরিশতাগণের বেশ**

আরেকটি বানোয়াট হাদীস:

عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيْمَا الْمَلاَئِكَةِ وَأَرْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ

"তোমরা পাগড়ী পরবে; কারণ পাগড়ী ফিরিশতাগণের চিহ্ন বা বেশ। আর তোমরা পিছন থেকে পাগড়ীর প্রান্ত নামিয়ে দেবে।"[৮৯৭]

**১৯. পাগড়ী কুফর ও ঈমানের মাঝে বাঁধা**

আলীর (রা) নামে প্রচারিত একটি বানোয়াট হাদীস:

عَمَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمٍ بِعِمَامَةٍ سَدَلَهَا خَلْفِيْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَدَّنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ بِمَلاَئِكَةٍ يَعْتَمُّوْنَ هَذِهِ الْعِمَامَةَ، وَقَالَ: إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيْمَانِ

"গাদীর খুমের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাগড়ী পরিয়ে দেন এবং পাগড়ীর প্রান্ত পিছন দিকে ঝুলিয়ে দেন। এরপর বলেন: বদর ও হুনাইনের দিনে আল্লাহ আমাকে এভাবে পাগড়ী পরা ফিরিশতাদের দিয়ে সাহায্য করেছেন। আরো বলেন: পাগড়ী কুফর ও ঈমানের মাঝে বেড়া বা বাঁধা।"[৮৯৮]

উপরের অধিকাংশ হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, তা জাল। দু-একটি হাদীসকে কেউ জাল এবং কেউ অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন।[৮৯৯]

**দ্বিতীয়ত: পাগড়ী-সহ সালাতের ফযীলত**

রাসূলুলাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো শুধু নামাযের জন্য পাগড়ী পরিধান করেছেন এরূপ কোন কথা কোথাও দেখা যায় না। তাঁরা সাধারণভাবে পাগড়ী পরে থাকতেন এবং পাগড়ী পরেই নামায আদায় করতেন। এখন প্রশ্ন হলো পাগড়ী-সহ সালাতের অতিরিক্ত কোন সাওয়াব আছে কিনা?

এবিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং মুহাদ্দিসগণ একমত যে, সেগুলো সবই বানোয়াট। সুপরিচিত মিথ্যাবাদী রাবীগণ এগুলো বানিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে আমি হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। বিস্তারিত আলোচনার জন্য পোশাক বিষয়ক পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

**২০. জুমু'আর দিনে সাদা পাগড়ী পরিধানের ফযীলত**

আনাস ইবনু মালিকের (রা) সূত্রে প্রচারিত একটি মিথ্যা কথা:

إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً مُوَكَّلِيْنَ بِأَبْوَابِ الْجَوَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُوْنَ لأَصْحَابِ الْعَمَائِمِ الْبِيْضِ

"আল্লাহর কিছু ফিরিশতা আছেন, শুক্রবারের দিন জামে মসজিদের দরজায় তাদের নিয়োগ করা হয়, তারা সাদা পাগড়ী পরিধান কারীগণের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।"[৯০০]

**২১. জুমু'আর দিনে পাগড়ী পরিধানের ফযীলত**

আবু দারদা(রা)-এর নামে বর্ণিত মিথ্যা কথা:

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ শুক্রবারে পাগড়ী পরিহিতদের উপর সালাত (দয়া ও দোয়া) প্রেরণ করেন।"[৯০১]

**২২. পাগড়ীর ২ রাক'আত পাগড়ী ছাড়া ৭০ রাকআত**

জাবির (রা)-এর নামে বর্ণিত জাল হাদীস:

رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِلاَ عِمَامَةٍ [حَاسِراً]

"পাগড়ী সহ দু রাক'আত নামায পাগড়ী ছাড়া বা খালি মাথায় ৭০ রাক'আত নামাযের চেয়ে উত্তম।"[৯০২]

**২৩. পাগড়ীর নামায ২৫ গুণ ও পাগড়ীর জুমু'আ ৭০ গুণ**

ইবনু উমরের (রা:) সূত্রে প্রচারিত একটি জাল কথা:

صَلاَةٌ [صَلاَةُ تَطَوُّعٍ أَوْ فَرِيْضَةٍ] [إِنَّ الصَّلاَةَ] بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ جُمُعَةً إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَيَشْهَدُوْنَ الْجُمُعَةَ مُعْتَمِّيْنَ وَلاَ يَزَالُوْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

"পাগড়ি সহ (ফরয অথবা নফল যে কোনো) একটি সালাত পচিশ সালাতের সমান এবং পাগড়ি সহ একটি জুমু'আ ৭০ টি জুমু'আর সমতুল্য। ফিরিশতাগণ পাগড়ি পরিধান করে জুমু'আর সালাতে উপস্থিত হন এবং সূযাস্ত পর্যন্ত তাঁরা পাগড়ি পরিধানকারীদের জন্য দোয়া করতে থাকেন।"

ইবনু হাজার আসকালানী, সাখাবী, সুয়ূতী, ইবন আররাক, যারকানী প্রমুখ মুহাদ্দিস একে বাতিল ও বানোয়াট হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।[৯০৩]

উল্লেখ্য যে, আল্লামা সুয়ূতী তাঁর সংকলিত 'আল-জামিউস সাগীর'-এর ভূমিকায় দাবি করেছেন যে, মাউযূ হাদীস তিনি এতে উল্লেখ করবেন না। অথচ তিনি এ গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। আবার তিনি নিজেই 'যাইলুল লাআলী' বা 'যাইলুল আহাদীসিল মাউদূ'আহ' নামক তাঁর জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন এবং হাদীসটি জাল বলে নিশ্চিত করেছেন।[৯০৪] এজন্য হাদীসের সনদবিচার ও জালিয়াতি নির্ণয়ে মুহাদ্দিসগণের সুস্পষ্ট মতামত ছাড়া শুধু 'উল্লেখ' করার উপর নির্ভর করা যায় না। মোল্লা আলী কারী তাঁর জাল হাদীস বিষয়ক 'আল-মাসনূ' নামক গ্রন্থে উপর্যুক্ত হাদীসটি জাল বলে উদ্ধৃত করেছেন। জাল হাদীস বিষয়ক 'আল-আসরার আল-মারফূআ' নামক অন্য গ্রন্থে তিনি হাদীসটির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা আবুল খাইর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান সাখাবী (৯০২ হি) এবং আলামা শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মানূফী (৯৩ হি) উভয়ে হাদীসটিকে মাউযূ ও বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর এ বিষয়ে নিজের দ্বিধা প্রকাশ করে বলেছেন: "ইবনু উমারের (রা) এ হাদীসটি সুয়ূতী 'আল-জামিয়ুস সাগীর' গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন এবং এ গ্রন্থে কোনো মাউযূ হাদীস উল্লেখ করবেন না বলে তিনি নিশ্চিত করেছেন।"[৯০৫]

স্বভাবতই ইমাম সুয়ূতীর প্রতি সু-ধারণা বশত মোল্লা আলী কারী দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। সম্ভবত তিনি 'যাইলুল লাআলী' গ্রন্থে হাদীসটির বিষয়ে সুয়ূতীর নিজের মতামত লক্ষ্য করেন নি। শুধু তাই নয়, মোল্লা আলী কারী তার 'মিরকাত' গ্রন্থে 'পাগড়ি' বিষয়ক আলোচনায় এ হাদীসটি প্রমাণ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। এমনকি এর দুর্বলতা বা এ বিষয়ে ইমাম সাখাবী ও মানূফীর মতামতও উল্লেখ করেন নি।[৯০৬]

**২৪. পাগড়ীর নামাযে ১০,০০০ নেকি**

আনাস ইবনু মালিকের (রা:) সূত্রে প্রচার করেছে মিথ্যাবাদীরা:

اَلصَّلاَةُ فِيْ الْعِمَامَةِ بِعَشَرَةِ آلاَفِ حَسَنَةٍ

"পাগড়ীসহ নামাযে দশহাজার নেকী রয়েছে।"[৯০৭]

এভাবে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, 'পাগড়ী পরে নামায আদায়ের ফযীলতে' যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই জাল ও বানোয়াট কথা।

**২৫. নতুন পোশাক পরিধানের সময়**

রাসূলুলাহ ﷺ নতুন পোশাক পরিধানের জন্য কোনো সময়কে পছন্দ করতেন বলে কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে নিম্নের  হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, যাকে মুহাদ্দিসগণ জাল বলে গণ্য করেছেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْباً لَبِسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"রাসূলুলাহ ﷺ নতুন পোশাক পরলে শুক্রবারে তা পরতেন।"[৯০৮]

**২৬. দাড়ি ছাঁটা**

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে বলেন: আমাদেরকে হান্নাদ বলেছেন, আমাদেরকে উমার ইবনু হারূন বলেছেন, তিনি উসামা ইবনু যাইদ থেকে, তিনি আমর ইবনু শু'আইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তাঁর দাদা থেকে,

كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا

"রাসূলুলাহ (ﷺ) নিজের দাঁড়ির দৈর্ঘ ও প্রস্থ থেকে কাটতেন।"

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন: "এ হাদীসটি গরীব (দুর্বল)। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (ইমাম বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, উমার ইবনু হারূন কোনোরকম চলনসই রাবী (مقارب الحديث)। তার বর্ণিত যত হাদীস আমি জেনেছি, সবগুলোরই কোনো না কোনো ভিত্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এই হাদীসটির কোনোরূপ ভিত্তি পাওয়া যায় না। আর এই হাদীসটি উমার ইবনু হারূন ছাড়া আর কারো সূত্রে জানা যায় না।"[৯০৯]

ইমাম তিরমিযীর আলোচনা থেকে আমরা তিনটি বিষয় জানতে পারি: (১) এ হাদীসটি একমাত্র উমার ইবনু হারূন ছাড়া অন্য

কোনো সূত্রে বর্ণিত হয় নি। একমাত্র তিনিই দাবি করেছেন যে, উসামা ইবনু যাইদ আল-লাইসী তাকে এ হাদীসটি বলেছেন। (২) ইমাম বুখারীর মতে উমার ইবনু হারূন একেবারে পরিত্যক্ত রাবী নন। (৩) উমার ইবনু হারূন বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের ভিত্তি পাওয়া গেলেও এ হাদীসটি একেবারেই ভিত্তিহীন।

অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস দ্বিতীয় বিষয়ে ইমাম বুখারীর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। বিষয়টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমাদেরকে মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা পদ্ধতি এবং এ বিষয়ক মতভেদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে।

উমার ইবনু হারূন ইবনু ইয়াযিদ বালখী (১৯৪ হি) ২য় হিজরী শতকের একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর আরো একটি বিশেষ পরিচয় ছিল যে, তিনি মুহাদ্দিসগণের ও আহলুস সুন্নাতের আকীদার পক্ষে মুরজিয়াগণের বিপক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখতেন। ফলে অনেক মুহাদ্দিসই তাঁকে পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, তিনি তাঁর কোনো কোনো উস্তাদের নামে এমন অনেক হাদীস বলেন, যেগুলো সে সকল উস্তাদের অন্য কোনো ছাত্র বলেন না। মুহাদ্দিসগণের তুলনামূলক নিরীক্ষায় এগুলো ধরা পড়ে।

এর কারণ নির্ণয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। তাঁর প্রসিদ্ধি ও বিদ'আত বিরোধী ভূমিকার ফলে অনেক মুহাদ্দিস তাঁর বিষয়ে ভাল ধারণা রাখতেন। তাঁরা তাঁর এ একক বর্ণনাগুলোর ব্যাখ্যায় বলেন যে, সম্ভবত তিনি অনেক হাদীস মুখস্থ করার ফলে কিছু হাদীসে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করতেন। এদের মতে তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলতেন না। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম বুখারী ও অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস।

অপরদিকে অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবাদী বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের নিরীক্ষায় তাঁর মিথ্যা ধরা পড়েছে। এদের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১৮১ হি)। তিনি বলেন, আমি ইমাম জাফর সাদিকের (১৪৮ হি) কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করার জন্য মক্কায় গমন করি। কিন্তু আমার পৌছানোর আগেই তিনি ইন্তিকাল করেন। ফলে আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু শিখতে পারি নি। আর উমার ইবনু হারূন আমার পরে মক্কায় আগমন করে। এরপরও সে দাবি করে যে, সে ইমাম জাফর সাদিক থেকে অনেক হাদীস শুনেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে মিথ্যাবাদী।

আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী (১৯৪হি) বলেন, উমার ইবনু হারূন আমাদের কাছে এসে জাফর ইবনু মুহাম্মদ (ইমাম জাফর সাদিক)-এর সূত্রে অনেক হাদীস বলেন। তখন আমরা উমার ইবনু হারূনের জন্ম এবং তার হাদীস শিক্ষার জন্য মক্কায় গমনের তারিখ হিসাব করলাম। এতে আমরা দেখলাম যে, উমারের মক্কায় গমনের আগেই জা'ফর ইন্তিকাল করেন। (উমার ১২৫/১৩০ হিজরীর দিকে জন্মগ্রহণ করেন। জাফর সাদিক ১৪৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এ সময়ে উমার হাদীস শিক্ষার জন্য বের হন নি।)

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন, উমার ইবনু হারূন একবার কিছু হাদীস বলেন। পরবর্তী সময়ে সে হাদীসগুলোই তিনি অন্য উস্তাদের নামে এবং অন্য সনদে বলেন। ফলে আমরা তার হাদীস পরিত্যাগ করি।

এভাবে অনেক মুহাদ্দিস উমার ইবনু হারূনকে মিথ্যাবাদী বা পরিত্যক্ত বলেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইয়াহইয়া কাত্তান, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, নাসাঈ, সালিহ জাযরাহ, আবূ নু'আইম, ইবনু হিব্বান ও ইবনু হাজার।[৯১০] এ জন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন।[৯১১]

এখানে উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা), আবূ হুরাইরা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা হজ্জ বা উমরার পরে যখন মাথা টাক করতেন, তখন দাড়িকে মুষ্টি করে ধরে মুষ্টির বাইরের দাড়ি কেটে ফেলতেন।[৯১২] এজন্য কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন যে, এক মুষ্টি পরিমাণের বেশি দাড়ি কেটে ফেলা যাবে। অন্যান্য ফকীহ বলেছেন যে, দাড়ি যত বড়ই হোক ছাঁটা যাবে না, শুধুমাত্র অগোছালো দাড়িগুলো ছাঁটা যাবে।

**২৭. আংটি ও পাথরের গুণাগুণ**

সমাজে প্রচলিত অসংখ্য মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পাথরের গুণাগুণ বর্ণনার হাদীস। মুসলিমের ঈমান নষ্টকারী বিভিন্ন শয়তানী ওসীলার মধ্যে অন্যতম হলো জ্যোতিষী শাস্ত্র এবং সমাজের আনাচে কানাচে ছাড়িয়ে পড়া ভণ্ড জ্যোতিষীর দল। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোন জ্যোতিষী বা ভাগ্য গণনাকারীর কাছে গেলে বা তার কথা বিশ্বাস করলে মুসলিম কাফির হয়ে যায় এবং তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে এখানে আলোচনা সম্ভব নয়। জ্যোতিষীদের অনেক ভণ্ডামীর মধ্যে রয়েছে পাথর নির্ধারণ। তারা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন ধরনের পাথরের আংটি পরতে পরামর্শ দেন। কেউ কেউ আবার এ বিষয়ে হাদীসও উল্লেখ করেন। পাথরের মধ্যে কল্যাণ-অকল্যাণের শক্তি থাকার বিশ্বাস ঈমান বিরোধী বিশ্বাস। বিভিন্ন অমুসলিম সমাজ থেকে এ বিশ্বাস মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, পাথরের গুণাগুণ সম্পর্কিত সকল হাদীসই বানোয়াট। বিভিন্ন ধরনের পাথর, যেমন: যবরজদ পাথর, ইয়াকুত পাথর, যমররদ পাথর, আকীক পাথর ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণিত কোন হাদীসই নির্ভরযোগ্য নয়।[৯১৩]

**২৮. আংটি পরে নামাযে ৭০ গুণ সাওয়াব**

আংটির ফযীলতে বানোয়াট একটি হাদীস

صَلاَةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ بِغَيْرِ خَاتَمٍ

“আংটি পরে নামায আদায় করলে আংটি ছাড়া নামায আদায়ের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি সাওয়াব হয়।”

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আংটি ব্যবহার করেছেন বলে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। তবে আংটি পরতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে কোন সহীহ হাদীস নেই।[৯১৪]

**২৯. নখ কাটার নিয়মকানুন**

নিয়মিত নখ কাটা ইসলামের অন্যতম বিধান ও সুন্নাত। নখ কাটার জন্য কোন নির্ধারিত নিয়ম বা দিবস রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দেন নি। বিভিন্ন গ্রন্থে নখ কাটার বিভিন্ন নিয়ম, উল্টোভাবে নখ কাটা, অমুক নখ থেকে শুরু করা ও অমুক নখে শেষ করা, অমুক দিনে নখ কাটা বা না কাটা ইত্যাদির ফযীলত বা ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো সবই পরবর্তী যুগের প্রবর্তিত নিয়ম। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ বিষয়ে যা কিছু প্রচলিত সবই বাতিল ও বানোয়াট।

নখ কাটার জন্য এ সকল নিয়ম পালন করাও সুন্নাত বিরোধী কাজ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নখ কাটতে নির্দেশ দিয়েছেন। কোন বিশেষ নিয়ম বা দিন শিক্ষা দেন নি। কাজেই যে কোনভাবে যে কোন দিন নখ কাটলেই এ নির্দেশ পালিত হবে। কোন বিশেষ দিনে বা কোন বিশেষ পদ্ধতিতে নখ কাটার কোন ফযীলত কল্পনা করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষাকে অপূর্ণ মনে করা এবং তাঁর শিক্ষাকে পূর্ণতা দানের দু:সাহস দেখান। আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ সুন্নাতের মধ্যে জীবন যাপনের তাওফীক প্রদান করেন।[৯১৫]

**৩০. খাদ্য গ্রহণের সময় কথা না বলা**

খাদ্য গ্রহণের সময় কথা বলা নিষেধ বা কথা না বলা উচিত অর্থে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট। শুধু বানোয়াটই নয়, সহীহ হাদীসের বিপরীত। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ খাদ্য গ্রহণের সময় বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলতেন ও গল্প করতেন।[৯১৬]

**৩১. খাওয়ার সময় সালাম না দেওয়া**

প্রচলিত ধারণা হলো খাওয়ার সময় সালাম দেয়া ঠিক না। বলা হয়:

لاَ سَلاَمَ عَلَى آكِلٍ

“খাদ্য গ্রহণকারীকে সালাম দেয়া হবে না।”

সাখাবী, মোল্লা কারী ও আজলূনী বলেন, হাদীসে এ কথার অস্তিত্ব নেই। তবে যদি কারো মুখের মধ্যে খাবার থাকে, তাহলে তাকে সালাম না দেওয়া ভাল। এ অবস্থায় কেউ সালাম দিলে উত্তর প্রদান ওয়াজিব নয়।[৯১৭]

**৩২. মুমিনের ঝুটায় রোগমুক্তি**

আরেকটি প্রচলিত বানোয়াট কথা হলো:

سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ... رِيْقُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ

“মুমিনের ঝুটায় রোগমুক্তি বা মুমিনের মুখের লালাতে রোগমুক্তি।”

কথাটি কখনোই হাদীস নয় বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয়।[৯১৮]

মুমিনের ঝুটা খাওয়া রোগমুক্তির কারণ নয়, তবে ইসলামী আদবের অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের মুসলিমগণ একত্রে একই পাত্রে বসে খাওয়া-দাওয়া করেছেন এবং একই পাত্রে পানি পান করেছেন। এখনো এ অভ্যাস আরবে ও ইউরোপে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে ভারতীয় বর্ণ প্রথা ও অচ্ছুত প্রথার কারণে একে অপরের ঝুটা খাওয়াকে ঘৃণা করা হয়। এগুলো ইসলাম বিরোধী মানসিকতা।

**৩৩. খাওয়ার আগে-পরে লবণ খাওয়ায় রোগমুক্তি**

আমাদের সমাজে প্রচলিত আরেকটি জাল হাদীস:

إِذَا أَكَلْتَ فَابْدَأْ بِالْمِلْحِ وَاخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ الْمِلْحَ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ دَاءً

“তুমি যখন খাদ্যগ্রহণ করবে, তখন লবণ দিয়ে শুরু করবে এবং লবণ দিয়ে শেষ করবে; কারণ লবণ ৭০ প্রকারের রোগের প্রতিষেধক...।”

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ কথাটি মিথ্যা ও বানোয়াট।[৯১৯]

**৩৪. লাল দস্তরখানের ফযীলত**

রাসূলুলাহ (ﷺ) কখনো লাল দস্তরখান ব্যবহার করেছেন বা করতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে দেখা যায় না। এ বিষয়ে অনেক বানোয়াট কথা প্রচলিত। যেমন: "হযরত রাসূল মকবুল (ﷺ) ... লাল দস্তরখান ব্যবহার করা হতো। ... যে ব্যক্তি লাল দস্তরখানে আহার করে তার প্রতি লোকমার প্রতিদানে একশ' করে ছাওয়াব পাবে এবং বেহেস্তের ১০০ টি দরজা তার জন্য নির্ধারিত হবে। সে ব্যক্তি বেহেস্তের মধ্যে সব সময়ই ঈসা (আ) ও অন্য নবীদের হাজার হাজার সালাম ও আশীর্বাদ লাভ করবে....। এরপর হযরত কসম খেয়ে বর্ণনা করলেন, কসম সেই খোদার যার হাতে নিহিত আছে আমার প্রাণ; যে ব্যক্তি লাল দস্তরখানে রুটি খাবে সে এক ওমরা হজ্বের ছাওয়াব পাবে এবং এক হাজার ক্ষুধার্থকে পেট ভরে আহার করানোর ছাওয়াব পাবে। সে ব্যক্তি এত বেশী ছাওয়াব লাভ করবে যেন আমার উম্মতের মধ্যে হাজার বন্দীকে মুক্ত করালেন... ।" এভাবে আরো অনেক আজগুবি, উদ্ভট ও বানোয়াট কাহিনী ও সাওয়াবের ফর্দ দেয়া হয়েছে।[৯২০]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দস্তরখান ব্যবহার করতেন। তবে তা ব্যবহার করার কোনো নির্দেশ বা উৎসাহ তাঁর থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি। দস্তরখান ছাড়া খাদ্যগ্রহণের বিষয়ে তিনি কোনো আপত্তিও করেন নি। আমরা দস্তরখান বিষয়ে যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করি, অনেক ফরয বা হারামের বিষয়ে সেরূপ গুরুত্ব প্রদান করি না। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দস্তরখান ব্যবহার করতেন বলতে আমরা বুঝি যে, তিনি আমাদের মত দস্তরখানের উপর থালা, বাটি ইত্যাদি রেখে খানা খেতেন। ধারণাটি সঠিক নয়। তাঁর সময়ে চামড়ার দস্তরখান বা 'সুফরা' ব্যবহার করা হতো এবং কোনো থালা, বাটি, গামলা ইত্যাদি ছাড়াই সরাসরি 'সুফরা'র উপরেই সরাসরি খেজুর, পনির, ঘি ইত্যাদি খাদ্য রেখে খাওয়া হতো।[৯২১]

## (গ) বিবাহ, পরিবার ও দাম্পত্য জীবন

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবার। পরিবার গঠন, পরিবারের সদস্যগণের পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্তব্য, সহমর্মিতা, স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব, দাম্পত্য জীবনের আনন্দ ও তৃপ্তির ফযীলত ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনেক নির্দেশনা বিভিন্ন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর পাশাপাশি অগণিত বানোয়াট, ভিত্তিহীন, জাল বা যয়ীফ কথা হাদীস নামে সমাজে প্রচলিত। সবচেয়ে বেশি অবাক হতে হয় যে, প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থগুলোর সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে অগণিত সূত্র বিহীন বানোয়াট কথা আমরা বিভিন্ন গ্রন্থে লিখছি বা মুখে বলছি।

বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিভিন্ন বিষয়ে সহীহ হাদীসের উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। শুধু সংক্ষেপে কিছু বানোয়াট কথা উল্লেখ করছি।

**১. বিবাহিতের ২ রাক'আত অবিবাহিতের ৭০ রাক'আত**

প্রচলিত একটি জাল হাদীস:

رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً مِنَ الأَعْزَبِ

"অবিবাহিতের ৭০ রাক'আত অপেক্ষা বিবাহিতের দু রাক'আত উত্তম।"

**২. বিবাহিতের ২ রাক'আত অবিবাহিতের ৮২ রাক'আত**

আরেকটি প্রচলিত জাল হাদীস:

رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ رَكْعَةً مِنَ الأَعْزَبِ

"অবিবাহিতের ৮২ রাক'আত অপেক্ষা বিবাহিতের দু রাক'আত উত্তম।"

কুরআন ও হাদীসে বিবাহের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বিবাহের ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্ত এ হাদীস দুটি জাল ও বানোয়াট।[৯২২]

**৩. বিবাহ অনুষ্ঠানে খেজুর ছিটানো, কুড়ানো বা কাড়াকাড়ি করা**

এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোনো সহীহ হাদীস নেই। হাদীসগুলোর সনদ অত্যন্ত যয়ীফ এবং সনদে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে। এজন্য মুহাদ্দিসগণ সেগুলোকে জাল বলে গণ্য করেছেন।[৯২৩]

**৪. দাম্পত্য মিলনের বিধিনিষেধ**

ইসলাম যেমন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক কঠিনভাবে নিষেধ করে, তেমনি বিবাহিত দম্পতিকে তাদের জীবন ও যৌবনের আনন্দ

উপভোগ করতে উৎসাহ দেয়। পায়ুপথে মিলন এবং রক্তস্রাব অবস্থায় মিলন নিষিদ্ধ। এছাড়া দম্পতির মিলন ও আনন্দলাভের কোনো দিন, তারিখ, বার, তিথি, সময়, উপকরণ, আসন বা পদ্ধতি ইসলাম নিষিদ্ধ করে নি। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোনোরূপ পর্দা নেই বা কোনো কিছু দর্শন, স্পর্শ, চুম্বন বা উপভোগে নিষেধাজ্ঞা নেই।

প্রচলিত অনেক জাল ও ভিত্তিহীন হাদীসে দাম্পত্য মিলন বিষয়ক বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। অমুক সময়ে, অমুক দিনে, অমুক বারে, অমুক রাতে, অমুক তিথিতে দাম্পত্য সম্পর্ক করবে না, তাতে অমুক প্রকারের ক্ষতি হবে, অথবা সন্তানের অমুক রোগ হবে.... ইত্যাদি। অথবা অমুক পদ্ধতিতে বা আসনে দাম্পত্য মিলন করবে না, তাহলে অমুক ক্ষতি হবে, বা সন্তানের অমুক খুত হবে... ইত্যাদি। অথবা দাম্পত্য মিলনের সময় কথা বলবে না, দৃষ্টিপাত করবে না...স্পর্শ করবে না...তাহলে অমুক রোগ হবে, বা অমুক ক্ষতি হবে... ইত্যাদি। অথবা অমুক সময়ে, বারে, তিথিতে দাম্পত্য মিলনে সন্তান সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগ্যবান হয়..। এগুলো সবই মিথ্যা, বানোয়াট ও জাল কথা।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মদীনার ইহূদীগণের মধ্যে এরূপ কিছু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। তখন মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে সূরা বাকারার ২২৩ নং আয়াত নাযিল করে সে সকল কুসংস্কার খণ্ডন করেন।[৯২৪]

**৫. স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত**

বহুল প্রচলিত একটি পুস্তকে রয়েছে: "হযরত (ﷺ) বলিয়াছেন, স্ত্রীগণের বেহেশত স্বামীর পায়ের নিচে।"[৯২৫] এ কথাটি একটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ সনদেও এ কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায় না। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা থেকে বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জান্নাত উভয়ের হাতে। উভয়ের প্রতি উভয়ের দায়িত্ব পালন ও অধিকার আদায়ের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব।

**৬. গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের পুরস্কার**

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে মাতৃগণের মর্যাদার জন্য বিশেষভাবে সন্তানধারণ, দুগ্ধপান ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে সাধারণভাবে সংসার-পালন, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদির সাধারণ সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জালিয়াতগণ তাদের অভ্যাস মত প্রত্যেক কর্ম বা অবস্থার জন্য পৃথক পৃথক আজগুবি ফযীলত ও সাওয়াবের বর্ণনা দিয়ে অনেক হাদীস বানিয়েছে। আমাদের সমাজে এগুলো প্রচলিত। এমনকি এ সকল ভিত্তিহীন কথা দিয়ে বিভিন্ন ছাপানো পোস্টার, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি ছাপা হয়।

প্রচলিত একটি পুস্তকে রয়েছে: "হুজুর (সাঃ) একদিন স্ত্রীলোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, যখন কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামী কর্তৃক হামেলা (গর্ভবর্তী) হইয়া থাকে, তখন হইতে প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বদা সে স্ত্রীলোকটি দিনে রোযা রাখার ও রাত্রি বেলা নফল নামায পড়ার ছওয়াব পাইবে। আর যখন প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় তখন খোদা তায়ালা তাহার জন্য বেহেশতের মধ্যে এমন বস্তুসমূহ গচ্ছিত রাখিয়া দেন যে, তাহার সন্ধান পৃথিবী, আকাশ, বেহেশত, দোজখবাসী কেহই অবগত নহেন। আর যখন সন্তান প্রসব করে তখন হইতে দুগ্ধ ছাড়ান পর্যন্ত প্রতি ঢোক দুগ্ধের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তাহাকে একটি করিয়া নেকী দান করিয়া থাকেন। এবং সেই সময়ের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইলে শহীদের দরওয়াজা প্রাপ্ত হইবে। আর যদি তাহাকে তাহার সন্তানের জন্য কোন রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঐ রাত্রি জাগরণের পরিবর্তে ৭০টি গোলাম আজাদ করার ছওয়াব দিয়া থাকেন। তৎপর তিনি ইহাও বলিয়া ছিলেন যে, এই ছওয়াব সমূহ কেবল মাত্র ঐ সমস্ত স্ত্রী লোকদেরকে দেওয়া হইবে যাহারা সর্বদাই খোদার হুকুম ও আপন স্বামীর হুকুম পালন করিয়া আওরাতে হাছীনার অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিয়াছে। আল্লাহ ও স্বামীর নাফরমান স্ত্রীলোকদিগকে কখনও ঐ সমস্ত ছওয়াব দেওয়া হইবে না।"[৯২৬]

এ 'কথাগুলো' একটি জাল হাদীসের 'ইচ্ছামাফিক' অনুবাদ।[৯২৭] এছাড়া আরো অনেক আজগুবি, মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা হাদীসের নামে লিখে এ সকল পুস্তকের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মসীলিপ্ত করা হয়েছে। এ সকল পুস্তকে 'হাদীস' নামে লেখা অধিকাংশ কথাই বানোয়াট ও জাল।

**(ঘ) বয়সের ফযীলত ও বয়স্কের সম্মান**

কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন সামাজিক শিষ্টাচারের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, বয়স্কদের সম্মান করা। বিভিন্ন হাদীসে যার বয়স বেশি তাকে আগে কথা বলার সুযোগ দেয়া, কোনো দ্রব্য তার হাতে আগে দেয়া বা অনুরূপ সামাজিক কর্মে ও সম্মানে অগ্রাধিকার দেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে বয়স্ক ও বৃদ্ধদেরকে সম্মান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সহীহ হাদীসের মধ্যে রয়েছে:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا (وَلَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا)

"যে ব্যক্তি আমাদের মধ্যকার ছোটদের মমতা না করবে এবং বড়দের অধিকার না জানবে (বড়দের সম্মান না করবে) সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৯২৮]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ....

"আল্লাহকে মর্যাদা প্রদর্শনের অংশ হলো শুভ্রতাময় (সাদা চুল-দাড়ি ওয়ালা) বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা... ।"[৯২৯]

**১. বৃদ্ধের সম্মান আল্লাহর সম্মান**

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের মত এ বিষয়েও জালিয়াতগণ জাল হাদীস তৈরি করেছে। এ বিষয়ক জাল বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীসগুলোর মধ্যে রয়েছে:

بَجِّلُوْا الْمَشَايِخَ فَإِنَّ تَبْجِيْلَ الْمَشَايِخِ مِنْ تَبْجِيْلِ اللهِ

"তোমরা শাইখ বা বৃদ্ধ মানুষদেরকে সম্মান করবে; কারণ বৃদ্ধদের সম্মান করা আল্লাহর সম্মানের অংশ।"

এ হাদীসটির অর্থ উপরের নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলোর কাছাকাছি। তবে এ শব্দে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। মুহাদ্দিসগণ একমত যে হাদীসটি জাল।[৯৩০]

**২. বংশের মধ্যে বৃদ্ধ উম্মতের মধ্যে নবীর মত**

এ বিষয়ে অন্য একটি জাল হাদীস:

اَلشَّيْخُ فِيْ قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِيْ أُمَّتِهِ

"কোনো কওম বা গোত্রের মধ্যে শাইখ বা বয়স্ক মুরব্বী ব্যক্তি উম্মাতের মধ্যে নবীর মত।"[৯৩১]

শাইখ বলতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে বা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত দুটি অর্থ বুঝানো হতো। প্রথম অর্থ হলো 'বৃদ্ধ ব্যক্তি'। এ হলো এই শব্দে মূল শাব্দিক ও ব্যবহারিক অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ হলো: "গোত্রপতি'। পরবর্তী যুগে সুফী বুযুর্গগণকেও 'শাইখ' বলা হতো। ফার্সী 'পীর' শব্দটিও এ অর্থের।

"শাইখ" শব্দটি এ তৃতীয় অর্থে ব্যবহার করা শুরু হওয়ার পরে এ হাদীসটির জালিয়াতি সম্পর্কে অসচেতন কেউ কেউ এ জাল হাদীটিকে তরীকতের শাইখ বা পীর মাশাইখদের মর্যাদার প্রমাণ হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি যে, পীর-মাশাইখদের মর্যাদা রয়েছে নেককার বান্দা হিসাবে এবং আল্লাহর পথের উস্তাদ বা মুরশিদ হিসাবে। তবে এ জাল হাদীসটির সাথে তাদের মর্যাদার কোনো সম্পর্ক নেই।

**৩. পাকাচুল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার শাস্তি মাফ**

এ জাতীয় অন্য একটি বানোয়াট কথা: আল্লাহ বলেন,

إِنِّيْ لأَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِيْ وَأَمَتِيْ يَشِيْبُ رَأْسُهُمَا... فِيْ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أُعَذِّبُهُمَا فِيْ النَّارِ بَعْدَ ذَلِكَ

"আমি লজ্জা পাই যে, ইসলামের মধ্যে আমার বান্দা বা বান্দির চুল-দাড়ি পেকে যাওয়ার পরেও আমি তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেব।"[৯৩২]

এ ধরনের অন্য একটি বানোয়াট কথা: "ইসলামের মধ্যে যার বয়স ৬০ বছর হলো, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিলেন।"[৯৩৩]

**৪. ৪০ বৎসর বয়সেও ভাল না হলে জাহান্নামের প্রস্তুতি**

আরেকটি বানোয়াট কথা:

مَنْ أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً فَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ

"যার বয়স চল্লিশ হলো, অথচ তার মধ্যে খারাপের চেয়ে ভাল বেশি হলো না; সে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত হোক।"[৯৩৪]

### (ঙ) ভাষা, পেশা ইত্যাদি বিষয়ক

ইসলাম সকল যুগের, সকল ভাষার, সকল সমাজের মানুষদের জন্য আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, দীন বা জীবন ব্যবস্থা। এখানে ভাষা, দেশ, বর্ণ, গোত্র, বংশ, যুগ ইত্যাদির কারণে কোনো মর্যাদার আধিক্য বা কমতি নেই। কুরআন ও হাদীসে একথা বারংবার বলা হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে জাতিগত, ভাষাগত, পেশাগত ইত্যাদি বিভেদের সুযোগ নিয়ে অনেক জালিয়াত কারো পক্ষে ও কারো বিপক্ষে

বিভিন্ন হাদীস বানিয়েছে। আরবী ভাষার পক্ষে ও ফার্সীর বিপক্ষে কেউ কথা বানিয়েছে। কেউ উল্টো করেছে। অনুরূপভাবে আরব, পার্সিয়ান, তুর্কি, নিগ্রো, রোমান, গ্রীক, আফ্রিকান... বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের পক্ষে ও বিপক্ষে হাদীস বানানো হয়েছে। স্বর্ণকার, তাতি, জেলে, নাপিত... ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার পক্ষে ও বিপক্ষে হাদীস বানানো হয়েছে।

সনদ বিচার ও নিরীক্ষায় এগুলোর জালিয়াতি ধরা পড়েছে। এছাড়া এগুলো ইসলামী মূল্যবোধের বিরোধী। মানুষের মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি 'তাকওয়া' বা সততা। পেশা, ভাষা, বর্ণ, গোত্র, বংশ ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে নিন্দা করা বা কাউকে কারো থেকে ছোট বলা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিরোধী। এ জাতীয় জাল হাদীসগুলোর মধ্যে রয়েছে:

**১. আরব জাতিকে তিনটি কারণে ভালবাসবে**

আরবী কুরআনের ভাষা এবং রাসুলুলাহ (ﷺ)-এর ভাষা। এজন্য স্বভাবতই সকল মুমিন আরবী ভাষাকে ভালবাসেন। ভাষার প্রতি এ স্বাভাবিক ভালবাসাকে কেন্দ্র করে জালিয়াতগণ আরব জাতিকে ভালবাসার ফযীলতে অনেক হাদীস বানিয়েছে। এ অর্থে একটি প্রচলিত হাদীস:

أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلاثٍ؛ لأَنِّيْ عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ

"তিনটি কারণে আরব জাতিকে (আরবদেরকে) ভালবাসবে: আমি আরবী, কুরআনের ভাষা আরবী এবং জান্নাতের ভাষা আরবী।"

এ কথাকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস বানোয়াট এবং কেউ কেউ যয়ীফ হিসাবে গণ্য করেছেন। সনদ বিচারে কথাটি বানোয়াট বলেই বুঝা যায়।[৯৩৫]

**২. ফার্সী ভাষায় কথা বলার কঠিন অপরাধ**

ফাসী ভাষা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ভাষা অর্থে জাল হাদীসের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ফার্সী ভাষায় কথা বলার নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক অনেক হাদীস বানিয়েছে জালিয়াতগণ। হাকিম নাইসাপূরী তার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে নিম্নের হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন:

مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ زَادَتْ فِيْ خُبْثِهِ وَنَقَصَتْ مِنْ مُرُوْءَتِهِ

"যদি কেউ ফার্সী ভাষায় কথা বলে, তবে তা তার নোংরামি-পাপ বৃদ্ধি করবে এবং তার মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব কমিয়ে দেবে।"

এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী তালহা ইবনু যাইদ রুক্বী। তিনি দাবি করেন যে, ইমাম আউযায়ী তাকে হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর থেকে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যক্তিকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যক্ত ও অত্যন্ত আপত্তিকর বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইবনুল জাওযী, যাহাবী প্রমুখ ইমাম হাদীসটিকে বানোয়াট ও মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন। ইমাম সুয়ূতী একাধিক সমার্থক হাদীসের ভিত্তিতে হাদীসটিকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, সনদগত দুর্বলতার পাশাপাশি অর্থ ইসলামী মূল্যবোধের বিরোধী হওয়ায় হাদীসটি বাতিল বলেই গণ্য।[৯৩৬]

**৩. বিভিন্ন পেশার নিন্দা**

যে সকল জাল হাদীস আমাদের সমাজে দীর্ঘস্থায়ী ঘৃণ্য প্রভাব রেখেছে সেগুলোর অন্যতম হলো, তাঁতি, দর্জি, কর্মকার, নাপিত ইত্যাদি পেশার মানুষদের বিরুদ্ধে বানানো বিভিন্ন জাল হাদীস। ইসলামে শ্রম, কর্ম ও পেশাকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সকল প্রকার পেশা ও কর্মকে প্রশংসা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ সকল জালিয়াত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বিভিন্ন পেশার নিন্দায় হাদীস বানিয়েছে। যেমন, তাঁতিগণ বা নাপিতগণ অন্য মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের সমমর্যাদা সম্পন্ন নয়। কর্মকার বা স্বর্ণকারগণ সবচেয়ে বেশি মিথ্যাবাদি। তাঁতিরাই দাজ্জালের অনুসারী হবে। পশু-ব্যবসায়ী, কসাই বা শিকারীর নিন্দা।[৯৩৭]

এ সকল জাল হাদীসের প্রচলন মুসলিম সমাজে বিভিন্ন পেশার প্রতি ঘৃণা, কর্মের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করেছে।

## (চ) অন্যান্য কিছু বানোয়াট হাদীস

**১. দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র**

আমরা জানি যে, আখিরাতের জন্য দুনিয়াতে কর্ম করতে হবে। তবে এ অর্থে একটি 'হাদীস' প্রচলিত, যা ভিত্তিহীন। 'হাদীসটিতে' বলা হয়েছে:

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ

"দুনিয়া হলো আখেরাতের শস্যক্ষেত্র।"

কথাটির অর্থ সঠিক হলেও তা হাদীস নয়। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ সনদেও কথাটি কোথাও বর্ণিত হয় নি।[৯৩৮]

**২. নেককারদের পুণ্য নিকটবর্তীদের পাপ**

প্রচলিত একটি বাক্য যা সাধারণত 'হাদীস' বলে উল্লেখ করা হয়:

حَسَنَاتُ الأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

"নেককার মানুষদের নেক-আমলসমূহ নিকটবর্তীগণের (আল্লাহর ওলীদের) পাপ।" মুহাদ্দিসগণ একমত যে বাক্যটি হাদীস নয়, বরং তৃতীয় শতকের একজন বুযুর্গ আবূ সাঈদ আল-খার্‌রার (২৮৬হি)-এর কথা।[৯৩৯]

**৩. মনোযোগ ছাড়া সালাত হবে না**

'হাদীস' বলে প্রচলিত আরেকটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা:

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ

"অন্তরের উপস্থিতি (মনোযোগ) ছাড়া সালাত হবে না।"

সালাতের মধ্যে মনোযোগের গুরুত্ব কুরআন ও বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে বুঝা যায়। তবে এ কথাটি হাদীস নয়; বরং সনদবিহীন বানোয়াট কথা।

**৪. মৃত্যুর আগে মৃত্যুবরণ কর**

হাদীস নামে প্রচলিত একটি বানোয়াট বাক্য:

مُوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوا

"তোমরা মৃত্যুর আগেই মৃত্যুবরণ কর।"

ইবনু হাজার আসকালানী, সাখাবী, মোল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস একমত যে, এ কথাটি ভিত্তিহীন একটি বানোয়াট কথা।[৯৪০]

**৫. মাদরাসা নবীর ঘর**

আমাদের দেশের অতি প্রচলিত ও ওয়ায়িযদের প্রিয় 'হাদীস':

اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللهِ وَالْمَدْرَسَةُ بَيْتِيْ

"মাসজিদ আলাহর বাড়ি এবং মাদরাসা আমার বাড়ি বা আমার ঘর।"

কথাটি হাদীসের নামে বলা একটি জঘন্য মিথ্যা ও বানোয়াট কথা, যা কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদেও রাসূলুলাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয় নি।

বস্তুত 'মাদরাসা' শব্দটিরই কোনো ব্যবহারই ইসলামের প্রথম দু শতাব্দীতে ছিল না। এর অর্থ এ নয় যে, "মাদরাসা" ব্যবস্থা রাসূলুলাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের যুগে ছিল না। "আকীদা", "তাসাউফ" ইত্যাদি পরিভাষা কুরআন-হাদীসে তো নেই, উপরন্তু সাহাবীগণের যুগেও ছিল না। প্রথম দু শতাব্দীর পরে এ সব পরিভাষার উদ্ভব। কুরআন-হাদীসে ঈমানের বিষয় বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগে এ বিষয়ক আলোচনাকে "আকীদা" নাম দেয়া হয়েছে। কুরআন-হাদীসে তাযকিয়ায়ে নাফসের নির্দেশ রয়েছে, পরবর্তী যুগে "তাসাউফ" পরিভাষার উদ্ভব। কুরআন-হাদীসে ইলম শিক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং রাসূলুলাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগে মসজিদে বা নির্ধারিত ঘরে পাঠগ্রহণ ও প্রদানের রীতি ছিল। তবে পাঠদানকেন্দ্রকে "মাদরাসা" নামকরণের প্রচলন সে যুগে ছিল না।

**৬. নবজাতকের বাম কানে ইকামত দেওয়া**

নবজাতকের কানে আযান দেওয়া সুন্নাত। আবু রাফি (রা) বলেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاةِ

"আমি দেখলাম, ফাতেমা (রা) যখন হাসানকে জন্ম দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসানের কানে নামাযের আযানের মত আযান দিলেন।"[৯৪১]

তবে বাম কানে একামত দেওয়ার বর্ণনাটি জাল পর্যায়ের। হাদীসটি নিম্নরূপ:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ

"যদি কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেয় তবে 'উম্মুস সিবইয়ান' (জিন) তার ক্ষতি করবে না।"

হাদীসটি আবূ ইয়ালা মাউসিলী, ইবনুস সুন্নী প্রমুখ মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনুল আলা রাযী থেকে মারওয়ান ইবন সালিম থেকে তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ উকাইলী থেকে ইমাম হুসাইন ইবন আলী (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ থেকে হাদীসটি সংকলন করেছেন। আর ইয়াহইয়া ইবনুল আলা এবং তার উসতাদ মারওয়ান ইবন সালিম উভয়ই জালিয়াত ছিলেন।[৯৪২]

**৭. ধুমপানের মহাপাপ**

প্রচলিত একটি পত্রিকা[৯৪৩] থেকে জানা যায়, আমাদের দেশের কোনো কোনো এলাকায় ধুমপানের বিরুদ্ধে দুটি বানোয়াট হাদীস প্রচার করা হয়:

مَنْ شَرِبَ الدُّخَانَ فَكَأَنَّمَا شَرِبَ دَمَ الأَنْبِيَاءِ

"যে ব্যক্তি ধুমপান করল সে যেন নবীগণের রক্ত পান করল।"

مَنْ شَرِبَ الدُّخَانَ فَكَأَنَّمَا زَنَى بِأُمِّهِ فِيْ الْكَعْبَةِ

"যে ব্যক্তি ধুমপান করল, সে যেন কাবাঘরের মধ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করল।"

এ প্রকারের জঘন্য নোংরা ও ফালতু কথা কেউ হাদীস হিসেবে বলতে পারে বলে বিশ্বাস করা কষ্ট। সর্বাবস্থায় এগুলো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা।

**৮. রাসূলুলাহ (ﷺ) ধুমপানের নির্দেশ দিলেন!**

'ইমামুস সুফিয়্যাহ' বা সূফীগণের ইমাম নামে খ্যাত গত শতকের সুপ্রসিদ্ধ আলিম, সূফী ও বিচারক ইউসূফ ইবন ইসমাঈল নাবহানী (১২৬৫-১৩৫০ হি/১৮৪৯-১৯৩২খৃ) রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "জাওয়াহিরুল বিহার ফী ফাদায়িলিন নাবিয়্যিল মুখতার"। এ গ্রন্থে তিনি প্রসিদ্ধ সূফী আলিম আব্দুল গনী নাবলুসী (১০৫০-১১৪৩ হি/ ১৬৪১-১৭৩১) থেকে উদ্ধৃত করেছেন:

جاء إلى مجلسنا السيد عبد القادر أفندي على عادته، وكان يقرأ علينا في مختصر صحيح البخاري في أواخره فقرأ الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي" ... ثم جرت معه مذاكرة في شرب الدخان فأخبرنا عن الشيخ أحمد بن منصور العقربي عن شيخنا الشريف أحمد بن عبد العزيز المغربي أنه كان يجتمع بالنبي ﷺ مراراً عدة ، وأنه مرض مرضاً شديداً فسأل النبي ﷺ عن شرب الدخان فسكت النبي ﷺ ولم يرد له الجواب، ثم أمره باستعماله.

"আব্দুল কাদির আফিন্দি তাঁর অভ্যাসমত আমাদের মাজলিসে আসলেন। তিনি মুখতাসার সহীহ বুখারীর শেষভাগ আমাদের কাছে পড়তেন। এদিন তিনি বুখারী সংকলিত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি পড়লেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে; শয়তান আমার রূপ গ্রহণ করতে পারে না।... এরপর তাঁর সাথে ধুমপান বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি বলেন, শাইখ আহমাদ ইবন মানসূর আকরাবী আমাদের শাইখ আহমাদ ইবন আব্দুল আযীয মাগরিবী থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি অনেক বার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে একত্রিত হয়েছেন। একবার তিনি কঠিনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি রাসূলুলাহ (ﷺ)-কে ধুমপান সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর না দিয়ে নীরব থাকেন। এরপর তিনি তাকে ধুমপান করতে নির্দেশ দেন।"[৯৪৪]

সম্মানিত পাঠক, রাসূলুলাহ ﷺ-এর নামে জালিয়াতির একটি বড় পথ স্বপ্ন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দুটো বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা করে অগণিত মিথ্যা এ পথ দিয়ে দীনের মধ্যে প্রবেশ করছে। সহীহ বিষয় দুটো নিম্নরূপ:

**(ক)** রাসূলুলাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলে প্রকৃতই তাঁকে দেখা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে স্বপ্নে আমাকে দেখল, সে প্রকৃতই আমাকে দেখল, কারণ শয়তান আমার রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে না।"[৯৪৫]

**(খ)** মুমিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ৪৬ ভাগের বা ৭০ ভাগের এক ভাগ। আনাস (রা), উবাদা ইবনুস সামিত, আবূ হুরাইরা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীদে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

"মুমিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ৪৬ অংশের এক অংশ।"[৯৪৬]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

"নেক স্বপ্ন নুবুওয়াতের ৭০ ভাগের এক ভাগ।"[৯৪৭]

এ দুটি সহীহ বিষয়কেই ভুল ব্যাখ্যা করে বিকৃত করা হয়েছে:

**(ক) অন্য কাউকে দেখাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখা বলে দাবি করা।**

মুসলিম উম্মাহ একমত যে, শয়তান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আকৃতি গ্রহণ করতে পারে না। কাজেই কেউ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে স্বপ্নে দেখে তাহলে সুনিশ্চিতভাবেই সে তাঁকে দেখেছে। তবে স্বপ্নে যদি কারো সম্পর্কে বলা হয় যে, ইনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ); কিন্তু পৃথিবীতে তাঁর যে আকৃতির কথা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সে আকৃতির সাথে উক্ত ব্যক্তির আকৃতির শতভাগ মিল না হয় তাহলে কি তাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলে মনে করতে হবে? অনেকে এরূপ দাবি করেন। তাঁরা দাবি করেন, শয়তান যেমন তাঁর রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে না, তেমনি সে অন্য রূপে এসে নিজেকে মুহাম্মাদ (ﷺ) বলে দাবি করতে পারে না।

এ দাবির পক্ষে হাদীসের কোনো প্রমাণ নেই। হাদীসে বলা হয়েছে, শয়তান তাঁর রূপ গ্রহণ করতে পারে না; কিন্তু অন্য রূপে এসে নিজেকে নবী বলে দাবি করতে পারে না বলে কোথাও বলা হয় নি। উপরন্তু মানুষ শয়তান যেমন জাল হাদীস বানাতে পারে, তেমনি জিন শয়তানও স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জালিয়াতি করতে পারে। বাস্তবে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জালিয়াতির একটি বড় পথ স্বপ্নে অন্য আকৃতির কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে বিশ্বাস করা। সাহাবী-তাবিয়ীগণ এ বিষয়ে কঠোর ছিলেন। কেউ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্বপ্নে দেখেছে বলে দাবি করলে তাঁরা তাকে স্বপ্নে দেখা মানুষটির আকৃতির বর্ণনা করতে বলতেন। স্বপ্নে দেখা মানুষটির আকৃতি হুবহু রাসূলুলাহ ﷺ-এর প্রকৃত আকৃতির সাথে মিললেই তাঁরা স্বপ্নকে সত্য বলে গ্রহণ করতেন। সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা), প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ও স্বপ্ন-বিশারদ মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনও (১১০হি) ও অন্যান্যরা এ মত পোষণ করতেন।[৯৪৮]

**(খ) ৪৬ বা ৭০ ভাগের একভাগকে শতভাগ নুবুওয়াত মনে করা।**

এটি বিভ্রান্তির দ্বিতীয় দরজা। স্বপ্নে যদি প্রকৃতই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে দেখা যায় এবং তিনি স্বপ্নে কুরআন বা হাদীসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু বলেন তবে তা কখনোই প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। স্বপ্নে যা-ই দেখা হোক না কেন শরীয়তে তার কোনো মূল্য নেই। শরীয়তের ভিত্তি শতভাগ নুবুওয়াত দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের উপর, অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাতের উপর। প্রয়োজনে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতে হবে। কিন্তু স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদি মুমিনের ব্যক্তিগত অনুভূতি। কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে বিচার করে তা গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

ইসলামের প্রথম যুগগুলোতে স্বপ্ন-কাশফ ইত্যাদিকে ব্যক্তিগত অনুভূতির পর্যায়েই রাখা হয়েছে। কোনো হাদীস বা ফিকহী মাসআলার বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে কখনোই স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির কোনোরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির আলোকে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা করা বা স্বপ্ন-কাশফকে দীন বা শরীয়তের সাথে সংযুক্ত করাই উম্মাতের অধঃপতন এবং ইসলামের বিকৃতির অন্যতম পথ। গোলাম আহমদ কাদিয়ানির মত অসংখ্য ভণ্ড স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদিতে তাদের মহা আধিপত্য প্রচার করছে। আর সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করছে। আমাদের হুজুরের সাথে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিশেষ সম্পর্ক। তিনি আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের কাছ থেকে না জেনে বা না শুনে কিছুই বলেন না। কাজেই তাঁর মতই একমাত্র সহীহ মত!!!

আর এজন্যই এখন বহু প্রকারের ইসলামের জন্ম হয়েছে। কেউ স্বপ্নে ধুমপানের নির্দেশ পেয়ে ধুমপান করাকে আহলুস সুন্নাহ হওয়ার শর্ত বানিয়েছেন। কেউ স্বপ্নে ধুমপানের নিষেধাজ্ঞা পেয়ে ধুমপান করাকে মহাপাপ বলে গণ্য করছেন। এভাবে দীন, শরীয়ত, হালাল, হারাম, হক, বাতিল ইত্যাদির মূল মাপকাঠি হয়ে গিয়েছে স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদি।

আলিমগণ তাদের ওয়াজ, তারবিয়াত ইত্যাদির ক্ষেত্রে মূলত স্বপ্ন-কাশফ ও হেকায়াত-কাহিনীর উপর নির্ভর করেন। প্রত্যেকেই নিজের মুরব্বী বা মতের সঠিকত্ব প্রমাণ করতে স্বপ্নের দলীল পেশ করেন। কেউ বলছেন, আমাদের বুজুর্গগণ স্বপ্নে (বা জাগ্রত অবস্থায়!!) রাসূলুলাহ ﷺ-কে মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে কিয়াম করতে দেখেছেন। কেউ বলছেন আমাদের বুজুর্গগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে স্বপ্নে নির্দেশ পেয়ে এ কাজ করেছেন। একে অপরের মত খণ্ডন করলেও স্বপ্ন-কাশফ ও গল্প নির্ভরতার বিষয়ে সকলেই একমত। ইসলামের প্রথম যুগগুলোর অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই স্বপ্ন-নির্ভর গল্প-কাহিনীর প্রচলন হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে।

এ কারণেই গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মত অগণিত ভণ্ড প্রতারকগণ সমাজের মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়। সকল আলিমই যেহেতু স্বপ্ন, কাশফ ও কারামতের গল্প বলেন সেহেতু সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বেশি। কুরআন-হাদীসের কথা বলে সাধারণ মুসলিম সমাজকে যতটুকু প্রভাবিত করা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবিত করা যায় স্বপ্ন, কাশফ, কারামত ইত্যাদির

গল্প দিয়ে।

হাদীস বলার ক্ষেত্রে দেশের আলিমগণ সহীহ-যয়ীফ আলোচনা করেন না এবং হাদীস-গ্রন্থের রেফারেন্স দেওয়ার গুরুত্ব কেউই বলেন না। বরং এগুলো বললে তাঁরা আপত্তি করেন। এজন্য সাধারণ মুসলিমগণ এ বিষয়ে মোটেও সচেতন নন। ফলে প্রতারক ও ভণ্ডগণ যা খুশি হাদীস বলে চালিয়ে দেন।

প্রিয় পাঠক, অনেকেই সমাজের অবক্ষয়, শিরক-কুফর, ভণ্ডদের প্রসার ইত্যাদি দেখে কষ্ট পান এবং এগুলো পরিবর্তন ও সংস্কার করতে আগ্রহী হন। তবে কার্যকর সংস্কারের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়:

**প্রথমত:** আমাদের শিক্ষা, তারবিয়াত, তাসাউফ, ফিকহ, ওয়াজ, আলোচনা, ফযীলত, দাওয়াত ইত্যাদি সকল কর্মকাণ্ড একান্তই কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের জীবন কেন্দ্রিক হতে হবে। স্বপ্ন, কাশফ, হেকায়াত, পরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের নামে প্রচারিত গল্প, কারামত ইত্যাদি যথাসম্ভব পরিহার করা উচিত। কয়েকটি কারণে তা করা উচিত:

(১) এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের মহব্বত আমাদের হৃদয়ে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকবে।

(২) হাদীসে নাবাবী ও হাদীসে সাহাবার অন্তত সনদ পাওয়া যায় এবং সহীহ বা জাল যাচাই করা সম্ভব। পক্ষান্তরে পরবর্তী বুজুর্গগণের নামে প্রচলিত গল্প, উক্তি, কারামত ইত্যাদির তেমন কোনো সনদ পাওয়া যায় না এবং এ ময়দানে জালিয়াতদের কারসাজিও খুব বেশি।

(৩) রাসূলুলাহ ﷺ-এর পরে সাহাবীগণকে কুরআন-হাদীসে উম্মাতের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী বুজুর্গগণের বিষয়ে তা বলা হয় নি। বরং তাঁরা তাদের বুজুর্গির পাশাপাশি ইজতিহাদ বা অসতর্কতা বশত বিভিন্ন খেলাফে সুন্নাত কাজ করেছেন। তাঁদের সকল বিষয় অনুকরণীয় নয়। তাঁদের কেউ সামা কাওয়ালী করেছেন, কেউ খেলাফে সুন্নাতভাবে নির্জনবাস করেছেন। কেউ খেলাফে সুন্নাত কথা বিভিন্ন হালতে বলেছেন। এগুলোর সত্য-মিথ্যা বা জালিয়াতি নির্ণয় যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এগুলোর আলোচনা ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার বয়ে আনে না। ভণ্ড-প্রতারকগণ মূলত এ সকল গল্প-কাহিনীর অপব্যবহার করেই মুমিনদের ঈমান বিনষ্ট করে।

### (ছ) আরো কিছু প্রচলিত ভিত্তিহীন কথা

আমাদের সমাজে আরো অগণিত ভিত্তিহীন ও মিথ্যা কথা দীনের নামে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। এ সকল মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথার মধ্যে রয়েছে:

১. কুলুখ মীযানের পাল্লায় ওজন করা হবে। এজন্য সাহাবীগণ বড় বড় ঢিলা ব্যবহার করতেন এবং তা দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুচকি হাসতেন।

২. "১৪০০ বছর পর কি হবে আমি জানি না"।

৩. মূসা (আ) মহান আল্লাহকে তাঁর রাজ্জাকিয়্যাত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তখন আল্লাহ তাঁকে হাতের লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করার নির্দেশ। প্রথম পাথর ভেঙ্গে ভিতরে দ্বিতীয় পাথর দেখা যায়। দ্বিতীয় পাথর ভাঙ্গলে ভিতরে তৃতীয় পাথর দেখা যায়। তৃতীয় পাথর ভাঙ্গলে তার ভিতর থেকে কচি ঘাস মুখে একটি পোকা বেরিয়ে আসে....।

৩. শুক্রবার হজ্জ হলে তা আকবারী হজ্জ বলে গণ্য হবে। আর এ হজ্জে আরব দেশের সরকারের দায়িত্ব সকল হাজ্জীকে উপহার দেওয়া।

৪. ঝড় হলে আযান দেওয়া এবং এ আযানে 'হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ' বলা বাদ দেওয়া।

৫. শূকর বা শুয়র বললে ৪০ দিন মুখ নাপাক থাকে।

৬. "যে মুরশিদ সে রাসূল খোদাও সে কোরানে কয়"।

৭. তাসের উদ্ভব: যাকারিয়া (আ)-কে হত্যা করে তাঁর রক্ত গাছের পাতায় লাগিয়ে খেলা করা হয় এবং তা থেকেই তাস খেলার উদ্ভব।

৮. ফুটবলের উদ্ভব: জনৈক নবীকে হত্যা করে তাঁর মাথা নিয়ে খেলা থেকে ফুটবল খেলার উদ্ভব।

৯. সুলাইমান (আ) আকাশ দিয়ে উড়ছিলেন। তা দেখে একজন সুবহানাল্লাহ বলেন। তখন তিনি আকাশ থেকে নেমে এসে তাঁর 'সুবহানাল্লাহর' সাওয়াবের বিনিময়ে তাঁর রাজত্ব দিতে চান।

১০. জনৈক দরিদ্র মুসা (আ)- কে বলেন, হে মুসা, আল্লাহকে বলুন, আমার সারা জীবনের রিজক যেন একদিনে দিয়ে দেন। তাই হলো, সবকিছু দিয়ে সে বিভিন্ন উপাদেয় খাবার তৈরি করল এবং দেশের ফকিরদের দাওয়াত করে খাওয়াল। ফকিররা দুআ করল, হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিদিনের রিজক তুমি এর মাধ্যমেই দিও। তাই হলো, তার দুঃখ ঘুচল।

১১. কলা হাত দিয়ে ভেঙে খাওয়া সুন্নাত।

১২. জন্মের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হারিয়ে যান। তাঁর মাতা আমিনা পেরেশান হয়ে যান। তখন গায়েবী আওয়াজ হয়: তোমার ছেলেকে সারা মাখলুক দেখতে চেয়েছে....।

১৩. রাসূলুলাহ (ﷺ) খেলছিলেন। আবু জাহল তাঁকে উঠের পিঠে নিজের পিছনে উঠিয়ে নেয়। তখন উঠ আর চলে না। তাঁকে সামনে নেবার পর চলা শুরু করে।

১৪. পানিতে পেশাব করলে কেয়ামতে আল্লাহ পানি থেকে পেশাব আলাদ করতে বলবেন।

১৫. পুরুষেরা জুমুআ পড়ে না এলে মহিলারা নামায পড়বেন না।

১৬. ঔষুধ খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' না বলে 'আল্লাহ শফি, আল্লাহ কাফি, আল্লাহ মাফি' বলতে হবে। 'বিসমিল্লাহ' বলে ঔষুধ খেলে ঔষুধ পানি হয়ে যায়।

১৭. রাসূলুলাহ ﷺ- এর হায়াত ৯০ বছর। ৬৩ বছর পৃথিবীতে ২৭ বছর মি'রাজ।

১৮. শবে মেরাজের ইবাদতে ১০০ রাতের ইবাদতের সাওয়াব।

১৯. আলী (রা) একবার মাত্র রাসূলুলাহ (ﷺ)-কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখে ফেলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে তা বলতে নিষেধ করেছিলেন। এ অতি আশ্চর্য বিষয় বলতে না পেরে তাঁর পেট ফেটে যাচ্ছিল। অবশেষ তিনি বাধ্য হয়ে মাঠের মাঝে এক বিরান কুয়ার মধ্যে নেমে কথাটা বলেন, তাতে কুয়া ফেটে পানি বের হয়ে যায়। সে পানিতে কুয়ার পাশে বাঁশ জন্মে। সে বাঁশের বাশি থেকে আওয়াজে এ গোপন কাহিনী প্রচার হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ জালিয়াতদের লাঞ্ছিত করুন।

## শেষ কথা

হাদীসের নামে জালিয়াতির এ আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আমাদের চারিপাশে অগণিত জাল হাদীসের ছড়াছড়ি। ওয়াযে, আলোচনায়, লেখনিতে ও গবেষণায় সর্বত্রই এ সকল মিথ্যা ও বানোয়াট কথার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। হাদীসের নামে বা রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচলিত ও প্রচারিত এ সকল অগণিত জাল কথার মধ্য থেকে কিছু বিষয় এ পুস্তকে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। অনেক বিষয়েই আলোচনা করা সম্ভব হলো না। আমরা আশা করছি, নতুন প্রজন্মের আলিমদের মধ্যে গবেষকগণ কলম ধরবেন এবং এ বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে এদেশের মুসলিমদেরকে জাল হাদীসের পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করবেন।

সাইয়্যেদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহীহ সুন্নাতকে জীবিত করা এবং মিথ্যা, জাল, ভিত্তিহীন বা অনির্ভরযোগ্য কথা আলোচনা, বর্ণনা, পালন বা বিশ্বাসের কঠিন পাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার আবেগে অযোগ্যতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করলাম। স্বভাবতই এর মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি রয়েছে। আমি সকল ভুলভ্রান্তির জন্য আলাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি ও তাওবা করছি।

এ নগণ্য প্রচেষ্টার মধ্যে যা কিছু কল্যাণকর রয়েছে তা সবই মহান আল্লাহর দয়া ও তাওফীক। তাঁর পবিত্র দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন দয়া করে তাঁর প্রিয়তম রাসূলের (ﷺ) সুন্নাতের খেদমতে এ নগণ্য প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নেন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা ও সকল পাঠকের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন!

وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.

# গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। যে সকল গ্রন্থ থেকে সরাসরি তথ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে সেগুলোর তালিকা ও তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো। আগ্রহী পাঠক ও গবেষক প্রয়োজনে এ গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যাদির বিশুদ্ধতা যাচাই ও অতিরিক্ত গবেষণার জন্য এ তালিকার সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন। পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে তালিকাটি ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলো। মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, উম্মাতের যে সকল ইমাম, মুহাদ্দিস, আলিম ও বুযুর্গের ইলমের ভাণ্ডার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং এ পুস্তকের তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি তাঁদের সকলকে আল্লাহ রহমত করুন এবং উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।


১. আল-কুরআনুল কারীম
২. আবু হানীফা নুমান ইবনু সাবিত (১৫০হি.), আল-ফিকহুল আকবার, মুল্লা কারীর শারহ সহ, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪.খৃ.)
৩. মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি), আল-মুআত্তা (কাইরো, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৫১)
৪. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি), আয-যুহদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৫. রাবীয় ইবনু হাবীব, আল-মুসনাদ (ওমান, দারুল হিকমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫হি)
৬. শাফেয়ী, মুহাম্মদ বিন ইদরীস (২০৪হি), আল-উম্ম (বৈরুত, দার আল -মারিফা, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি)
৭. শাফিয়ী, আর-রিসালাহ (কাইরো, আহমাদ শাকির, ১৯৩৯)
৮. আব্দুর রাজ্জাক সানআনী (২১১হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি)
৯. ইবনু হিশাম (২১৩হি.), আস-সীরাহ আন-নাবাবীয়্যাহ (কায়রো, দারুর রাইয়ান, ১ম প্র. ১৯৭৮)
১০. সাঈদ ইবনু মানসূর (২২৭ হি), আস-সুনান (রিয়াদ, দারুল উসাইমী, ১ম প্র. ১৪১৪ হি)
১১. ইবনু আবী শাইবা (২৩৫হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫)
১২. আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মিশর, মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮)
১৩. আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৪. আবদ ইবনু হুমাইদ (২৪৯হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম, ১৯৮৮)
১৫. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি)
১৬. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি), আত-তারীখুস সাগীর (হালাব, সিরিয়া, দারুল ওয়াঈ, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৭)
১৭. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৮. বুখারী, আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)
১৯. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি), আস-সহীহ (কাইরো, এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা)
২০. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, কিতাবুত তাময়ীয (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাউসার, ৩য়, ১৯৯০)
২১. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)
২২. আল-ফাকিহী, মুহাম্মদ বিন ইসহাক্ব (২৭৫হি), আখবারু মাক্কাহ (বৈরুত, দারু খিদির, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি)
২৩. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)
২৪. বালাযুরী আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া (২৭৯ হি), আনসাবুল আশরাফ (কাইরো, মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ, ১৯৫৯)
২৫. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি) ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর (বৈরুত, আলামুল কুতুব, আবু তালিব কাযী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯)
২৬. তিরমিযী, আস-সুনান (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী)
২৭. বাযযার, আবু বাকর আহমাদ ইবনু আমর (২৯২ হি), আল-মুসনাদ (বৈরুত, মুআসসাসাতু উলুমিল কুরআন, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯)
২৮. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী (২৯৪ হি), মুখতাসারু কিয়ামিল্লাইল (ফাইসাল আবাদ, পাকিস্তান, হাদীস একাডেমী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৪)
২৯. নাসাঈ, আহমাদ ইবনু শু'আইব (৩০৩হি), আদ-দু'আফা ওয়াল মাতরূকীন (সিরিয়া, হালাব, দারুল ওয়াঈ, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৯হি)
৩০. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১খৃ)
৩১. নাসাঈ, আস-সুনান, বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯২।
৩২. আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী (৩০৭হি), আল-মুসনাদ (সিরিয়া, দিমাশক, দারুস সাকাফাহ আল- আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
৩৩. তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তারীখুল উমামি ওয়াল মুলুক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি)
৩৪. তাবারী, জামিউল বায়ান/তাফসীর তাবারী (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৮)
৩৫. খাল্লাল, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩১১হি) আস-সুন্নাহ (রিয়াদ, দারুর রাইয়াহ, ১ম, ১৪১০হি)
৩৬. ইবনু খুযাইমা, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩১১ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৭০)
৩৭. ইবনু খুযাইমা, কিতাবুত তাওহীদ (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৯৭)
৩৮. হাকীম তিরমিযী (৩২০হি), নাওয়াদিরুল উসূল (কাইরো, রাইয়ান, ১ম প্র. ১৯৮৮)
৩৯. আবূ জা'ফর তাহাবী (৩২১), আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ, ইবন আবীল ইজ্জ হানাফীর শারহ সহ, (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮খ্রি.)
৪০. ইবনু দুরাইদ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (৩২১ হি), জামহারাতুল লুগাহ (হাইদারাবাদ, ভারত, দাইরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৩৪৫ হি)
৪১. ইবনু আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ (৩২৭ হি), আল ইলাল (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৪০৫ হি)
৪২. ইবনু আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ (৩২৭ হি), আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৫২)
৪৩. নাহহাস, আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ (৩৩৮ হি), মা'আনিল কুরআনির কারীম (মক্কা মুকাররমা, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮)
৪৪. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান (৩৫৪হি), আস-সহীহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
৪৫. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৫)
৪৬. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন (হালাব, সিরিয়া, দার আল-ওয়াঈ)
৪৭. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমাদ (৩৬০ হি), আল-মু'জামুল কাবীর (মাউসিল, ইরাক, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৩)
৪৮. তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৪৯. তাবারানী, আল-মু'জামুস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)

৫০. রামহুরমুযী, হাসান ইবনু আব্দুর রাহমান (৩৬০ হি), আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ৩য় মুদ্রণ, ১৪০৪ হি)
৫১. ইবনু আদী, আবু আহমাদ আব্দুল্লাহ (৩৬৫ হি), আল-কামিল ফী দুআফাইর রিজাল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৮)
৫২. আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ, ইবনু হাইয়ান আল-ইসফাহানী (৩৬৯হি), আল-আযামাহ (রিয়াদ, দারুল আসিমাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮হিঃ)
৫৩. ইবনুল মুকরি', আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম (৩৮১হি.), আর রুখসাতু ফী তাকবীলিল ইয়াদ, রিয়াদ, দারুল আসিমা, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.)
৫৪. জাওহারী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ (৩৯৩ হি), আস-সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলমি লিল-মালাঈন, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯)
৫৫. ইবনু ফারিস, আহমাদ (৩৯৫ হি), মু'জাম মাকাঈসুল লুগাহ (কুম, ইরান, মাকতাবুল ই'লাম আল-ইসলামী, ১৪০৪ হি)
৫৬. হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫ হি), মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ ১৯৭৭)
৫৭. হাকিম নাইসাপূরী, আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র, ১৯৯০)
৫৮. হামযা ইবনু ইউসূফ জুরজানী (৪২৭হি), তারীখ জুরজান (বৈরুত, আলামুল কুতুব, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮১)
৫৯. আবূ নু'আইম ইসপাহানী, আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৩০ হি), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৫হি)
৬০. আবূ নু'আইম ইসপাহানী, মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফা (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাউসার, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫হি)
৬১. খালীলী, খালীল ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৪৬ হি), আল-ইরশাদ (বৈরুত, দারুল ফিক্র, ১৯৯৩)
৬২. ইবনু হাযম, আলী ইবনু আহমাদ (৪৫৬হি) আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪হি)
৬৩. ইবনু হাযম, আসমাউস সাহাবাহ আর-রুআত (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
৬৪. বাইহাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮হি.), আল-ই'তিকাদ (বৈরুত, দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১)
৬৫. বাইহাকী, শুআবুল ঈমান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
৬৬. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪)
৬৭. বাইহাকী, হাইয়াতুল আম্বিয়া (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলূম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)
৬৮. বাইহাকী, কিতাবুয যুহদ আল-কাবীর (বৈরুত, কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৬)
৬৯. ইবনু আব্দিল বার্‌র, ইউসূফ ইবনু মুহাম্মাদ (৪৬৩হি) আত-তামহীদ (মরোক্কো, ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৩৮৭ হি)
৭০. খতীব বাগদাদী, আহমাদ ইবনু আলী ইবনু সাবিত (৪৬৩ হি), আল-কিফাইয়াতু ফী ইলমির রিওয়াইয়া (মদীনা মুনাওয়ারা, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ)
৭১. খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৭২. খতীব বাগদাদী, আল-জামিয় লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি' (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪০৩হি)
৭৩. গাযালী, আবু হামিদ, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৫০৫ হি) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
৭৪. ইবনুল কাইসূরানী, আবুল ফাদল মুহাম্মাদ ইবনু তাহির (৫০৭ হি), শুরুতুল আইম্মাহ আস-সিত্তাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ হি)
৭৫. ইবনুল কাইসুরানী, তাযকিরাতুল হুফফায (রিয়াদ, দারুস সুমাইয়ী, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫হি)
৭৬. দাইলামী, শীরওয়াইহি ইবনু শাহারদার (৫০৯হি) আল-ফিরদাউস (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬)
৭৭. ইবনুল আরাবী, আবু বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (৫৩৪ হি), আহকামুল কুরআন (বৈরুত, দারু ইহয়িয়াউত তুরাসিল আরাবী)
৭৮. যামাখশারী, মাহমুদ বিন উমর (৫৩৮ হি), আল-কাশশাফ (বৈরুত, দার আল-মারিফা)
৭৯. জূযকানী, হুসাইন ইবন ইবরাহীম (৫৪৩ হি), আল-আবাতীল ওয়াল মানাকীর ওয়াস সিহাহ ওয়াল মাশাহীর (রিয়াদ, দারুস সুমাইয়ী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪২২ হি/২০০১খৃ)
৮০. কাযী ইয়ায ইবন মূসা (৫৪৪ হি), আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুসতাফা (শামিলা ৩.৫)
৮১. ইবনু আতিয়্যাহ, আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক (৫৪৬ হি), আল- মুহাররার আল ওয়াজীয (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩)
৮২. আব্দুল কাদির জীলানী (৫৬১হি.), গুনিয়াতুত তালিবীন, (অনুবাদ নুরুল আলম রঈসী, চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২)
৮৩. আব্দুল কাদির জীলানী, সিররুল আসরার (অনুবাদ মাও. আব্দুল জলীল, ঢাকা, হক লাইব্রেরী, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৯৮), পৃ. ৩৭।
৮৪. আলী ইবনু আবী বাক্‌র মারগীনানী (৫৯২ হি), হেদায়া (বৈরুত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
৮৫. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), আল-ইলালুল মুতানাহিয়্যাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হি)
৮৬. ইবনুল জাওযী, আল-মাউদূআত (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫হি)
৮৭. ইবনুল জাওযী, আদ-দুয়াফা ওয়াল মাতরূকুন (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি)
৮৮. ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুসতাফা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ. ১ম মুদ্রণ, ১৯৮৮)
৮৯. ইবনুল আসীর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারাক (৬০৬ হি), আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস (বৈরত, দারুল ফিকর)
৯০. মুঈন উদ্দীন চিশতী (৬৩৩ হি), আনিসুল আরওয়াহ, দলিলুল আরেফীন ও ফাওয়ায়েদুস সালেকীন সহ (অনুবাদ কফিল উদ্দীন চিশতী, ঢাকা, চিশতিয়া পাবলিকেশন্স, ৩য়, ১৪১৫ হি)
৯১. মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি) আল-আহাদীস আল-মুখতারাহ (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতুন নাহদাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০হি)
৯২. সাগানী, হাসান ইবনু মুহাম্মাদ (৬৫০ হি) আল-মাউদূ'আত (দামেশক, দারুল মামূন, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৫)
৯৩. আল-মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবনু আব্দুল কাবী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল কুতুবলি ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি)
৯৪. ইবনুল আবার, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ কুযায়ী (৬৫৮ হি), আত-তাকমিলা লিকিতাবিস সিলাহ (শামিলা)
৯৫. কুরতুবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ (৬৭১ হি), আল- জামে'লি আহকামিল কুরআন (বৈরুত, দার আল-ফিকর, তা.বি.)
৯৬. নাবাবী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬হি), শারহু সাহীহ মুসলিম (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২হি)
৯৭. ইবনু খালিকান (৬৮১হি.), ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান (ইরান, কুম, মানশুরাতুশ শরীফ আর-রাযী, ২য় প্রকাশ)
৯৮. ইবনু মানযূর, মুহাম্মাদ ইবনু মাকরাম (৭১১ হি) লিসানুল আরাব (বৈরুত, দারু সাদির)
৯৯. নিযামুদ্দিন আউলিয়া (৭২৫ হি), রাহাতুল মুহিব্বীন (অনুবাদ কফিল উদ্দীন আহমাদ, বারগাহে চিশতিয়া, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪)
১০০. নিজামুদ্দীন আউলিয়া (৭২৫হি), রাহাতিল কুলুব (অনুবাদ কফিল উদ্দীন আহমাদ, বারগাহে চিশতিয়া, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪)
১০১.ইবনু তাইমিয়া, আহমাদ ইবনু আব্দুল হালীম (৭২৮ হি), আল-ইসতিগাসাহ ফির রাদ্দি আলাল বাকরী (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১০২.ইবনু তাইমিয়া, আহাদীসুল কুসসাস (বৈরূত, মাকতাব ইসলামী, ২য় প্র., ১৯৮৫)
১০৩. ইবনু তাইমিয়া, মাজমূ'উ ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১)
১০৪. ইবনু তাইমিয়া, কিতাবুর রাদ্দি 'আলাল আখনাঈ (রিয়াদ, দারুল ইফতা)
১০৫. ইবনু জামা'আ, মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম (৭৩৩ হি), আল-মানহালুর রাবী (দামেশক, দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি)

১০৬.মুযযী, ইউসূফ ইবনুয যাকী (৭৪২ হি), তাহযীবুল কামাল (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮০)
১০৭. ইবনু আব্দুল হাদী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৭৪৪ হি) আস-সারিম আল-মানকী (রিয়াদ, দারুল ইফতা, ১৯৮৩)
১০৮. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৭৪৮ হি) মীযানুল ই'তিদাল (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫)
১০৯.যাহাবী, মুগনী ফিদ দুআফা' (বৈরুতু, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১১০.যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম মুদ্রণ, ১৪১৩হি)
১১১.যাহাবী, তারবীবু মাউযূআত ইবনিল জাওযী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪)
১১২.ইবনুল ক্বাইয়িম, মুহাম্মদ বিন আবি বকর, নাক্বদুল মানকুল (বৈরুত, দার আল-ক্বাদেরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০)
১১৩.ইবনুল কাইয়িম, আল মানার আল মুনীফ (সিরিয়া, হলব, মাকতাব আল মাতবুয়াত আল ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৭০),
১১৪.ইবনুল কাইয়িম, হাশিয়াত সুনানি আবী দাউদ (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৫)
১১৫.ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ (বৈরুত, মুআসসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭)
১১৬.ইবনুল কাইয়িম, আর-রূহ (জর্ডান, মাকতাবাতুল মানার, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
১১৭.আবু হাইয়্যান, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ (৭৫৪ হি), আল-বাহর আল-মুহীত (বৈরুত, দার আল-ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩)
১১৮.যাইলায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ (৭৬২ হি), নাসবুর রাইয়াহ (কাইরো, দারুল হাদীস, ১৩৫৭ হি)
১১৯.ইবনু কাসীর ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪ হি), তুহফাতুল তালিব (মক্কা মুকাররামা, দারু হিরা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি)
১২০.ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্র, ১৯৯৬)
১২১.ইবনু কাসীর, তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম (কায়রো, দার আল-হাদীস, ২য় সংস্করণ, ১৯৯০)
১২২.ইবনু কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১২৩.সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১হি.), শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ (দেউবন্দ)
১২৪.ইবনু আবিল ইজ্জ হানাফী (৭৯২হি.), শারহুল আকীদাহ আত তাহাবিয়্যাহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮খ্রি.)
১২৫.ইবনু রাজাব, আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫হি.), লাতায়িফুল মাআরিফ (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১২৬.ইবনু রাজাব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১ম প্র, ১৪০৮ হি)
১২৭.ইবনু রাজাব, শারহু ইলালিত তিরমিযী (বৈরুত, আলামুল কুতুব, ২য় মুদ্রণ ১৯৮৫)
১২৮. ইবনুল মুলাক্কিন, উমার ইবনু আলী (৮০৪হি), খুলাসাতুল বাদরিল মুনীর (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি)
১২৯.ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬হি), আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১৩০. ইরাকী, তাখরীজ এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, এহইয়া-সহ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
১৩১.ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬হি), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মিশর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯০)
১৩২.হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭ হি), মাওয়ারিদুয যামআন (দামেশক, দারুস সাকাফাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
১৩৩. হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২)
১৩৪. জুরজানী, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৮১৬হি), তা'রীফাত (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি)
১৩৫. বুসীরী, আহমাদ ইবনু আবী বকর (৮৪০হি.) মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাতিল মাহারাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.)
১৩৬. বুসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ (বৈরুত, দারুল আরাবিয়্যাহ, ২য মুদ্রণ, ১৪০৩ হি)
১৩৭. বুসীরী, যাওয়াইদ ইবনি মাজাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৯৩)
১৩৮. ইবনু হাজার আসকালানী, আহমাদ ইবনু আলী (৮৫২ হি), লিসানুল মীযান (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতু আল-আ'লামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৬)
১৩৯. ইবনু হাজার, আল-মাতালিবুল আলিয়াহ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১৪০. ইবনু হাজার, আদ-দিরাইয়াহ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ)
১৪১.ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি)
১৪২.ইবনু হাজার, নুখবাতুল ফিকর (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী)
১৪৩. ইবনু হাজার, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযীস সাহাবা (বৈরুত, দারুল জীল, ১ম, ১৯৯২)
১৪৪. ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর (মদীনা মুনাওয়ারা, সাইয়িদ আব্দুল্লাহ হাশিম, ১৯৬৪)
১৪৫. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব (সিরিয়া, হালাব, দারুর রাশীদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬)
১৪৬. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্র, ১৯৮৪)
১৪৭. ইবনু হাজার, আল-কাওলুল মুসাদ্দাদ (কাইরো, মাকতাবাত ইবন তাইমিয়া, ১ম, ১৪০১হি)
১৪৮. ইবনু কাতলূবগা, যাইনুদ্দীন কাসিম (৮৭৯), তাজুত তারাজিম ফী মান সান্নাফা মিনাল হানাফিয়্যাহ (দেমাশক, দারুল মামুন, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
১৪৯.সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২ হি) আল-কাওলুল বাদী' (মদীনা মুনাওয়ারাহ, আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৭)
১৫০. সাখাবী, আল-মাকাসিদুল হাসানাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র, ১৯৮৭)
১৫১.সাখাবী, ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫)
১৫২. সুয়ূতী, জালাল উদ্দীন (৯১১ হি) আদদুররুল মানছূর (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০০)
১৫৩. সুয়ূতী, আল-জামি'য়ুস সাগীর (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১)
১৫৪. সুয়ূতী, যাইলুল লাআলী (ভারত, আল-মাতবাউল আলাবী, ১৩০৩ হি)
১৫৫. সুয়ূতী, আন-নুকাতুল বাদী'আত (কাইরো, দারুল জানান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১)
১৫৬. সুয়ূতী, জালাল উদ্দীন, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
১৫৭. সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ)
১৫৮. সুয়ূতী, আল-লাআলী আল-মাসনু'আ (বৈরুত, দারুল মারিফাহ)
১৫৯. সুয়ূতী, শারহুস সুদূর (বৈরুত, দারুল কুতবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৬০. জালাল উদ্দীন মাহালী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৮৬৪হি) ও জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরুল জালালাইন (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ)
১৬১.কাসতালানী, আহমদ ইবন মুহাম্মাদ (৯২৩ হি), আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬)
১৬২.শামী, মুহাম্মাদ ইবন ইউসূফ (৯৪২হি), সীরাহ শামিয়াহ: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (বৈরুত, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)
১৬৩. আবুস সু'উদ, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল ইমাদী (৯৫১ হি), তাফসীর-ই-আবিস সু'উদ (বৈরুত, দারু ইহয়িয়ায়িত তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি.)

১৬৪. ইবনু আর্‌রাক, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৯৬৩ হি). তানযীহুশ শারীয়াহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্র, ১৯৮১)
১৬৫.ইবনু হাজার হাইতামী মাক্কী আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৯৭৪হি.) ফাতাওয়া হাদীসীয়্যাহ (বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাস, ১ম, ১৯৯৮)
১৬৬.ইবন হাজার হাইসামী, আন-নি'মাতুল কুবরা ((মিসরের জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, নং ৪৪৯)
১৬৭.ইবন হাজার হাইতামী, আন-নি'মাতুল কুবরা (তুরস্ক, মাকতাবাতুল হাকীকাহ, ১৯৯৩ খৃ)
১৬৮. ইবন হাজার হাইতামী, তুহফাতুল মুহতাজ ফী শরাহিল মিনহাজ (শামিলা ৩.৫)
১৬৯.মুহাম্মাদ তাহির পাটনী (৯৮৬ হি) তাযকিরাতুল মাউযূ'আত (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৯ হি)
১৭০. মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল-আসরার আল-মারফূ'আহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
১৭১.মোল্লা আলী কারী, আল মাসনু' (হালব, সিরিয়া, মাকতাব আল-মাতবু'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯)
১৭২.মোল্লা 'আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৪)
১৭৩. মোল্লা আলী কারী, শরাহু শারহি নুখবাতিল ফিকর (বৈরুত, দারুল আরকাম)
১৭৪. মোল্লা আলী কারী, শারহু মুসনাদি আবী হানীফা, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
১৭৫. মোল্লা আলী কারী, শারহুশ শিফা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
১৭৬.মুনাবী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি), ফাইযুল কাদীর শারহু জামিয়িস সাগীর (মিশর, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল-কুবরা, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৬ হি)
১৭৭. মুনাবী, তা'আরীফ (বৈরুত, দারুল ফিক্‌র, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি)
১৭৮. মুজাদ্দিদ আলফ সানী, আহমাদ ইবন আব্দুল আহাদ সারহিন্দী (১০৪৩হি), মাকতুবাত শরীফ, বঙ্গানুবাদ শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমাদ আফতাবী (ঢাকা, আফতাবীয়া খানকাহ শরীফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪২০হি)
১৭৯.মুজাদ্দিদ আলফ সানী, মাকতুবাত শরীফ, জিলদে দুওম, বঙ্গানুবাদ এ.টি. খলীল আহমাদ, (ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
১৮০. হালাবী, আলী ইবনু বুরহান উদ্দীন (১০৪৪ হি), আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যাহ (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৪০০ হি)
১৮১.আব্দুল হক্ক দেহলবী (১০৫২ হি), মুকাদ্দিমা ফী উসূলিল হাদীস (বৈরুত, দারুল বাশাইর, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৬)
১৮২. মোল্লা চালপী হাজী খালীফা, মুসতাফা ইবনু আব্দুল্লাহ (১০৬৭ হি), কাশফুয যুনূন (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৯৯২)
১৮৩. যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২ হি), মুখতাসারুল মাকাসিদ আল-হাসানাহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৩)
১৮৪. যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
১৮৫. আল-আজলূনী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ (১১৬২ হি), কাশফুল খাফা (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৫ হি)
১৮৬. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, আহমাদ ইবনু আব্দুর রাহীম (১১৭৬হি.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা (বৈরুত, দারু ইহয়ায়িল উলূম, ২য় প্রকাশ ১৯৯২)
১৮৭. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী, আল-কাউলুল জামিল (অনুবাদ, হাফেয মাওলানা আব্দুল জলীল, ঢাকা, হক লাইব্রেরী, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০০)
১৮৮. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইয়ামানী (১১৮১ হি), আন-নাওয়াফিহুল আতিরাহ (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
১৮৯. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫৫ হি.), আল ফাওয়ায়িদ আল মাজমুআ (মক্কা মুকাররমা, মাকতাবাতু মুস্তাফা নিযার আল-বায)
১৯০.শাওকানী, নাইলুল আউতার, (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩)
১৯১.শাওকানী, ফাতহুল ক্বাদীর (বৈরুত, দার আল-ফিকর, ১৯৮৩)
১৯২.আলুসী, সাইয়্যেদ মাহমুদ (১২৭০ হি), রুহুল মা'আনী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪)
১৯৩. দরবেশ হূত, মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ (১২৭৬ হি), আসনাল মাতালিব (সিরিয়া, হালাব, আল-মাকতাবা আল-আদাবিয়্যাহ)
১৯৪.আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), আল-আসারুল মারফূয়া ফীল আখবারিল মাউযূয়া (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪)
১৯৫.আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আজইবাতুল ফাযিলা লিল আসইলাহ আল-আশারাতিল কামিলা (হালাব, মাকতাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ৯৯৮৪)
১৯৬.আব্দুল হাই লাখনবী, যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী (দুবাই, দারুল কালাম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫ )
১৯৭.আব্দুল হাই লাখনবী, আন-নাফিউল কাবীর লিমান উতালিউল জামিয়িস সাগীর (ভারত, লাখনৌ, মাতবাআতুল ইউসূফী, ১ম প্রকাশ)
১৯৮. সিদ্দীক হাসান কান্নুজী (১৩০৭ হি), আবজাদুল উলূম (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৮)
১৯৯.রাহমাতুল্লাহ কিরানবী (১৩০৮হি), ইযহারুল হক (রিয়াদ, দারুল ইফতা, ১ম, ১৯৮৯)
২০০. মুহাম্মাদ ইবনুল বাশীর আল-মাদানী (১৩২৯ হি), তাহযীরুল মুসলিমীন (দামেশক, দারু ইবনি কাসীর, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি)
২০১.আল-কাত্তানী, মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার (১৩৪৫ হি), আর-রিসালাতুল মুসতাত্‌রাফা (বৈরুত, দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ৪ র্থ প্রকাশ ১৯৮৬)
২০২. মুবারকপুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান (১৩৫৩হি), তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
২০৩. থানবী, আশরাফ আলী (১৩৬২হি), তাফসীর-ই আশরাফী (ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী)
২০৪. মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন (১৩৬৪ হি/ ১৯৪৫ খৃ), বাগমারির ফকিরের ধোকাভঞ্জন (বশিরহাট, শরফুল আমিন, ২য়, ১৪০৬ বাং)
২০৫.মোহাম্মদ রুহুল আমিন, সিরাজগঞ্জের বাহাছ (বশিরহাট, নুরুল আমিন, ৩য়, ১৩৯৬ বাং)
২০৬. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, এজহারোল হক বা কদমচুছির ফতোয়ার সমালোচনা (বশিরহাট, শরফুল আমিন, ২য়, ১৪০৭ বাং)
২০৭.মুআলিমী, আব্দুর রাহমান ইবনু ইয়াহইয়া (১৩৮৬ হি), মুকাদ্দিমাতুল ফাওয়াইদিল মাজমূ'আ লিশ-শাওকানী (বৈরুত, মাতবা'আতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, ১ম, ১৯৬০)
২০৮. শানক্বীতী, মুহাম্মদ আমীন, (১৩৯৩ হি), আদওয়া আল- বায়ান (রিয়াদ, দারুল ইফতা)
২০৯. যিরিকলী, খাইরুদ্দীন (১৩৯৬হি), আল-আ'লাম (বৈরুত, দারুল ইলমি লিল মালাঈন, ৯ম প্রকাশ, ১৯৯০)
২১০.শামসুল হক আযীমাবাদী, আউনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি)
২১১.মুফতী শফী, মা'আরেফ আল-কুরআন (ঢাকা, ইফাবা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩),
২১২.মাওলানা মুহা. যাকারিয়া কান্ধলবী, ফাযায়েলে আমাল (অনুবাদ মুফতী মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ, ঢাকা, দারুল কিতাব, ১ম প্রকাশ, ২০০১)
২১৩.আহমাদ শাকির, মুসনাদু আহমাদ (কাইরো, দারুল মাআরিফ, ১৯৫৮)
২১৪.মুহাম্মাদ আজ্জাজ আল-খতীব, আস-সুন্নাতু কাবলাত তাদবীন (কাইরো, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৩)
২১৫.মুহাম্মাদ আবূ শাহবাহ, আল-ইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল মাউদূ'আত (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৮ হি)
২১৬.গুমারী, আহমাদ ইবন সিদ্দীক, আবুল ফাইয (১৩৮০/১৯৬০), আল-মুগীর আলাল আহাদীসিল মাউযুআতি ফিল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, দারুর রায়িদিল আরাবী)

২১৭.গুমারী, আব্দুল্লাহ ইবন সিদ্দীক, মুরশিদুল হায়ির লিবায়ানি ওয়াদয়ি হাদীসি জাবির (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা ৩.২৮)
২১৮. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন (১৪২০/১৯৯৯), সাহীহ জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮)
২১৯.আলবানী, যায়ীফুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য়, ১৯৯০)
২২০. আলবানী, সাহীহ সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্র, ১৯৯৭)
২২১.আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাআরিফ, ১ম প্র, ১৯৯৭)
২২২. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস যাঈফাহ (রিয়াদ, মাআরিফ, ১ম, ১৯৯২-২০০১)
২২৩. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাআরিফ, ১ম প্রকাশ)
২২৪. আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (রিয়াদ, মাআরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৯৮৮)
২২৫. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুত, মাকতাব ইসলামী, ১ম প্র, ১৯৭৯)
২২৬. আলবানী, মাকালাতুল আলবানী (রিয়াদ, দারু আতলাস, ২য় মুদ্রণ, ২০০১)
২২৭. আবূ জাফর সিদ্দিকী, হাজী মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ (১৪২৩/২০০২), আল-মাউযূআত (কলকাতা, সূফী প্রেস, পীরযাদা কুতুবুদ্দীন সিদ্দিকী প্রকাশিত)
২২৮. আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, আরবাউ রাসাইল ফী উলুমিল হাদীস (হালাব, সিরিয়া, মাকতাবুল মাতবু'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯০)
২২৯. মুহাম্মাদ সালিহ উসাইমীন, শারহুল বাইকূনিয়্যাহ (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫)
২৩০. আবু ইসহাক আল হুয়াইনী, জুন্নাতুল মুরতাব (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭)
২৩১.আবু তালিব কাযী, ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর (বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১ম, ১৯৮৯)
২৩২. বাকর বিন আব্দুল্লাহ আবু যাইদ, আল-তাহদীস (রিয়াদ, হিজরাহ, ১ম প্র, ১৯৯১)
২৩৩. মুহাম্মাদ মুস্তাফা আল-আযামী, মানহাজুন নাকদ ইনদাল মুহাদ্দিসীন (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাউসার, ৩য় মুদ্রণ ১৯৯০)
২৩৪. সাবুনী, মুহাম্মদ আলী, সাফওয়াতুত তাফাসীর (বৈরুত, দারুল কুরআন, ৪র্থ, ১৯৮১)
২৩৫. ড. মাহমূদ তাহহান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৮ম প্রকাশ, ১৯৮৭)
২৩৬. ডঃ খালদূন আল-আ'হদাব, যাওয়াইদু তারীখি বাগদাদ (দিমাশক, দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
২৩৭. ড. ফালাতা, উমার ইবনু হাসান, আল-ওয়াদউ ফিল হাদীস (বৈরুত, মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১)
২৩৮. ড. আমীন আবু লাবী, ইলমু উসূলিল জারহি ওয়াত তা'দীল (সৌদী আরব, আল-খুবার, দারু ইবনি আফফান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
২৩৯. অধ্যাপিকা কামরুন নেসা দুলাল, নেক আমল (চট্টগ্রাম, হাফেজ কামরুল হাসান, ২য় প্রকাশ, ২০০০)
২৪০. আলহাজ্জ কাজী মো. গোলাম রহমান, মকছুদোল মো'মেনীন (ঢাকা, রহমানিয়া লাইব্রেরী, ৪৮তম সংস্করণ, ২০০১)
২৪১.মৌলবী মো. শামছুল হুদা, নেয়ামুল কোরআন (রহমানিয়া লাইব্রেরী, ২৬, ২০০১)
২৪২. মুফতী হাবীব ছামদানী, বার চান্দের ফযীলত (ঢাকা, মীনা বুক হাউস, ১ম প্র, ২০০১)
২৪৩. শাহ মুহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ, পীর সাহেব ছারছিনা শরীফ, খুতবায়ে ছালেহীয়া (ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯)
২৪৪. মুস্তফা হামীদী, মুফতীয়ে আযম আল্লামা, মীলাদ ও কিয়াম, কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল প্রমাণে, (ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ২য় প্রকাশ, ২০০৫)
২৪৫. মাও. মুহাম্মাদ আমজাদ হুসাইন; অজীফায়ে ছালেহীন (ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ৩য় প্রকাশ ২০০২)
২৪৬. মো. বসির উদ্দীন আহমদ, নেক আমল (ঢাকা, উমেরুন্নেছা খানম, আব্বাছিয়া লাইব্রেরী, ৮ম প্রকাশ, ১৯৯১)
২৪৭. মুফতী ইয়ার খান, দিওয়ানে সালেক (চট্টগ্রাম, মুহাম্মাদী কুতুবখানা), পৃ. ৬১ ।
২৪৮. মুহাম্মাদ ইবন খাইর ইশবিলী (৫৭৫ হি); ফিহরিসত (বৈরুত, দারুল কুতুব, ১৯৯৮) ।
২৪৯. আব্দুল খালেক, এম. এ., সাইয়েদুল মুরসালীন (ঢাকা, ইফাবা. ৪র্থ সংস্ক. ১৯৯০)
২৫০. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রহমত (সা), (অনুবাদ, মাওলানা আব্দুল মতীন জালালাবাদী , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২)
২৫১.এম এন. এম ইমদাদুল্লাহ, আদি ও আসল কাছাছুল আম্বিয়া (ঢাকা, তাজ কোম্পানী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০১ বাংলা)
২৫২. আলহাজ্জ খান বাহাদুর আহছানউল্লা, ছুফী (ঢাকা, ই. ফা. বা. ২য় সংস্করণ ২০১১)
২৫৩. মাও. মো. আশরাফুজ্জামান, ছহী কাসাসুল আম্বিয়া (ঢাকা, সুলেখা প্রকাশনী, ১ম, ২০০৪)
২৫৪. সাইয়েদ দিলদার আলী, রাসূলুল কালাম ফিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম (লাহোর)
২৫৫. মুফতি আহমাদ ইয়ার খান, জা'আল হক (অনুবাদ অধ্যাপক লুৎফুর রহমান, মোহাম্মদী কুতুবখানা, চট্টগ্রাম, ১৯৮৮)
২৫৬. ড. মাহমূদ সায়ীদ, আল-ইত্তিজাহাতল হাদীসিয়্যাহ ফিল কারনির রাবিয় আশারা (কাইরো, দারুল বাসায়ির, ১৪৩০/২০০৯)
২৫৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, মাওলানা মুতীউর রহমান, প্রচলিত জাল হাদীস (ঢাকা, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়্যা, ১ম প্রকাশ ২০০৩)
২৫৮. আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী, মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসানাবাদী, প্রচলিত জাল হাদীসঃ একটি তাত্ত্বিক আলোচনা (চট্টগ্রাম, মাজমাউদ্দা'ওয়াতি ওয়াত তাহকীক, ১ম প্রকাশ ২০০৫)
২৫৯. ড. ঈসা ইবন আব্দুল্লাহ হিমইয়ারী, আল-জুযউল মাফকূদ মিনাল জুযয়িল আওয়ালি মিনাল মুসান্নাফ (কুয়েত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি/ ২০০৫ খৃ)
২৬০. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭)
২৬১.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ, ২০১৩)
২৬২. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিক্‌র-ওযীফা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৩)
২৬৩. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাতঃ গুরুত্ব ও প্রয়োগ (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ, ২০০৯)
২৬৪. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনানঃ সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৫ম সংস্করণ ২০০৭)
২৬৫. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ফুরফুরার পীর আল্লামা আবূ জাফর সিদ্দিকীর (রাহ) আল-মাউযুআতঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০০৯খৃ)
২৬৬. আঞ্জুমানে আহমাদিয়া রাহমানিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম, মাসিক তরজুমান (২৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মে-জুন ২০০৫)
২৬৭. বাংলা বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি
268. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut, Librairie Du Liban, 1980)
269. Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, USA, Michigan, Baker Book House, 13th printing 1987
270. The Oxford Illustrated History of Christianity, New York, Oxford University Press, 1990
271. Dr. Muhammad Ali Alkhuli, The Truth About Jesus Christ (Jordan, ALFALAH House for Publication,

2nd ed. 1996)
272. Muhammad Ridha Shushtary, The Claim of Jesus (Tehran, Iran, Chehel-Sotoon Madrasah & Library)
273. T. H. Horne, An Introduction to The Critical Study And Knowledge of The Holy Scriptures (London, 3rd Edition, 1822)